আধুনিক বাংলা কবিতার কালপুরুষ

পরিমল চক্রবর্তী

পাণ্ডুলিপি
১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক
মানস ভট্টাচার্য
১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৪

প্রচ্ছদ
প্রবীর সেন

মুদ্রক
দুলাল চন্দ্র ঘোষ
৩২ই জয় মিত্র স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৫

আধুনিক বাংলা কবিতার
উত্তরসাধকদের
হাতে

সূচীপত্র

প্রসঙ্গত

রবীন্দ্র-পরবর্তী দশজন বাঙালী কবিকে নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটির আলোচনা-পরিসরে আধুনিক বাংলা কবিতার বিচিত্র রূপটিকে সামগ্রিক জটিলতায় (total complexity) উন্মোচিত করতে চেষ্টা করেছি। রচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে, এই কবিতা নিয়ে এ-যাবৎ প্রকাশিত সব ক'টি গ্রন্থই, সেগুলির রচয়িতা-রচয়িত্রীদের সঙ্গে ক্ষেত্র-বিশেষে গুরুতর মতপার্থক্য সত্ত্বেও, শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে পাঠ করেছি : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনা সম্পর্কে অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছি ; তাথ্যিক (factual) নির্ভুলতার প্রয়োজনে কতিপয় আকরগ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছি এবং একাধিক বিদেশী কাব্যসমালোচকের রচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার প্রয়াস চালিয়েছি। আর, আধুনিক কবিতার কূটত্ব-প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন প্রশ্নকে সামনে রেখে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি কয়েকজন কৃতবিদ্য আধুনিক কাব্যসমালোচকের সঙ্গে। এই সব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার প্রতিটির এবং এই সমস্ত মনস্বী সমালোচকের প্রত্যেকের কাছেই কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করছি।

আলোচিত কবিদের রচনা সম্পর্কে মতামতজ্ঞাপনে বা মন্তব্যকরণে দায়িত্বের বোঝা সম্পূর্ণভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি এবং যথাসাধ্য পৈশুন্যমুক্ত থাকতে চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়-দায়িত্বও সম্পূর্ণভাবেই আমার নিজের।

গ্রন্থটি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণকালে আলোচিত কবিদের অনেকেই ছিলেন জীবিত ; আর আজ, গ্রন্থটির প্রকাশকালে, তাঁদের প্রায় সকলেই মৃত। একমাত্র সুকান্ত ভট্টাচার্য ব্যতীত এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো এবং এই গ্রন্থের আলোচনা-পরিধির অন্তর্গত যে-দু'জন কবি এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন, সেই অরুণ মিত্র ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সে-সম্পর্ক আজও আগের মতোই বজায় রয়েছে। আজ তাঁদের সকলের কথাই মনে পড়ছে, অন্তত দু'জনের কথা তো বিশেষভাবেই—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু, যাঁরা উভয়েই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে আমার শিক্ষক।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, এই গ্রন্থের প্রবেশিকা-প্রবন্ধটি ('আধুনিকতা ঃ কবিতার আধুনিকতা ঃ বাংলা কবিতার আধুনিকতা') 'জিজ্ঞাসা' ত্রৈমাসিকে, অমিয় চক্রবর্তীকে নিয়ে আলোচনার অংশবিশেষ ' "দূরযানী" ও অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দপ্রকরণ' নামে দু'টি অংশে বিভক্ত হ'য়ে 'কবিতাষু' ও 'অভিষেক'—এই দুই স্বল্পখ্যাত পত্রিকায় এবং বিষ্ণু দে-সম্পর্কিত আলোচনাটির কিয়দংশ 'বিষ্ণু দে ঃ কবিতায় লৌকিক ঐতিহ্য'—এই শিরোনামে 'সাহিত্যচিন্তা', ষাণ্মাষিকের 'বিষ্ণু দে স্মরণ-সংখ্যা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো, অন্য আলোচনাগুলিরও বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে নানা পত্র-পত্রিকায় ; কিন্তু অধিকাংশ আলোচনার অধিকাংশ অংশেরই আত্মপ্রকাশ মুদ্রিত আকারে এই প্রথম।

জানুয়ারি, ১৯৯৪ — পরিমল চক্রবর্তী

'নিরালা'
৪৩৪ পূর্ব সিঁথি রোড,
কলকাতা—৭০০০৩০

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

।। কবিতা ।।

নির্বাসিন
ঝর্ণা-মন
রঞ্জিত ফাল্গুনে
স্মৃতিবিস্মৃতির গান
পরিস্রুত অন্ধকার
ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি
তমসার তৃষ্ণা
ভাসানের ভেলা
যূথজনতার ভিড়ে আমি আছি একা
উৎসে ফিরে যেতে চাই
কবিতা-সমগ্র

।। গল্প ।।

রূপান্তর

।। প্রবন্ধ ।।

সাহিত্যের স্বাধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ

।। সমালোচনা ।।

তিরিশ-পরবর্তী বাংলা কবিতার দিক্‌চিহ্ন
ভক্তিবাদী বাঙালী কবি ঃ কাব্যকৃতি
তিরিশের অনালোচিত বাঙালী কবি
বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য ঃ মহিলা-কবি
বিচিত্র প্রসঙ্গ ঃ বিচিত্র ভাবনা

।। ইংরেজি ।।

The Green Signal
The Bridge of Seperation

।। অনুবাদ ।।

বিচ্ছেদের সেতু ('The Bridge of Seperation'-এর বঙ্গানুবাদ)

আধুনিকতা ঃ কবিতার আধুনিকতা ঃ বাংলা কবিতার আধুনিকতা

॥ এক ॥

আধুনিকতার ধারণাটা চিরকালই খুব গোলমেলে. কেননা এককথায় এর কোনো সংজ্ঞা হয়না, হওয়া সম্ভব নয়। অনেকগুলি লক্ষণ মিলিয়ে একে হয়তো সনাক্ত করা যায়. কিন্তু সেই লক্ষণগুলির কোনো একটি দিয়েও একে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়া যায় না। আবার সেই লক্ষণগুলির একাধিককে মিলিয়েও আধুনিকতার সনাক্তকরণ (identification) সকল সময় বা সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর না-ও হ'তে পারে. যেহেতু সেই লক্ষণগুলি, আধুনিকতার সংজ্ঞা-নির্ণয়কারীদের বিশ্লেষণে. বহু স্থলেই মাত্র বিভিন্ন নয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীতও। আবার এই বৈপরীত্যেরও নেপথ্য-নিয়ামক আধুনিকতার স্বরূপনির্ণয়-প্রয়াসীদের জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিত (perspective)-গত পার্থক্য। প্রাচীন চিন্তাবীর (old thoughtmaster)-দের ভাবনার গভীরে প্রবেশ না-ক'রেও, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দুই আধুনিকতার স্বরূপ-সন্ধানীর মতামতের সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে পরিচিত হওয়া যেতে পারে। কয়েক বছর আগে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত, চিলির কবি অক্টাভিও পাজ্-এর মতে, '···the very essence of modernity is the criticism of eternity'। আর, সম্প্রতি-প্রকাশিত এ-সম্পর্কিত আলোচনাগ্রন্থে ড্যানিয়েল বেল্-এর মানবেতিহাস পর্যবেক্ষণান্তিক সিদ্ধান্ত ঃ 'I see Modernism as an agency of the dissolution of the bourgeous world-view···'। দুই মন্তব্যকারীই মাননীয় এবং দু'টি অভিমতই মান্য ; কিন্তু মূলত (fundamentally) কত পৃথক! অথচ দু'জনের মন্তব্যেই রয়েছে আত্মগত (personal) উপলব্ধির উচ্চারণ। ফলে, দু'টি মন্তব্যই ষোলোআনা আন্তরিক। পাজ্-এর বিশ্লেষণে আধুনিকতার সমস্যাটি কালসত্তার শাশ্বত দিক্‌টির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং আধুনিকতার মৌলসত্ত্ব (essence) চিরন্তনতার সমালোচনায়, অর্থাৎ পরীক্ষিত পরিগ্রহণে। কিন্তু বেল-এর পর্যবেক্ষণে আধুনিকতা কালের চিরন্তনতার সমালোচনা নয়, কালপ্রবাহের খণ্ডপ্রসূত একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিগলন (dissolution)-এর মাধ্যম।

আধুনিকতার স্বরূপ-সম্পর্কিত ভাবনা-পার্থক্যের মতো আধুনিকতার লক্ষণ সম্পর্কেও গুরুতর মতবৈষম্য রয়েছে বিভিন্ন চিন্তাপথিক (thought-traveller)-দের মধ্যে। ভিন্ন-ভিন্ন মতের অনুবর্তীরা ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে ও প্রসঙ্গে এ-সম্পর্কে নিজেদের ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন। আধুনিকতার লক্ষণসন্ধিৎসু চিন্তাপরায়ণতার দুই বিপরীত কোটির একদিকে যেমন আছেন ইংরেজ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড,

অন্যদিকে তেমনই রয়েছেন বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথ। আর্নল্ড সাহেবের বিবেচনায় মুক্ত বুদ্ধির বিচরণ, যুক্তিভিত্তিক বিচারণ, মতাদর্শের বিশ্বাস-সম্মত গ্রহণ-বর্জন, আস্তিত্বিক সত্যসন্ধিৎসা, উদারতা, সহ্যশীলতা এবং বিশ্বাসপরায়ণতাই আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ। অথচ, অত্যাশ্চর্য লাগে, যখন ভাবি এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার কথা। 'অত্যাশ্চর্য' বলার হেতু এই যে তাঁর মতো স্থিতপ্রজ্ঞ মহামনীষির বিচারে আর্নল্ড-নির্ধারিত লক্ষণ সমূহকে ছাপিয়ে বিশ্বজাগতিক সর্ববিষয়ক 'বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমি'-সংলগ্নতাকেই আধুনিকতার মৌল লক্ষণ ব'লে প্রতিভাত হয়েছিলো। এখানেই এবং এই মুহূর্তেই এ-সম্পর্কে একটি কথা না-জানিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না। কথাটি এই যে, আমার স্থির বিশ্বাস, আধুনিকতার লক্ষণ-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই বিচারে তাঁর নিজস্ব চিন্তার তাপ কিংবা ভাপ নয়, তাঁর সমকালের চাপ ও ছাপই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। এবং আমার এই বিশ্বাস বাস্তবের সমর্থনপুষ্ট হ'য়ে ওঠে যখন তাঁর এই বিচারের কালসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারি, এই শতকের তিরিশের দশকের পৃথিবীব্যাপী সার্বিক অবক্ষয় ও অবিশ্বাস, মূল্যবোধের চরম বিপর্যয় ও মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পরাজয়ের নির্বিন্ন (shattered) পটভূমিকায় বাংলা কবিতায় আধুনিকতার উত্থান-পর্বেই আধুনিকতার লক্ষণ বিচারে এই ধারণায় তিনি সাময়িক-ভাবে স্থিত হয়েছিলেন। অথচ আমরা দেখেছি, আধুনিকতার লক্ষণ-সম্পর্কিত তাঁর এই একদর্শিতা পরবর্তীকালে কত উদার ভূয়োদর্শিতায় অভিসিক্ত হয়েছে ; সময়ের সীমারেখাকে অতিক্রম ক'রে আধুনিকতার ধারণাকে তিনি কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দিয়ে বলেছেন, 'আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে'। অতএব, স্বীকার করতেই হয়, আধুনিকতা-সম্পর্কিত আলোচনার কোনো দিকেই ঐকমত্যে উপনীত হওয়াটা সত্যিই কঠিন।

॥ দুই ॥

সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায়, আধুনিকতাকে চিহ্নিত করা আরো কঠিন সমস্যা। কেননা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনযাত্রার রীতিতে বা চিন্তা-ভাবনার ধরনে আধুনিকতার যে-প্রকাশ, তার তবু একটা চৌহদ্দি থাকে, ঐহিক প্রকাশ (material expression)-এর দিক্ থাকে, কিন্তু কবিতার মতো নিখাদ চিদ্সত্ত্ব (pure spiritual) শিল্পের ক্ষেত্রে তার কোনো তলই পাওয়া যায় না। কবিতার বহিরাঙ্গিক প্রকাশ (external manifestation)-গত দিক্ যতই দৃষ্টিগ্রাহ্য হোক না কেন, তার আন্তর-সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন আধুনিক-অনাধুনিক-নির্বিশেষ কোনো পন্থাতেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। এর কারণ কবিতা কবির ভাবনা-কল্পনার সারাৎসার এবং সেই ভাবনা-কল্পনার আশ্রয় তাঁর মন ; অথচ মনের কোনো পরিমাপ্ নেই, বস্তুজাগতিক কোনো মানদণ্ডেই তাকে পরিমিত করা যায় না। এখানেই সমস্যাটির আসল রহস্য।

কিন্তু কবিতা যেহেতু জীবনেরই অন্তর্গত, কবিতা ও জীবন যেহেতু পরস্পরের পরিপূরক (complementary) এবং দুঃখসহোদরা, অতএব জীবনের জটিলতা যে কবিতাকেও স্পর্শ করবে, জীবনের আধুনিকতা যে কবিতার আধুনিকতাকেও প্রভাবিত করবে, নির্দ্ধারিত ক'রে দেবে (বস্তুত তা করেছেও), তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়? আসলেও, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিশ্বকাব্যের (world poetry) বিকাশের বিভিন্ন পর্বেই কবিতার আধুনিকতা প্রায়শই জীবনের আধুনিকতার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে, কদাচিৎ, ব্যতিক্রমস্বরূপ, বিপ্রতীপে। অর্থাৎ, পৃথিবীর কোনো দেশে এবং কোনো কালেই কবিতার আধুনিকতার অবস্থান জীবনের আধুনিকতার অবস্থানের থেকে বহু ব্যবধানের ব্যাপার ছিলো না এবং এখনো তা নেই।

মানুষের জীবনের আধুনিকতার মতোই কবিতার জগতের আধুনিকতারও কাল-বিভাগ সম্ভব এবং এই বিভাজন, আলোচনার সুবিধার্থে, কাম্যও—যদিও নির্দ্দিষ্ট কোনো কালের নিরিখে কবিতার আধুনিকতা-নির্ণায়ন প্রয়াস প্রায়ই নৈষ্ফল্য-অবসিত। কেননা, আবারও বলি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষা চুরি ক'রেই, কবিতার 'আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে'। এবং কবিতার আধুনিকতা বিচারে সময়ের চেয়ে মর্জির প্রাধান্যবশতই আমরা লক্ষ্য করি যে সেকালে রচিত বহু কবিতা একালেও আশ্চর্যভাবে আধুনিক আবার একালে রচিত অনেক কবিতাও একালেই শোচনীয়ভাবে অনাধুনিক। হোমার ও দান্তের, বাল্মীকি ও বেদব্যাসের কিংবা কালিদাস ও ভবভূতির অথবা পৃথিবীর আরো অনেক দেশের এবং আরো অনেক কালের যে-সব লেখককে আমরা প্রাচীন প্রাজ্ঞ (old master) হিসেবে গণ্য করি, সেই প্রাতঃস্মরণীয়দের কবিতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আজো যে পড়ে, প'ড়ে হাসে-কাঁদে-ভাবে, আনন্দে আত্মহারা, আবেগে আন্দোলিত এবং বেদনায় বিগলিত হয়, না-হ'য়ে পারে না, অথচ সমকালীন কারো-কারো কবিতাপাঠে রীতিমতো অনীহা বোধ করে, এটা কি কবিতার আধুনিকতায় সময়ের গৌণতার এবং মর্জির মুখ্যতারই পরিচায়ক নয়? বস্তুত, রচিত হ'লেই যেমন কবিতা উত্তীর্ণ হয় না, একালে লিখিত হ'লেই তেমনই তা আধুনিক হ'য়ে ওঠে না। রসোত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কবিতাকে যেমন কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হয়, আধুনিক হ'য়ে ওঠার জন্যও তাকে তেমনই কতক-কতক বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হ'তে হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই আধুনিকতা। অর্থাৎ, মানুষের চিদ্‌বৃত্তিপ্রসূত যে-কোনো শিল্পের মতো কবিতার ক্ষেত্রেও, সময়ের চিহ্নশীলতা নয়, কালের বৈশিষ্ট্য-মণ্ডনই আধুনিকতার মূল কথা। এবং আধুনিকতার এই মূল কথাটার কোনো এ-যুগ সে-যুগ নেই, সকল যুগের পক্ষেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে হ্যাঁ, এখানে একটি কথা আছে। যার অভিসারে কবিতা-সুন্দরীর যাত্রা, সেই পাঠক-বরোত্তমের মানসিক প্রস্তুতি ও রুচিগত আধুনিকতার ওপর কবিতার আধুনিকতার উপলব্ধি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ, একজন আধুনিক কবি তাঁর পাঠকের তরফেও আধুনিকতা দাবি করেন, তা যে-যুগেই তিনি কবিতা লিখুন না কেন। মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্টের

একটি উক্তিতে আমার এই সিদ্ধান্তের হুবহু সমর্থন পেয়ে আত্মবিশ্বাসের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটলো। এ-সম্পর্কে ফ্রস্ট স্পষ্টই বলেছেন, 'A modern poet must be one that speaks to modern people no matter when he lived in the world.'।

অন্তঃস্থ স্বরূপে, যেহেতু যথার্থ আধুনিকতা চিরকালীনতার সীমান্তস্পর্শী, অতএব যে-কবি প্রকৃতই আধুনিক, তিনি যথার্থ চিরকালীনও। এমন কবির ক্ষেত্রে আধুনিকতা চিরকালীনতারই সমার্থক। এবং এঁদের সন্ধানও, সংখ্যায় সামান্য যদিও, বিশ্বকবিতার ইতিহাসে সত্যিই পাওয়া যায়। বস্তুত, আগের স্তবকে হোমার থেকে ভবভূতি পর্যন্ত যে-ক'জন পাশ্চাত্য-প্রাচ্য কবির নাম উল্লেখ করেছি, তাঁরা সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। কবিতার এই আধুনিকতা ব্যাপ্তার্থক এবং এই কবিকুল ব্যাপ্তার্থেই আধুনিক। এই আধুনিকতা এবং এই কবিরা—দুই-ই চিরকালের। কিন্তু চিরকালীনতার প্রান্তছোঁয়া এই আধুনিকতা ছাড়াও আরো এক ধরনের আধুনিকতা কবিতার জগতে রয়েছে। এই আধুনিকতা সময়-শাসিত, কালখণ্ডিত, ইতিহাস-নির্দ্ধারিত। কাব্যালোচকের পক্ষে সুবিধেজনক—কাজ-চালানো-গোছের এই আধুনিকতা। এই আধুনিকতার মানদণ্ডে সেই কবিতাই আধুনিক, যাতে আধুনিক সময়ের জীবনের কথা আছে, ছবি আছে, রহস্য আছে এবং সেই সঙ্গে আছে সেই রহস্যের উন্মোচনও। এই আধুনিকতার নিরিখে সেই কবিই আধুনিক যাঁর কবিতায় আধুনিক কালের মানবিক পরিস্থিতির (human situation) গ্রন্থিল জটিলতা (knotted complexity) প্রতিফলিত, জীবন-জিজ্ঞাসা উচ্চারিত এবং ইতিহাস-চেতনা অনুভূত। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কবিতাকেই আমরা 'আধুনিক কবিতা' নামে পৃথিবীর দেশে-দেশে উদারভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছি এবং এই কবিতার আধুনিকত্ব বিশ্লেষণই বিভিন্ন দেশের সমালোচকরা তাঁদের মনীষা ও যুক্তিশীলতাকে যুগে-যুগে নিয়োজিত রেখেছেন।

এই অপেক্ষাকৃত সীমিত পরিধির আধুনিক কবিতার উৎস-সন্ধান কি সম্ভব? সম্ভব কি সন্ধান পাওয়া তার সুতিকাগৃহের, তার জন্মস্থানের, জন্মক্ষণের? সম্ভব, সব ক'টিরই সন্ধানলাভ সম্ভব, কিন্তু কোনো একটিরও নিশ্চিতরূপে নয়। আমাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা'য় রচিত কবিতার প্রসঙ্গ আপাতত ওঠাচ্ছি না, এই আলোচনাতেই, অন্যত্র (পরবর্তী অংশে) সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো। এখানে সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে য়োরোপীয় কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত-প্রসঙ্গে দু'-চারটি কথা নিবেদন করছি। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, আধুনিক কবিতার জন্ম-মহাদেশ য়োরোপই বটে; কিন্তু সেই মহাদেশের অর্ন্তগত কোন্ দেশটি, তা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল; কেননা বিষয়টি নিয়ে সাহিত্যের সমালোচকদের মধ্যে তো বটেই, সাহিত্যের ইতিহাসকারদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ রয়েছে—যেমন রয়েছে এই কবিতার জন্মকালকে ঘিরেও। আধুনিক কবিতার জন্মস্থান ও জন্মকাল—দুইকে নিয়েই, সাহিত্যের নানা দিকের মতো, সাহিত্য জগতের নানা মুনির নানা মত। তাঁরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন যাঁর-যাঁর বিশ্বাস মতো

এ-বিষয়ে কোনো-না-কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে। সিদ্ধান্তসমূহে কখনো তাঁরা কাছাকাছি, কখনো কিছু দূরের ; সিদ্ধান্তগুলির কোনো-কোনোটি সময় ও সালকেন্দ্রিক, কোনো-কোনোটি বা গ্রন্থকার ও গ্রন্থভিত্তিক। যাঁরা সময় ধ'রে আধুনিক কবিতার যাত্রারম্ভ নিরূপণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নির্দিষ্ট কোনো সালকে পর্যন্ত চিহ্নিত করেছেন—যেমন সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক এল্‌ম্যানের মতে ১৯০০, সাহিত্যের সমালোচক লেভিনের অভিমতে ১৯২২ এবং সাহিত্যের রচয়িত্রী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর সিদ্ধান্তে ১৯১০ (উল্‌ফ্‌ অবশ্য এল্‌ম্যান ও লেভিনের মতো কোনো সালকে চিহ্নিত ক'রেও এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হ'তে পারেন নি ; তিনি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন এবং ১৯১০-এর সর্বশেষ মাস ডিসেম্বরকে সনাক্ত ক'রে এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।) অন্যরা, নির্দিষ্ট সালের পরিবর্তে কালখণ্ডকেই নির্ধারিত করেছেন—কেউ উনিশ শতকের নব্বুইয়ের দশককে, কেউ বিশ শতকের প্রারম্ভিক পঁচিশ বছরকে। আর, যাঁরা গ্রন্থকার ও গ্রন্থ ধ'রে এ-পথে এগোতে চেয়েছেন, তাঁদের কেউ বলেছেন ইংরেজ ওয়ার্ডস্বার্থের 'The Prelude' থেকে, কেউ বলেছেন জর্মান গায়টের 'The Faust' থেকে, আবার কেউবা—যেমন জে. এম. কোহেন এবং মাইকেল হ্যামবার্গার—বলেছেন ফরাসী বদলেয়ারের 'Les Fleurs du Mal' থেকেই আধুনিক কবিতার যাত্রারম্ভ। বস্তুত, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত বদলেয়ারের এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালে ভাব ও প্রকরণ—উভয় দিক্‌ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি ও কবিতাকে যত গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশ্ব-কবিতাকে আধুনিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে, তার গুরুত্বের বিবেচনায় এ-সম্পর্কে কোহেন এবং হ্যামবার্জারের সিদ্ধান্তকেই সবচেয়ে সঙ্গত (ফলে গ্রহণীয়) ব'লে মনে হয়। অবশ্য কবিতার আধুনিকতা-সম্পর্কিত ধারণা তখনো ঠিকভাবে গ'ড়ে ওঠেনি, দানা বাঁধেনি তাকে ঘিরে বিশেষ কোনো চিন্তা-ভাবনা। ১৮৮৬ সালে, য়ুজেন উল্‌ফ্‌ নিজের রচনায় 'modernism' শব্দটি 'আধুনিকতা' অর্থে প্রথম ব্যবহার করেন। কালক্রমে শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখায় শব্দটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। য়োরোপীয় কবিতায় আধুনিকতার আবির্ভাবের এই হচ্ছে স্বল্পায়ত বিবরণ, তার জন্মকালের সম্ভাব্য নির্ধারণ। কিন্তু প্রত্ন-আধুনিকতা বা শাশ্বত আধুনিকতা (perennial modernism) এবং এ-কালীন আধুনিকতা বা নব্য আধুনিকতা (neo-modernism)—কোনোটিকেই তার জন্মের স্থান বা কাল দিয়ে চিনে নেয়া যায় না, কেননা জন্মস্থান অথবা জন্মকালের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক নিতান্ত পরোক্ষ না-হ'লেও অত্যন্তই অস্পষ্ট। ফলে, আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে তার জন্মস্থান বা জন্মকালের নির্ধারণের ওপর বিশেষ নির্ভর করতে অনেকেরই ভয় হয়—যেমনটি হয়েছিলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও, যে-কারণে আধুনিকতা (বিশেষভাবে কবিতার) সম্পর্কে নিজের অভিমতের কথা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।'

॥ তিন ॥

বাংলা কবিতায় এই আধুনিকতা কবে সঞ্চারিত হ'লো, কখন, কী-ভাবে? য়োরোপীয় কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চারকাল নিরূপণের মতো বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আত্ম-প্রকাশের কাল-নির্দ্ধারণেও বিভিন্ন জনে—এমন কি আধুনিক কবিদের মধ্যেও—যদিও তেমন প্রবল নয়, কিছু-কিছু মৃদু মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ-সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন চিন্তার ধারকরা মনে করেন, ইতিহাসের দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছে। আবার তুলনামূলক ভাবে নূতন চিন্তায় বিশ্বাসীদের কেউ (যেমন রবীন্দ্রনাথ) এই কবিতায় আধুনিকতার আবির্ভাব লক্ষ্য করেছেন মধুসূদনে, কেউবা (যেমন বিষ্ণু দে) রবীন্দ্রনাথে, এবং অনেকেই (এ-ক্ষেত্রে বিশেষ কারো নামই উল্লেখ করছি না, কেননা অনেকের নামই মনে এসে ভিড় জমাচ্ছে) আরো পরবর্তীকালীনদের মধ্যে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বিষ্ণু দে-র এতদ্‌সম্পর্কিত অভিমত, তাঁর নিজের ভাষাতেই, এখানে তুলে ধরছি। তাঁর সম্পাদিত 'একালের কবিতা'র 'মুখবন্ধে' তিনি লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের চোদ্দ পনেরো বছরের কবিতা থেকেই সচরাচর বাংলা কাব্যে আধুনিক যুগ নির্দিষ্ট। মনে হয় বাংলা কবিতার দুঃসাহসী আধুনিক পর্বের পুরোধার সূত্রপাত ও পরিণতি কড়ি ও কোমল থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত।' পক্ষান্তরে, স্বর ও সুরগত পার্থক্যের বিবেচনায়, কেউ-কেউ বাংলা কবিতার আধুনিকতাকে প্রথম আবিষ্কার করেছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এবং মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে জীবনানন্দের বিশ্বাস ছিলো, 'রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার অভ্যুত্থান হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে।' (দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা': 'কবিতার কথা'।)

আধুনিক বাংলা কবিতার উৎস-অনুমান নিয়ে এত জনে এত মত, কিন্তু কোনোটাই যথেষ্টরকমে গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এগুলির একটাও সম্পূর্ণ নয়। এই মতসমূহের প্রতিটিতেই এ-সম্পর্কে সত্যের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু কোনোটিতেই সত্যের সম্পূর্ণতা নেই। বাংলা কবিতার ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ (harmonious) নয়; মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ উদার অর্থেই আধুনিক (liberal modern), সীমিত অর্থে নন; যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ-বিশেষের প্রকাশ স্পষ্ট, কিন্তু সমগ্রতা অস্পষ্ট; 'সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে' সকল বাঙালী কবির রচনাতেই আধুনিকতার 'অভ্যুত্থান' ঘটেনি, ঘটেছে কিছু সংখ্যকের রচনায়। এই কিছু সংখ্যক বাঙালী কবিই বাংলা কবিতায় একালীন আধুনিকতার জনক এবং বাংলা কবিতায় এই আধুনিকতার সূত্রপাত বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের—অর্থাৎ তিরিশের দশকের—ঘটনা। কিন্তু কী-ভাবে ঘটলো সেটা, আমাদের সাহিত্যের সে-যাবৎ ইতিহাসে নূতন-অধ্যায়-সংযোজন-করা সেই ঘটনা?

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিলো 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায়, 'কালি-কলমে'র পৃষ্ঠায়, 'প্রগতি'র পৃষ্ঠায়। পরবর্তীকালে, সেই স্বল্পায়ু পত্রিকা তিনটির দ্বারা প্রবর্তিত আধুনিকতার ধারাকে বাংলা কবিতায় প্রবাহিত রেখেছে আরো অন্তত তিনটি পত্রিকা—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়', বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্ব্বাশা'। এবং অদ্যাবধি অন্যান্য অনেক পত্রিকাই মূলত সেই মূল ধারার অনুকূলেই (কদাচিৎ, যেমন ষাটের দশকের 'ক্ষুধিত' এবং 'শ্রুতি' ও 'ঈগল' পত্রিকা-কেন্দ্রিক 'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলনপর্বে, প্রতিকূলে) বাংলা কবিতাকে প্রবাহিত রেখে চলেছে। এমন কি অতি আধুনিক কালের অত্যাধুনিক (Ultra-modern) বাংলা কবিতাতেও 'কল্লোলী'য় আধুনিকতার আমূল বা তুমুল কোনো মৌলিক (fundamental / radical) বিপর্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে না—যদিও 'কল্লোলে'র কালের অন্তর্গত আমরা নই, আমরা 'কল্লোলে'র বেশ কয়েক দশক পরবর্তীকালের প্রজন্ম।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা-আন্দোলনের উদ্ভাবনে ও উদ্বোধনে 'কল্লোলে'র ভূমিকায় সেদিন অসম্ভাব্যতা বা আকস্মিকতার কোনো স্থান ছিলো না, যেমন ছিলো না সেই পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট লেখকদের বহুমুখী সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপে। বস্তুত, যুগের প্রভাবে এবং হয়তো বা প্রয়োজনেই, সামাজিক বাস্তবতার (social realism) একাধিক হেতুসন্নিপাতে, পত্রিকা হিসেবে 'কল্লোলে'র এবং আধুনিকতার বাণীশিল্পী-রূপে তার লেখকদের—দু'-য়েরই আবির্ভাব আমাদের সাহিত্যে সেদিন হ'য়ে উঠেছিলো প্রায় অনিবার্য, যেন-বা অপ্রতিরোধ্যই। কিন্তু কী সেই কারণপরম্পরা, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কোন্ সেই ঘটনার ক্রমিকতা (sequence), যার সুগভীর অভিঘাতের পরিণাম রূপ নিয়েছিলো সেদিনের সেই ঘটনায়? সেগুলি শুধু বহুসংখ্যকই নয়, বহুমুখীও; এবং মাত্র বহুমুখীই নয়, বহুজটিলও। কিন্তু তার বিস্তারিত বিশ্লেষণে আপাতত আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; তাছাড়া, এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তবু বর্তমান বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ও প্রাসঙ্গিকতায় এ-সম্পর্কে অন্তত যেটুকু না-বললেই নয়, সেটুকুই লিপিবদ্ধ করছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ ১৯১৪ সালে আর সমাপ্তি ১৯১৮-তে। চার / পাঁচ বছরের ব্যাপ্তিকালে এই যুদ্ধ বস্তুগত ক্ষয়-ক্ষতি (material wastage) যত সাধন করেছিলো, মনোগত ধ্বংস সাধন (mental destruction) করেছিলো তার তুলনায় বহুগুণে বেশি। সমরোত্তর সার্বিক বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের অন্ধকার পটভূমিকায় (bleak background) সমরপূর্ব পৃথিবীর পুরোনো চেহারাটাই রাতারাতি অস্পষ্ট হ'য়ে এলো। যুদ্ধান্তিক দুঃসহ আবহাওয়ায়—ফ্ল্যাণ্ডার্সের বিস্তীর্ণ মাঠে, লণ্ডনের রক্তাক্ত পরিখায়, বার্লিনের উত্তপ্ত বারুদখানায় পূর্বতন মানবিক মূল্যবোধগুলির (human values) শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটলো। মানুষের আত্মিক সংকট (spiritual crisis) ঘনীভূত (intensified) হ'লো। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, য়োরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তখন চলেছে দারুণ অর্থনৈতিক মন্দা—অর্থনীতির ভাষায়, 'the great

slump of the thirties'। এই সমস্ত কিছুরই ছায়া পড়লো মানুষের মনে, তাঁর চিন্তা-ভাবনায়, তাঁর মননবৃত্তির প্রকাশ সাহিত্যে ও শিল্পে। প্রথম মহাযুদ্ধ য়োরোপের মাটিতেই সীমাবদ্ধ থাকলেও তার বিধ্বংসী প্রভাব (devastating impact) য়োরোপের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ; সমগ্র পৃথিবীতেই তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিলো। সেই প্রভাবেই নৈতিক শূন্যতা (moral hallowness) এবং অনিকেততা (rootlessness) শিক্ষিত মানসকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিলো পৃথিবীর সর্বত্র—ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্মানীতে, রাশিয়ায়, স্ক্যান্দিনেভিয়ায়। সমরোত্তর হতাশায় এইসব দেশের তৎকালীন সাহিত্য হ'য়ে উঠেছিলো বিশেষভাবে বিধুর। সেই হতাশ্বাস (frustration) সর্বাধিক প্রাবল্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলো ইংরেজি সাহিত্যেই—এলিয়টের 'Hollow Man' ('we are hollow man···') এবং অডেনের 'London Bridge' ('London bridge is falling...') তারই নির্ভুল নিদর্শন। এই সঙ্গে অবশ্য তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আরো অনেক সাহিত্যিকের এবং তাঁদের রচনার নামও নিশ্চিতরূপেই উল্লেখযোগ্য।

'কল্লোলে'র আবির্ভাব ১৯২৩ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পাঁচ বছর পরে। স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন পৃথিবী-পরিস্থিতির সামগ্রিক অভিঘাত এই পত্রিকাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিলো। যুদ্ধ-বিপর্যস্ত য়োরোপের মূল্যবোধের অবক্ষয় এই পত্রিকার লেখকদের জীবন-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের মূলেও গভীর ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলো। ফলে, রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের সঙ্গে তাঁদের পরিবর্তিত জীবন-ধারণার বিরোধ প্রথমে অনিবার্যরূপে অনুভূত হ'তে আরম্ভ ক'রে পরবর্তীকালে ক্রমে-ক্রমে প্রত্যক্ষ রবীন্দ্র বিরোধিতার রূপ নিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের শুভ আস্তিক্যবোধ (benevolent theism)-এ আস্থা হারিয়ে তাঁরা সমবেতকণ্ঠে মেতে উঠেছিলেন নাস্তিক্যের নান্দীপাঠে—যদিও, আশ্চর্যের বিষয়, 'কল্লোলে'র প্রধানদের প্রায় প্রত্যেকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভ্রান্তভাবে ফিরে এসেছিলেন বিশ্বজাগতিক যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণার উপশমপুরুষ রবীন্দ্রনাথেরই কাছে। এই শেষ কথাটারও উল্লেখ করলাম কেবল এটা জানিয়ে দিতে যে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মপ্রক্রিয়ায় মাত্র রবীন্দ্রপরিবর্জনেরই নয়, রবীন্দ্রপরিগ্রহণেরও গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা ছিলো।

'কল্লোলে'র কাল অনেকদিন আগেই অবসিত ; কিন্তু বাংলাকবিতায় 'কল্লোল'-প্রবর্তিত আধুনিকতার অগ্রগতি আজো অব্যাহত। কোথাও তা ব্যাহত হয়নি—বরং যুগ-পরম্পরায় নূতন বেগ (speed) তাতে সঞ্চারিত হয়েছে। আধুনিকতার এই অগ্রগতি অর্জনে একদিকে যেমন কিছু-কিছু বর্জন, অন্যদিকে তেমনই অনেক কিছু গ্রহণ—দুই-ই এই কবিতার পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয় ব'লে অনুভূত হয়েছে। বস্তুত, গ্রহণ-বর্জনের এই সুদূরশ্রুত পালা-কীর্তনই আধুনিক বাংলা কবিতার 'আঁতের কথা', এই বিরতিহীন দ্বান্দ্বিকতাতেই তার অন্তরের পরিচয়। এই কবিতা, সময়ের আবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, বিবর্তনের বিচিত্র ধাপ অতিক্রম করতে-করতে, উৎকর্ষের এমন এক শীর্ষে

আজ উপনীত, যার সম্পর্কে প্রয়োগযোগ্য একমাত্র বিশেষণ 'ঈর্ষণীয়'। বিশ্বমানে উন্নীত আজ এই কবিতা, বিশ্বমানের সমকক্ষ তার আধুনিকতা। বিশ্বকবিতার আধুনিকতার যাবতীয় লক্ষণ—অনর্গল আবেগের চেষ্টিত পিছুটান (efforted backpull), রোম্যাণ্টিক ভাবালুতার সচেতন গতিরোধ, নিসর্গের বর্ণনায় আত্যন্তিকতা পরিহার, আস্তিক্য-বিরুদ্ধতা (anti-theism), একই মূল ভাবাবলম্বিতায় পারস্পরিক বৈপরীত্য (reciprocal antinomy) ঃ যেমন মানুষকে একই সঙ্গে 'humanise' ও dehumanise' করা, এবং সর্বোপরি নৈর্ব্যক্তিকতা, যা আসলে কীটস্-এর 'negative capability' (যার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত বাংলা অনুবাদ 'নৈরাত্মসিদ্ধি')-রই আধুনিক রকমফের—ইত্যাদির সব ক'টিই এই কবিতায় কমবেশি সাঙ্গীকৃত। নিছক যুগলক্ষণের বর্ণন নয়, যুগবৈশিষ্ট্যের উন্মোচনই এই কবিতার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে এই কবিতা অর্জুনের মতো স্থির। বৃহৎ চলৎ কালের ছন্দকে প্রাণে নিয়ে এই কবিতাও এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার আধুনিক কবিতার মতোই—যদিও মনে রাখা ভালো, পৃথিবীর অপরাপর দেশের মতো আমাদের দেশেও এই কবিতা এখনো কোনো পদ্ধতি (system) নয়, মাত্র প্রক্রিয়া (process) ॥*

* আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন-সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের 'সাহিত্যের স্বাধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ ১৩৬১-৭২' প্রবন্ধটি এবং 'তিরিশ-পরবর্তী' বাংলা কবিতার দিক্চিহ্ন' গ্রন্থের 'পূর্বলেখ'-শীর্ষক ভূমিকা-প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

উত্তররৈবিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের আসন সর্বোচ্চে। এই ঈর্ষণীয় আসনটি যে তিনি অধিকার করেছেন তাঁর সমকালীন কোনো কাব্যান্দোলনের পরিচালক বা তাত্ত্বিক নায়করূপে নয়, কবি হিসেবে একান্ত মৌলিকতার গুণেই, শিক্ষিত পাঠক-সমাজে এ-কথা আজ সর্বস্বীকৃত। কিন্তু তাঁর সেই মৌলিকতার স্বরূপনির্ণয় সব জনের তো বটেই, সকল সমালোচকের পক্ষেও নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। বস্তুত, কবি হিসেবে তাঁর গোত্রনিরূপণ অদ্যাবধি এক মহাসমস্যার ব্যাপার হ'য়ে আছে এবং সম্ভবত আরো অনেকদিন পর্যন্ত তা-ই হ'য়ে থাকবে। কেননা কবিতা গণিতশাস্ত্র নয়, গাণিতিক নির্ভুলতায় কোনো কবির আত্মস্বরূপের সন্ধানপ্রয়াস অবান্তর না-হ'লেও অসম্ভবেরই নামান্তর।

গাণিতিক বিশুদ্ধিতে কবিদের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ অসম্ভবই বটে, তা হ'লেও সমালোচকদের তরফে সে-চেষ্টায় কোনো বিরাম থাকে না। নানাভাবে—প্রধানত কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যেই—তাঁরা প্রয়াস চালান কবিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের। এবং এই প্রক্রিয়াতেই তাঁরা এক কবিকে অন্য কবি থেকে পৃথক করেন। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও কাব্যসমালোচকদের দিক্ থেকে সেই চেষ্টার আন্তরিকতায় কোনো শৈথিল্য বা ত্রুটি ঘটে নি। তাঁরা প্রায় সকলেই নিজ-নিজ বিশ্লেষণী ক্ষমতায় আস্থাশীল থেকে নিজের-নিজের মতো চেষ্টা করেছেন কবি হিসেবে জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের। জীবনানন্দ-সমালোচকদের নাতিদীর্ঘ তালিকায় প্রথমেই আছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিজীবনের প্রথম পর্বেই (দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে) নিজস্ব রচনাস্বাতন্ত্র্যে জীবনানন্দ যখন রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার আগ্রহী পাঠক এবং আজ যখন জীবনানন্দের জীবনাবসানের পর দীর্ঘ তিনটি যুগেরও অধিককাল অতিক্রান্ত, তখন এ-কথা ভেবে সত্যিই আনন্দ জাগে যে প্রথমাবধি স্পষ্টত রবীন্দ্র-আবহ-বহির্ভূত এবং ঈষৎ রবীন্দ্রিকতা-অনীহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এমন কি তাঁর কাব্যপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'মৃত্যুর আগে' ('ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অন্তর্গত) কবিতাটি পাঠ করবার পর 'চিত্ররূপময়'—এই আশ্চর্য বিশেষণে বিশেষিত পর্যন্ত করেছিলেন তাঁর কবিতাকে। বস্তুত, জীবনানন্দের মতো ইন্দ্রিয়-তন্ময় ও ধূসরতায় আবিষ্ট কবির চিত্রপ্রধান প্রথম পর্বের সমস্ত কবিতা সম্পর্কেই রবীন্দ্রপ্রদত্ত এই বিশেষণটি যথার্থতম। 'চিত্ররূপময়' বিশেষণটি জীবনানন্দের প্রথম পর্বের কবিতার মূলে স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাপারে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করে আমাদের। আরো পরে, যখন জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর

কবিতা সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে বেশ কিছুটা জানাজানি হ'য়ে গেছে এবং তদানীন্তন তরুণ কবিদের মনে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার ঘটেছে, তখন লাজুকপ্রকৃতির এই কবি-মানুষটি সম্বন্ধে (তাঁর কবিতা সম্পর্কে নয়) 'নির্জনতম' বিশেষণটির প্রয়োগ তাঁর কবিসত্তার আবিষ্কর্তা বুদ্ধদেব বসুর রচনায় লক্ষ্য করা গেছে। এ-বিশেষণটিও তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। বাস্তবিক, জীবনানন্দের কবিতাকে নয়, প্রথম দিকের কবি জীবনানন্দ দাশকে নিখিল বাঙালী কবিকুলের ভিড় থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণে এর চেয়ে নির্ভুল বিশেষণের ব্যবহার আজও আমাদের অজানা। কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে 'নির্জনতম' শব্দটি অপেক্ষা যোগ্য বিশেষণ অদ্যাবধি আমাদের অজ্ঞাত,—তথ্য হিসেবে এটা যেমন একটা সত্য, সত্য হিসেবে এটাও তেমনই একটা তথ্য যে তাঁর কবিতার অনুরক্ত আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনো-কোনো পাঠক-পাঠিকা, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে তাঁর বিশিষ্ট যে-স্থান ও ভূমিকা আজ ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এই বিশেষণে বিশেষিত করতে আপত্তি জানাতে পারেন ; কেননা সীমিত আয়ুর অন্তিম পর্ব পর্যন্ত বাংলা কাব্যপরিধির এক নিভৃত প্রান্তে ব'সে আপনমনে কবিতাকে আশ্রয় ক'রে যে-জীবনানন্দ জীবনের নিগূঢ় আনন্দকে প্রকাশ করছিলেন, মৃত্যুর পরবর্তী যুগে তাঁর স্থান আর সেই নির্জন সুদূর প্রান্তে সীমাবদ্ধ রইলো না—আমরা, তাঁর প্রতিভামুগ্ধরা, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁর ভাস্বর আসনটিকে এনে স্থাপন করলাম আধুনিক বাংলা কাব্যবৃত্তের একেবারে কেন্দ্র-স্থলে। ফলে, যে-জীবনানন্দকে একদা 'নির্জনতম' কবি অভিধায় আখ্যাত ক'রে একাকীত্বের অন্ধকারে আমরা নির্বাসিত করেছিলাম, মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে সেই নির্বাসনদশা থেকে উদ্ধার ক'রে এনে আমরাই বসালাম আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে ; 'নির্জনতম' কবি হ'য়ে উঠলেন আমাদের স্বজনতম। এ-কথা ভেবে আজ আনন্দের যেমন সীমা নেই, তেমনই অনুশোচনাও তীব্রভাবে প্রাণে বাজে যখন ভাবি, জীবদ্দশায় কত অবহেলাই না সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে হাসিমুখে ; তাঁর আকস্মিক অকালমৃত্যু আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কী-অপূরণীয় ক্ষতিই না সাধন করেছে ! আবার ভাবলে অবাক লাগে, এই অকালমৃত্যুই, যেন ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁকে পৌঁছে দিলো স্বীকৃতির স্বপ্ন-স্বর্গে। বিশ্ববিধানে ক্ষতি যেমন অনিবার্য, সেই ক্ষতির পূরণও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমনই প্রায় সুনিশ্চিত—মৃত্যুর হিমশীতল হাত থেকে এই সান্ত্বনাটুকুই আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে বিষণ্নহৃদয়ে।

আধুনিক কাব্যসমালোচকদের কেউ-কেউ, যাঁরা জীবনানন্দ সম্পর্কে 'নির্জনতম' এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে 'চিত্ররূপময়'—এই দুই বিশেষণের প্রয়োগে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা তাঁর কবিচরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রতীকী বা সিম্বলিক এবং পরাবাস্তববাদী বা সুররিয়ালিস্ট শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন ; আবার কেউবা তাঁকে অধিচেতনা বা আদিচৈতন্যের কবি হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রযুক্ত বিশেষণের তালিকায় ভবিষ্যতে হয়তো আরো নূতন-নূতন শব্দ সংযোজিত হবে। কিন্তু তাঁর

সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যে-বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে, তার প্রতিটিই তাঁর আয়ুষ্কালের। মৃত্যুর পরে তাঁর ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে নূতন কোনো বিশেষণের উদ্ভাবন সাম্প্রতিক সমালোচকদের রচনাতে নজরে পড়ে না। তাঁর সম্পর্কে উপরোক্ত বিশেষণ-গুলির প্রতিটিরই প্রয়োগ সঙ্গত, কিন্তু তাঁর কবিচরিত্রের স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ সনাক্তকরণে কোনোটিই যথেষ্ট নয়। তাঁর কবিজীবনের ভিন্ন-ভিন্ন পর্বের রচনার ব্যাখ্যায় এগুলির প্রতিটিই আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু সমগ্র কবিজীবনের রচনাকর্মের বিশ্লেষণে একটিও সামগ্রিকভাবে সত্য নয়। অবশ্য তাঁর সমগ্র কাব্যকৃতির কথাই যদি বলি, তাহ'লে তো এ-সত্যও অস্বীকারের উপায় নেই যে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই বিশেষণ সমূহের যৌথ প্রয়োগ (collective application)-ও পর্যাপ্ত নয়, কেননা কবিস্বভাবে তিনি ছিলেন এতই গহন এবং দূরচারী। নিজের স্বভাবের গহন দূরচারিতা সম্পর্কে তিনি নিজেও নিশ্চয় সচেতন ছিলেন, যে-কারণে তাঁর ও তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে প্রযুক্ত এই বিশেষণগুলির আংশিকতা ও অসম্পূর্ণতা বিষয়ে অসন্তোষ শেষ পর্যন্তও তাঁর ঘোচেনি। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় এ-সম্পর্কে তিনি নিজের মনোভাব এই ভাষায় সরাসরি ব্যক্ত করেছেন —'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; স্যুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' এবং বিশেষণ প্রয়োগে সমালোচকে-সমালোচকে এই পার্থক্যের হেতু সম্পর্কেও তিনি অনিশ্চিত নন। এ-ক্ষেত্রেও তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট—'কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার ; কাজেই পাঠক ও সমালোচকের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য।'

কিন্তু সমালোচকদের বিচারে যে-মতের অবলম্বী বা যে-পথের পথিকই তিনি হ'য়ে থাকুন না কেন, আমাদের কবিতার ইতিহাসে তাঁর যথার্থ অবস্থানটি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লে আমরা দেখবো, আমাদের কাব্যসাহিত্যে যাঁরা ক্ল্যাসি-ক্যাল রীতির গাঢ়পিনদ্ধ রচনাধর্মে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন নি অথচ রোম্যান্টিকতার সহজ ভাবালুতাতেও গা ভাসিয়ে দিতে রাজী হন নি, সেই বিরলসংখ্যক নব্য-ক্ল্যাসিক (neo-classical) কবিদের পুরোধা হচ্ছেন তিনি। সাহিত্যের এই দুই ধারার মধ্যবর্তী অবস্থানগত বিবেচনায়, অন্য কোনো কারণে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য না-থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সঙ্গে তুলনীয় মাত্র একজনই আছেন বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ; তিনি হচ্ছেন অ্যাডগার অ্যালেন পো—মার্কিন সাহিত্যে প্রতীকী আন্দোলনের প্রধানতম ঋত্বিক। জীবনানন্দও বিচিত্র সব প্রতীকের একান্ত নিজস্ব ব্যাবহারে বাংলা সাহিত্যের প্রতীকী কাব্যধারাকে যে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছেন, এ-কথা আজ সুপরিজ্ঞাত একটি তথ্য-বিশেষ। পো-র মতো তিনিও তাঁর কবিজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতীককে

গ্রহণ করেছেন তাঁর অন্তর্জীবনের আবরণ উন্মোচনের উপায়স্বরূপ। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে তাঁর প্রতীক ঝিঁঝিঁ, জোনাকি, মাছি, পেঁচা, কাক, শকুন, ইঁদুর, বক, বুনোহাঁস—এই সব তুচ্ছ ইতর পতঙ্গ ও প্রাণী ; 'বনলতা সেন'-এ ধানকাটা মাঠ, শহরের পথ, বিকেলের অবসন্ন আলো, জল এবং অতি বিখ্যাত পাখির নীড় ; 'মহাপৃথিবী'তে চিল, সিন্ধুসারস, বিড়াল ও বহুআলোচিত উটের গ্রীবা ; 'সাতটি তারার তিমির'-এ বলদের নিঃশব্দতা, খেতের দুপুর, আইবুড়ো ভিখিরী, রাতচরা ডাঁশ, রৌদ্রের অন্ধকার, ধবল বাতাস ইত্যাদি। বস্তুত, তিনি তাঁর কবিতায় নানা প্রসঙ্গে ও ভিন্ন-ভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রতীক-ধর্ম আরোপ ক'রে অনেক সাধারণ শব্দকেও অসাধারণের স্তরে উন্নীত করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাব্যগ্রন্থের কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করার মতো। সেই গ্রন্থটির নাম 'রূপসী বাংলা', যেটিতে প্রতীকের ব্যবহার একেবারেই অন্য রকমের। এটিতে প্রতীকের বিন্যাস পৃথক-পৃথক বা আংশিক নয়, একত্রিত ও সামগ্রিক। পল্লীবাংলার সমগ্র নিসর্গপ্রকৃতিই এটিতে প্রতীকায়িত, প্রতীকের ব্যঞ্জনায়-ব্যঞ্জনায় তার রূপ অতি অপরূপ ভঙ্গিতে উন্মোচিত। শুধু তা-ই নয় ; জীবনানন্দ তাঁর কিছু-কিছু কবিতায় গভীর ইঙ্গিতময় ও প্রগাঢ় ভাবোদ্দীপক বহু প্রতীকের আশ্চর্য ব্যবহারেও অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। কবিজীবনের মধ্য-পর্বের রচনা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় বর্ণিত মৃত্যুর ভয়াবহতা ব্যঞ্জিত করতে তিনি নির্বাচন করেছেন উট-এর প্রতীক, অন্ত্য-পর্বের 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় সমকালীন যুগ-সংকটকে তিনি তুলে ধরেছেন অপরাহ্ণের প্রতীকে, আর কালের আঘাতে জীবনের সব কিছুই যে পরিবর্তিত হ'তে থাকে, তিলে-তিলে ক্ষয় হ'তে-হ'তে অবশেষে একদিন ধ্বংস হ'য়ে যায়, মৃত্যু যে সমস্ত কিছুরই সমাপ্তি ঘোষনা করে সুনিশ্চিতভাবে—এই অনাদ্যন্ত বোধ ও বেদনা, যা নাকি সমগ্র জীবনানন্দীয় কাব্যের মূল ভিত্তি ও বিশ্বাস, সেই বোধ ও বেদনাকে আমাদের চৈতন্যের স্তরে-স্তরে সংক্রামিত ক'রে দেবার জন্য তিনি বিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেছেন বিষাদ-সমাচ্ছন্ন হেমন্ত ঋতুর প্রতীক) তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীক-প্রসঙ্গে সামান্য যে-দু'একটি কথা অতি সাধারণভাবে এখানে বলা হ'লো, তা যে আসলে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদগ্রহণ প্রয়াসেরই সামিল, সেটা আলাদা-ভাবে বলার অপেক্ষাই রাখে না ; কেননা এই প্রসঙ্গের আলোচনা এত সংক্ষেপে কিছুতেই সমাপ্ত হবার নয়। পরে, তাঁর কবিতার প্রাকরণিক (technical) দিকের পর্যালোচনায়, প্রতীকের প্রসঙ্গ সম্ভব হ'লে আবার উত্থাপিত হবে।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রতীক প্রয়োগের নিপুণতা ও অজস্রতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু তাঁর কবিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে মাত্র 'প্রতীকী' শব্দটির ব্যবহারেই ক্ষান্ত না-হ'য়ে চিন্তাকে আরেকটু গভীরে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং এই শব্দটির পাশে 'সুররিয়া-লিস্ট' শব্দটিকেও সমমর্যাদায় স্থান দেয়া উচিত। কেননা আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক-পাঠিকারা জানেন, আমাদের কবিতায় এই অভিনব ধারাটি সংযোজনার সমূহ কৃতিত্ব কবি জীবনানন্দেরই। অবশ্য এই কঠিন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবত

অনিবার্য ছিলো ; কেননা যে-কোনো মৌলিক কবির মতো সহজাত এক গভীর অন্বেষায় সত্য, শুভ ও সুন্দরকে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন কবিজীবনের একেবারে প্রথম থেকেই। তাঁর এই অন্বেষণ-প্রক্রিয়াতে আমরা কয়েকটি স্তর বা পর্যায়ের স্পষ্ট পরিচয় পাই। ইন্দ্রিয়তন্ময়তার প্রথম পর্বের পর ইতিহাসচেতনার মধ্য দিয়েই তাঁর সত্যানুসন্ধানের সূচনা। কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কিছু সংখ্যক রচনা গভীরভাবে ইতিহাস-চেতনাসমৃদ্ধ। এই পর্বের কবিতায় প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনার স্বীকৃতিস্বরূপই সে-দিনের সমালোচকরা তাঁর কবিতার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'য়ে 'জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা' কথাটির যে বহুল ও পৌনঃপুনিক প্রয়োগ করেছিলেন, এখনো তাঁর কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে একালের সমালোচকদের রচনায় তা সমানভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস-চেতনা তাঁর কবিদৃষ্টিকে এই পর্বে যতোই স্বচ্ছ করুক না কেন, তাঁর কবিতা একান্ত-ভাবেই ইতিহাসচেতনানির্ভর—এই ধারণা পোষণ করার অর্থ তাঁর প্রতি সুবিচার নয়, অবিচার করা। কেননা তাঁর কবিজীবনের এই পর্বের কবিতাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যাবে যে ইতিহাসচেতনাকে তিনি একাগ্রচিত্তে লালন করলেও তাকে তিনি কখনোই একান্তভাবে স্বাগত করেন নি। তাঁর পক্ষে ইতিহাসচেতনা ছিলো একটা মধ্যবর্তী ও আপাত আশ্রয়ভূমির মতো। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কবিতা বিশ্লেষণ করলে আমরা এ-ও লক্ষ্য করবো, কী-ভাবে বা কোন্ পথে ঐ দ্বিতীয় পর্বেই তিনি ধীরে-ধীরে ইতিহাসচেতনাকে অতিক্রম ক'রে সমাজচৈতন্যে নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন। সম্ভবত তাঁর মনে এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিলো যে কেবল ইতিহাসচেতনার অতীতমুখিনতাতেই সত্য সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই, সমাজচৈতন্যের বর্তমানের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত ক'রেই সত্যের সন্ধানলাভ সম্ভব। ফলত, সমগ্র মানবসমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা ক'রে তিনি 'সুচেতনা' কবিতায় তাঁর স্থির উপলব্ধিজাত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন—'এই পথে আলো জ্বেলে—এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে নিসর্গতন্ময় কবির মনে সমাজচৈতন্যের যে-বীজ অস্পষ্টভাবে অঙ্কুরিত হ'তে শুরু করে, সে-বীজই তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহের একাধিক রচনায় ক্রমে পল্লবিত হ'য়ে ওঠে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' ও 'শকুন', 'বনলতা সেনে'র 'সবিতা' ও 'সুচেতনা', 'মহাপৃথিবী'র 'আট বছর আগের একদিন', 'সাতটি তারার তিমিরে'র 'তিমিরহননের গান' ও 'বিভিন্ন কোরাস' এবং শেষদিকের রচনা 'এইসব দিন-রাত্রি' ও '১৯৪৬-৪৭'—এই কবিতাগুলির বিশ্লেষণ পরম্পরায় তাঁর সমাজচৈতন্যের বিকাশের ধারাবাহিকতার হদিশ পাওয়া সম্ভব।

এখানে মাত্র একটি কবিতার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে বিষয়টিকে বিশদীকৃত করা হচ্ছে ঃ কবিতাটির নাম 'বোধ'। 'বোধ' জীবনানন্দের অন্যতম দীর্ঘ কবিতা। এটির পংক্তিসংখ্যা একশ' আট। কবিতাটি ব্যক্তিচেতনা ও যুগচেতনার সুমিত ও সমন্বিত রূপ। মূল স্বরূপে এটি অবশ্য একটি অস্তিত্ববাদী (existentialist) রচনা —যদিও তার প্রকাশ কবিতাটিতে তেমন স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ নয়। তবে এ-বিষয়ে সংশয়

নেই, ব্যক্তিচেতনা ও যুগচেতনার যুগল স্তম্ভেই এই কবিতাটিতে অস্তিত্ববাদের অবস্থান। জ্ঞান, অবগতি, অনুভব, উপলব্ধি, জাগরণ, চৈতন্য, বুদ্ধি, মতি এবং ধীষণা—এই সব ক'টির সমাহার ও সম্মিলনের পরিণামে আমাদের মধ্যে যে-শক্তি (faculty)-র উন্মেষ ঘটে, প্রচলিত অর্থে তারই নাম বোধ। কবি এই কবিতাটিতে তাঁর মধ্যে এই বোধের ক্রিয়াশীলতা ও তাড়নার (impulse) অভিঘাত (impact)-কে মাত্র নিজেই গভীর-ভাবে অনুভব করেন নি, আমাদিগকেও অতি পুঙ্খভাবে অনুভব করিয়েছেন।

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে কবি তাঁর মধ্যে বোধের সক্রিয়তার কথা নানাভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর চলাফেরা, চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম—ইত্যাদির প্রতিটির মধ্য দিয়েই এই বোধ আপন অস্তিত্ব জাহির ক'রে চলেছে ; এর হাত থেকে তিনি আর কিছুতেই নিস্তার পাচ্ছেন না। যেখানেই তিনি প্রস্থিত হোন না কেন—আলোয় কিংবা অন্ধকারে—এই বোধ তাঁর নিত্য সঙ্গী। অথচ একে তিনি স্বপ্ন ব'লেও অভিহিত করতে পারছেন না, কেননা স্বপ্নের অবাস্তবতা এতে নেই। তাঁর চেতনায় এর অস্তিত্ব নিতান্ত বাস্তব—'স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে / মাথার ভিতরে।' এই জাগর-সত্তারূপী বোধ তার মনের সংজ্ঞান (conscious) এবং অসংজ্ঞান (sub-conscious) স্তরের মধ্যবর্তী ; ফলে, স্থূল বস্তুবুদ্ধির অগম্য। একমাত্র হৃদয়সংবেদনাতেই তিনি এর বিদ্যমানতা সম্পর্কে অবগত হ'তে পারছেন। এর আবেশে তাঁর সমস্ত কাজ পণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে, সমস্ত সময় শূন্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে। হৃদয়েও জন্ম নিচ্ছে গভীর এক শূন্যতা। সেই শূন্যতার শিকার হ'য়ে মানুষের মধ্যে বাস ক'রেও মানুষজন থেকে তিনি পৃথক হয়ে যাচ্ছেন। 'সকল লোকের মাঝে ব'সে / আমার নিজের মুদ্রাদোষে / আমি একা হতেছি আলাদা ?'—এই প্রশ্ন তাঁর মধ্যে জেগে উঠছে। এইভাবে বস্তুজাগতিক সকল কিছুর সঙ্গে যখন তিনি নিঃসম্পর্কিত, তখন একমাত্র হৃদয়ই তাঁর সত্তার অধিষ্ঠানক্ষেত্র হ'য়ে উঠেছে, তারই সঙ্গে চলেছে তাঁর যতো কিছু স্বগতোক্তি ; বিমূঢ়ের মতো তিনি তার কাছে জানতে চেয়েছেন 'সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !' অর্থাৎ, সার্বিক এক অনন্বয়ের দ্বারা তিনি ক্রমে-ক্রমে গ্রস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

এই অনন্বয়ের অনুভূতি (feeling of alienation) স্বরূপত যুগচেতনারই প্রকাশ, এই malady of the age অস্তিত্বের গভীর সংকটেরই অভিব্যক্তি। বস্তুত, '—তবু কেন এমন একাকী ?'—প্রশ্নের আকারে এই বিষণ্ণ উচ্চারণ শুধু তাঁর একারই হৃদয়মথিত নয়, এটা আসলে অস্তিত্বের যন্ত্রণা বা anguish of existence-ক্লিষ্ট মানুষ-মাত্রেরই সত্তা-উন্মথিত। আত্মসত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে মানুষ যেদিন থেকে প্রয়াসী হয়েছে, সেদিন থেকেই তার মধ্যে অস্তিত্ববাদী চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। জৈব-জাগতিক প্রতিবন্ধকতায় তার সেই অস্তিত্বজিজ্ঞাসা মাঝে-মাঝে প্রতিহত হ'লেও কখনোই অবসিত হয়নি। আত্মজিজ্ঞাসায় অগ্রগতির পথে জৈবিক আস্তিত্বিক প্রতিবন্ধকতার পেষণ এবং তাঁর গ্লানিকর নিরর্থকতার অভিব্যক্তি জীবনানন্দের একাধিক কবিতাতেই বেশ স্পষ্ট। এবং ব্যক্তিক সত্তা ও সামাজিক সত্তার অনিবার্য সংঘাত, পরাচেতনা ও

অপরাচেতনার দ্বিকোটিক বিভাজন, আন্তর্জীবনের আবরণ উন্মোচনের প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসে নিরন্তর নিরলস সংগ্রাম—অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনের এই সাধারণ লক্ষণসমূহের বিদ্যমানতায় সেই কবিতাগুলির মধ্যে 'বোধ'-এর স্থান সর্বোচ্চে।

কিন্তু সমাজচৈতন্যকে ভিত্তি ক'রে মানবসভ্যতার আন্তরিক উত্তরণাভিলাষে তিমির-হননের যে-গান গেয়ে উঠেছিলেন সত্যানুসন্ধিৎসু জীবনানন্দ, সে-গান কিন্তু সমে এসে পৌঁছোলো না, মধ্যপথেই তালভঙ্গ হ'লো, যতি পড়লো তাতে। কেননা সমাজচৈতন্যের সূত্র ধ'রে এগোতে-এগোতে তিনি মুক্তির ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারলেন না, বরং মানবসমাজের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত, লোভ-হিংসা-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-কামনা-বাসনা-অসূয়া-জর্জরিত অধঃপতিত রূপ তাঁকে নিক্ষেপ করলো ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার পঙ্ককুণ্ডে, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন তিনি, রিরংসা-বিবমিষায় সঙ্কুচিত হ'য়ে এলো তাঁর সমগ্র সত্তা। তিনি বিচলিত হ'য়ে উঠলেন, আতঙ্কিত বোধ করলেন এবং তারই অনিবার্য অভিঘাতে তাঁর সামাজিক বিশ্বাসের একেবারে ভিৎ-এ ফাটল দেখা দিলো। ফলে, যে-জীবনানন্দের কণ্ঠে আমরা ধ্বনিত হ'তে শুনেছিলাম 'এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'-র মতো আশ্বাসবাণী, সেই জীবনানন্দেরই বিমূঢ় কণ্ঠে 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতায় উচ্চারিত হ'লো নৈরাশ্যবার্তা—'মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।' মনে হয়, আমরা যেন তাঁর এই সংশয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনি সময়ের উজান ঠেলে ভেসে-আসা ইংরেজি সাহিত্যের যুদ্ধবিরোধী যুদ্ধ-কবি উইলফ্রীড ওয়েন-এর বিপন্ন প্রশ্ন : 'was it for this the clay grew tall ?' অতএব যখন জীবনানন্দ তথাকথিত সামাজিক চৈতন্য ও মূল্যবোধে বিচলিতআস্থা হ'য়ে এই নেতিবাচক প্রত্যয়ে সুস্থিত হয়েছেন যে মানুষ এখনো নীরন্ধ্র অন্ধকারেই নিমজ্জিত হ'য়ে আছে, তখন এবং একমাত্র তখনই তিনি সামাজিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষতার আড়ালে আরেক নিহিত বাস্তবতার পরোক্ষ উপস্থিতি ক্রমে-ক্রমে অনুভব করতে আরম্ভ করলেন। সেই বাস্তবতার আহ্বানে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলেন তিনি এবং স্বপ্ন-তাড়িতের মতো পায়ে-পায়ে সেই দিকেই এগোতে থাকলেন, অভিযাত্রী হ'য়ে উঠলেন পরাবাস্তবতার গহন পথের, সূত্রপাত ঘটলো তাঁর কবিজীবনের তৃতীয় পর্বের।

তাঁর এই মানসিক কক্ষপরিবর্তনে, যে-সব সাহিত্যিক-বিশেষণধারী ছদ্মবেশী রাজনৈতিক কর্মী সাহিত্যকে সামাজিক রূপান্তরের ও দলীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে তৎপর, তাঁরা যথেষ্ট নিরাশ হ'লেও যাঁরা সাধারণভাবে রাজনীতিতে উৎসাহী হ'য়েও কবিতাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে আগ্রহী, তাঁরা নিশ্চিতরূপেই আশান্বিত বোধ করবেন। কেননা এর ফলে তাঁর সৃষ্টির নিসর্গে স্পষ্ট ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে এবং কবিজীবনের এই তৃতীয় পর্বে তাঁর কাছ থেকে আমরা উপহার পেয়েছি এমন কিছু কবিতা, যেগুলিকে নির্দ্বিধায় চিহ্নিত করা চলে 'শ্রেষ্ঠ'—এমন কি 'মহৎ' অভিধায়। আজ, যখন কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়ে পরিণত হয়েছেন, তখন তাঁর কবিজীবনের সেই দূরবিগত

পর্যায়ের কথা ভেবে এই সংশয় আমাদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক যে যদি সেদিন সমাজবাস্তবতা থেকে পরাবাস্তবতায় তাঁর পথান্তর না ঘটতো, তবে হয়তো আধুনিক বাংলা কবিতার গরীয়ান দৃষ্টান্ত তাঁর এই পর্বের কোনো-কোনো কবিতার স্বাদ থেকে আমরা চিরতরেই বঞ্চিত থাকতাম। বাস্তবিক, পরাবাস্তবতার এই তৃতীয় পর্বটি তাঁর পরিশীলিত কবিজীবনেরও পরিশীলিততম অধ্যায়। এই পর্বে এমন সব বিশুদ্ধ কবিতা (pure poem) তিনি রচনা করেছেন যেগুলির সমকক্ষ রচনা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ। এই পর্বের কবিতাগুলিতে, তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রতিপাদনে, যে-সব প্রতীক ও উপমা প্রয়োগ করেছেন কিংবা যে-সমস্ত রূপকল্প ও চিত্রকল্প ইতস্তত নির্মাণ করেছেন সেগুলি একপক্ষে যেমন পরাচেতনাসঞ্জাত, অপরপক্ষে এগুলির সঠিক উপলব্ধিও তেমনই পরাঅনুভূতিসাপেক্ষ। অর্থাৎ, এই কবিতাগুলির মর্মে প্রবেশের জন্য পাঠকদের তরফে স্বতন্ত্র ধরনের প্রয়াসের প্রয়োজন ; কেননা এগুলির আবেদন শুধু হৃদয়ের বা মাত্র মস্তিষ্কের কাছে নয়, এগুলির আবেদনে সাড়া দেবার দায়িত্ব যুগ্মভাবে হৃদয় এবং মস্তিষ্ক উভয়েরই। নিছক বুদ্ধি নয়, বোধ—আবার কেবল বোধও নয়, বোধিরও প্রয়োজন এগুলির মর্মোপলব্ধির জন্য।

সত্যসন্ধানী জীবনানন্দের কবিদৃষ্টিতে পরাবাস্তবের মানচিত্র যখন ধরা পড়লো, তখন কবি হিসেবে তিনি অনেকটাই রূপান্তরিত। সমাজবাস্তবতার বস্তুবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গিতে আপাত-প্রতীয়মানকেই তিনি সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু পরাবাস্তবতার তুলাদণ্ডে প্রতীয়মানের তুলনায় সত্যকে বহুগুণে গুরুভার ব'লেই তাঁর কাছে অনুভূত হ'লো, তাঁর দৃষ্টিকে এড়াতে পারলো না সত্য ও প্রতীয়মানের মধ্যবর্তী বিপুল ব্যবধান। যে-জগৎসংসারকে একদিন সাময়িকভাবে হ'লেও তাঁর মনে হয়েছিলো দীপ্ত রৌদ্রালোকিত এবং স্থিতিশীল, প্রতীয়মানের আবরণ উন্মোচিত হ'তেই পরাবাস্তবের আলোয় সেই জগৎসংসারেরই চেহারা অন্যরকম হ'য়ে উঠলো, হ'য়ে উঠলো অবচেতনার ছায়া-সমাচ্ছন্ন এবং চূড়ান্তরকমের অস্থিতিশীল। তাঁর স্যুররিয়ালিস্ট-পর্বের সমস্ত কবিতাই, রবীন্দ্রনাথের ছবির মতো, বাস্তবের এই অন্যরকম চেহারার। অন্য চেহারার বাস্তবতার এই কবিতাগুলি পড়তে-পড়তে পাঠক-পাঠিকাদের মনে না-হ'য়েই পারে না যে এগুলিতে উদ্ঘাটিত জগৎ তাঁদের অপরিচিত, এ-জগতের ঘটনা-পরম্পরা অসম্ভব, কোনোক্রমেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য তো নয়ই। অথচ আশ্চর্য, এই কবিতাগুলি তৎসত্ত্বেও তাঁদের টানে এবং গভীরভাবেই। বস্তুজাগতিক বাস্তবতার অন্তরালবর্তী মগ্নচেতনালোকের বাস্তবতার এই যে উন্মোচন, সহজ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় এরই নাম স্যুররিয়ালিজম্। বাংলা কাব্যের মূল প্রবাহে স্বর্গত কবি জীবনানন্দ দাশ এই অত্যাধুনিক কাব্যরীতিটিকে সংযোজিত করেছেন এবং এই সংযোজনা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যে তাঁর অন্যতম অবদান।

কিন্তু স্যুররিয়ালিজমে আশ্রিত হ'য়েও জীবনানন্দের কাব্যবিশ্বাসের বিবর্তন সমাপ্ত হয়নি। তাঁর কবিজীবনে এর পরেও আরো একটি পর্ব ছিলো—চতুর্থ বা শেষ পর্ব।

এই শেষ পর্বে তিনি পরাবাস্তবের অন্ধকারের অস্পষ্টতা অতিক্রম ক'রে 'অন্তিম মূল্যে'র অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন, 'তিমিরবিনাশী' হ'তে চেয়েছিলেন। জগৎপারাবারের তীরে মানবিক আস্তিত্বিক, সত্য কোন্ মূল্যে নিরূপিত হবে—এই পর্বে এটাই হ'য়ে উঠেছিলো তাঁর অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়। একটা আশাভরসাময় অথচ বিবেকসম্মত মীমাংসায় উপনীত হওয়াই পরিণত হয়েছিলো তাঁর অন্তিমের ইচ্ছায়। এবং তাঁর সেই অন্তিমের ইচ্ছা কোনো অর্থেই জর্ম্যান-কুলীন টমাস মান-কথিত 'contrivance'-মাত্র ছিলো না, তাতে নবসৃষ্টির নিজস্ব প্রেরণাই নিহিত ছিলো। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মৃত্যুর আকস্মিক আগমনে তাঁর সে-ইচ্ছার পূরণ ঘটেনি। কাব্যবৃত্তের পরিক্রমা অসমাপ্ত রেখেই পরলোকের আহ্বানে তাঁকে সাড়া দিতে হয়েছে। বাংলা কবিতার পক্ষে তাঁর এই অকালপ্রয়াণ নিঃসন্দেহে অপূরণীয় ক্ষতি।

এতক্ষণ ধ'রে জীবনানন্দের কবিসত্তার ক্রমবিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ যে-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করলাম, তা থেকে একটা বিষয় সকলেই বুঝতে পারবেন ; বুঝতে পারবেন যে জীবনানন্দ দাশ কবি হিসেবে খুবই স্বতন্ত্র ; তাঁর কবিতা একান্তভাবেই অনন্য-পরতন্ত্র। যথার্থ প্রতিভাবান কবিদের মতো তিনিও তাঁর কবিজীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত দেশীবিদেশী কোনো কবির দ্বারা স্পষ্টত প্রভাবিত না-হ'য়ে নিজের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখতে পেরেছেন। একজন আধুনিক কবি হিসেবে এটা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই কৃতিত্বের ; কেননা আধুনিক বাঙালী কবিদের কেউ-কেউ এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট রকমে পারস্পরিক প্রভাবপ্রবণ থেকে গেছেন। কবি হিসেবে জীবনানন্দের স্বকীয়তার উৎসসন্ধানে ব্রতী হ'লে আমরা দেখতে পাবো যে তিনি রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে প্রবাহিত বাংলা কবিতার আবহমান ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত—কিন্তু যাকে আমরা বলি রবীন্দ্রঐতিহ্য, তার কোনো স্পষ্ট উত্তরাধিকার কিংবা সজ্ঞান অনুসরণ তাঁর কবিতায় সহজলক্ষ্য নয়, অথচ তাঁকে কোনোক্রমেই কট্টর রবীন্দ্রবিরোধী হিসেবেও চিহ্নিত করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বর্জন করেন নি, গ্রহণ করেছেন ; অস্বীকার করেন নি, স্বীকার করেছেন ; তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্পষ্টত প্রভাবিত করতে পারেন নি। এ-কথা ঠিক যে কোনো-কোনো আধুনিক সমালোচক তাঁর কবিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একাধিক কবির প্রভাব খুঁজে ফিরেছেন তাঁর কবিজীবনের ভিন্ন-ভিন্ন পর্বে। তাঁদের যুক্তির স্বপক্ষে কেউ বলেছেন কবির প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালকে' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামের প্রভাবের কথা, তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতায় কেউ খুঁজে পেয়েছেন অ্যাডগার অ্যালেন পো-র 'To Helen' কবিতার প্রভাব, কেউবা উল্লেখ করেছেন তাঁর নিসর্গতন্ময়তায় রচিত প্রকৃতিপর্যায়ের কবিতাবলীতে ওয়র্ডস্বার্থ, শেলী, সুইনবর্ণ এবং সেই সঙ্গে প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের প্রভাবের, সুতীব্র ইন্দ্রিয়বোধের কবিতাগুচ্ছ প্রসঙ্গে কেউ হয়তো বলেছেন কীট্‌স্‌-এর প্রভাবের কথা আবার কেউবা সাদৃশ্য টেনেছেন তাঁর সুররিয়ালিস্ট পর্বের পরাবাস্তব কবিতামালার সঙ্গে স্যামুয়েল টেলর কোলরীজের অতিপ্রাকৃত কবিতার, উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্‌স্‌-এর স্বপ্নাতুর কবিতাবলীর।

এ-সবই সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। কেননা জীবনানন্দের কাব্যে অন্য কোনো কবি কিংবা কোনো-কোনো কবির প্রভাব আবিষ্কার করতে গিয়ে এ-কথাটা স্মরণে না রাখলেই নয় যে কোনো কবির রচনায় তাঁর পূর্বজ বা সমকালীন কোনো কবির প্রভাব পড়া অমার্জনীয়রূপে দূষ্য কিছু নয়, বরং প্রাথমিক পর্যায়ে তা খুবই স্বাভাবিক, এমন কি প্রায় অনিবার্য। তাঁর প্রথম পর্বের 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের রচনাগুলিতে সত্যেন্দ্র-নজরুলের প্রভাব পড়েছিলো অনেকটা necessary evil হিসেবে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে এড়াতে গিয়েই এই দুই কবির প্রভাব তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছিলো। তাঁর নিসর্গপর্যায়ের কবিতার ওপর ওয়র্ডস্বার্থ, শেলী, সুইনবর্ন কিংবা প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের প্রভাবের মূলে ছিলো ইংরেজ রোম্যাণ্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক নৈকট্য, নিজের দেহের শোণিতস্রোতে এই কবিদের অস্তিত্বের ঘনিষ্ঠ অনুভূতি। আর, মার্কিন সাহিত্যিক অ্যাডগার অ্যালেন পো-র 'To Helen' কবিতার সঙ্গে তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাটির অস্পষ্ট সাদৃশ্য, মনে হয়, নেহাৎই আকস্মিক—হয়তো জীবনানন্দের নিজেরও অজ্ঞাত। কিন্তু কোলরীজের কবিতার সঙ্গে তাঁর কোনো কবিতার তুলনা একেবারেই অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। কেবল কীট্স্ ও ইয়েট্স্—এই দু'জন কবির সঙ্গেই তাঁর স্বভাবসাদৃশ্য কিছুটা স্পষ্ট।

জীবনানন্দের কাব্যে এইসব প্রভাবের অস্তিত্ব সমালোচকগণ আবিষ্কার ও স্বীকার করলেও তিনি নিজে সজ্ঞানে কখনো তাঁর কবিতায় কোনো প্রভাবকে সহজে স্বীকার করেন নি, বরং একেবারে প্রাথমিক পর্যায়কে বাদ দিলে, তাঁর জীবননাট্যের আকস্মিক যবনিকাপাত পর্যন্ত সতর্ক সাধনায় আত্মস্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখতে পেরেছিলেন তিনি। সমস্ত প্রভাবকে অস্বীকার বা স্বীকার ক'রেও তাঁর কবিতায় শেষ পর্যন্ত এমন একটা অপূর্বতা বিরাজমান, যা, প্রথম পরিচয়েই পাঠকদের তাঁর কবিতার অনুরাগী ক'রে তোলে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'কয়েকটি লাইন' কবিতায় তিনি যে আবেগবশে হঠাৎ লিখে ফেলেছিলেন—'আমার মতন আর নাই কেউ'—এটাই বোধ হয় তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো সত্য। বাস্তবিক, নিজের কবিতায় এতখানি অকপট আত্ম-উন্মোচন এবং এত যথার্থ আত্মপরিচয়প্রদানের দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে খুব বেশি নেই।

(জীবনানন্দের কাব্যবিশ্বাসের মতো তাঁর কবিতাতেও বিবর্তনের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট এবং তাঁর কাব্যগত বিবর্তন তাঁর বিশ্বাসগত বিবর্তনেরই অনুক্রমিক) ফলে, বিশ্বাসের বিবর্তনের মতো তাঁর কবিতার বিবর্তনেও কয়েকটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত পর্যায় আছে। বিভিন্ন কবিতা থেকে আংশিক উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁর কাব্যবিবর্তনের রূপ-রেখাটিকে তুলে ধরা যেতে পারে। (সেই বিবর্তনের আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ধূসর জগতে—পল্লীবাংলার হেমন্তসন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় এবং সমাপ্তি কবি-প্রত্যাশিত 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' কলকাতার সুস্পষ্ট কলকোলাহলে) প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি বর্ণনামূলক এবং প্রধানত প্রকৃতিরই বর্ণনা। কিন্তু বর্ণনার নিপুণ অনুপুঙ্খতায় সেগুলি জীবন্ত। দৃষ্টি ও শ্রুতির কাছেই এই কবিতাগুলির মুখ্য আবেদন। এগুলিতে

নৈসর্গিক আবেষ্টনী ও আবিষ্টতা এত ঘনিষ্ঠ (close) ও গভীর (profound) এবং স্থূল বাস্তবের হস্তাবলেপ ও সংঘাত এত কম যে কখনো-কখনো এগুলি কল্পনার (imagination) স্তর অতিক্রম ক'রে কাল্পনিকতার (fancy) প্রান্তস্পর্শী। এই পর্যায়ের কবিতা থেকে অনুপুঙ্খ বর্ণনার এবং fancy-স্পর্শিতার দু'টি দৃষ্টান্ত :

১.

…হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা কড়্‌কড়্ ;
শসাফুল—দু'-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুকনো মাকড়সা
লতায়—পাতায় ;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়—

('পঁচিশ বছর পরে' : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

২.

যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে—মরার হাতের শাদা হাড়ের মতন—
যেখানেই বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে ল'য়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান—

('সহজ' : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিতে ইতিহাসচেতনা, সমাজ-বাস্তবতা এবং তদানুষঙ্গিক ব্যঙ্গপ্রভরতারই প্রাধান্য। এইসব কবিতায় কবির প্রাথমিক ইতিহাসচেতনা কীভাবে ধীরে-ধীরে সমাজবাস্তবতার পথ ধ'রে এগোতে-এগোতে শেষ পর্যন্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপে পর্যবসিত হয়েছে, তার একটা ইতিবৃত্ত লুকোনো রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি যদি হ'য় দর্শকের, দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি তাহ'লে পথিকের এবং বিশ্লেষকের। প্রথম পর্বের কবিতাগুলি মূলত naturalism-এর, কিন্তু এই পর্বের কবিতাগুলি স্পষ্টত realism-এর। ইতিহাসচেতনার কবিতাগুলির মধ্যে 'বনলতা সেন'ই অবশ্য প্রধান, যেটিতে কবির পথিকবৃত্তি ইতিহাসেরই প্রেক্ষাপটে :

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;

কবিতাটি শুধু তাঁর নিজেরই নয়, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কবিতাটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং বস্তুতপক্ষে করাও হয়েছে তা-ই —যদিও প্রথম ব্যাখ্যার চেয়ে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই সমালোচকমহলে অধিক সঙ্গত ব'লে গ্রাহ্য হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যায় এটি একটি প্রেমের কবিতা—বিশুদ্ধ ও নিটোল এবং সম্পূর্ণভাবে শারীরিক না-হ'লেও অন্তত মানবিক প্রেমেরই, এর বেশি কিছু নয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে কবি জনৈক প্রেমিক পুরুষ এবং বনলতা সেন জনৈকা প্রেমিকা রমণী। প্রেমিক যেমন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রেমিকার কাছে তাঁর সমস্ত দুঃখ ও অবসাদের অবসান কামনা করে, প্রার্থনা করে সামান্য শান্তি ও সান্ত্বনা, কবিতাটিতে 'ক্লান্ত প্রাণ' কবিও তেমনই বনলতা সেন নাম্নী নাটোরবাসিনী তাঁর প্রেমিকার কাছে একটু শান্তি পেতে চেয়েছেন এবং সেই রমণী সত্যিই তাঁকে 'দুদণ্ড শান্তি' দিয়েছে। কিন্তু এহ বাহ্য ; এটা কবিতাটির বাইরের পরিচয়, ভেতরের নয়। 'বনলতা সেন' কবিতার এই প্রথম ব্যাখ্যাটি খুবই সরল, সন্দেহ নেই ; এবং ব্যাখ্যাটির এই অতিসারল্যের (over-simplification) দরুণই এই ব্যাখ্যাকে অনেকে কবিতাটির মর্মোদ্ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট নয় ব'লে বিবেচনা করেন এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকেই বেশি গুরুত্ব দেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় কবিতাটি অনেক গভীর এবং যথেষ্ট জটিল। এই বিশ্লেষণে এটি নিছক কোনো মানবীয় বা সাধারণ প্রেমের কবিতা নয় ; এটি ইতিহাসচেতনার এবং কাল-চেতনার কবিতা এবং বনলতা সেন কোনো মর্ত্যমানবী নয়, চিরন্তন নিসর্গপ্রকৃতিরই প্রতীক। এই ব্যাখ্যায় কবি নিজেও তাঁর ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে চিরপথিক (eternal travellar)-এ পরিণত—'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' কিংবা 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' তাঁর অবস্থান, 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে' তাঁর ঘুরে বেড়ানো এবং 'হাজার বছর ধরে' 'পৃথিবীর পথে' তাঁর পথ হাঁটা—ইত্যাদির কোনোটাই তাঁর ব্যক্তিমানুষের পথযাত্রার নয়, এগুলির প্রতিটিই আসলে মানবসত্তার শাশ্বত অগ্রগতির, মানবাত্মার চিরন্তন pilgrim's progress-এরই ধারাবিবরণী। মানবসত্তার এই অগ্রযাত্রা অনাদ্যন্ত। সুদূর অতীত থেকে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার পথরেখা চিহ্নিত। সময় সেখানে সীমাহারা। এই কবিতাটিতেও সময়ের এই অনন্ত প্রবাহ স্পষ্ট-রূপে অনুভূত, তার গ্রন্থিটি সুন্দরভাবে উন্মোচিত। এখানে অতীত যেমন বর্তমানে সমাগত, বর্তমানও তেমনই অতীতে প্রত্যাবৃত্ত। অর্থাৎ, বর্তমানের সময়-মুহূর্ত (time-moment)-টি সময়ের সমগ্র প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেই প্রবাহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। 'ক্ষণকাল'-এর আভাসনের পরিবর্তে কবিতাটিতে আমরা লক্ষ্য করি 'চিরকাল'-এর উদ্ভাসন। বস্তুত, সময়চেতনা সম্পর্কে জীবনানন্দের যে

বিশ্বাস ছিলো, 'মহাবিশ্বলোকের সময়ের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো।'—এই কবিতাটি তাঁর সেই বিশ্বাসেরই অন্যতম প্রত্যক্ষ ফলিতরূপ (direct applied form)।

আঠারো পংক্তির এই কবিতাটির প্রথম স্তবকে কবিপ্রাণের আত্মপরিচয়, দ্বিতীয় স্তবকে কবিপ্রাণের প্রেমিকাপরিচিতি এবং তৃতীয় বা অন্তিম স্তবকটিতে উভয়ের পরিণামী সম্মিলন, অর্থাৎ, স্বপ্নগত সত্য (dream-reality)-র উদ্ঘাটন। কিন্তু স্মরণে রাখার, বনলতা সেন কবির স্বপ্নের নায়িকা হ'লেও এবং কবিতাটিতে স্বপ্নের আবেশ থাকলেও, এই কবিতায় স্বপ্নে আত্মগোপন নেই, যা আছে তা হচ্ছে ইতিহাসে নিমজ্জন। কবিতাটিতে যে-কালচেতনার, প্রেমচেতনার—এমনকি প্রকৃতিচেতনারও—পরিচয় প্রকাশিত, তা ইতিহাসচেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, সেই চেতনার অঙ্গীভূত। এই চেতনাসমূহের কোনোটিকেই কবি ইতিহাসচেতনার মূলস্রোত (mainstream) থেকে বিবিক্ত ব'লে গণ্য করেন নি। অতএব স্বীকারে বাধা নেই, 'বনলতা সেন' কাল-চেতনার মতো ইতিহাসচেতনারও কবিতা। এই দ্বিতীয় এবং প্রকৃত ব্যাখ্যাতেই কবিতাটির ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা—দুই-ই দূরযানী।

'এইসব দিনরাত্রি', '১৯৪৬-৪৭' এবং আরো কয়েকটি কবিতায় সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা বাস্তবিক শোচনীয়ঃ

জানেনা কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে ;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।
... ...
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।

('এইসব দিনরাত্রি')

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
... ...
বাংলার লক্ষ গ্রামবাসী একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিলো প্রায় ; নিভে গেছে সব।

('১৯৪৬-৪৭')

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতাগুলিও প্রায়শই সুতীব্র ও শাণিত ঃ

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

('রাত্রি' ঃ 'সাতটি তারার তিমির')

তৃতীয় পর্যায়ের পরাবাস্তব কবিতাগুলি, আগেই দেখেছি, ভিন্ন জগতের অভিসারী। প্রচলিত ধারণায় সে-জগৎ সত্যও নয়, সত্যতাশূন্যও নয়, স্বপ্নেরও নয়, স্বপ্নহীনতারও নয় : সম্পূর্ণ বাস্তব নয়, আবার একেবারে বাস্তবতাবর্জিতও নয়। সে-জগতে এগুলির কোনোটিই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান অথবা সম্পূর্ণ অবিদ্যমান কোনোটাই নেই। এইসব আপাত-বিপরীতের মধ্যবর্তী সেই জগতকে আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। এবং আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বাস করি আর না-ই করি, ফ্রান্‌জ্‌ কাফকার জগতের মতো, আপাত-অবিশ্বাস্য সেই জগতের গোলকধাঁধাঁয় একবার প্রবেশ করলে আমাদের মনের পা সেখানে আটকে যায়, তার ছায়াঘোর অতিক্রম ও মায়াডোর ছিন্ন ক'রে আমরা সহজে বেরিয়ে আসতে পারি না। জীবনানন্দের পরাবাস্তব কবিতার আলোচনাপ্রসঙ্গে বিখ্যাত 'বিড়াল' ('মহাপৃথিবী') এবং 'ঘোড়া' ('সাতটি তারার তিমির') কবিতার যথাক্রমে ঃ

১.

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফ্‌রান-রং-এর সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

এবং

২.

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
... ...
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেলে গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

অংশ দু'টি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু কিছুমাত্র কম উল্লেখ্য নয় তাঁর অপেক্ষাকৃত অনালোচিত অন্য একটি কবিতার এই পংক্তি ক'টিও ঃ

বলিল সে ঃ 'আমারে চেয়েছ তাই ছোটো বোনটিরে—
তোমার সে ছোটো-ছোটো মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এতদিন
ঘুমাতেছিলাম আমি '—ভয় পেয়ে থেমে গেলো মেয়ে,
বলিলাম ঃ 'আবার ঘুমাও গিয়ে
ছোটো বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

কবিতাটির নাম 'মেয়ে' এবং এটি প্রথম-পরবর্তী সংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সংযোজিত। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত বটে, কিন্তু আমার ধারণা, কবিতাটি আরো অনেক পরবর্তীকালীন রচনা—জীবনানন্দের কবিজীবনের তৃতীয় পর্যায়ের। এই ধারণার প্রথম কারণ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলির সঙ্গে এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্যগত মিল একেবারেই অনুপস্থিত, অথচ তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের কবিতার সঙ্গে এটির চারিত্রিক সাদৃশ্য স্পষ্টতই প্রতীয়মান। দ্বিতীয় কারণ এই যে জীবনানন্দের একাধিক গ্রন্থেরই কবিতার বিন্যাস সেগুলির রচনার কালানুক্রমিক নয়। আগের রচনা পরের গ্রন্থে এবং পরের রচনা আগের গ্রন্থে সন্নিবেশের অনেক উদাহরণ অনেক অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার জানা। কিন্তু রচনাকাল, আগে অথবা পরে, যখনই হোক না কেন, কবিতাটিতে দুঃস্বপ্নের ঘোর ভেঙে পরিচিত পারিপার্শ্বিকতায় কবিচিত্তের প্রত্যাবর্তনের কথা আছে, আছে পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে ফিরে আসার কাহিনী। এবং কবিসত্তার এই পুনর্জাগরণই 'বিড়াল' এবং 'ঘোড়া'র মতো এই কবিতাটিরও স্যুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতার পরাকাষ্ঠা।

জীবনানন্দের কবিজীবনের শেষ বা চতুর্থ পর্যায়ের সমস্ত কবিতাই স্বরূপত 'তিমির-হননের গান'। ইতিপূর্বেই 'সুচেতনা' ('বনলতা সেন') কবিতায় তাঁর উপলব্ধি ঘটেছিলো, 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা / সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।' এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে সেই 'শেষ সত্যে'র সন্ধানেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। এর আগেই 'উত্তরপ্রবেশ' ('সাতটি তারার তিমির') কবিতায় ঃ

> নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
> সজন নির্জন হ'য়ে থেকে
> ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
> উত্তরপ্রবেশ করে আরো-বড়ো চেতনার লোকে ;

—এই চেতনার সঙ্গে তিনি পরিচিত হ'য়ে উঠেছিলেন ; এই পর্যায়ে তিনি প্রয়াসী হলেন সেই 'আরো-বড়ো চেতনার' উন্মোচনে। পরাবাস্তব তৃতীয় পর্যায়ের মতো এই পর্যায়ে তিনি 'তিমিরবিলাসী' নন, তিনি 'তিমিরবিনাশী'। 'তিমিরহননের গান' ('সাতটি তারার তিমির') কবিতায় তিনি একই সঙ্গে প্রশ্ন রেখেছেন ঃ

> তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
> আমরা কি তিমিরবিলাসী ?

এবং সেই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ উচ্চারণ করেছেন ঃ

> আমরা তো তিমিরবিনাশী
> হ'তে চাই।
> আমরা তো তিমিরবিনাশী।

এই 'তিমিরবিনাশী' মন্ত্রোচ্চারণেই সংহত হয়েছিলো তাঁর কবিজীবনের অসমাপ্ত অন্তিম পর্যায়ের যা-কিছু আগ্রহ।

জীবনানন্দের কবিজীবনের শেষ পর্যায়টি তাঁর আকস্মিক অকালমৃত্যুতে অসমাপ্তভাবে অবসিত, এটা একটা দুঃখজনক সত্য। কিন্তু লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয়, এই অসমাপ্ত শেষ পর্যায়েই তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে একটি সঞ্চারী সুর। এই ঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালীন এবং ঐ যুদ্ধের অভিঘাত ও অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। মনে হয়, মানবিক অস্তিত্বের সব হাহাকারকে আপন অস্তিত্বে সাঙ্গীকৃত ক'রে নিয়ে, জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা-বিফলতাকে অতিক্রম ক'রে এক শুভ আস্তিক্যবোধে এবং অপরাজেয় আশাবাদে তিনি ক্রমেই উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছিলেন; উপনীত হয়েছিলেন এক মহাজাগতিক চেতনায় (cosmic consciousness)। জীবনের অন্ত্য-পর্যায়ের রচনা একটি কবিতার এই পংক্তি ক'টিতে ধ্বনিত তাঁর সেই আশাবাদ মন্ত্রের মতোই অমোঘ, মন্ত্রের মতই অনুপম ঃ

নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

('সময়ের কাছে' ঃ 'সাতটি তারার তিমির')

জীবনানন্দ সময়-সচেতন কবি এবং সময়-চেতনারও। দূর থেকে নয়, সময়ের অগ্নিবলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই মানবিক পরিস্থিতি (the human situation)-কে অবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। এবং সেই অবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কালজ্ঞান তাঁকে সহায়তা করেছে। বস্তুত, ইতিহাসচেতনার মতো কালজ্ঞানও যে কবিদের ক্ষেত্রে তাঁদের উৎকর্ষ নিরূপণের অন্যতম মানদণ্ড এবং এই দুই বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমানতার বিবেচনাতেই যে কবিরা 'মহৎ' পদবাচ্য হন, এই কাব্যসত্য তাঁর আদৌ অজ্ঞাত ছিলো না। তাঁর একটি উক্তি এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। 'কবিতার কথা' গ্রন্থের 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধের দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় বাক্যে তিনি বলেছেন,'···কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' নিজের কবিতায় এই কালজ্ঞানের তিনি অধিকারী ছিলেন। কালকে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিন খণ্ডে বিভাজিত ক'রে দেখেন নি (যদিও এই তিনেরই স্বাতন্ত্র্য তাঁর কবিতায় স্বীকৃত), দেখেছেন এক অখণ্ডিত ও অনাদ্যন্ত প্রবাহ-রূপে। সেই প্রবাহে অতীতের ধারা এসে যেমন মিশেছে, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্রোতও তাতে তেমনই অবলুপ্ত হয়েছে। কালের ঘূর্ণনেই—'অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে' ('এইসব দিনরাত্রি')—কালের তিনরূপ তাঁর কাছে প্রতিভাত। অতীতচারিতায় কখনো তাঁর 'মনে হয় প্রাণ এর দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে / জন্ম নিয়েছিলো কবে' ('যাত্রী'), আবার বর্তমান-সচেতনতায় তিনি কখনো বা বুঝতে পারেন 'ঢের ভারতীয় কাল—পৃথিবীর আয়ু শেষ ক'রে / জীবনের বঙ্গাব্দ পর্বের প্রান্তে ঠেকে' ('মানুষের

মৃত্যু হ'লে') ; মানুষের কালগ্রস্ততার কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর অনুভূতি জাগে 'আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি' ('আবহমান') এবং সেই ঘড়ি মণিবন্ধে বেঁধে তিনি উপলব্ধি করেন. 'সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়' ('সময়ের কাছে') ।

কালের ঘূর্ণন-প্রসঙ্গে যদিও তিনি 'মৃতবৎ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তবু সময় তাঁর দৃষ্টিতে মৃত নয়, জীবিত—বরং সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অতিজীবিত' ; কেননা তাঁর কানে 'সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে / কথা বলে' ('১৯৪৬-৪৭') । সেজন্যই সময়কে মৃতজ্ঞানে তার ব্যবচ্ছেদ (postmortem)-এ তিনি অনাগ্রহী (ব্যতিক্রমস্বরূপ আপাতত মনে পড়েছে একমাত্র 'আট বছর আগের একদিন'-শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটির কথা, যেটিতে সমকালের ব্যবচ্ছেদই তাঁর অভিপ্রেত ।), সজীব বিবেচনায় তার গ্রন্থি-মোচনেই তাঁর যত উৎসাহ । সময়কে জীবিত জেনেই জননীর অঙ্কশায়িত শিশুর মতো সময়ের ক্রোড়ে তিনি কালনিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'তে চেয়েছেন—সময়ের কাছে তাই তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা ঃ

> আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
> হে সময়গ্রন্থি ··· ··· ···
> আমাকে জাগাতে চাও কেন ।
>
> ('অন্ধকার' ঃ 'বনলতা সেন')

জীবনানন্দকে আমরা প্রধানত প্রকৃতির কবি হিসেবেই জেনেছি, প্রেমের কবিরূপে নয় । মূল পরিচয়ে তিনি প্রকৃতিরই কবি, সন্দেহ নেই ; কিন্তু প্রেমের কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও উত্তররৈবিক বাঙালী কবিদের মধ্যে তাঁর একটা বড়ো ভূমিকা আছে এবং সে-ভূমিকায় তাঁর কৃতিত্বও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মতো । প্রেমের কবিরূপে তাঁর বৈশিষ্ট্য কী বা কোথায় ? তাঁর বৈশিষ্ট্য এই এবং এখানটায় যে প্রেমদৃষ্টিতে তিনি রূপবিদ্ধ । নিছক দেহ নয়, দেহ যার আশ্রয়, সেই রূপই তাঁকে আবিষ্ট করেছে, তারই আবেশে তিনি বিহ্বল । ফলে, প্রেমের কবিতায় তিনি শারীরিক হ'য়েও, তাঁর সমকালীন বুদ্ধদেব বসুর মতো, শরীর-সর্বস্ব নন । আবার তাঁর প্রেমিকা সুধীন্দ্রনাথের প্রেমিকার মতো ক্ষণিকা ও চপলা অথবা অমিয় চক্রবর্তীর নায়িকার মতো চিরভ্রাম্যমানা ও অক্লান্তপথিকাও নয় । তাঁর প্রেমিকা মৃতা—অতীতপ্রস্থিতা এবং স্মৃতিকবলিতা । এই মৃতা ও অতীতপ্রস্থিতা নায়িকার স্মৃতি-রোমন্থনেই তাঁর প্রেমের কবিতা সঞ্জীবিত । এবং তাঁর নায়িকা মৃতা হওয়াতেই তাঁর প্রেম-ভাবনার রূপানুধ্যানে রসঙ্গে মৃত্যুচিন্তাও অনিবার্যভাবে উপস্থিত । শুধু রূপতন্দ্রাই নয়, মৃত্যুভীতিও তাঁর প্রেমের কবিতায় লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ।

বাস্তবের পৃথিবীতে তাঁর নায়িকাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, প্রত্যহের পরিচিত সংসারে কোথাও তার অস্তিত্ব নেই । সেই কারণেই নায়িকার অনুধ্যানে তাঁকে হ'তে হয়েছে অতীতচারী, করতে হয়েছে স্মৃতির জগতে অস্থির পদচারণা । বর্তমানের পরিধিতে নয়, নায়িকাকে খুঁজতে-খুঁজতে 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগত' পর্যন্ত

মনকে তিনি প্রসারিত ক'রে দেন এবং স্মৃতির অনুষঙ্গেই—'মায়াবীর আরশিতে'—নায়িকার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে ঃ

......পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপ দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;

('সিন্ধুসারস' ঃ 'মহাপৃথিবী')

'মায়াবীর আরশিতে' দেখা-পাওয়া এই যে রূপসী, সে-ই কবির কাঙ্ক্ষিতা নায়িকা এবং সেই নায়িকার চোখের, চুলের, এমনকি প্রাণেরও রূপাচিত্রণে ধরা পড়ে নায়িকা-কেন্দ্রিক তাঁর কবিস্বপ্নের স্বরূপ।

প্রেমের কবিতায়, তাঁর স্বভাবানুযায়ী, তিনি মাত্র অতীত-ধূসরিত বা স্বপ্ন-কুহেলীতেই নন, তিনি যথেষ্ট আন্তরিক এবং গভীরও। এই উভয় বৈশিষ্ট্যই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতাটিতে সমভাবে উপস্থিত। 'তুমি তো জানো না কিছু—না জানিলে, / আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে'—কবিতাটির এই প্রারম্ভিক পংক্তিদ্বয়ে প্রেমিকার প্রতি তাঁর যে-মনোভাব ব্যক্ত, তা যেমন আন্তরিক—

কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালিয়েছি পুরোহিত হ'য়ে তার বুকের উপরে।
আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত।

এই প্রত্যয়ী উচ্চারণে প্রেমের প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশও, কবিতাটির মধ্য-পর্বে, তেমনই গভীর। তাঁর 'শ্যামলী', তাঁর সুরঞ্জনা', তাঁর 'আকাশলীনা', তাঁর 'তুমি'—সবই প্রেমের কবিতা—বিখ্যাত এবং সমানভাবে আন্তরিক ও গভীর। শ্যামলীর মুখে তিনি আবিষ্কার করেছেন 'সেকালের শক্তি', সুরঞ্জনাকে তাঁর মনে হয়েছে 'পৃথিবীর বয়সিনী...এক মেয়ের মতন', 'আকাশলীনা'র নায়িকাকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর।

এই কবিতা ক'টির প্রতিটিকেই সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং সেই বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় দেখানো যেতে পারে, প্রেমের কবিতার লেখক হিসেবে এ-ক'টিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায় ও কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রেম-ভাবনায় বিস্ময়ের অনুভূতির প্রকাশে এ-ক'টির কোনোটিই তাঁর 'তুমি'র সমকক্ষ নয়। মৃতা প্রেমিকার স্মরণে—

'মাটির অনেক নিচে চলে গেছো ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ ? কোন্ কথা ভাবছো আঁধারে ?

ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে ঃ
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে
আর কাকে পাবো এই সহজ গভীর অনায়াসে—'

কবির এই বিস্ময়বিমিশ্র ও বিস্ময়বিমূঢ় অনুভূতির প্রকাশে 'আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে'র উল্লেখ যে-আবহের সৃষ্টি করেছে, তা একদিকে যেমন বিশেষভাবে নৈসর্গিক, অন্যদিকে তেমনই একান্তভাবেই জীবনানন্দীয়।

বক্তব্যের দিক ছাড়া কাব্যকৃতিত্বের অন্যান্য দিকের বিবেচনাতেও আমাদের অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য। রচনায় তাঁর একটা শৈলী (style) ছিলো। অন্যান্য মৌলিক সাহিত্যিকের মতো সেই শৈলীতেই তাঁরও পরিচয়। তাঁর রচনাশৈলীতে ভাষাগত দিক্ (linguistic aspect)-টিই প্রধান। ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁর বিবর্তন আমূল (radical) নয়, ক্রমিক (gradual)। একটি ধীর প্রক্রিয়ার পথে এই বিবর্তন তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে।

'ঝরাপালক'-পরবর্তী পর্যায় থেকেই বহু, মাত্র নূতন নয়—দেশী, গ্রাম্য, অন্ত্যজ এবং আকাড়া শব্দকে তাঁর কবিতায় তিনি উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 'নিক্তি নিরপেক্ষ', 'পররতিময়', 'দিক্‌দর্শিন', 'তিতীক্ষু', 'সংবিজ্ঞাতা', 'আশাশীল', 'অনুভূতিদেশ', 'কিউক্রীবতায়', 'জ্ঞানপ্রতিভা', 'শকুনক্রান্তি', 'অনবতুল', 'প্রাণলোকযাত্রী' ইত্যাদি নূতন শব্দের উদ্ভাবন তাঁর শব্দ-সম্পর্কিত পরীক্ষামনস্কতারই পরিচায়ক, সন্দেহ নেই; কিন্তু 'গাড়ল', 'বেয়াই', 'আপিলা চাপিলা', 'ঝিঁক', 'ফোঁপ্‌রা', 'ছেঁড়াফাড়া', 'চোখঠার', 'আখড়াই', 'দিনমান', 'সোহাগ', 'সূর্যমামা', 'ন্যাড়া', 'বিয়োবার', 'খরশান', 'ছিরি', 'ধলা', 'আস্তানা', 'সুবাতাস', 'মিনসে', 'আইবুড়', 'রগড়' এবং এ-রকম আরো অনেক দেশজ শব্দকে যে তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন, সেটা মোটেই পরীক্ষামূলক নয়, সেটা নিশ্চিতরূপেই উদ্দেশ্যমূলক। এইসব শব্দের প্রভূত প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বাংলা কবিতার ভৌগোলিক সীমাকে কিছুটা প্রসারিত করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেনও।

শব্দের ব্যবহারের মতো বিশেষণের প্রয়োগেও তাঁর অভিনবত্ব লক্ষ্যণীয়। সাধারণত বিশেষণরূপে অব্যবহৃত শব্দকেই তিনি বিশেষণ হিসেবে তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। নদীর আগে তাঁর বিশেষণ 'নেউলধূসর', ছবির আগে বিশেষণ 'অবলুপ্ত', চোখের বিশেষণ 'শিশিরভেজা'; তাঁর কবিতায় সূর্য 'জাফরান-রং-এর', রোদ 'কমলা-রঙের', আঁধার 'অদ্ভূত', 'যূথচারী' এবং 'প্রধান'; তাঁর কবিতায় মানুষীর চোখ 'পটলচেরা', পাড়াগাঁর বাসরঘরের মেয়েটি 'গোধূলিমদির'; তার জগৎ 'মধ্যবিত্তমদির', সেই জগতে বিচ্ছুরিত রৌদ্র 'নটকান-রক্তিম', প্রবাহিত বাতাস 'মিহিন', উচ্চারিত কথা 'সফেন', ডাঁশ 'রাতচরা' এবং পেঁচা 'বৈবাহিক'; সেখানে পুরুষ 'উৎক্রান্ত', কেরানী 'মিহি', মরাল 'অমল', নীলিমা 'তনুবাত', প্রাসাদ 'কম্প্র', অধিনায়ক 'মেশিনপ্রতিম',

আমলকী 'লোকশ্রুত' এবং পাখি 'জ্ঞানপাপী'। এ-সমস্তই তাঁর কবিতায় বহুপ্রযুক্ত ও অনায়াসলক্ষ্য। তাছাড়া, বিশেষণের প্রয়োগ-সংক্রান্ত অন্য একটা প্রবণতাও তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ-বিশেষ বিশেষ্য ও বিশেষণের পরিকল্পিত পাশাপাশি অবস্থানের মধ্য দিয়ে মানবিক অস্তিত্বের বহুবিধ অসঙ্গতি-বিসঙ্গতির (inconsistancies and paradoxes of human existence) প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে তিনি পরোক্ষত আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রয়াসের সুন্দর উদাহরণ ঃ 'সপ্রতিভ আঘাত', 'বিমর্ষপ্রসব', 'সচ্ছল কঙ্কাল', 'নিটোল সারস', 'স্থবির গর্জন', 'ফিচেল বাতাস', 'অমায়িক কুটুম্বিনী', 'মসলিন যুবারা' ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ক্রিয়ার লৈখিক ও মৌখিক রূপের মধ্যে তিনি সন্ধি স্থাপন করেছেন ; কিন্তু এই দুই অসম রূপের মধ্যে সেতুবন্ধন সব ক্ষেত্রে সুফল প্রসব করেনি। কেননা এর পরিণাম ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁর স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যকে বহু স্থলেই প্রতিহত করেছে।

কবিতায় জীবনানন্দের উপমাগুলি প্রায়শ দৃষ্টিগ্রাহ্য, বাক্‌প্রতিমাগুলি কল্পনা-সমৃদ্ধ, প্রতীকগুলি তাঁর কবিস্বভাবের গূঢ়ত্বব্যঞ্জক। প্রতীকের যে দুই উৎস—ব্যষ্টিমন (individual mind) এবং সমষ্টিমন (collective mind)—তার উভয়েরই সন্ধান তাঁর কবিতার প্রতীকসমূহের বিশ্লেষণ থেকে লাভ করা কোনো কঠিন কাজ নয়।

কবিতার অঙ্গ-প্রাকরণিক বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে তাঁর এই আত্মস্বাতন্ত্র্য আসলে তাঁর আত্মজ্ঞানেরই পরিচায়ক। 'প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব —অন্য কারু কবিতায় নয়।'—তাঁর নিজের এই উক্তির কথা স্মরণে রেখেই 'ভাবনা প্রতিভার আশ্রয়ে' লালিত থেকে এই আত্মস্বাতন্ত্র্য তিনি ধীরে-ধীরে অর্জন করেছিলেন।

আমাদের সাহিত্যে জীবনানন্দ মাত্র স্বতন্ত্রই নন, তিনি অনন্যও। তাঁর উক্তি—'ভাবনাপ্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে'—অনুযায়ী নিজের প্রতিভার কাছে আমৃত্যু তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। এবং এই আত্মবিশ্বস্ত থাকার নেপথ্যে কে বা কারা দেশ-বিদেশে তাঁর যথার্থ পূর্বসূরী—বাঙালী রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র-নজরুল, নাকি ইংরেজ শেলী-কীট্‌স্-সুইনবর্ণ বা প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠী অথবা আইরিশ ইয়েট্‌স্ ও অ্যামেরিকান পো—অথবা একত্রিতভাবে সকলে—সে-প্রশ্নের সর্বসমালোচকগ্রাহ্য মীমাংসা এখনো সুদূরপরাহত থাকলেও, এ-সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনি বিচিত্রভাবে অনুকৃত, একালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে তাঁর উত্তরসূরী আছেন এবং তাঁরা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য নন। বস্তুত, জীবনানন্দ-সমকালীন এবং জীবনানন্দ-পরবর্তী বাঙালী কবিদের দ্বারা এ-যাবৎ সর্বাধিক অনুসৃত ও অনুকৃত কবি জীবনানন্দ নিজেই। এখানেই নিহিত রয়েছে প্রমাণ কবি হিসেবে তাঁর সজীবতার এবং সবীজতারও ॥

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের বাঙালী কবিদের মধ্যে যিনি কবি হিসেবে জীবিত থাকার প্রধানতম শর্তস্বরূপ ক্ল্যাসিসিজম্‌কে নিঃশ্বাসবায়ুর মতো সহজ ও অনিবার্য ব'লে গ্রহণ ক'রে আধুনিক বাংলা কাব্যে ধ্রুপদী আদর্শকে অপ্রসর অথচ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথের কাছে ক্ল্যাসিসিজম্‌ বা ধ্রুপদীবাদ মাত্র কাব্যের প্রকরণগত একটি বিশেষ রূপ বা কাব্যগত একটি ধারণাই ছিলো না, তাঁর কাছে তা জীবনচর্যার পক্ষে অপরিহার্য ও অমোঘ এক প্রতীতি হিসেবেও প্রতিভাত হয়েছিলো। কেননা সমগ্র কবিজীবনে বিবর্তনের ক্রমচক্র স্তর-পরম্পরা একে-একে অতিক্রম করার পরিণামে শেষ পর্যন্ত যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীসুলভ গভীর ও উদাস দার্শনিকতাবোধসঞ্জাত যে-অভিজ্ঞানের অধিকারী তিনি হয়েছিলেন, এই প্রাণময় গ্রহে নিখিল প্রাণীকুলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মর্মন্তুদ যে-মহাসত্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো, মানবঅস্তিত্বের প্রগাঢ় যে-অন্তঃসারশূন্যতা তাঁকে অন্তরে-বাহিরে উন্মথিত ক'রে তুলেছিলো, তারই কাব্যসম্মত প্রকাশমাধ্যম হিসেবে ধ্রুপদীরীতিকে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার বিষয়রূপে গ্রহণ ক'রে এক দুর্লভ শিল্পমহিমায় সমুন্নত ক'রে গেছেন।

এটা সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে এই কারণে নয় যে তিনি রোম্যান্টিকতায় সম্পূর্ণ আস্থাহীন কিংবা কাব্যের লীরিকধর্মে ঘোর অবিশ্বাসী, বরং তাঁর পক্ষে প্রকৃত অর্থে ক্ল্যাসিসিস্ট হওয়া সম্ভব হয়েছে এই হেতু যে টমাস স্টার্ন্‌স্‌ এলিয়ট-কথিত মহাকবির সর্বপ্রধান লক্ষণ ইতিহাসচেতনা তাঁর কবিসত্তার গহনতম প্রদেশ পর্যন্ত শেকড় ছড়াতে সক্ষম হয়েছিলো। তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'সংবর্ত'-র 'জাতক (২)' কবিতার প্রথম স্তবকে তিনি লিখেছেন ঃ

> অথবা পিশাচ সুদ্ধ গৃধ্নু ইতিহাসের খাতক ;
> এবং সে-ইতিহাস নিত্য তথা বিকল্পস্বরূপ।
> ফলত যদিচ তাকে পদে পদে লাগে অপরূপ,
> তবু তা প্রকৃতপক্ষে পরিণামী প্রাক্তন পাতক ॥

অন্যত্র বলেছেন, 'ইতিহাস নিষ্ক্রান্তও বটে।' 'সংবর্ত'র 'যযাতি'তেও পাই ঃ

> ··· ··· জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
> বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
> নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
> যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

এবং বলাই বাহুল্য, সম্পূর্ণ 'সংবর্ত' কবিতাটিই তাঁর ইতিহাসচেতনার নিদর্শন।

তাঁর দৃষ্টিতে মৃত্যু নয়, কালই প্রকৃত শত্রু। 'ক্রন্দসী'র 'কাল' কবিতায় তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কালের কবল থেকে 'কিছুরই কি নেই অব্যাহতি ?' বস্তুত, চিরন্তন ইতিহাস-পরিধির মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি মানবঅস্তিত্বের সার্বিক সমস্যাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। কাব্যচর্চা ও জীবন-সাধনার যৌথ দায়িত্বের স্বীকৃতি, কবি হিসেবে তাঁর সাধ ও সাধনার ঐকান্তিক অন্বয়প্রয়াস কিংবা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের যা মূল ভিত্তি, সেই অমোঘ, অন্ধ-মূক-বধির, যান্ত্রিক, ন্যায় অন্যায় বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার, সর্বব্যাপ্ত, প্রায় পেগানসুলভ নির্মম নিয়তিবাদ—যা বিশ্বাসের সমস্ত আশ্রয়কে একে-একে কেড়ে নিয়ে মানুষকে নিরঙ্কুশ শূন্যতার অন্তহীন অন্ধকারে নিক্ষেপ করে,—এই সমস্ত কিছুই তাঁর কাব্যে ইতিহাসবোধসঞ্জাত এবং ইতিহাসচেতনার প্রেক্ষাপটেই এমন ভাস্বর হ'য়ে প্রতিফলিত।

আবার এই ইতিহাসচেতনা, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে, প্রকৃতপক্ষে কালজ্ঞানেরই নামান্তর ; কেননা তাঁর দৃষ্টিতে কালজ্ঞানের অর্থ শুধু sequence of time বা সময়ের পারম্পর্যই নয়, তা ক্রমাগত প্রবাহিত stream of time কিংবা সময়ের স্রোতও, যা ধীরে-ধীরে সমস্ত কিছুকেই বর্ণাঢ্যতায় উজ্জ্বলতর অথবা বিবর্ণতায় ধূসরতর ক'রে তোলে নিয়তির নির্মম নির্দেশে। এই কালজ্ঞানকে আপন অস্তিত্বের অঙ্গীকৃত ক'রে তোলা, সময়ের এই স্রোতাবর্তকে আপন ধমনীতে প্রবাহিত রক্তধারায় ঘনিষ্ঠতায় অনুভব করা এবং সেই অনুভূত অভিজ্ঞতা (felt experience)-কে মানবেতিহাসের বিষণ্ণ পটভূমিকায় স্থাপন ক'রে আপন কাব্যে মূর্ত ক'রে তোলা যথার্থ কালজ্ঞানী কবি ভিন্ন অন্যের পক্ষে কঠিন ; কেননা এর জন্য ব্যক্তিত্বের সেই অখণ্ডতা প্রয়োজন, কবিচরিত্রের সেই আভিজাত্য আবশ্যক, যা, সংখ্যাগত বিচারে, অনেক কবির পক্ষেই অলভ্য। সুধীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মূল উৎসই হচ্ছে এই স্বচ্ছ কালজ্ঞান এবং তাঁর কবিতামাত্রেই কালজ্ঞানীর রচনা —যদি কবিশ্রেষ্ঠ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আদ্যোপান্ত কবিতাবলীর সঙ্গে আমরা অন্তরঙ্গতা স্থাপনের সামর্থ্য অর্জন করি এবং যদি সেই কবিতাবলীর গভীরে প্রবেশ করতে আমরা সক্ষম হই, তাহ'লে তাঁর কবিতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তাঁর কবিতায় বর্ণিত নিয়তির অমোঘতার মতোই আমরাও যে এই একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হবো, এ-কথা সম্ভবত অতিশয়োক্তি নয়। বাস্তবিক, সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের সংগঠনে সেই সমুন্নত আভিজাত্য আনুপাতিক হারে এত অধিক মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো, তাঁর কবি-চরিত্রের বিকাশ ও বিবর্তনে সেই কৌলিন্য তাঁকে এমন এক স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছিলো, যাকে, এই বিংশ শতাব্দীর ঘোরতর বৈজ্ঞানিক যুগেও, বংশধারা কিংবা পরিবেশপ্রসৃষ্টি-প্রসূত না-ব'লে ঈশ্বরের দান ব'লেই মেনে নিতে হয়। আর, শুধু এই চারিত্রিক আভিজাত্যের বিচারেই বা কেন, সুধীন্দ্রনাথের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতেও ঈশ্বরের সর্ববিধ আশীর্বাদ, এক রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে, তাঁর মতো এত অবিরলধারায় বর্ষিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতাকে সঠিক তাৎপর্যে উপলব্ধি করার মূল রহস্য তাঁর ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য এবং চরিত্রের কৌলিন্যের গভীরে নিহিত রয়েছে ; কেননা তাঁর ব্যক্তিত্বের আভিজাত্যই তাঁর ধ্রুপদীরীতির সমুন্নত কাব্যাদর্শকে গঠন করেছে এবং এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে একেবারে কৈশোরিক কবিতাগুলি ছাড়া, তাঁর কাব্যের বৃহৎ অংশই ক্ল্যাসিক পিনদ্ধতায় এমন ঋদ্ধ, যা, তিরিশের অন্য কবিদের অনেকের রচনাতেই অনায়াসদৃষ্ট নয়। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে মহাকবিকল্প যে-দ্রোহ থেকে-থেকে বারে-বারেই সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে এবং প্রকৃতপক্ষে যে-দ্রোহই তাঁকে তাঁর সমসাময়িক অন্য কবিদের থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে, তারও মূলে তাঁর ব্যক্তিত্বের আভিজাত্যকেই আমরা আবিষ্কার করি। বাস্তবিক, সুধীন্দ্রনাথ দত্তই বাংলা কবিতার এই শতকের তৃতীয় দশকের আভিজাততম কবি।

অন্য একটি পরিপ্রেক্ষিত থেকে লক্ষ্য করলেও আধুনিক বাংলা কবিতার অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে সুধীন্দ্রনাথের কবিচরিত্রের সমুন্নত যে-আভিজাত্যকে তাঁর কাব্যের মূল উৎস হিসেবে আমি চিহ্নিত করেছি, সেই আভিজাত্যই তাঁকে আবহমান বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারায় কিঞ্চিৎ বিযুক্ত এবং ঐতিহ্য-অনাশ্রিত ব'লে প্রতিপন্ন করেছে এবং তাঁর সমকালীন কবিদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যকেও একই সঙ্গে স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। এ-কথা সত্য, আধুনিক পাশ্চাত্য যে-জীবনাদর্শে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন এবং পাশ্চাত্য যে-মানসিকতাকে তিনি আমাদের সাহিত্যে বিপুল উদ্যমে সংক্রামিত করেছিলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তারও একটা পটভূমি রয়েছে—তা যতোই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হোক না কেন ; আর, সেই পটভূমি-নির্মিতির প্রথম শিল্পীর স্মরণীয় আসনটি আমরা বরণীয় মধুসূদনের জন্যই সংরক্ষিত রেখেছি। সম্ভবত সেই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর কবি মধুসূদন দত্তের মানসপ্রবণতার সঙ্গে বিংশ শতকের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মানসিকতার সুদূর সাযুজ্য লক্ষ্য ক'রে বাংলা সাহিত্যের কোনো-কোনো আলোচক সুধীন্দ্রনাথের নামের পূর্বে মধুসূদনের নামটি হাইফেন-সংযুক্ত ক'রে লিপিবদ্ধ করেছেন। এমন কি আজ রম্য গল্পকথার মতো মনে হ'লেও, 'কালিকলম'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী মুরলীধর বসুর মুখে ব্যক্তিগত কথাবার্তার অবকাশে শুনেছি যে এককালে 'হাতিবাগানের মাইকেল' অভিধায় ভূষিত হ'য়ে সুধীন্দ্রনাথের নাম কলকাতার কাব্য-প্রেমিকদের মুখে-মুখে উচ্চারিত হয়েছে। আজ যখন মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়েই দীর্ঘ এক শতাব্দীর ব্যবধানে যাঁর-যাঁর আরাধ্য প্রাণপুরুষের সঙ্গে মিলেমিশে এক হ'য়ে গেছেন, তখন, স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, মধুসূদনের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের এবম্বিধ সমীকরণের প্রকৃত হেতুটি কী? মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ—এই দুই কবির রচনার সঙ্গে পরিচিতির নিবিড়তা এবং এই দুই কবি সম্পর্কে রসজ্ঞ সমালোচক-দের আলোচনার গভীরতাকে ভিত্তি ক'রে এই প্রশ্নটির উত্তরস্বরূপ প্রধানত তিনটি কথা আমার মনে জেগেছে। প্রথমত, উভয় কবিরই বহুলাংশে সাদৃশ্যযুক্ত য়োরোপীয়

সুলভ ও অভারতীয় ব্যক্তিগত জীবন-যাপনপ্রণালী, দ্বিতীয়ত, উভয় কবির ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের কোনো-না-কোনো কবির কাব্যবিশ্বাসের অনুসরণে নিজেদের কাব্যাদর্শের গঠন এবং তৃতীয়ত, এই দু'জন কবির কবিতাতেই অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত, সংস্কৃতগন্ধী, দুরূহ ও গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগের উদাহরণের উপস্থিতি—বিবেচনা করি. এই তিনটি বিষয়ই এই ধরনের 'বিপর্যয়'-এর মূল কারণ। অবশ্য হাস্যোদ্রেককারী হ'লেও এই প্রসঙ্গে এই দুই কবির কৌলিক সাদৃশ্যের কথাও হয়তো কারো-কারো মনে আসতে পারে।

কিন্তু, এতদ্‌সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্যকোণ থেকে দেখা এবং তাঁর কবিতায় সবিতাধর্ম আরোপের শর্তস্বরূপ এ-সত্য স্বীকার না-করলেই নয় যে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যজগৎ কোনোক্রমেই কবি মধুসূদন দত্তের কাব্যজগৎ নয় এবং একই 'দত্তকুলোদ্ভব' এই দুই কবির সাদৃশ্যসন্ধানের প্রয়াস বহুলাংশেই নির্ভিত্তিক, এমনকি বিভ্রান্তকারী। এই কারণেই এই ধরনেই প্রচেষ্টার অপগুরুত্ব (malsignificance)-কে বোঝাতে গিয়ে আমি 'বিপর্যয়' শব্দটি ব্যবহার করেছি এবং শব্দটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণের জন্য শব্দটিকে আমি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছি। আসলে, মধুসূদনের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য, যতটুকুই থেকে থাকুক না কেন, তা সমধর্মী নয়, বরং সহমর্মী ; তা মাত্র আপাতিকই নয়, তা আকস্মিকও। কেননা বিরাট যে-আদর্শবোধ এবং গগনস্পর্শী যে-উচ্চাভিলাষ মধুসূদনকে ব্যক্তিগত জীবনযাপনায় য়োরোপীয় ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো, এমন কি ধর্মান্তরিত হ'তে পর্যন্ত প্রণোদিত করেছিলো, সুধীন্দ্রনাথের য়োরোপীয়সুলভ দৈনন্দিন জীবনধারায় ঠিক তুল্যমূল্য কোনো শক্তি সক্রিয় ছিলো না। পাশ্চাত্য জীবনচর্যা মধুসূদনের পক্ষে যদি হ'য়ে থাকে অভিজাত অভিলাষসৃষ্ট, তবে সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা প্রধানত প্রথানুগত্য। ইংরেজ মহাকবি জন মিল্টনকে আপন কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠতম কবিপুরুষ হিসেবে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মধুসূদন কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং মহাকাব্য রচনার দুর্মর যে-প্রয়াসে 'অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন' বহু দিবসরজনী অতিবাহিত করেছিলেন, মহাকাব্যরচনার ঠিক তদ্রূপ কোনো প্রচণ্ড প্রয়াস সুধীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করা যায় না, যদিও একজন আধুনিক কাব্যসমালোচকের সঙ্গে একমত হ'য়ে এ-কথা আমি স্বীকার করি যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সংবর্ত' একাধিক বিচারেই 'মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত।'

তথাপি সুধীন্দ্রনাথ যে তাঁর সামগ্রিক শক্তিকে মধুসূদনের মতো মহাকাব্যরচনার দুর্মর প্রয়াসে নিয়োজিত করেন নি, বরং তিনি যে তাঁর ধী ও মেধাকে এবং প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কাব্যপাঠের ব্যাপক অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত জ্ঞান ও মননসামর্থ্যকে একাগ্রপণে নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁর বিবেচনায় কাব্যের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান, 'শব্দ'র উপযুক্ত নির্বাচন ও যথাযথ প্রয়োগে এবং প্রায় শুচিবায়ুগ্রস্তসুলভ সতর্কতায় ও গজেন্দ্র-গামী মন্থরতায় স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধের নিরন্তর পরিবর্তন ও পরিমার্জনায় (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, জনৈক প্রবীণ সুধীন্দ্র-সুহৃদের মুখে যখন শুনেছিলাম যে 'উড়ে

চলে গেছে'—এই ক্রিয়ারূপকে 'উড্ডীন'-বিশেষণে রূপান্তরের নিবিষ্ট প্রয়াসে সুধীন্দ্রনাথ একদিন সমস্ত সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছিলেন, তখন বিস্মিত না-হ'য়ে পারিনি।), এর থেকেই সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা বড়ো রকমের সত্যের সন্ধান আমরা পাই এবং সেই সত্যটা, যা আগের স্তবকে একটু আগেই উল্লেখিত হয়েছে, হচ্ছে এই যে সুধীন্দ্রনাথের জগৎ মধুসূদনের জগৎ ছিলো না। এবং এই স্থূল সত্যের আড়ালে সূক্ষ্ম যে-সত্যটি আত্মগোপন ক'রে আছে, তা-ও এই দুই প্রধান বাঙালী কবির মৌলিক পার্থক্যকেই আমাদের কাছে স্পষ্ট করছে, যেন আমাদের ভ্রান্ত ধারণার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে মধুসূদন যদি আশ্রয় ক'রে থাকেন আবেগকে সুধীন্দ্রনাথ তবে আশ্রিত ছিলেন অভিজ্ঞতায় (প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকায় তাঁর সরল স্বীকৃতি—'আঁকড়ে ধরেছিলুম অভিজ্ঞতাকে।'); মধুসূদনের কাব্যের জন্মভূমি যদি হ'য়ে থাকে হৃদয়, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎস একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক; মধুসূদনের কবিতা যেমন প্রেরণাবাদীর বিবৃতি, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তেমনই প্রেরণাসন্দিগ্ধের বিধৃতি; মধুসূদন তাঁর কবিতার প্রতি পংক্তিতে অবরুদ্ধ আবেগকে অবারিত ক'রে দিলেও সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় 'কদাচ আবেগের মুণ্ডপাত করেন নি।' এবং আমাদিগকে স্বীকার করতে বাধ্য করায় যে মধুসূদন ঠিক যতখানি আস্তিক ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় ততখানিই নাস্তিক।

আলোচনার আরো অনেক দিক্ আছে, ভিন্ন-ভিন্ন প্রসঙ্গ—যেগুলিকে পর-পর বিশ্লেষণ ক'রে ক্রমে-ক্রমে আমরা এই দুই কবির মৌল পার্থক্যের লক্ষণগুলিকে আরো সুচিহ্নিত করতে পারি। নিজের উচ্চাভিলাষ ও কাব্যাদর্শের সার্থক রূপায়ন মধুসূদন যেমন ইংরেজ কবি একমাত্র জন মিল্টনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর কাব্যবিশ্বাসের স্থির প্রতিফলন কোনো একমাত্রিক (unidiamensional) ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখতে পাননি কিংবা তাঁর কাব্যাদর্শ গঠনে কোনো একজন মাত্র কবির দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হননি, বরং নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা চিন্তা-ভাবনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নানা জিজ্ঞাসা-অন্বেষার দোলাচলে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীসুলভ অভিজ্ঞতার সাযুজ্যে ও স্বীকরণে নিজের জীবনদর্শন গ'ড়ে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের কাব্যাদর্শকেও নির্মাণ করেছেন নিরভিমান দার্শনিকতায়। এবং তিনি যে 'স্বভাব কবি' ছিলেন না, ছিলেন 'স্বাভাবিক কবি', তারই প্রমাণস্বরূপ আমরা তাঁর জীবনদর্শন তথা কাব্যদর্শনে বিবর্তনের কয়েকটি স্তর বা পর্যায়ের সন্ধান পাই। আর, এই তথ্যটিও সেই সঙ্গে আমাদের অজ্ঞাত থাকে না যে এই পর্বপরম্পরার অন্তে রয়েছে নেতিবাদী স্তেফান মালার্মে এবং ক্ষণবাদী পোল্ ভালেরির মতো প্রচণ্ড পাশ্চাত্য প্রভাব। এবং এইখানটা-তেই, যত ক্ষীণ সূত্রেই হোক না কেন, মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে, পরস্পর যথেষ্ট পার্থক্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, সাদৃশ্যের একটি অদৃশ্য বন্ধন আমাদের কাছে ধরা পড়ে; আমরা বুঝতে পারি যে মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাব্যাদর্শের মূল উৎস মূলত পাশ্চাত্য কাব্যবোধ ও জীবনাদর্শ-সঞ্জীবিত। তবে এ-কথাও স্বীকার্য যে তুলনা-

মূলক বিচারে মধুসূদনের কবিতায়, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে, ভারতীয় উপাদান অনেক বেশি। নিজের কাব্যভাবনায় আদর্শের সন্ধান সুধীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য কবিকুলের—বিশেষত ফরাসী প্রতীকী কবিদের—কাছেই এবং অস্বীকার অনর্থক যে প্রাচ্য জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্যের মর্মবাণী সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তার অন্তঃস্থলে তেমনভাবে সংক্রামিত হয়নি, অন্তত এই গরীয়ান আদর্শের অনুসরণের সচেতন প্রয়াস তাঁর সাহিত্যকর্মের কোথাও সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, মধুসূদন পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন ও কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী হ'য়েও নিছক জড়বাদী, ভোগসর্বস্ব ওই জীবনপ্রবাহে অসহায় বিপন্ন তরণীর মতো ভেসে যান নি সম্পূর্ণভাবে ; বরং সেই জীবনাদর্শকে স্বীকৃতি জানিয়েও ঘুরে-ফিরে বারেবারেই ভারতীয় জীবনস্বপ্নে বিভোর হয়েছেন তিনি। কেননা সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও সুস্থির চিত্তেই এ-কথা স্বীকার্য যে কবি মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের সংস্থাপন, সংগঠন ও বিকাশের স্তর-পরম্পরায় প্রাচ্য জীবনাদর্শেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো, তাঁর কবিসত্তার গভীরে ভারতীয় এবং বিশেষভাবে বাঙালী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্থায়ী প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছিলো।

অর্থাৎ, এককথায় বলতে গেলে, মধুসূদন ছিলেন দৃশ্যত পাশ্চাত্য-প্রেমিক, কিন্তু তাঁর অন্তর্জীবন ছিলো গভীরভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যে দৃঢ়মূল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁর সাহিত্যকর্মের একটা বিরাট অংশকেই সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো চলে—বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কথা, যে-গ্রন্থটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও অদ্যাবধি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য এবং যে-মহাগ্রন্থে মধুসূদনের কাব্যসাধনা যেন একটা সাময়িক সমে পোঁছে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। সেই 'মেঘনাদবধ কাব্য'ও তার অপূর্বতা অর্জন করেছে প্রাচ্য সাহিত্যের সর্বপ্রধান মহাকাব্য 'রামায়ণ'কে ভিত্তি ও অবলম্বন ক'রে। তাছাড়া, তাঁর সৃষ্টিকর্মের সর্বাপেক্ষা তন্ময় ও স্মৃতিভারাতুর অংশ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রায় প্রতিটি কবিতায়, যেমন—বাংলার লৌকিক কাহিনীকেন্দ্রিক 'কমলে কামিনী', 'শ্রীমন্তের টোপর' (মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকে), 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'ঈশ্বরী পাটনী' (ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' থেকে), রামায়ণ ও মহাভারত-ভিত্তিক 'সুভদ্রা-হরণ', 'দুঃশাসন', 'উর্ব্বশী', 'শিশুপাল', 'শকুন্তলা' (মহাভারত অবলম্বনে), 'সীতাদেবী', 'সীতা-বনবাসে', 'রামায়ণ', 'কৃত্তিবাস' (রামায়ণ অবলম্বনে) এবং বাংলার নিসর্গপ্রকৃতি ও উৎসবাশ্রয়ী 'কপোতাক্ষ নদ', 'বটবৃক্ষ', 'নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির', 'নদীতীরে প্রাচীনা দ্বাদশ শিবমন্দির', 'উদ্যানে পুষ্করিণী', 'বিজয়া দশমী', 'নূতন বৎসর', 'কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা', 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিনমাস' ইত্যাদি চতুর্দশপদে গ্রথিত, আত্ম-উন্মোচক ও বিষণ্ণ কবিতাগুলিতে অতীতাশ্রয়ী যে-নিভৃতচারিতা, আশাভঙ্গের যে আর্তি, নৈরাশ্যবিধুর যে-স্বপ্নাচ্ছন্নতা মর্মান্তিক বেদনায় ব্যক্ত হ'য়ে রোম্যান্টিক নস্ট্যালজিয়ার উত্তুঙ্গশীর্ষ স্পর্শ করেছে, তারও অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে এ-দেশের চিরায়ত প্রাচীন ঐতিহ্য ও অতীতলীন প্রিয়

প্রসঙ্গের ধূসরতায় মধুসূদনের পৌনঃপুনিক প্রত্যাবর্তন। কিন্তু স্বদেশের সংস্কৃতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে উত্তাপ সংগ্রহ ক'রে আপন কাব্যে প্রাণসঞ্চারের সযত্ন প্রয়াস সুধীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত।

ওপরের এই আলোচনার খেই ধ'রে এগোতে-এগোতে আমরা এমন একটি প্রসঙ্গে এসে উপস্থিত হ'তে পারি, যে-প্রসঙ্গটির বিশ্লেষণ মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে শব্দচয়ন, শব্দসংস্থাপন, বাক্যবন্ধে সেইসব শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহার এবং তাঁদের কবিতায় রূপক-প্রতীক-উপমা প্রভৃতির প্রয়োগ—অর্থাৎ, এককথায় যাকে আমরা বলি শিল্পপ্রকরণ, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই কবির মধ্যে যে-পার্থক্য, তার প্রকৃতি আমাদের কাছে সহজবোধ্য ক'রে তুলতে সাহায্য করে। এ-কথা সত্যি যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, সংস্কৃতগন্ধী, গুরুগম্ভীর ও দুরূহ শব্দের প্রতি মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়েরই আত্যন্তিক আকর্ষণ থাকায় এই দুই স্বতন্ত্র আদর্শে আস্থাশীল কবির মধ্যে শব্দগত সাদৃশ্য সন্ধানের প্রবণতা বাংলা কাব্যের অধিকাংশ আলোচকের রচনাতেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই প্রয়াসের প্রতিবাদ ক'রে জানতে চাই যে মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ—এই দুই কবির মধ্যে ভাষাগত এবং ব্যাপক অর্থে শিল্প-প্রকরণগত যে-সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রয়াসে সমালোচকগণ তাঁদের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রেখেছেন, সেই সাদৃশ্য ভাষাগত অথবা শিল্পগত যা-ই হোক না কেন, যদি কিছুটাও থেকে থাকে, তবে তা নিতান্তই আপাত, অগভীর এবং প্রতারক; কেননা প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ শব্দসচেতন শিল্পী হিসেবে পৃথক জগতের অধিবাসী। সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে 'কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ'; অর্থাৎ, তাঁর বিবেচনায়, কাব্যসিদ্ধির প্রধানতম শব্দ হচ্ছে শব্দসিদ্ধি। 'ক্রন্দসী'র 'বাক্য' কবিতায় তিনি স্বীকার করেছেন, শব্দের আশ্রয় যে-বাক্য, তাতেই তাঁর আনন্দ—'আমার আনন্দ বাক্যে'। এবং এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেছেন যে তাঁর রচনাবলী যেন শব্দব্যবহার-পরীক্ষার দৃষ্টান্তরূপেই বিবেচিত হয়—'উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য' (মুখবন্ধ : 'সংবর্ত')। ফলে, কবিজীবনের প্রথম থেকেই তিনি সতর্ক প্রয়াসে এমন এক শব্দরীতির উদ্ভাবনায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন, যে-রীতির অন্তর্গত সমুদয় শব্দই ইঙ্গিতবহ, সূক্ষ্ম অর্থে ব্যঞ্জনাধর্মী এবং তাঁর অন্তর্লীন লীরিকতায় বিশ্বস্ত দ্যোতক। সেই শব্দাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর অভিজ্ঞতা-অর্জিত, বুদ্ধিপ্রধান, গভীর অধ্যাবসায়ী অনুশীলনের চিহ্নবহ এবং শিল্পঋদ্ধ—যদিও তাঁর কবিতায় অভিনিবিষ্ট পাঠে পাঠক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন যে তিনি শব্দের সয়ম্ভূ কোনো মূল্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না অথবা তিনি চাইতেন না যে তাঁর ব্যবহৃত শব্দসমূহ তাঁর কবিতার ভাবকে আচ্ছন্ন কিংবা অতিক্রম করুক।

অপরপক্ষে মধুসূদনের এপিক কবিস্বভাবে তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী ভিন্ন তাৎপর্যে মণ্ডিত ছিলো। যে-হ্লাদিনীশক্তির লীলা-চাঞ্চল্য তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই শক্তির প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে বিশেষ যে-ধরনের অপ্রচলিত শব্দাবলী

তিনি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন, কঠোর বিচারে তার অধিকাংশই যুগোচিত সংস্কারাচ্ছন্ন, আবেগ-উদ্দীপিত এবং ব্যঞ্জনারিক্ত। তাঁর সৌন্দর্যতৃষ্ণাতুর, আবেগতাড়িত ও নৈরাশ্যবিধুর ব্যক্তিগত জীবনের যন্ত্রণা তাঁর কাব্যের শব্দ-নির্বাচন, শব্দ-প্রসাধন—এমনকি শব্দের এলোমেলো অস্থির বিন্যাস পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছিলো। উপরন্তু তাঁর কাব্যে ইস্পাতকঠিন যে-ঘনত্ব আমাদের সপ্রসংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারও মূলে রয়েছে তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত সেই বিশেষ ধরনের শব্দাবলী, ওজস্বিতাগুণে যেগুলি সমগ্র বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অদ্যাবধি অতুলনীয়। সপ্রতিভ ও প্রখর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ স্বধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ভাষা-শিল্প ও প্রকরণগত বিবেচনায় উভয়ের মধ্যে এই যে পার্থক্য, এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে মধুসূদন যেক্ষেত্রে বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিগত আনন্দবেদনার স্থান শিল্পের চেয়েও ঊর্ধ্বে, সেক্ষেত্রে 'আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য'—এই নীতিবাক্যসুলভ আপ্ত উক্তিতে সুধীন্দ্রনাথের আস্থা ছিলো তাঁর কবিজীবনের অন্ত্য-পর্বেও অবিশ্বাস্যরকম অটুট।

আসলে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যাঁর কথা আমাদের মনে পড়া স্বাভাবিক, তিনি মধুসূদন দত্ত নন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেননা সাহিত্য রচনার মতো গুরুতর কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে গিয়ে একেবারে প্রথম থেকেই সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধা ও বিনম্রতায়। তাঁর প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে এই সত্য ধরা পড়েছিলো যে ভবিষ্যতের বাংলা কাব্য সমৃদ্ধ হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন ক'রে নয়, গ্রহণ করে ; রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে—তাঁকে স্বীকার ক'রে, তাঁকে শিরোধার্য ক'রে। এই ধরনের উপলব্ধিতে একদিকে যেমন আছে বাস্তবের স্বীকৃতি, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে যথার্থ কবিজনোচিত দূরদৃষ্টি ও আত্মচৈতন্যের পরিচয়। সেই কারণেই সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত পাঠক-পাঠিকাদের লক্ষ্যে পড়ে যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারের অক্ষম ও অপটু প্রয়াস, রবীন্দ্রোত্তর যুগের অনেক সাধারণ, এমনকি কোনো-কোনো প্রধান ও প্রবীণ কবির মতো, সুধীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত কবিজীবনের কোনো পর্বেই সুস্পষ্ট নয় —১৯৩৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'তে রবীন্দ্রপ্রভাবের ছায়া যেমন গাঢ়, সিকি-শতক ব্যবধানে ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দশমী'তেও সে-ছায়া কিছুমাত্র ম্লান হ'য়ে আসেনি, মূলত তা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। এই সাহসী মন্তব্যে যাঁরা উন্নাসিকতা বা ঔদ্ধত্যের সন্ধান পাবেন, তাঁদের মনোযোগকে একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমি আকর্ষণ করতে চাই। আমি তাঁদের জানাতে চাই, রবীন্দ্রপ্রভাবের ব্যাপকতাকে সুধীন্দ্রনাথ যে তাঁর কবিজীবনে আগাগোড়া অকপটেই স্বীকার ও গ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেই আপন কাব্যসৌধের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সে-সম্পর্কে বিশ্বস্ততম সাক্ষী হ'য়ে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। আমি তাঁদের স্মরণ করাতে চাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি—'সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তাঁর প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে।

তার একটি কারণ—তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে—নিয়েছে নিঃসংকোচে—অথচ তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ তাঁর আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি অনন্যত্বের স্পর্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তিস্বীকার উপেক্ষা করতে।' বাস্তবিক, সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে অন্তরে-বাইরে আদ্যোপান্তই গ্রহণ করেছেন—কবিজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে 'তন্বী'-পর্বে প্রত্যক্ষভাবে, আর, পরিণত পর্যায়ে অনেকাংশে পরোক্ষভাবে। তিনি যে মাত্র রবীন্দ্ররীতির লীরিকতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন, তা-ই নয় ; সেই লীরিকতাকে সচেতনভাবে আত্মস্থ করার অপরিমেয় সুযোগও আধুনিক বাংলা কাব্যে এনে দিয়েছেন তিনি। উপরন্তু, যখন লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের সুদূরপ্রয়াণবাসনা কিংবা নিরুদ্দেশযাত্রার রোমাঞ্চ-শিহরণ সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও ইতস্তত আকীর্ণ হ'য়ে আছে, তখন সহজেই বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে ঈপ্সিত যে-জীবন ও জগতের অন্বেষণে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত জগৎ ও জীবনও তার থেকে বহুদূরে অবস্থিত ছিলো না। কেবল মানস-বিচারেই নয়, নিজের কাব্যকলাতেও সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্ররীতি পরিহার করেন নি। শুধু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দাবলীর স্বেচ্ছাকৃত ব্যবহারেই নয়, স্বীয় কাব্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গিমাটুকু পর্যন্ত স্থানে-স্থানে অনুসরণ করতে প্রয়াসী থেকেছেন। এমনকি, সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতার দেহাবয়ব, বাংলা কবিতার অভিনিবেশী পাঠক-পাঠিকার মনে, অনেক সময় একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার দেহাকৃতির কথা জাগিয়ে তোলে।

তাছাড়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির সাদৃশ্যের বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে, ভিন্ন-ভিন্ন পর্বে, অজস্র কবিতা-গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনী-পত্রগুচ্ছ, এমনকি প্রবন্ধের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের মূল সাধনা হিসেবে যে-'বন্ধনহীন গ্রন্থি'র উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন, সুধীন্দ্রনাথেরও সমগ্র কবিজীবনের গোপন অভিলাষ সেই ছন্দময় দ্বন্দ্বময়তাকেই একান্তভাবে প্রত্যাশা করেছে—যদিও তা সুদৃঢ় গ্রন্থির শিল্পশাসনে। স্বপ্নবিলসিত স্মৃতি-রোমন্থনে রবীন্দ্রনাথ যত উন্মুখ, সুধীন্দ্রনাথও তত উৎসুক ; 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সুদূরপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ যতখানি বিহ্বল, সুধীন্দ্রনাথও ঠিক ততখানি চঞ্চল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কবিমানসের স্বভাবসাদৃশ্য এর বেশি তুলনার ধকল সহ্য করতে পারবে না। কেননা এ-কথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ হুবহু এক নন কিংবা একজন আরেকজনের প্রতিরূপ (prototype)-ও নন ; মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই এবং সুধীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠ আমাদের মনে এ-ধারণাই বদ্ধমূল করে যে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত জগৎই সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যাশিত ছিলো বটে, কিন্তু স্বীয়-দেশ-কাল-ইতিহাস-নির্ভর অভিজ্ঞতার আলোকে এ-সত্য তিনি

উপলব্ধি করেছিলেন যে এই প্রতিকূল সংসারে রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে আদর্শের সেই শুদ্ধসীমায় উপনীত হওয়া অসম্ভবেরই নামান্তর। সেই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যা কেন্দ্রবিন্দু—এই বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত এক ঐশীশক্তিতে যথার্থ আস্তিক সুলভ অটল, অনড়, স্থিতধী আস্থা—সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের কোথাও তার অস্তিত্বমাত্র নেই। বরং প্রগাঢ় নাস্তিকের মতো সন্দিগ্ধকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'হয়তো ঈশ্বর নেই ; স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ ;' ('বিপ্রলাপ' ঃ 'সংবর্ত')। তাঁর কাব্যের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে নৈষ্ফল্যের শিকার, পৌঢ়ত্বপীড়িত, এক ব্যর্থ বিয়োগান্ত নায়ক আর তার সমস্ত অস্তিত্বমথিত আধুনিক সভ্যতার মর্ম থেকে উৎসারিত চিরজাগরূক তীব্র এক হাহাকার। তাঁর নায়ক 'এক রুদ্ধশ্বাস দুঃসহ বেদনাবোধে জর্জরিত, 'অন্ধ অনাথ নিয়তি'র হাতে অসহায় ক্রীড়নক এবং 'ভবিতব্যভারাতুর'—

> আজিকে আমার চিত্তে পুঞ্জিত যে-উদ্বিগ্ন বিষাদ,
> ভবিতব্যভারাতুর, স্তব্ধ, মূক মেঘের সমান,
> কালবৈশাখীর ঝড়ে টুটিবে সে-সংহতির বাঁধ ;
> চপলা দরশ দিবে ; মুক্ত হবে অবরুদ্ধ দান ।।
>
> ('ভবিতব্য' ঃ 'অর্কেস্ট্রা')

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র নায়ক-নায়িকারা, ব্যর্থতাবোধের গভীর যন্ত্রণায় আত্মবিলাপী তথা আত্মবিলোপী। তাঁর কাব্যের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অন্তঃপ্রতিবেশের অন্ধকার কন্দরে-কন্দরে বাদুড়ের নৈশ আশ্রয়, ইঁদুরের ধ্যানে মগ্ন অতি ক্রূর কাল-পেঁচার গোপন আস্তানা আর সেই সঙ্গে ততোধিক ভয়ঙ্কর অতি সতর্ক হিসেবী শিবার অস্তিত্ব, যে নাকি ঔদরিক ক্ষুধার তাড়নায় অর্ধভুক্ত শব ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে অতিব্যস্ত। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে তুলনায় প্রশস্ত বহিঃপ্রতিবেশের চিত্রটিও একান্তই অনুজ্জ্বল ও বিষাদান্ত। সেখানে আমরা সাক্ষাৎ পাই যুদ্ধক্ষিপ্ত দাম্ভিক মুসোলিনীর, ভ্রমণপরায়ণ অসহায় গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগীর, স্বস্তিকালাঞ্ছিত বালখিল্য নাট্‌সীদের, উদ্বাস্তুকল্প রুশবিপ্লবী ট্রট্‌স্কির ; আমরা সেখানে যে-স্পেন, চীন ও ফরাসীদেশের উল্লেখ পাই, সভয়-বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, সেই দেশসমূহের কবিপ্রযুক্ত বিশেষণ যথাক্রমে 'মৃত', 'ম্রিয়মান' এবং 'কবন্ধ'। যেহেতু সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের (অন্তত তাঁর সর্বোত্তম কাব্যকীর্তি 'সংবর্তে'র) প্রধান উপজীব্য অন্তঃসারশূন্য আধুনিক সভ্যতায় শরিক একজন অক্ষম, বন্ধ্যা, বিপন্ন ও নিষ্ফল নায়কের আদর্শগত স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী, অতএব তাঁর কাব্যমঞ্চের প্রাঙ্গণে, সেই নায়কের মনোজাগতিক পটভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণভাবে, ঋতুচক্রের মধ্যে কেবল লোলচর্ম শীত এবং পত্রবিরল হেমন্ত নিজ-নিজ রক্তশূন্য অপার পাণ্ডুরতা ও বিবর্ণ ধূসরতা নিয়ে অতৃতীয় ঋতুরূপে বিরাজিত। তাঁর কাব্যের নায়ক ও নায়িকা উভয়েই এক নিষ্ফল, দুর্বহ অস্তিত্বের দায়ভাগীমাত্র ; কেননা তাঁর নায়ক যেমন পুরুষত্বহীন, তাঁর নায়িকাও তেমনই বন্ধ্যা। নিজেদের জীবনের এই মর্মন্তুদ পরিণতি সম্পর্কে তাঁর কাব্যের নায়ক-নায়িকা অতিশয় অবগত ব'লেই

ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের কোনো প্রত্যাশা নেই, কোনো মোহ নেই ; আশাভঙ্গের নিদারুণ বেদনায় তারা অনিকেত ও নিরুত্তরিত। তারা এই বিশাল, ব্যাপ্ত অরুন্তুদ সংসারে নিঃসঙ্গ, এই 'বিরূপ বিশ্বে···নিয়ত একাকী', অনুবন্ধী সভ্যতার প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ অনাশ্রিত—এমন কি প্রক্ষিপ্তপ্রায়। সে জন্যই অন্তরের শূন্যতার গুরুভার লাঘবের অছিলায় তারা আত্মছলনায় প্রবৃত্ত হয় ; ধূমায়িত রিক্ত মাঠে, হেমন্তলোহিত গিরিতটে, চ্যুতপত্রঢাকা বনবীথিতে রূপজীবী জরতীর মতো শুরু হয় তাদের ভ্রমণপর্ব। আর, অঘ্রাণের অত্যাচারে তাদের ভ্রমণপথের চারিধারে শুষ্ক পত্র ঝ'রে প'ড়ে আর ঝরে প'ড়ে—ঝ'রে-ঝ'রে স্তূপীকৃত হয়। 'অর্কেস্ট্রা'র প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী'র দ্বিতীয় স্তবকে এবং 'উত্তরফাল্গুনী'রও প্রথম কবিতা 'শর্বরী'র প্রথম পংক্তিদ্বয়ে এই ছবি অতি স্পষ্ট ঃ

১.

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ণ বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত ॥ ('হৈমন্তী')

২.

সহসা হেমন্ত সন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে। ('শর্বরী')

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থ 'সংবর্তে'র শ্রেষ্ঠতম কবিতা 'সংবর্তে' প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনার নিদর্শনসদৃশ এবং কবি হিসেবে আপন ভূমিকার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশক একটি পংক্তি রচনা করেছিলেন ; তিনি লিখেছিলেন, 'কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস'। এই পংক্তিটি সুধীন্দ্রকাব্যের মর্মলোকে প্রবেশের নেপথ্য সরণী এবং সাধারণভাবে তাঁর কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ। কেননা তাঁর আদ্যোপান্ত সমস্ত কবিতাই নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত বিচারে মানব সভ্যতার উপস্থিত মলমাসের বিশ্বস্ত বিবরণ। এবং এখানটাতেই তাঁর সঙ্গে প্রাচ্য কবি জীবনানন্দ দাশের বৈসাদৃশ্য যেমন একদিকে প্রকট, তেমনই অন্যদিকে প্রাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কবি, বর্তমান শতাব্দীর সর্বপ্রধান কাব্যসমালোচক টমাস স্টার্নস্ এলিয়টের সাদৃশ্যও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। জীবনানন্দের কাব্যে অন্তঃশীল যে-বেদনাস্রোতে আমরা ভেসে যাই, বিষাদের যে-অবগাঢ়তায় বারবার আমরা আপ্লুত হই, তা মূলত সর্বকালীন পটভূমিকায় মানব-মানবীর অবক্ষয়ী হৃদয়কে প্রত্যক্ষ করার বেদনা, তা একান্তভাবেই অনুভূতি-নির্ভর, আবেগাশ্রিত। পক্ষান্তরে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবেদনা স্পষ্টতই হয় বিশুদ্ধ দার্শনিক, নয় সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ব্যর্থতাপ্রসূত। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ইন্দ্রিয়শীলতায় যতখানি সোচ্চার, জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে বোধিনিমগ্নতায় ঠিক ততখানিই নিরুচ্চার। একজনের অভিলষিত মুক্তি ইন্দ্রিয়-নির্ভর দ্বন্দ্বরক্তিমতায় সোপানে-সোপানে, অন্যজনের অন্তর্লোকের আলো-অন্ধকার রহস্য-সমাচ্ছন্ন অতিচেতনার পথে-পথে। আবার, সুধীন্দ্রনাথের

কবিমানসের এই জটিল দ্বন্দ্বরক্তিমতাই তাঁকে এলিয়টের পাশে টেনে নিয়ে গেছে ; ফলে, এলিয়টের কবিতার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ এক ধরনের ভাগবত সাযুজ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। যন্ত্রবিজ্ঞানশাসিত বর্তমান সভ্যতার বহুবিধ বিলাস ও সুবিধাভোগী আধুনিক মানুষরা যে নয়নমোহন বাহ্য আড়ম্বরের অন্তরালে অন্তরে-অন্তরে একেবারেই শূন্যগর্ভ, বন্ধ্যা, নিষ্ফল ও অসহায়—সেই 'ফাঁপা মানুষ'দের বিশুষ্ক হৃদয়ে ক্রমবিস্তার্যমান ধূ-ধূ মরুভূমির বিষণ্ণ-ধূসর চিত্রটিই এলিয়ট তাঁর কাব্যে শেষাবধি উন্মোচিত ক'রে গিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়ক-নায়িকাও অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার শরিক ও শিকার। বর্তমান কালের অতি বিশিষ্ট এই দুই কবির কাব্যের ভাবসাদৃশ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে মানববিদ্যার ভিন্ন একটি শাখায় পারঙ্গম অন্য এমন একজনের কথা আমার মনে জাগছে, যাঁর সমগ্র জীবনের দর্শন-প্রতীতি, আমার বিবেচনায়, এই দুই কবির কাব্যগত ভাবসাযুজ্যের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। অস্তিত্ববাদের উদ্‌গাতা প্রখ্যাত জর্মান দার্শনিক কিয়ের্কগার্ডের কথাই আমি উল্লেখ করতে চাইছি এ-প্রসঙ্গে, কেননা আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের প্রধানতম সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি যে 'anguish of isolation'-এর কথা বলেছিলেন, এলিয়ট ও সুধীন্দ্রনাথ—উভয়েই কবিজীবনের মর্মলোকেই বিচ্ছিন্নতার এই মর্মান্তিক অনুভূতি প্রগাঢ়রূপে জাগ্রত।

দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে আমি সুধীন্দ্রনাথের অতিবিখ্যাত কবিতা 'উটপাখী'র প্রতি বর্তমান আলোচনার পাঠক-পাঠিকাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করতে চাই। সুধীন্দ্রনাথের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ক্রন্দসী'র প্রথম কবিতা 'উটপাখী'তে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা'র ত্রয়োবিংশতিতম কবিতা 'শাশ্বতী' ('শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে')-র ভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবসঙ্গতির কারণেই সুধীন্দ্রনাথের সমালোচকদের কেউ-কেউ তাঁর এই দু'টি কবিতাকে পরস্পরের পরিপূরক (complementary) ব'লে বিবেচনা করেছেন—যদিও অনুপুঙ্খপাঠে আমার মনে হয়েছে, কবিতা দু'টির মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কিন্তু 'উটপাখী'র মর্মোদ্ধারে 'শাশ্বতী'র সঙ্গে সেটির তুলনামূলক বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন বা অবকাশ নেই। নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে কবিতা দু'টির এই ভাবসাদৃশ্যের উল্লেখ।

'উটপাখী' 'ক্রন্দসী'র চাবি-কবিতা (key-poem) ; কেননা এই কবিতাটিতেই সমগ্র 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের কেন্দ্রিয় কথাটা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কবিতা হিসেবে 'উটপাখী'র যা মূলসুর, কাব্যগ্রন্থরূপে 'ক্রন্দসী'র মূলসুরও মূলত তা-ই। স্বরূপত 'উটপাখী' একটি প্রতীকী কবিতা, মরুবাসী উটপাখীর প্রতীকে বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত যুগমানসের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলাই এটিতে কবি-অভিপ্রেত। যে-যুগ কবিতাটির পটভূমিকায় বিরাজিত, সে-যুগ এই শতকের অভিশপ্ত তিরিশের যুগ, যখন অবক্ষয়ের করাল মূর্তি পৃথিবীব্যেপে প্রসারিত, আস্তিত্বিক সংকট চূড়ান্ত বিন্দুতে (apex-point) উপনীত। ফলত, decadent thirties বা অবক্ষয়িত তিরিশের

য্‌ুগপ্রেক্ষিতে কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যপ্‌ূর্ণ। চিন্তনে-মননে স্‌ুধীন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থই য্‌ুগসচেতন। য্‌ুগের সত্যকে তিনি সত্যিই সত্য ব'লে জ্ঞান করেছেন এবং কবি হিসেবে চেষ্টা করেছেন নিজের কবিতায় সেই সত্যের কাছে বিশ্বাসী থাকতে। সেই কারণেই, তাঁর আরো কয়েকটি কবিতার মতো, এই কবিতাটিতেও য্‌ুগসত্যের উন্মোচন এত যথার্থ।

আপাতলক্ষ্যে 'উটপাখী' একটি প্রেমের কবিতা এবং ব্যক্তিগত প্রেমের। কিন্ত্‌ু ঘনিষ্ঠ পাঠে (close study) বোঝা যায়, ব্যক্তিগত বিরহে কবিতাটির স্‌ুত্রপাত হলেও এটির সমাপ্তি ঘটেছে বিশ্বগত বিচ্ছেদবেদনায়। এবং এই কারণেই এটা ব্‌ুঝতেও বিশেষ অস্‌ুবিধে হয়না যে তিরিশের য্‌ুগই কবিতাটির প্রত্যক্ষ পটভূমি বটে, কিন্ত্‌ু এর প্রকৃত পটভূমি আরো অনেক বেশি ব্যাপ্ত—শ্‌ুধ্‌ু তদানীন্তন বর্তমানই নয়, স্‌ুদ্‌ুর অতীতও সেই পটভূমিকার অন্তর্গত। সেই বৈশ্বিক (universal) পটভূমিকায় কালের বৈনাশিক শক্তিকে কবি অন্‌ুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন এই অর্‌ুন্তুদ সংসারে মানবিক দায় বা দশা (situation)-কে এবং অনিবার্যত এমত সিন্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে কালের সেই সর্বাত্মক 'ধ্‌ুংসের দায়ভাগে' প্রত্যেক মান্‌ুষই 'সমান অংশীদার'। অতএব, এই বাস্তব পরিস্থিতিতে, আত্মছলনা (self-deception) অনর্থক ; কেননা, তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' অর্থাৎ, কোনোর্‌ুপ আত্ম-প্রতারণাতেই প্রলয়ের প্রতিরোধ সম্ভব নয়। তিনি যেন স্পষ্টতই প্রমাণ পেয়েছেন, য্‌ুগান্তের সেই ঝড় আসন্ন, কালান্তের, কল্পান্তের ; কালের সেই সম্মার্জনীর আঘাত থেকে কারো অব্যাহতি নেই। মর্‌ুঝড়ে মর্‌ুপাখীর অনির্ভর বাল্‌ুকায় ম্‌ুখ গ্‌ুঁজে ব্যর্থ আত্মরক্ষাপ্রয়াসের মতোই প্রাক্তন ম্‌ুল্যবোধকে, এই প্রলয়ের ম্‌ুখে, আঁক্‌ড়ে থাকার চেষ্টাও ব্‌ৃথা। অতএব 'ফাটা ডিমে' 'তা দিয়ে'—অর্থাৎ প্‌ুরোনো চিন্তা-ভাবনার লালন-পালনে, কালক্ষয় অর্থহীন। অর্থহীন, যেহেতু আজ আর কোথাও ল্‌ুকোবার উপায় নেই —'কোথায় ল্‌ুকাবে? ধ্‌ুধ্‌ু করে মর্‌ুভূমি ; / ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।'

কবিতাটির মধ্যভাগে কৃশিত আশাবাদের যে-ধ্‌ুনি ক্ষীণভাবে উচ্চারিত, তাতে 'নব সংসার' পাতার কথা থেকে থাকলেও ঠিক কোন্ পন্থায় সে তা সম্ভব হ'তে পারে, তার কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত নেই। তব্‌ুও মর্‌ুভূমির উটপাখীই যে কবির আশ্রয়, তার কারণ, এই কবিতাটিতে তিনি Totemism-বিশ্বাসী। টোটেমবাদের মর্মকথাই হ'লো মন্‌ুষ্য ও মন্‌ুষ্যেতর (subhuman) প্রাণীকুলের মধ্যে প্রতীকী সম্পর্ক (symbolic relation) স্থাপন এবং এই বিশ্বাসে আদিপিতার মর্যাদা কোনো-না-কোনো জন্ত্‌ুতে বর্তায়। 'উটপাখী' কবিতায় এই আদিম সামাজিক মতবাদ (premi-tive social cult)-এ সাময়িকভাবে হ'লেও, স্‌ুধীন্দ্রনাথ আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

এলিয়ট ও স্‌ুধীন্দ্রনাথ উভয়েরই মানসিক সংবেদন অভিন্ন পরিমণ্ডলে প্রকম্পিত হওয়ার ফলে এলিয়টের কবিতার 'Cactus land'-কে স্‌ুধীন্দ্রনাথের কবিতার ফণিমনসায় পর্যবসিত হ'তে দেখি, এলিয়টের কবিতার বন্ধ্যাভূমিকে স্‌ুধীন্দ্রনাথের কবিতায়

মরুভূমিতে প্রতিফলিত হ'তে দেখি, এলিয়টের রুক্ষ ধরিত্রীর 'Here is no water but only rock'-এর 'জল নেই' ধ্বনিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় 'তবু ক্ষয় / এবং পিপাসা এখানে সর্বতোব্যাপী' ('তীর্থপরিক্রমা' ঃ 'দশমী')-র ধু-ধু রিক্ততায় প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনি। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করার সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রন্দসী'র সদ্যালোচিত 'উটপাখী'র প্রারম্ভিক চার পংক্তি, 'দশমী'র সদ্যোল্লেখিত 'তীর্থপরিক্রমা'র প্রথম দিক্ এবং 'সংবর্ত' গ্রন্থের 'যযাতি' কবিতার '···ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে, / মরু নগরে নগরে' পংক্তি-খণ্ড। তাছাড়া, 'বন্ধ্যা ফণিমনসা', 'ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া' ইত্যাদি অংশ এবং 'উত্তরফাল্গুনী'র 'প্রতিপদ' কবিতার অন্তিম স্তবকের ঃ

> শত শ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমুমে ;
> বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর :

এই প্রারম্ভিক পংক্তিদ্বয়ও এ-প্রসঙ্গে সমানভাবে স্মরণীয়।

কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও, বাঙালী কবি সুধীন্দ্রনাথ যে ইংরেজ ক্যাথলিক-কবি এলিয়টের চেয়ে ফরাসী প্রতীকী-কবি মালার্মের সঙ্গেই অধিকতর আত্মিক নৈকট্য অনুভব করেছেন, এবং 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই' যে তাঁর 'অন্বিষ্ট', অকপটে তা স্বীকার করেছেন—এমনকি মালার্মের মতো নির্দ্বিধকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন 'কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ' তার কারণ কী? মালার্মের প্রতীকী কবিতার সঙ্গে আমার সামান্য যেটুকু পরিচয় অনুবাদের মাধ্যমে হয়েছে (তারও অনেকখানি আবার সুধীন্দ্রনাথেরই কল্যাণে), তা থেকে এ-সিদ্ধান্তেই আমি উপনীত হয়েছি যে সুধীন্দ্রনাথের মালার্মে-অনুরক্তির প্রধান হেতু জগৎ ও জীবনের প্রতি মালার্মের মতো তাঁরও যথার্থ সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গি (lofty attitude), ব্যঞ্জনাগভীর প্রকাশরীতি, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রচলিত আভিধানিক অর্থকে পুনঃ-পুনঃ অতিক্রম করা, শিল্প হিসেবে কাব্যের প্রকরণগত দুরূহতা এবং সর্বোপরি তাঁর নঙর্থক জীবনদর্শন, যা নাকি অবগাঢ় বিষাদের নিঃসীম অন্ধকারে রহস্য-সমাচ্ছন্ন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করলেও তাঁর ও মালার্মের কবিতার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণী পাঠ (close and analytical study) আধুনিক কবিতার অনুরাগী হিসেবে আমাদের লক্ষ্যে কিন্তু কাব্যপ্রকরণগত সমধর্মিতা এবং কবিতাকে এক বিশেষ ধরনের শব্দ-শিল্প হিসেবে আপন-আপন কাব্যসাধনায় গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য কোনো মৌলিক সাদৃশ্য গোচরীভূত হয়না শব্দসাধক এই দুই কবির কাব্যাদর্শে। সত্য বটে, শব্দের মহিমা ও ঐশ্বর্যেই মালার্মের কবিতার স্বকীয়তা এবং সুধীন্দ্রনাথের কবিতার আভিজাত্যের (cothalicity) মূলেও রয়েছে শব্দগুণ। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও এই দুই কবির পার্থক্য সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয়, কেননা এদের একজন (মালার্মে) শব্দপ্রতিমাশিল্পী (imagist) হিসেবে যথাযথ অর্থ উদ্ঘাটনে অধিকাংশ শব্দের মারাত্মক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে একান্ত সচেতন ছিলেন ব'লেই শব্দের এই সীমাবদ্ধতাকে তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন ধ্বনি (sound) ও অনুষঙ্গের (association) নিত্যনূতন ব্যবহারে, অনুভূত অভিজ্ঞতা ও অন্তরলালিত

ধ্যান-ধারণাকে নিজস্ব আদর্শের অনুসারী করতে গিয়ে তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দকে এক অভিনব অর্থময়তায় মহিমান্বিত ক'রে তোলার সাধনার মধ্যবর্তিতায়। কিন্তু শব্দকে নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্যজনে (সুধীন্দ্রনাথে) এ-ধরনের কোনো সজ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না, কেননা শব্দের অর্থবহতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিলো কিছুটা স্বতন্ত্র ; তা অনেকটা জর্মান ইতিবাদী (positivist) **Ludwig wittgenstein**-প্রমুখের শব্দের ধারণা ও তত্ত্বানুসারী। সেই কারণেই স্বতন্ত্র শব্দের স্বয়ম্ভূ মূল্যে আস্থাহীন হ'য়ে শব্দের সসীমতাকে তিনি অসীমতায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতায় ছন্দোমিলের নিরলস প্রসাধন-পরিচর্যায়। এবং প্রধানত এই কারণেই মালার্মে ও সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের দুর্বোধ্যতার ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ বিপরীতধর্মী হ'য়ে পড়েছে। মালার্মের ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যঞ্জনাগুলোই দুর্বোধ্য, শব্দগুলি নয় ; আর, সুধীন্দ্রনাথ-প্রযুক্ত শব্দের ব্যঞ্জনা নয়, অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত, প্রাচীনপন্থী ও সংস্কৃত-ঘেঁষা ব'লে শব্দসমূহই সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য।

শব্দসংক্রান্ত এই পার্থক্য ছাড়াও অন্য কোনো-কোনো দিকের বিবেচনাতেও এই দুই কবির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। এই বিশ্বচরাচর-প্রসৃষ্টিতে মালার্মে অক্ষয় ও অব্যয় যে ধ্রুবত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, স্বীয় কাব্যে তার স্বীকৃতি রয়েছে ; কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এ-ধরনের কোনো শাশ্বতে অবিশ্বাসী, তিনি ক্ষণবাদী (momentarist) ঃ

> আমি ক্ষণবাদী ; অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
> নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
> তাতে যার জের, সে-সংসারও
>
> ('উপস্থাপন' ঃ 'দশমী')

মালার্মের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ তার অন্তঃস্থ প্রচ্ছন্ন রহস্যবিধুরতা। তাঁর কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো বিভিন্ন পংক্তিতে মাঝে-মাঝেই আমরা যে এক ধরনের রহস্য-সমাচ্ছন্ন মিস্টিসিজমের প্রান্তস্পর্শী সূক্ষ্ম অনুভূতির চকিত আভাস পাই, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার যত্রতত্র তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মালার্মে তাঁর কবিতায় গীতিকবিতাসুলভ সংগীতধর্মকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ; ফলে, স্থানে-স্থানে তাঁর কবিতা ভাবাবেগে আলুলায়িত, অতি-উচ্ছ্বসিত। পক্ষান্তরে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আবেগ-নিঃস্ব না-হ'য়েও আবেগ-সর্বস্ব নয় ; একমাত্র প্রেম-পর্যায়ের কবিতাগুলির কথা বাদ দিলে তাঁর কবিতার অধিকাংশই স্পষ্টরূপে গদ্যগন্ধী— এমনকি কোথাও-কোথাও প্রবন্ধকল্প ঃ

১.

> অবশ্য আমার
> পক্ষে সংগত যে নয় অনুতাপ, সে-কথা স্বীকার
> করি ; কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
> নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—

অপ্রাপ্তসংকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—
তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশ যাত্রার সংজ্ঞায় হেন
দুরবস্থা শুধু সম্ভাবাই নয়, অবশ্যম্ভাবীও
বটে, অশোভন তখন নির্বেদ।

('যযাতি' ঃ 'সংবর্ত')

২.

...নগরে, গ্রামে, বাহিরে ও
ঘরে আরবেরই উত্তরাধিকার যেহেতু অজ্ঞেয়,
তাই উহ্য অবিশ্বাসে উদ্বিগ্ন মানুষ, অহংকৃত
সৌজন্য সত্ত্বেও, মৎসর অদৃষ্টবাদে, বার্বাস্থিত
অথচ উদ্দাম অন্তত সংসক্ত নৃত্যে ॥

('তীর্থপরিক্রমা' ঃ 'দশমী')

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পড়তে-পড়তে মনে হয়, এগুলির ভাষা যেন একজন সন্দিহান মানুষের অক্লান্ত ধৈর্যের অনিবার্য ফলশ্রুতি, এগুলির ভাব যেন একজন ভূয়োদর্শী মানুষের পরম অভিজ্ঞাত অনুভূতির অবিকৃত প্রতিফলন। এবং এটাই স্বাভাবিক; কেননা ন্যায়শাস্ত্রসম্মত যুক্তিবাদকে সুধীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, কাব্যসৃষ্টির অপরিহার্য শর্ত হিসেবে শিরোধার্য ক'রে নিয়েছিলেন, যে-কারণে তাঁর কবিতাকে অনেকটা গদ্যের মতো যুক্তিগর্ভ হ'তে হয়েছে এবং তাঁর বহু কবিতার বহু পংক্তিতে ন্যায়শাস্ত্রানুগ বহু logical statement ও logical deduction-এর আবির্ভাব ঘটেছে। সেই শুষ্ক, নিরুত্তাপ, নিতান্তই গণিতগন্ধী ন্যায় ও যুক্তিবাদে মালার্মে মুহূর্তের জন্যও আস্থাশীল হ'তে পারেন নি। তৎসত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতাবিশেষে মালার্মে প্রতিফলিত—যেমন তাঁর 'শর্বরী' ('উত্তরফাল্গুনী') ও 'হৈমন্তী' ('অর্কেস্ট্রা') কবিতায় রূপান্তরসাধনী প্রতীক (transformative symbol)-এর সাদৃশ্যে এবং 'দশমী' গ্রন্থের 'নৌকাডুবি' ও 'ভ্রষ্টতরী' কবিতাদ্বয়ে মালার্মের যথাক্রমে বিখ্যাত মরালের এবং তরীর প্রতীকের স্পষ্ট ছায়াপাত আমাদের লক্ষ্যের গোচরে আসে। তদুপরি, মালার্মের দিবাস্বপ্নদর্শক 'ফন'-এর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা'র নায়কের স্বভাবী-সাদৃশ্যও পাঠকের নজরের একেবারে অগোচরে থাকার মতো নয়।

তবু আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, মালার্মের চেয়ে মালার্মে যাঁর গুরু, সেই পোল্ ভালেরির সঙ্গেই কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের অধিক আত্মিক নৈকট্য। কেননা ভালেরির সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যা মালার্মের সঙ্গে তাঁর, অন্তত দীর্ঘকালীন পরিণতি-প্রবণতায় (longterm maturity) সহজলক্ষ্য নয়। আস্তিক্য-ধর্মবিরোধী (স্মরণীয়, সুধীন্দ্রনাথের 'বিপ্রলাপ') নৈতিবাদী জীবন-দর্শন এবং কবিজীবনের অন্তিম অধ্যায়ে ধীরে-ধীরে মানব-চৈতন্যের অপ্রতিহত স্বাধীনতা ও প্রভূত শক্তিতে সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন (এখানে জানিয়ে রাখি, কবিজীবনের

মধ্য-পর্বেই মালার্মে চৈতন্যের সার্বভৌমত্বে আস্থা হারিয়েছিলেন), রোম্যাণ্টিক ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাসময় আবেগ সম্পর্কে অনীহা, গভীর বৈদগ্ধ্য, অধ্যবসায়ী পরিমার্জনা, মননবাদীর একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতাবোধ এবং সর্বোপরি কাব্যশিল্পপ্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এ-সবই হচ্ছে ভালেরি ও সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে সাদৃশ্যের সূত্র। তাছাড়া, ভালেরি যেমন নেতিবাদী জীবনদর্শন ধ'রে এগোতে-এগোতে শেষ পর্যন্ত ক্ষণবাদে পৌঁছেছিলেন সুধীন্দ্রনাথও তা-ই; অধিকন্তু তিনি আত্মার সার্বভৌমত্বেও দৃঢ়প্রত্যয়ী হ'য়ে উঠেছিলেন ঃ

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত ঃ
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দুরান্ত তারায়
উধাও মনের আগে ; মাতরিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত ;
('সোহংবাদ' ঃ 'সংবর্ত')

কিন্তু ভালেরি ক্ষণবাদকে অতিক্রম ক'রে শেষাবধি এই বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে কোনো সুস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি, অথচ সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে 'ক্ষণবাদী' ব'লে ঘোষণা করা সত্ত্বেও ক্ষণবাদেই বিরতি না-মেনে মানববিকাশের সমগ্র ধারাটি অনুপুঙ্খ অনুধাবন ক'রে জীবনের অন্তিম-পর্বে একটি নির্দিষ্ট দর্শনে উপনীত হয়েছিলেন। ফলে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্য জুড়ে একটি দার্শনিক জিজ্ঞাসার মন্থর অথচ নিশ্চিত ক্রম-পরিণতি রয়েছে, যা ভালেরিতে নিতান্ত অলক্ষ্য না-হ'লেও অনেকাংশেই অস্পষ্ট।

আবার, চিন্তা ক'রে দেখেছি, অস্থি-মজ্জায়, রক্ত-মাংসে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্ধকার সেই নরকেরই স্থায়ী বাসিন্দা, যে-নরকের প্রথম অধিবাসী ফরাসিকবি-কুলচূড়ামণি শার্ল বদলেয়্যার। টমিস্ট দর্শন-প্রাণিত দান্তের মতো সাময়িক নরক-পরিদর্শন তিনি করেন নি, বদলেয়্যারের মতো তিনিও ছিলেন সেখানকার প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের স্থায়ী অধিবাসী। 'ক্রন্দসী'র 'নরক' কবিতায় তিনি ধ'রে রেখেছেন তাঁর সেই নরকবাসের অভিজ্ঞতার কথা ঃ

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।
... ...
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।

মনে হয়, সেই বিপ্রতীপ মানসিক পরিবেশে স্থায়ী বসবাসের ফলেই তিনি

'অনেকান্ত জড়বাদ' ও 'সর্বান্তিক বিনাশে' এমন অনড় আস্থা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পর যে-সব কবি বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা লিখেছেন, তাঁদের একজন সুধীন্দ্রনাথ। সামগ্রিক জীবনদর্শনের মতো, প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও, তিনি ভালেরিপন্থী, ভালেরির প্রভাবে ক্ষণবাদী। তাঁর প্রেমের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মতো, শাশ্বতের কোনো স্থান নেই, চিরন্তনের কোনো ভূমিকা নেই। মানুষের জীবনে জন্ম-জন্মান্তর ব্যেপে প্রেমের পরিব্যাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন। প্রেমের মাধুর্য দিয়েই তিনি নিখিলের মাধুর্যকে আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন প্রেমের রহস্যের মধ্যেই অনন্তকে উপলব্ধি করতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও, প্রেম-প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনায় সুধীন্দ্রনাথ একেবারেই অন্যরকমের। তাঁর ধারণায় প্রেমিক-প্রেমিকার শারীরিক মিলনেই প্রেমের সার্থকতা ও সমাপ্তি এবং শরীরের অস্তিত্বের মতো প্রেমের অস্তিত্বও সাময়িক। তাঁর স্থির বিশ্বাস, 'অসঙ্গত চিরপ্রেম' ('মহাসত্য' ঃ 'অর্কেস্ট্রা')।

সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় নায়িকা শুধু ক্ষণিকাই নয়, সে চপলা এবং প্রেম-কৌলীনপুণাও। তদুপরি, তাঁর বহু কবিতার নায়িকাই বিদেশিনী,—নীলনয়না এবং সুবর্ণ-কেশিনী। তাঁর একাধিক কবিতায়—যেমন 'ক্রন্দসী'র 'সমাপ্তি'তে—এমনই এক নায়িকার সাক্ষাৎ আমরা লাভ করি। অবশ্য এই কবিতাটিতে এবম্বিধ নায়িকার আবির্ভাব একান্ত অহেতুক বা নিতান্ত নির্ভিত্তিক নয়। এই কবিতায় এই নায়িকার সাক্ষাৎলাভের একটি বাস্তব এবং কবির আত্মজৈবনিক ভিত্তি (autobiographical basis) আছে। সেই ভিত্তির পরিচয় না-নিলে এই কবিতাটির সঙ্গে পাঠকদের পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একবার, বিদেশ ভ্রমণকালে, জার্মনীর রাইনতীরবর্তী এক শহরে অসুস্থ অবস্থায় কবি কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। প্রবাসে, সেই নিঃসঙ্গ পর্বে, তিনি পেয়েছিলেন এক স্বর্ণকেশিনীর অক্লান্ত সেবা, যা তাঁর দ্রুত আরোগ্যলাভের সহায়ক হয়। পরবর্তী জীবনে তিনি সেই রমণীকে কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি, সেই বিদেশিনীর সান্নিধ্যের স্মৃতি আমৃত্যু তাঁকে বিরহব্যথায় উদ্বেল করেছে।

'সমাপ্তি' কবিতাটির পটভূমিকায় বিরাজিত বর্ষা। বর্ষা বিরহেরই ঋতু। স্বাভাবিকভাবেই বর্ষাঋতুর প্রভাবে কবি বিরহবেদনায় আকুল হ'য়ে উঠেছেন। বহুদিনের ওপার হ'তে একটি সুর ভেসে এসে তাঁর চিত্তবীণায় ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে, ভেসে উঠেছে স্মৃতির পর্দায় সেই বিদেশিনীর মুখ। তাঁর স্মৃতিতে বিভোর হ'য়ে 'উন্মন আবেশে' তিনি 'বরষাবিষণ্ণ বেলা' কাটালেন বর্ষার অবিশ্রাম ধারাপাতে তিনি যেন সেই বিদেশিনী-কণ্ঠের স্নেহসম্ভাষণ শুনতে পেলেন। অবরুদ্ধ বাতায়নে ঝটিকার তান্ডব। কবির বিচ্ছেদবেদনাতুর চিত্ত এর প্রতিকারে নিজের অক্ষমতার কথা বিধাতাকে জ্ঞাপন করে। ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যা কবির চোখে যেন দিনশেষের প্রদীপভাতি। অতঃপর অন্ধকারের গাঢ় আবরণ যেন শবাচ্ছাদনের মতো বিস্তৃত হলো কবির 'অন্তরে বাহিরে'। তাঁর মনে

হ'লো. মৃত্যুর ব্যূহ যেন ক্রমসংকুচিত ; মনে হলো. 'রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো / পাটিল জঞ্জালকণা' কুড়োবার দিন অবসিতপ্রায়। তিনি অনুভব করলেন. 'ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ' হ'য়ে 'উত্তোলিত সম্মাজনী'র আঘাতে তাঁর 'অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি'র অবসান এইবার অত্যাসন্ন।

'সমাপ্তি'র স্তবকসংখ্যা তিন এবং ছত্রসংখ্যা সাতাশ—প্রথম স্তবতকে দশ, দ্বিতীয়-স্তবকে ছয় এবং তৃতীয় বা শেষ স্তবকে এগারো। কবিতাটির প্রথম স্তবকে একটি নিপুণ চিত্ররচনা আছে—বর্ষণমুখর একটি দিনের চিত্র। এই চিত্রণের মধ্য দিয়েই কবি সৃষ্টি করেছেন সেই বাতাবরণ, যা তাঁর মনোবেদনার অভিব্যঞ্জনার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সহায়ক। দ্বিতীয় স্তবকে ঘনিয়ে এসেছে আসন্ন রাত্রির সংকেতবাহী বিপুল অন্ধকার। স্মৃতির বিদ্যুতে প্রেমের যে-দীপ্তি এতক্ষণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো, এইবার তার অবসান ঘটলো। এইভাবে কবির প্রেমভাবনার সমাপ্তি সূচীত হলো গভীর নৈরাশ্যে। এই সার্বিক নৈরাশ্যই কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে কবিকে অন্ধ নিয়তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং ভবিতব্যের অমোঘতায় তিনি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন—নিশ্চিত নিয়তিবাদীর (**confirmed fatalist**) মতো তিনি উচ্চারণ করেছেন এবং অক্লেশেই—'মনে হ'লো আশা নাই'…'এইবার ফুরায়েছে পালা'। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এই উচ্চারণ কি জীবন-সতৃষ্ণের, নাকি জীবন-বিতৃষ্ণের ?

আমাদের সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের কোনো যথার্থ উত্তরসূরী নেই (প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য, পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন নিঃসন্তান), যেমন নেই তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী, এ-কথা সত্যের খাতিরেই স্বীকার করতে হয়। আমাদের সাহিত্যে তিনি কোনো-কোনো অর্থে ঐতিহ্য-বহির্ভূত ব'লেই বিবেচিত হবেন, এ-কথা বলাও অসঙ্গত কিছু নয়—যদিও কোনো অর্থেই তিনি আমাদের সাহিত্যের আবহমান ধারায় প্রক্ষিপ্ত নন। ব্যক্তিগত জীবনে উদার দৃষ্টির. চারিত্রিক কৌলিন্যের এবং 'শাস্ত্রকবি'জনোচিত আভিজাত্যের দুর্লভ যে-দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন ক'রে গেছেন, সাহিত্যজীবনে সমুন্নত যে-কাব্যাদর্শ শেষাবধি অনুসরণ ক'রে যেতে পেরেছেন, আমাদের জীবনচর্যা কিংবা সাহিত্যচর্চায় তা গ্রহণের যোগ্যতা আমরা আজও ঠিক অর্জন করতে পারিনি ব'লেই এই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কে জানে, অনাগত ভবিষ্যতে, মহাকালের অন্তহীন অগ্রগতিতে সুধীন্দ্রনাথের পথযাত্রী সৌভাগ্যবান কে-কে বা কারা-কারা হবেন ! বলাই বাহুল্য, একমাত্র মহাপ্রাজ্ঞ মহাকালই পারে এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ; আমরা কেবল অসহায়ের মতো প্রশ্নটি উত্থাপনই করতে পারি, এর উত্তর আমরা কেউই দিতে পারি না ॥

কবি অমিয় চক্রবর্তী সার্থক রবীন্দ্র-উত্তরসাধক। রবীন্দ্রজীবনসাধনার যথার্থ স্বরূপটি তিনি যে তাঁর নিরাসক্ত কবিদৃষ্টিতে মাত্র অবলোকন করেছেন, তা-ই নয়, মরমীয়াসুলভ ধ্যানতন্ময়তায় সেই স্বরূপকে তিনি আপন চৈতন্যের স্তরে-স্তরে সংক্রামিতও করেছেন। তাঁর সমকালে তিনিই একমাত্র বাঙালী কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার সঙ্গে নিজের জীবনআরাধনাকে নিবিড়ভাবে মেলাতে পেরেছেন। কিন্তু কেবল এটুকু বললেই অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে সবটুকু বলা হয় না ; প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-সাধনাকে তিনি শুধু স্বীকার ও স্বীকরণই করেন নি, সে-সাধনাকে তিনি কিছুটা সম্পূর্ণতাও দান করেছেন। একজন মানুষ হিসেবে এখানেই তিনি সার্থক, রবীন্দ্র-উদ্বুদ্ধ একজন কবিরূপে এখানেই তাঁর সার্থকতা।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যকৃতির সামগ্রিক পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে পারি। আলোচনা আরম্ভ করতে গিয়ে প্রথমেই একটি অপ্রীতিকর অথচ অত্যাবশ্যক প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়, কেননা তা না-হ'লে কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যপ্রতিভার প্রকৃতি তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবার সম্ভাবনা। প্রসঙ্গটিকে একটি প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করা যেতে পারে এবং তা হচ্ছে এই : অমিয় চক্রবর্তী কতখানি নিজস্বতাসম্পন্ন কবি আর তাঁর কবিতাই বা কতটুকু স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন ? অবশ্য এই প্রসঙ্গটিকে উত্থাপন করতে হবে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রখর-উজ্জ্বল উপস্থিতির পটভূমিকায়। অতএব, কথান্তরে, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটিকে এইভাবেও তুলে ধরা যেতে পারে : অমিয়কাব্য কতখানি রবীন্দ্রকাব্য-নিরপেক্ষ ? অর্থাৎ, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাবমুক্ত কিনা কিংবা তা হ'য়ে থাকলে কোন্ অর্থে এবং কতটুকু। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি শুধু এই কারণে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনো-কোনো তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকের গুরুগম্ভীর অথচ অগভীর রচনায় এবং বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শানুসারী কিছু-কিছু প্রগতিশীল (?) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, যান্ত্রিক ও একপেশে (আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর চক্ষুষ্মান অথচ অন্ধ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে মহামূল্যবান) মৃত প্রবন্ধে এই সংশয় ও প্রশ্ন অত্যন্ত অশোভন-ভাবে বারেবারেই উচ্চারিত হ'তে শুনে অন্যান্য অমিয়-অনুরাগীর মতো আমিও গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ অনুভব করি। এ-সব প্রবন্ধ পাঠে কিংবা এঁদের বক্তব্য শুনে এমন ধারণাই জন্মায় যে এঁরা যেন বলতে চান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক জনৈক মহাকবি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও অতি বিস্ময়কর সম্মোহন-প্রতিভার জাদুস্পর্শে তাঁর একদা-সাহিত্য-সচিব অমিয় চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ কবিতারচনাকর্ম-

উদ্দীপিত ক'রে গিয়েছেন—এইমাত্র। ফলে, এঁদের কারো মতে, 'অমিয় চক্রবর্তী তো রবীন্দ্রনাথের ওপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন', আবার কেউবা বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মতো পূর্বসূরী ছিলেন ব'লেই অমিয় চক্রবর্তীর এই সাফল্য' কিংবা 'রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর কথা ভাবাই যায় না'—ইত্যাদি। অর্থাৎ, এঁদের বিবেচনায়, কবি-অভিধায় অমিয় চক্রবর্তীর যেটুকু কৃতিত্ব, তা আসলে তাঁর কাব্যদীক্ষাদাতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই প্রাপ্য, কেননা তিনিই কবি হিসেবে অমিয় চক্রবর্তীকে ধীরে-ধীরে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, ক্রমে আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবি প্রতিষ্ঠার মূলে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিষয়ে এবম্বিধ ভ্রান্ত ধারণার অস্তিত্ব সত্ত্বেও এর প্রধান উৎস যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই, অন্তত এ-সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। কেননা এ-কথা আমাদের জানা যে কবিজীবনের সূচনা-পর্বে অমিয় চক্রবর্তীর অনেকগুলি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেই শুধু নয়, প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং প্রগাঢ় ছত্রচ্ছায়ায়। ফলে, প্রথম পর্বের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মাত্র প্রভাবিতই করেন নি, রবীন্দ্রপ্রভাব তাঁকে আবৃত ও আচ্ছন্নও করেছে। ১৯২৬ সালে তিনি গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিবের দায়িত্ব এবং বরণ ক'রে নিয়েছেন দিবারাত্রির সর্বাধিক সময়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গীর জীবন। আর, ঠিক পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৯২৭ সাল থেকে প্রধানত 'বিচিত্রা' পত্রিকাকে অবলম্বন ক'রে আরম্ভ হয়েছে তাঁর সক্রিয় কবিজীবন। অবশ্য এরও আগে তিনি যে আদৌ কবিতা রচনা করেন নি, তা নয়; কেননা তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত কবিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "ঠিক নাম মনে পড়ছে না, কিন্তু একটি সনেট। আমার কৈশোরে 'সবুজপত্রে' বেরিয়েছিলো। 'সবুজপত্রে'র প্রথম দিকের কোনো এক সংখ্যায়।" কিন্তু কৈশোরিক সেই কবিতাটি তাঁর কবিজীবনের একেবারে ভ্রূণ-পর্বের রচনা; অতএব সেটিকে আলোচনার বহির্ভূত রাখাই শ্রেয়। কিন্তু ১৯২৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে তাঁর যে প্রকাশ্য কবিজীবন-পর্বের সূচনা হ'লো (এখানে উল্লেখ্য, 'প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো?'—জনৈক তথ্যসন্ধানীর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিহ্বলের মতো উচ্চারণ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য।'), সেই পর্বের পরিণতি বা সার্থকতা সম্পর্কে অন্যান্যের চেয়ে তিনি নিজেই বোধ হয় ছিলেন অনেক বেশি সন্দিহান। এ-সম্পর্কে তিনি যে প্রথমাবধি কতখানি সচেতন ছিলেন, তারই চমৎকার নিদর্শন ধরা পড়েছে তাঁর তদানীন্তন একটি উক্তিতে, যেখানে অকপটেই তিনি স্বীকার করেছেন, 'মহাপুরুষের ছত্রতলে বিরাজ করার মধ্যে একটি অলীকতা আছে—ঐ রকম আশ্রয় মানুষের আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর।' 'আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর' বলতে তিনি যে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও এই উল্লেখের দ্বারা তিনি যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কবিচরিত্র গঠনের পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধকতার প্রতিই পরোক্ষে ইঙ্গিত করেছেন, এটুকু উপলব্ধি করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। কেননা একজন চরিত্রাকাঙ্ক্ষী কবি হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

রবীন্দ্র-প্রভাবের শীতল আশঙ্কায় ক্রমাগত তাড়িত হ'তে-হ'তে অবশেষে আট বছরের মাথায় ১৯৩৩ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিবের কাঙ্ক্ষিত পদ পরিত্যাগ করেছেন। শুধু তা-ই নয়; প্রত্যক্ষ রবীন্দ্রসান্নিধ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের কবিতাকে স্বকীয়তার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় তিনি শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ ক'রে ঐ বৎসরই দেশান্তরী হ'তে পাড়ি দিয়েছেন সুদূর ইংল্যাণ্ডের পথে। নিজের সাহিত্য-সচিবের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদায় দেন নি, তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় সে-পদ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এর থেকেই অনুমান করা চলে, রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির সচেতন প্রয়াস কবিজীবনের প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে কতখানি গভীর ছিলো। অতএব যে-সমস্ত অমিয়-অনীহ তাঁর কবিতাকে সর্বতোভাবে রবীন্দ্র-লালিত ব'লে মনে করেন এবং তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতারই উপস্থিতি অনুভব করেন, তাঁদের যুক্তি সর্বাংশে মেনে নিতে বিবেকে বাধে—অন্তত বিনা তর্কে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।

তবে হ্যাঁ, তাদের যুক্তি এই অর্থে গ্রাহ্য যে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ ক'রে ইংল্যাণ্ড যাত্রা পর্যন্ত যে-সব কবিতা তিনি রচনা করেছেন, সেগুলির অধিকাংশই সজ্ঞানে-অজ্ঞানে হ'য়ে উঠেছে সর্বাংশে রাবীন্দ্রিক—ভাবে, ভাষায়, ব্যঞ্জনায়—এমন কি গঠনরীতিতেও। অর্থাৎ, সেই বৎসর পর্যন্ত নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রকক্ষেই তাঁর কাব্য আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৩৩-পরবর্তী তাঁর কবিতা সম্পর্কে এ-কথা কিছুতেই সত্য বা গ্রাহ্য নয়। কেননা তাঁর ইংল্যাণ্ড প্রবাস-পর্বের চার-বৎসর-ব্যাপী (১৯৩৪-৩৭) ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডির রচনা সম্পর্কে গবেষণার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বেলিয়ল কলেজ থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রী অর্জণ ক'রে এবং সেই সঙ্গে তদানীন্তন ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐশ্বর্যময় পরিমণ্ডলে গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ ক'রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বল্প ব্যবধানে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' এবং 'একমুঠো' যখন প্রকাশিত হ'লো, তখন সেই কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত রচনাবলীতে তাঁর যে-কাব্যাদর্শ ও কবিচরিত্র হঠাৎ দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠলো, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কররূপে অভিনব। গ্রন্থ দু'টির প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলেন সমকালীন সমালোচককুল। এ-দু'টিতে কেউবা লক্ষ্য করলেন কবির পালা-বদল, কেউবা লক্ষ্য করলেন তাঁর গোত্রান্তর, আবার কেউবা তাঁর জন্মান্তর। গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি সম্পর্কে বলা হ'লো 'বিস্ময়কর', 'একেবারেই অভিনব', 'একেবারেই আধুনিক'—এমন কি 'উগ্ররকমের আধুনিক।' অর্থাৎ এই গ্রন্থ দু'টির কাব্যকৃতি বাংলা কাব্যের সে-যাবৎ অনুসৃত ধারায় আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রাহ্য হ'লো।

'খসড়া' ও 'একমুঠো' কাব্যগ্রন্থ দু'টি যে কোনো অর্থেই রবীন্দ্রানুসরণজাত নয়, আধুনিক বাংলা কাব্যের সকল সমালোচকই একবাক্যে এ-কথা স্বীকার করেছেন; কিন্তু এ-দু'টির কবিতাগুলি যে সেই সঙ্গে এতটুকু রবীন্দ্রবিরোধিতাজাতও নয়,

এ-কথাটা তাঁরা অনেকেই তেমনভাবে উল্লেখ করেন নি। অথচ এই কবিতাগুলির নিবিষ্ট পাঠ এমন ধারণারই জন্ম দেয় যে এগুলি বৈশিষ্ট্যগত বিবেচনায় রবীন্দ্রানুসরণ ও রবীন্দ্রবিরোধিতার সুদূর মেরুর সমদূরবর্তী ; অর্থাৎ, চারিত্রিক বিচারে এগুলি মূলত রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ এবং স্পষ্টত অমিয় চক্রবর্তীর কবিসত্তার স্বকীয়তাসূচনার ইঙ্গিত-বাহী। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে : কেমন ক'রে এটা সম্ভব হ'লো ? যে-কবি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও তাঁর শান্তিনিকেতন-পর্বে কবিতারচনায় ছিলেন সর্বাংশে রবীন্দ্র-আচ্ছাদিত, তিনিই কী-ক'রে কয়েক বছরের প্রবাসজীবনের ব্যবধানে এত দ্রুত অর্জন করলেন রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তি ? কী-ক'রে সম্ভব হ'লো এত সংক্ষিপ্ত সময়সীমায় তাঁর কবিতার পক্ষে রবীন্দ্র-কাব্যের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হ'তে থাকা ? বলাই বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত অনালোচিত এ-প্রশ্নটির উত্তর বহুলাংশে নিহিত রয়েছে তাঁর ইংল্যাণ্ড প্রবাস-পর্বের গভীরে। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে তিনি গেলেন অক্সফোর্ডে, উদ্দেশ্য সমৃদ্ধ ছাত্র-জীবনকে সমৃদ্ধতর ক'রে তোলা। কিন্তু, আমার ধারণা, সেটা ছিলো তাঁর নিতান্তই জাগতিক উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যের অন্তরালে তাঁর একটি গভীরতর আত্মিক আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত ছিলো : কেননা ছাত্রবৃত্তির আবরণে তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিশ্ববিদ্যাবুভুক্ষু, আত্মঋদ্ধির আভরণে অন্য দিকে তেমনই ছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাব-মুমুক্ষু। অতএব আন্তর-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি অনিবার্যভাবে খুঁজে পেলেন তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের বিচিত্র বীক্ষণাগারের পথ। জাগ্রত আগ্রহ নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন তাতে : অচিরেই তাঁর পরিচয় ঘটলো পাশ্চাত্য ভাবধারায় রচিত (বিশেষত ইংরেজি) কাব্যের নূতন যুগের বিজ্ঞানচেতনা, কার্ল মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের অন্তর্চেতনাপ্রবাহ-প্রভাবিত নিজস্ব স্বরূপের সঙ্গে। ফলে, পশ্চিমী কাব্যের ভাবাদর্শে তাঁর কবি-মন উদ্বুদ্ধ হ'লো, বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতি—এই উভয় দিকের বিচারেই তাঁর কবিমানসের রূপান্তর ঘটলো। তিনি মার্ক্সকে বর্জন, বিজ্ঞানচেতনাকে গ্রহণ এবং ফ্রয়েডকে আত্মসাৎ করলেন। তাঁর কবিমানসের রূপান্তরের পরিণাম হিসেবেই আমরা পেলাম 'খসড়া' ও 'একমুঠো' গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবদ্ধ, তদানীন্তন য়োরোপীয়—বিশেষভাবে ইংরেজি—কবিতার সমগোত্রীয়, আধুনিক কবিতাগুলি।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিপ্রতিভার বিবর্তনে কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়টি রবীন্দ্রানুসরণের, যখন তিনি বিষয়ে ও প্রকরণে রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এই পর্যায়টি তাঁর কবিজীবনের পক্ষে ঐতিহাসিক অর্থে মূল্যবান ; কেননা এটি তাঁর কবিজীবনের প্রস্তাবনা, তাঁর কাব্য-সাধনার ভূমিকাস্বরূপ।

দ্বিতীয় পর্যায়টি অবশ্যই রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির, তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' ও 'একমুঠো'র পর্যায়, এই পর্যায়টি তাঁর কবিজীবনের আত্মোন্মোচনের ! এই পর্যায়ে তিনি প্রথম পর্যায়ের সহজ-সরল ও কিঞ্চিৎ তরল রোম্যান্টিকতাকে পরিহার

ক'রে প্রধানত চাক্ষুষ দৃষ্টির সীমার অন্তর্গত দৃশ্যাবলী ও বস্তুপুঞ্জকেই তাঁর কবিতার উপজীব্যে পরিণত করলেন ; তাঁর কবিতায় মনকে ছাপিয়ে চক্ষুই যেন প্রাধান্য পেলো, মননেন্দ্রিয়ের স্থান যেন দখল করলো দর্শনেন্দ্রিয়। ফলে, এই পর্যায়ে তাঁর জীবনদর্শন হ'য়ে উঠলো দৃষ্টির দর্শন। এই প্রাণময় গ্রহে জন্মগ্রহণ ক'রে, উৎসুক দু'টি চক্ষু মেলে আশ্চর্য যে-চিত্রমালা এই মৃন্ময়ী ধরণীতে তিনি দেখতে পেলেন, তাতেই তিনি আবিষ্কার করলেন মানবঅস্তিত্বের মৌল রহস্য। 'খসড়া' ও 'একমুঠো'র অধিকাংশ কবিতাই এই অভিনব দর্শন-প্রসূত। পাঠক-পাঠিকাদের মনের পটে নিজেদের অতি-পরিচিত প্রাত্যাহিক জীবনের সুখ-দুঃখের আলো-ছায়ার বর্ণসম্পাতে অনুরঞ্জিত বিচিত্র ছবিকে স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলাতেই এই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। এই পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টি বহু ক্ষেত্রেই স্বদেশের সীমা অতিক্রম ক'রে বিদেশে এবং কোনো-কোনো কবিতায় সর্বদেশে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে—এমনকি পৃথিবীর পরিধি অতিক্রম ক'রে গ্রহান্তরে (মঙ্গলগ্রহে)-ও তা প্রসারিত হয়েছে। তাঁর এই দৃষ্টিপ্রসারণের একটি চমৎকার উদাহরণ 'একমুঠো'র অন্তর্গত নূতন স্বাদের এই কবিতাংশটি ঃ 'আছি এখন মার্স-এ। দেউলে লাল বাতি জ্বালা। / মৃত্যুর্ধাবর্তি পঞ্চম ঃ। / দূরে শনির সোনার থালা : / নির্বাণপথের শূন্য। / এখানে কই / রেফ্রিজরেটরের দই।' আধুনিক জীবনের চিন্তন-মননের সাক্ষ্যবহ রীতিমতো 'আধুনিক' কবিতা। এই আধুনিকতা তাঁর এই পর্যায়ের কবিতায় বিশেষভাবে প্রকাশিত। কিন্তু 'খসড়া' ও 'একমুঠো'য় বর্ণনামুখর ও দৃশ্যপ্রধান কবিতার প্রাধান্যের জন্য যদি কেউ মনে করেন যে এই পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণই বহির্মুখী, তাহ'লে তিনি ভুল করবেন ; কেননা তাঁর দৃষ্টির দর্শনে দর্শনে-ন্দ্রিয়ের ভূমিকাই মুখ্য হ'লেও মননেন্দ্রিয়ের স্থানও একেবারে গৌণ নয়। অর্থাৎ তাঁর দেখাটা কেবল চোখের দেখাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, একই সঙ্গে তা মনের দৃষ্টি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের কবিতাবলীতে আমরা এগুলির রচয়িতার শুধু একজোড়া উজ্জ্বল চক্ষুকেই আবিষ্কার করিনা, তাঁর একটি উৎসুক মনের অস্তিত্বকেও সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করি। এই কবিতাগুলিতে স্বদেশী-বিদেশী বিচিত্র আবহের মাত্র বহিরঙ্গ রূপই তিনি বর্ণন করেন নি, অন্তরঙ্গ স্বরূপও সেই সঙ্গে উন্মোচন করেছেন। প্রাসঙ্গিক মাত্র একটি দৃষ্টান্তই তুলে ধরছি তাঁর 'খসড়া' গ্রন্থের 'অতি আধুনিক' একটি কবিতা থেকে, যে-কবিতায় তাঁর মতে 'সমস্ত প্রসঙ্গ / রূপের অঙ্গ, / ছন্দে হচ্ছে ঢালাই। / চিন্ময় দেয়াশালাই।' লক্ষ্য করবার বিষয়, যে-কবি বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রসঙ্গকেই চোখের দেখায় রূপের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে-কবিই মনের আলোয় প্রত্যক্ষ করেছেন যে রূপের অঙ্গস্বরূপ সমস্ত প্রসঙ্গই চক্ষুদৃষ্টি-নিরপেক্ষ, বোধিসঞ্জাত ও উপলব্ধিগ্রাহ্য এক বিশ্বজনীন ছন্দে প্রতিনিয়তই ঢালাই হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে এটাও বিশেষভাবেই লক্ষ্যণীয় যে বিশ্বজনীন ঢালাই প্রক্রিয়ায় অগ্নি-প্রজ্জ্বলনে ব্যবহৃত যে দেয়াশালাই, সেটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছেন 'চিন্ময়' শব্দটি। অর্থাৎ, এই মৃন্ময় সংসারের সমস্ত দৃশ্য ও ঘটনার অন্তরালেই তিনি অনুভব

করেছেন সর্বব্যাপী এক চিন্ময় সত্তার উপস্থিতি, স্পর্শ। মৃন্ময় সংসারের পরিচিত দৃশ্যপুঞ্জের আড়ালে চিন্ময় সত্তার অদৃশ্য উপস্থিতির উপলব্ধির ঠিক এই ধরনের আরো একটি উদাহরণ 'খসড়া'রই অন্তর্গত 'নাগরদোলা' কবিতার প্রারম্ভিক দু'টি পংক্তি থেকেই তুলে ধরা যেতে পারে। সেই পংক্তি দু'টিতে তিনি বলছেন, 'চারপয়সার নাগরদোলা কে দুলবি আয়, / ঘোরায় মেলার কর্তা, ভুবনডাঙ্গায়।' বাহ্যত এটি আমাদের বহুপরিচিত গ্রাম্য মেলারই একটি প্রাণচঞ্চল ছবি, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এই 'মেলার কর্তা' আসলে সংসাররূপ মেলারই কর্তা, অর্থাৎ, বিশ্ববিধানের অদৃশ্য নিয়ন্তা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিখ্যাত 'হাট' কবিতার সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর এই 'নাগরদোলা' কবিতাটির, আঙ্গিকগত প্রচুর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, ভাবের সাদৃশ্য একালীন বাংলা কবিতার অভিনিবিষ্ট পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি এড়াবার নয়, কেননা দু'টি কবিতাই সমদর্শনসঞ্জাত। যতীন্দ্রনাথের চোখে এই মর্ত্যসংসার একটি বিশাল হাট, আর অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে তা একটি বিচিত্র মেলা। দৃষ্টিভঙ্গির এই সাদৃশ্যেই কবিতা দু'টি সম্বন্ধযুক্ত।

ওপরে, এতক্ষণ ধ'রে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিচরিত্রের যে-বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হ'লো, সে বৈশিষ্ট্যকে অন্য নামের বদলে আমি মর্ত্যাশ্রিত ঐশীরাগ ব'লে অভিহিত করতে চাই। তাঁর কবিস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যই আধুনিক কবিতার কোনো-কোনো সমালোচকের চোখে তাঁকে একজন মরমিয়াবাদী কবি হিসেবে প্রতিভাত করিয়েছে। আবার কেউবা তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনার উত্তরাধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে, তাঁর কবিদৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনা থেকে পার্থক্য-মণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনই বিশুদ্ধ মরমিয়াবাদ থেকেও তা স্বাতন্ত্র্য-স্পন্দিত। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনা মূলত একজন ধর্মনিরপেক্ষ অধ্যাত্মবাদীর (secular spiritualist) ইন্দ্রিয়াতীত ও বোধিগ্রাহ্য উপলব্ধিপ্রসূত চেতনা ; কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর জীবনদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়বেদ্য অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি উভয়ই সমস্বীকৃত। আর, বিশুদ্ধ মরমিয়াবাদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানটায় যে বিশুদ্ধ মরমিয়াবাদীর কাছে বস্তুজগৎ প্রায় অস্বীকৃত এবং একমাত্র সত্য ভাবজগৎ ; কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে বস্তুজগৎ এবং ভাবজগৎ দুই-ই সমান তাৎপর্যপূর্ণ। সেজন্যই আমার মনে হয়, অমিয় চক্রবর্তীর যে-জীবনদৃষ্টিভঙ্গি, তাকে আমাদের বলা উচিত বিজ্ঞানমনস্কের মরমিয়াবাদ কিংবা নব্য মরমিয়াবাদ (neo-mysticism)। কেননা তথাকথিত বিশুদ্ধ মরমিয়াবাদে সন্তুষ্ট না-থেকে বা নিজেকে সীমাবদ্ধ না-রেখে তিনি সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনাকেও আপন চৈতন্যে সাঙ্গীকৃত ক'রে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তিনি মরমিয়াবাদের ভাবজগতে কান পেতে থেকেও প্রতিদিনের বস্তুজগৎ থেকে চোখ ঘুরিয়ে নেননি, রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনার ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধিকে স্বীকার ক'রেও প্রাত্যহিক জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর কবিমনটি যেন শেলী-

বর্ণিত সেই স্কাইলার্কের মতো—একইসঙ্গে গগণচারী হ'য়েও বস্তুজগতে দৃষ্টিনিবদ্ধ। এখানেই তাঁর নিজস্বতা।

এই মরমিয়াবাদ, যাকে বলা হ'লো নব্য কিংবা বৈজ্ঞানিক মরমিয়াবাদ, তা কিন্তু আসলে আধুনিক জীবনদৃষ্টিভঙ্গির বা জীবনদৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতারই স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি। প্রাণস্পন্দিত এই গ্রন্থে মানবজীবন এবং নিসর্গ-প্রসৃষ্টিকে ঘিরে তাঁর এই বিশেষ দর্শন গ'ড়ে ওঠার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে একজন যথার্থ আধুনিকসুলভ তাঁর মনের সর্বগ্রচারিতা, অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও ভূয়োদর্শিতা, অন্যদিকে তেমনই আছে আধুনিক মানসিকতার অন্যতম প্রধান প্রমাণ অনাদ্যন্ত সময়প্রবাহ (continuity of time) সম্পর্কে সবিশেষ সচেতনতা। এ-দু'টি কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃতীয়টি—নূতন যুগের বিজ্ঞান-চেতনা। বলা বাহুল্য, এ-তিনটিই ব্যাপক অর্থে আধুনিক যুগের কবি ও কবিতামাত্রেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফলে, একজন আধুনিক কবির মতো অমিয় চক্রবর্তীকেও তাঁর কবিতায় চেতন ও অবচেতন মিলিয়ে মানুষের গহন অন্তর্লোকের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে হয়েছে, মনঃসমীক্ষণের অন্ত-র্চেতনাপ্রবাহী ইঙ্গিতগূঢ় ভাষা ও বাক্‌রীতিকে তাঁর কাব্যের এলাকাভুক্ত করতে হয়েছে. নবযুগের বিজ্ঞান-ভাবনাকে তাঁর কবিতায় বাণীমূর্ত করতে হয়েছে। অর্থাৎ, এককথায়, নূতন যুগের কবি ও কবিতার আদর্শকে তিনি তাঁর কবিতায় স্বীকার ও শিরোধার্য ক'রে নিয়েছেন। নব্যযুগের বিজ্ঞানচেতনা তাঁর কবিতায় কীভাবে বাণীরূপ লাভ করেছে, তারই একটি দৃষ্টান্ত 'একমুঠো'র 'প্রাগতিক' কবিতাটি, যেটির একটি সোনাজ্বলা পংক্তি ঃ 'দেশী ধ্যানে সায়ান্স লেগেছে।' এবং আরো কয়েকটি কবিতার সঙ্গে 'খসড়া'র ইতিপূর্বে উল্লেখিত 'নাগরদোলা' কবিতাটিও—যে কবিতাটিতে 'ন্যূটনী আপেল', 'তারা উল্কা চাঁদ সূর্য্যি' কিংবা 'ছেবগা' গ্রন্থের উল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষভাবে বিজ্ঞানভাবিত এই পংক্তিদ্বয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঃ 'ছেবগা-সুন্ধ জ্যোতির্গুচ্ছ আরো ঘোরে কার / কাল-শূন্য আইনস্টাইনী শূন্যে একাকার।' অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার সাক্ষ্যস্বরূপ 'খসড়া' থেকে যে-কবিতারটির পংক্তি-পঞ্চক এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে, সে-কবিতাটিও ইতিপূর্বে উল্লেখিত। সেই 'অতি আধুনিক' কবিতায় তাঁর বক্তব্য ঃ 'উলটিয়ে দেখো/মন, যা সব শেষের / সর্বদেশের, / তাতেই উহ্য ইতিহাস,/ জড়ের, জীবের প্রয়াস।' আর, অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও ভূয়োদর্শিতার, কবিমনের সর্বগ্রচারিতার স্বাক্ষর রয়েছে 'একমুঠো' গ্রন্থের 'চেতনা স্যাকরা' কবিতাটির জটিল ও সার্থক অঙ্গবিন্যাসে। কবিতাটিতে কবি নিজেই 'চেতন স্যাকরা' এবং 'চেতন স্যাকরা'র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি জানাচ্ছেন ঃ 'গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,/সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে / ধ্যান বানাই।' আবার কবিতাটির একেবারে শুরুতেই চেতন স্যাকরা বলছে, 'সোনা বানাই।' অর্থাৎ, চেতন স্যাকরা শুধু সোনাই বানায় না, সোনা বানানোর সঙ্গে-সঙ্গে সে ধ্যানও বানায়। কবিও ধ্যান বানান এবং এই ধ্যান বানাবার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতেই চেতন স্যাকরার অভিজ্ঞতায়

কবির অনুপ্রবেশ, এই ধ্যান বানানোর সূত্রেই কবির সঙ্গে চেতন স্যাকরার আত্মিক অভিন্নতা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ধ্যান-নির্মাণের বীজমন্ত্রভিত্তিক এই আশ্চর্য আধুনিক কবিতাটি পাঠ ক'রে একদা রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁকে জানিয়েছিলেন, 'তোমার এই লেখাটি আধুনিক কাব্যের একটি সেরা নিদর্শনরূপে দেখা দিয়েছে।'

'খসড়া' ও 'একমুঠো' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশকালের ব্যবধান মাত্র এক বছরের। ফলে, দু'টি পৃথক গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও 'খসড়া' ও 'একমুঠো'য় চয়িত কবিতাগুলির মধ্যে ভাব ও আঙ্গিকগত সাদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। কবিতাগুলির নিবিষ্ট পাঠে পাঠক-পাঠিকার মনে এটা খুব স্পষ্ট হ'য়েই ধরা পড়ে যে এগুলির প্রতিটিই কবি-জীবনের একটা বিশেষ সময়-পর্বের এবং কবিমানসের বিবর্তনের বিশেষ একটা স্তরের রচনা। স্বদেশ-বিদেশজুড়ে কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ক্রমবিস্তৃতি, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রখররূপে সচেতন রাখা এবং সেই সঙ্গে দৃশ্যের অন্তঃস্থ স্বরূপের অনুধ্যান ও উন্মোচন, আন্তর্জাগতিক ভৌগোলিক পরিবেশের তথ্যাদি পরিবেশন এবং সর্বোপরি সুস্পষ্ট চলচ্চিত্রধর্মিতা—আধুনিক কবিতার যে-বৈশিষ্ট্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে সমালোচক লরেন্স ডারেল তাঁর বিখ্যাত 'Key to Modern Poetry' গ্রন্থে আধুনিক কবিতাকে চলচ্চিত্রের সমধর্মী ব'লে অভিহিত করেছেন—ইত্যাদি সমস্ত কিছুই এই কবিতাগুলির ভাবলোকে বিরাজিত, এই কবিতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ; এবং এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই কবি এক অত্যন্ত নূতন ধরনের গদ্যছন্দের অবয়বে মূর্ত করে তুলেছেন। 'খসড়া'র 'মর্মান্তিক', 'হাসপাতাল', 'বহুকালের ঘড়ি', 'ঘর', 'সমুদ্র' অথবা 'মেঘদূত' এবং 'একমুঠো'র 'আরোগ্য', 'সেই পথ', 'ঘুম', 'সঙ্গৎ', 'সংসার', 'যুদ্ধের খবর' কিংবা সেই বিখ্যাত 'চেতন স্যাকরা'—ইত্যাদি আপাত-বিসদৃশ কবিতাগুলির মর্মলোকে মৌলিক যে-সাদৃশ্য বিদ্যমান, এগুলির পৌনঃপুনিক পাঠে তা যেমন আমাদের অজ্ঞাত থাকে না, তেমনই এ-সত্যটাও আমাদের কাছে ধরা পড়ে যে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের রচনাগুলিতে তিনি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতা ও অভিনবত্বের যে-পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের রচনাগুলি মূলত সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষারই পরবর্তী স্তর, পরিণততর রূপ।

তবু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করবো 'একমুঠো'র তেমন অনন্ত দু'টি কবিতার কথা, যে-কবিতা দু'টিতে অমিয় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। এই কবিতা দু'টির প্রথমটির নাম 'সংসার', যে-কবিতাটির 'বিষণ্ন পুকুর-জলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের ফালি ;'—এই আশ্চর্য পংক্তিটির প্রথম পাঠেই আমি বিষণ্ন হ'তে-হ'তে নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিলাম, আবিষ্ট হ'য়ে পড়েছিলাম। প্রথম পাঠের সেই দিনটি থেকেই এই পংক্তিটি আমার স্মৃতিতে চিরজাগরূক হ'য়ে আছে। দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'বৃষ্টি', যে-কবিতাটি, আরো অনেকের মতো, আমারও বিবেচনায়, নিঃসন্দেহে অমিয় চক্রবর্তীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বাংলা কবিতারও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। কবিতাটির আবেদন এতই আদিমতামণ্ডিত যে

সেদিকে আড়চোখে তাকানো ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই। আপাতসরল অথচ গূঢ়ার্থগভীর এই কবিতাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই টমাস স্টার্নস্ এলিয়টের সেই বিখ্যাত উক্তি আমাদের মনে পড়ে, যে-উক্তি বাংলা তর্জমায় অনেকটা এ-রকম দাঁড়ায় ঃ আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি অনুভূতি আছে, যেগুলি সদর্থে এতই আদিম, যে সেগুলির দিকে আড়নয়নে তাকানো ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। শুধু যে কবিতাটির আলোচনা-প্রসঙ্গেই এলিয়ট সাহেবের এই উক্তিটি আমাদের মনে পড়ে তা-ই নয়, কবিতাটির নিবিষ্ট পাঠেও তাঁর অতিবিখ্যাত সমগ্র 'দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ড' কবিতাটির কথা সাধারণভাবে এবং 'হোয়াট দ্য থাণ্ডার সেইড' নামক পঞ্চমাংশের কথা, যেখানে পাথর ও জলের বিরুদ্ধ অথবা অসমধর্মিতার বর্ণনায় একটি মৌলিক রূপকল্প রচিত হয়েছে, বিশেষভাবে আমাদের স্মৃতিতে জাগে। 'হোয়াট দ্য থাণ্ডার সেইড'-এ একবিন্দু জল নেই, শুধু আছে শুষ্ক, রুক্ষ, অবিরল পাথরের স্তূপ—কবির ভাষায়— 'no water, but only rock', 'rock and no water', 'mountains of rock without water'। এই আশ্চর্য রূপকবর্ণনায় কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে জাদুমন্ত্রকল্প শব্দের যে-সম্মোহনজাল বিস্তৃত হয়েছে, বাক্‌ভঙ্গিমা যেমন গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী হ'য়ে উঠেছে, অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি'র (যে-কবিতাটির প্রারম্ভিক পংক্তি 'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥') '·· রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে, / মরুময় দীর্ঘ তিয়াসার মাঠে' অংশের একই 'মাঠে' শব্দের পুনঃ-পুনঃ উচ্চারণের মধ্যে তারই প্রতিরূপ (prototype) আমরা খুঁজে পাই, 'দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ডে' অনুসৃত এলিয়টের কাব্যরীতির সুস্পষ্ট প্রতিফলনকেই আমরা যেন আবিষ্কার করি। অবশ্য এ-কথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে তিরিশের দশকের অধিকাংশ বাঙালী কবির চিন্তাধারা ও কাব্যরীতিই এলিয়টের প্রভাবে কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলো ; অমিয় চক্রবর্তীও পারেন নি সেই প্রভাব থেকে তাঁর কবিতাকে পুরোপুরি মুক্ত রাখতে। আলোচ্য কবিতাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অমিয় চক্রবর্তীর এই কবিতাটির সঙ্গে 'দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ড' ছাড়া অন্য একটি কবিতারও ভাবসাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট ; সেই কবিতাটি হচ্ছে এডোয়ার্ড টমাস-এর অপেক্ষাকৃত অপ্রচারিত 'রেইন'। উভয় কবিতাতেই প্রকৃতির মাটি এবং মানুষের মন বৃষ্টির ধারাসম্পাতে প্রায় সমভাবেই সিক্ত হয়েছে, সরস হয়েছে—যদিও পরিণামের বিচারে কবিতা দু'টি কিঞ্চিৎ পার্থক্যমণ্ডিত। সে যা-ই হোক, অমিয় চক্রবর্তীর এই কবিতাটি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথাটা হচ্ছে এই যে এটি আমাদের চক্ষু ও মস্তিষ্কের সীমা অতিক্রম ক'রে একেবারে হৃদয়ের দুয়ারে গিয়ে সরাসরি আঘাত করে, আমাদের অস্তিত্বের শিকড় ধ'রে প্রবলভাবে টান দেয় ; আমরা কবিতাটির দ্বারা গ্রস্ত হই। এই গ্রস্তকরণক্ষমতাই যে-কোনো কবিতার সার্থকতা পরিমাপের অন্যতম প্রধান মানদণ্ড।

কবিতাটির পটভূমিকায় রয়েছে চিরন্তন বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চল। 'রুক্ষ মাঠে', 'দিগন্তপিয়াসী মাঠে', 'বনতলে' এবং 'ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের

কাঁচা বাঁটে', 'বাগানের নিবিড় পল্লবে', 'স্তম্ভিত দিঘির জলে'—ইত্যাদির উল্লেখে কবিতাটির এই গ্রাম্য পটভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত যথেষ্ট স্পষ্ট। সমগ্র প্রথম পংক্তিটি এবং পঞ্চম পংক্তির শেষ অংশটুকু বাদ দিলে, এই গ্রামীণ আবহেই কবিতাটির আরম্ভ, বিস্তার এবং সমাপ্তি। আপাতলক্ষ্যে কবিতাটি পল্লীবঙ্গের গ্রীষ্মান্তিক একটি দিনের মাধ্যাহ্নিক ধারাবর্ষণের নিপুণ বর্ণনা। এতদিন দিগন্ত বিস্তৃত যে-প্রান্তর মরুভূমির তৃষ্ণা বুকে নিয়ে বিশুষ্ক দিন যাপন করছিলো, সে-প্রান্তরে বৃষ্টি নামে; বৃষ্টির ধারা পোঁছে যায় মাটির গভীরে, গূঢ় প্রাণের শিরায়-শিরায়। 'ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি'তে, 'গ্রামের বুকের কাঁচা বাঁটে' মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে, বৃষ্টি ঝরে অবিরল ধারায়। কিন্তু পল্লীবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সুনিপুণ বর্ণনাতে কবিতাটির সমাপ্তি ঘটলেও এটি পাঠের মানসিক অভিঘাত (mental impact) অবসিত হয় না। বহুক্ষণ ধ'রে পাঠক-পাঠিকার মনে এটির সুর অনুরণিত হ'তে থাকে।

এর অবশ্য কারণ আছে এবং তা কবিতাটিতেই নিহিত। কবিতাটির আপাতরূপকে অতিক্রম ক'রে অন্য একটি রূপও এটিতে কবি আভাসিত ক'রে তুলেছেন এবং সেই দ্বিতীয় রূপটিই কবিতাটির প্রকৃত স্বরূপ। কবিতাটির ব্যঞ্জনাপরিধিকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে মানুষের মনোজগৎকেও তিনি এটির সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে তুলেছেন। এবং এই সম্পর্কায়ণ প্রক্রিয়ায় কবিতাটির চাক্ষুষ প্রাকৃতিক পটভূমিকার (visual natural background) অন্তরালে দ্বিতীয় একটি পটভূমি তিনি গ'ড়ে তুলেছেন। সেই পটভূমি অবশ্যই প্রাকৃতিক নয় এবং নিশ্চিতরূপেই তা মানসিক। কবিতাটিতে প্রাকৃতিক পটভূমি থেকে মানসিক পটভূমিতে কবিচিত্তের প্রস্থানবার্তা আছে, আছে প্রকৃতির পটভূমি থেকে যাত্রা শুরু ক'রে যাত্রার অন্তে মনের পটভূমিতে উপনীত হওয়ার কথা। প্রথম পটভূমিকায় 'মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে' যে-বৃষ্টির পতন, দ্বিতীয় পটভূমিকায় সেই বৃষ্টিকেই তিনি 'মনের মাটিতে' পর্যন্ত পাতিত করিয়েছেন— 'বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥' কিন্তু এটা মাত্র পটভূমিকারই নবরূপায়ণ নয়, এটা কবির অভিজ্ঞতারও সম্প্রসারণ; কেননা এরই ফলে এবং এই পথেই পল্লীবঙ্গের সাধারণ একটি দিনের বৃষ্টিপাতের মতো সাধারণ একটি ঘটনার তাৎক্ষণিক অভিঘাত (immediate impact) কবিচিত্তে সঞ্চারিত হ'য়ে শাশ্বতকালকে স্পর্শ করেছে। চোখের দেখাকে এভাবেই তিনি মনের দেখায় রূপান্তরিত করেছেন, করতে পেরেছেন।

কবিতাটিতে একটি মাঙ্গলিক দিক্ আছে, আছে কবিমানসের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরিচয়। বৃষ্টির অকৃপণ ধারাপাতে নিসর্গপ্রকৃতিতে যেমন আনন্দবার্তা ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে, নবজীবনের উদ্বেলতা প্রকাশিত হয়, বিশ্বসৃষ্টির মঙ্গলময়তায় আস্থাশীল কবির অন্তরের অভিলাষ, আধুনিক পৃথিবীর মানুষের মরু-অভিশপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও অনন্বিত (alienated) জীবনেও তেমনই নব আনন্দের, নব সৃজনের, নব অন্বয়ের বৃষ্টিধারা অবিরলভাবে বর্ষিত হোক। কবিতাটিতে কবি এই মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কেননা তাঁর ধারণা জন্মেছে, সভ্যতার এখন (কবিতাটির রচনাকালে) সমূহ সঙ্কট—মানুষের মনের ভূমি

রুক্ষ ও অনুর্বর, মরুতৃষ্ণাপূর্ণ : মানবসভ্যতা এখন 'অন্ধকার মধ্যদিনে' উপনীত। বলাই বাহুল্য, কবির এবম্বিধ ধারণা, কবিতাটির রচনাকালীন ভয়ঙ্কর পৃথিবী-পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

কবিতাটির সাফল্যের প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্যই এর বিষয়বস্তু, অর্থাৎ বর্ষা, যা কিনা অন্যান্য বহু বাঙালী কবির মতো অমিয় চক্রবর্তীরও প্রিয় ঋতু। এই ঋতুটির প্রতি, একজন কবি হিসেবে, তাঁর অনুরাগ অন্তহীন। ফলে, স্বভাবতই, বর্ষাবিষয়ক একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতা তিনি রচনা করেছেন, যেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'খসড়া'র অন্তর্গত অভিনব ভঙ্গিমার 'মেঘদূত', কবিতাটি এবং 'পারাপার'-গ্রন্থভুক্ত 'বৃষ্টি'-শীর্ষক অন্য একটি কবিতা, যেটির প্রথম ও শেষ পংক্তি দু'টি যথাক্রমে 'কেঁদেও পাবেনা তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে' এবং 'কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।'

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিপ্রতিভার বিবর্তনধারার তৃতীয় পর্যায়ে বিশেষ যে-দর্শনকে অবলম্বন করেছেন, তাকে বলা যেতে পারে ধ্যানীর দর্শন বা ধ্যানবাদ। এই পর্যায়ে রচিত তাঁর কবিতাবলীর নিবিষ্ট পাঠে পাঠক-পাঠিকাদের মনে এমন ধারণাই জন্মে যে দৃষ্টিবাদ বা দৃষ্টির দর্শনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি যেন ক্রমশই সচেতন হ'য়ে উঠছেন ; তিনি যেন ক্রমেই এ-সত্য উপলব্ধি করতে পারছেন যে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু-নিচয়ই বিশ্ব-সংসারের শেষ সত্য নয়, দৃষ্টিবেদ্য বস্তুপুঞ্জের অন্তরালে অন্য এক সত্তাও সর্বভূতে বিরাজমান। সেই সত্তার অস্তিত্বের অনুভূতি বোধিগ্রাহ্য, ধ্যানসাপেক্ষ। নিছক পার্থিব বস্তুচেতনা মানবঅস্তিত্বের ও বিশ্বব্যাপারের সকল রহস্যের উন্মোচনে যে অপারগ, প্রাত্যহিক বস্তুজীবনের (material life) শত দ্বন্দ্ব ও সহস্র বৈপরীত্যের অন্তরালবর্তী সুগভীর ঐক্য ও সামঞ্জস্য, সকল বিসংগতির সংগতি, সমস্ত বিরোধের অবসান যে নিহিত রয়েছে ধ্যানের গভীরে—এই নিগূঢ় সত্যের অনুভূতি এই পর্যায়ে তাঁর কবিচেতনার মর্মমূলে ধীরে-ধীরে বাসা বেঁধেছে, তাঁর কবিতায় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এই পর্যায়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থে মোট তিনটি ঃ 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' এবং 'দূরযানী'। তন্মধ্যে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মাটির দেয়ালে'র প্রকাশ সম্পর্কে একটু ইতিহাস আছে। বাংলা কাব্যের অনুসন্ধিৎসুরা জানেন যে বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে এককালে 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক পয়সায় একটি' নামে একটি কবিতাপুস্তিকা সিরিজ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'মাটির দেয়াল' সেই সিরিজের দ্বিতীয় সংখ্যারূপে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। এই কাব্যগ্রন্থের নাম-করণটি লক্ষ্য করবার মতো—'মাটির দেয়াল' ; অর্থাৎ কবি তাঁর কাব্যসৌধের দেয়াল যা দিয়ে গ'ড়ে তুলতে চান, তা অন্য কিছু নয়—মাটি, অন্তরঙ্গ মৃত্তিকা। আর, এ মাটিও অন্য কোনো দেশের নয়, তাঁর কাব্যের স্বভূমি, তাঁর প্রাণের স্বদেশ, বাংলার। এই কবিতাপুস্তিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রবাসী' কবিতায় তার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে ঃ

নদী, শাখানদী, পুকুর, কচুবন, কলাবাগান, মাদার
দোঁপাটি, ছোলাক্ষেত, শর্ষে, দূরে মাটির দেয়াল
কুমড়ো লতানো চাল—
বাংলা—

ছোটো ছোটো আকাশ ভর্তি।

তাথ্যিক বর্ণনার ভারে সামান্য নুয়ে-পড়া এবং কিঞ্চিৎ ফিরিস্তিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এ-সত্যটি উপলব্ধি করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না যে অক্সফোর্ডে একটানা পাঁচ বৎসর প্রবাসীর জীবন যাপন করার পরেও আলুলায়িতরূপ বাংলাই তাঁর কাব্যের যথার্থ স্বভূমি, তাঁর প্রাণের প্রচ্ছন্ন স্বদেশ। প্রবাস-পর্বেও এই স্বদেশই যে তাঁর মর্মলোকে সদাজাগ্রত, তারই নিদর্শনস্বরূপ 'মাটির দেয়ালে'র অন্য একটি কবিতার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটি নিঃসন্দেহে এই কবিতাপুস্তিকার শ্রেষ্ঠতম রচনা। কবিতাটির নাম 'বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন'। এই কবিতায় আমরা এমন একজন মানুষের (বাঙালীর ?) সাক্ষাৎ পাই, যিনি চাকরিরূপ কারাগারে 'নির্বাসিত কেরাণী' হ'য়েও, তাঁর বড়ো বাবুর পক্ষে তাঁর কোন্-কোন্ বস্তু কেড়ে নেয়া সাধ্যাতীত, সমিল গদ্যে তাঁর তালিকা প্রস্তুত ও পেশ করেছেন ঃ

যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠ্‌লে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি,
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।

কবিতাটি নিছক গদ্যছন্দে রচিত, কিন্তু এটির ক্রমান্বিত পংক্তিমালার চমৎকার অন্ত্যানুপ্রাসে বিশুদ্ধ গদ্যের ভাষাতেও পেলব পদ্যের আমেজ সৃষ্ট হয়েছে। এই কবিতাটির এবং এই কবিতাপুস্তিকাটির আরো কয়েকটির—যেমন নিখুঁত ছন্দের কবিতা 'উৎকল', বিদ্রূপাভাসের কবিতা 'উদ্ভট', প্রথম কবিতা 'হারাপ্পা', দ্বিতীয় কবিতা 'কচুরিপানা' এবং অন্তিত কবিতা 'নয়নিমা' ইত্যাদির ছন্দঘটিত এবং বাগ্‌ভঙ্গি-বিষয়ক নিপুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য ও রবীন্দ্রধর্মিতার কথা বিবেচনা ক'রে এ-কথা প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলা চলে যে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' ও 'একমুঠো'র কাব্যপ্রকরণগত রবীন্দ্রপরিহারপ্রবণতা পরিহার ক'রে তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মাটির দেয়ালে' প্রকরণ-পরীক্ষায় আবার ফিরে এসেছেন বাংলা কাব্যের কল্পবৃক্ষ রবীন্দ্রনাথের শীতল ছত্রচ্ছায়ায়। এই পুস্তিকার অধিকাংশ রচনাতেই সেই প্রত্যাবর্তনের পূর্বাভাস সূচীত।

'মাটির দেয়াল' সম্পর্কে আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার। তা হচ্ছে এই কাব্যগ্রন্থিকার অন্তর্গত রচনাগুলির সহজ-সারল্য। এই সারল্য আপাতিক নয়, আন্তরিক। সমকালীন ইংরেজি কাব্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও পাশ্চাত্য প্রকরণে বিশ্বাসী 'খসড়া' ও 'একমুঠো'র কবি যে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মাটির দেয়ালে' আরো 'উগ্র রকমের

আধুনিক কবিতা না-লিখে মৃন্ময়ী ধরিত্রীর প্রতি অনুরাগরঞ্জিত, মৃত্তিকাগন্ধী কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করলেন, সেই থেকেই শুরু হ'লো তাঁর কবিমানসের মৃত্তিকাভিসার. আরম্ভ হ'লো তাঁর কবিতার 'ভূমিস্পর্শ অভিযান'—যা পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় গভীরতায় মণ্ডিত হয়েছে, ব্যাপকতায় স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৪২ সালে, তাঁর কবি-জীবনের প্রথম যুগে প্রকাশিত 'মাটির দেয়ালে'র 'বিজ্ঞাপনে' তিনি আমাদিগকে জানিয়ে-ছিলেন ঃ 'এই বইটার নাম মাটির দেয়াল। / হঠাৎ মনে হয়েছিল খেয়াল / আখর আঁকতে/ ধুলোয় বসবার আগে থাকতে। / দুদণ্ড রাস্তার লোককে ডাকতে / মাটির আঁচড়-কাটা এই মাটির দেয়াল।' আর, ১৯৭৭ সালে, কবিজীবনের অন্তিম যুগে প্রকাশিত 'কবিতা সংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন ঃ 'মাটি, ধরণী, বসুন্ধরা যে নামেই হোক, ভূমিস্পর্শ অভিযানই আমার স্বপ্রকাশ, তার অন্য ভাষা নেই, ভাষা নেই। সংসারে একটি মৃন্ময়ী বাসা বেঁধেছিলাম, সে-ই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। যাবার সময় কত দূরে জানিনা, কিন্তু এই বেলা বলতে চাই ভূমিকা আমার শুধু এই। যা লিখেছি তারই মৃত্তিকায় গড়া প্রদীপ রইলো, আরো দু-সন্ধ্যা তুলসী-তলায় জ্বলুক। যদি আমার ভাগ্যে থাকে।' বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, আয়ুর অন্তিমে পৌঁছে 'কবিতা সংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর কাব্যের অন্বিষ্ট হিসেবে যে-'ভূমিস্পর্শ অভিযানে'র কথা কবি বিনীতকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, সেই 'ভূমিস্পর্শ অভিযানে'র সজীব বীজটি কিন্তু তাঁর কবিজীবনের প্রথম যুগের ক্ষীণাকৃতি কাব্যগ্রন্থিকা 'মাটির দেয়াল'কে আশ্রয় ক'রেই একদা অঙ্কুরিত হয়েছিলো।

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অভিজ্ঞান বসন্তে'র কবিতাগুলি ছ'টি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি 'প্রাথমিক', 'প্রদক্ষিণ', 'সূর্য-খণ্ডিত ছায়া', 'মন-মাধ্যাহ্নিক', 'সংসার' এবং 'দিনযাপন'।

প্রথম পর্ব 'প্রাথমিক'-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতাটির নাম 'অভিজ্ঞান', যেটি এই পর্বের অন্তিমে বিন্যস্ত। নিহিত কাব্যগুণ ছাড়াও এই কবিতাটির অন্য একটি মূল্য আছে এবং তা হচ্ছে এই যে এই কবিতাটিতেই রয়েছে 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যগ্রন্থটির এবম্বিধ নামকরণের অস্পষ্ট ইঙ্গিত। অস্পষ্টতার কুহেলীজাল ছিন্ন করলে বেশ বোঝা যায়, কবিতাটিতে কবি আদিমাতা ধরিত্রীকে লক্ষ্য ক'রেই তাঁর অন্তরের ব্যাকুল প্রশ্ন রেখেছেন, 'শ্যামলরক্তিম ঘণ্টাধ্বনি / শুনেছো কি ?' এবং এটাও স্পষ্ট হয় যে 'নিরন্ত-বসন্ত-প্রতীকী চিহ্ন'ই আসলে সেই ঘণ্টাধ্বনি। নিসর্গনিখিলের দিগ্বিদিকে বিকশিত পত্রপুঞ্জে, উদ্গত অঙ্কুরে-অঙ্কুরে সেই আশ্চর্য ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে ; জন্মের জাগরণে, মৃত্যুর মহানিদ্রায় সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত আলোড়িত ক'রে তার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হ'য়ে ওঠে। আর, তারই মায়াপ্রভাবে 'ছায়াজয়ী জাগে', 'যুদ্ধবিজয়ী জাগে'। কবির দৃষ্টিতে এই 'ছায়াজয়ী' ও 'যুদ্ধবিজয়ী' প্রাণের প্রকাশই বসন্তের অভিজ্ঞান, অর্থাৎ 'অভিজ্ঞান বসন্ত' ; কেননা, কবির বিশ্বাস, শুধু নিসর্গের রূপলোকেই বসন্তঋতু তার অভিজ্ঞান রেখে যায় না, মানুষের চিত্তলোকেও সে তার অভিজ্ঞান এঁকে যায়।

কবি 'প্রদক্ষিণ' পর্বের সর্বশেষ কবিতাটির নাম রেখেছেন 'কোথায় চলেছো পৃথিবী'। সূর্যসনাথ এই পৃথিবীর বিরতিহীন গতির কথা চিন্তা ক'রে তাকে সম্বোধন ক'রে এই কবিতায় তিনি বলেছেন 'তোমারও নেই ঘর / আছে ঘরের দিকে যাওয়া।' এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কেও একই কথা আমাদিগকে জানিয়েছেন ; 'আমারও নেই ঘর / আছে ঘরের দিকে যাওয়া।' এই উদার উচ্চারণে এই পর্বে তাঁর অনিকেত মনোভাবটি আশ্চর্যভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে. 'প্রদক্ষিণে'র তাৎপর্য চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বসুমাতার মতোই কবির জীবনেও কোনো 'ঘর নেই', কেবল 'আছে ঘরের দিকে যাওয়া।' কিন্তু শুধু এই কবিতাটিতেই নয়, 'প্রদক্ষিণ'-পর্বের প্রায় সব ক'টি কবিতাতেই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে কবিজীবনের ভ্রামণিক পর্বের। 'তালীবনবরণী ভারতবর্ষে'র অন্ত্য-উপস্থিতির সঙ্গে-সঙ্গে এই পর্বের কবিতাগুলিতে উল্লেখিত রয়েছে সুদূর দক্ষিণমেরুর ভূ-সীমান্তিক ক্রান্তিরেখা, রয়েছে পূর্বভারতীয় দীপপুঞ্জ ও চীনের উত্তরাঞ্চলে শৌখিনসুলভ ভ্রমণ এবং সেখানকার জনৈক বৃদ্ধের 'চাষ করা রৌদ্রপড়া শীত-বসন্তের কুঞ্চিত মাঠে'র মতো দুঃখ-তাপী মুখ, রয়েছে ইরাণের পাহাড়িয়া গ্রাম, রয়েছে ইন্দোস্তান-গিরিবর্তের ঊর্ধ্বাকাশে স্থির অচঞ্চল 'মানবোত্তম অভয়মুদ্রা' আর উদ্বেল চিদ্-সমুদ্রে তরঙ্গিত হাইফার ইহুদি মেয়েটির অবাক-করা 'একটি দৃষ্টিনির্ভর ক্ষণে'র করুণ স্মৃতিকণিকা। অর্থাৎ, এগুলিতে রয়েছে 'ভারত মৃৎসমুদ্রের ওঙ্কৃত দূর দূরান্তরে' প্রদক্ষিণরত পথিকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাব্যঋদ্ধ বাণী রূপায়ণ।

ষড়-পর্ব 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব 'সূর্যখণ্ডিত ছায়া', কেননা এই পর্বেরই সর্বপ্রথমে বিন্যস্ত হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর প্রবল সাড়া-জাগানো, বহু-আলোচিত 'ঝোড়ো হাওয়া আর / পোড়ো বাড়ীটার / ঐ ভাঙা দরোজাটা'র মিলন-গীতি 'সংগতি' কবিতাটি, যেটির মূলমন্ত্র জগৎ ও জীবনের সকল বৈপরীত্যের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন ও সংগতিস্থাপন। এই সংগতিপ্রয়াসই তাঁর কবিতার প্রধান প্রেরণা। অবশ্য এ-কথাও সেই সঙ্গে সমানভাবে স্মরণীয় যে কাব্যে তাঁর এই সংগতি-প্রয়াস পূর্বোল্লেখিত তাঁর 'ভূমিস্পর্শ' অভিযান'কে অব্যাহত রেখেই ; কেননা তিনি তাঁর কবিজীবনের অন্বিষ্ট 'ভূমিস্পর্শ'কে অস্বীকার ক'রে তাঁর কবিতায় কখনোই কোনো সংগতি-সংগীত রচনা করেন নি. তাকে স্বীকার ক'রেই তাঁর কবিতার মূলসুর— সংগতির সুরকে তিনি বেঁধেছেন। কিন্তু 'সংগতি' কবিতাটির মূল্য অমিয়কাব্যের মূলমন্ত্র উচ্চারণেই নিঃশেষিত নয় ; অন্তর্নিহিত বাণীসম্পদেও (message-value) কবিতাটি যথেষ্ট মূল্যবান। বর্তমান সময়পরিধির বিক্ষত ও বিধ্বস্ত প্রাত্যাহিক জীবনের সহস্র লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাকে স্বীকার ক'রে, সমস্ত ক্লেদ ও আবর্জনাকুণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে যে-কবি 'সাক্ষী' কবিতায় আশ্চর্য প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে উচ্চরণ করেছেন, 'প্রক্ষালন ধাপে ধাপে, দ্যাখো, ধুয়ে রেখেছি পাথর', সে-কবিকেই 'সাক্ষী' রচনার বহু পূর্বে আমরা এই কবিতায় আবিষ্কর করি, যেখানে তিনি রাত্রি অবসানের আশ্চর্য লগ্নে প্রভাতী পথিকের মতোই ছন্দ-সুরের তাল-মূর্চ্ছনায় গেয়ে উঠেছেন,

'তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে / যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে / মেলাবেন।' বর্তমান করাল কালের নিয়তিলাঞ্ছিত আধুনিক জীবনযাত্রার সর্বতোব্যাপ্ত অবিশ্বাসের অন্ধকারে নেমে তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছেন ধ্রুব বিশ্বাসের স্থির শিখাটি, মৃত্যুর ভয়াল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা ক'রে গেয়ে উঠেছেন জীবনের আনন্দ-সংগীত। বাস্তবিক, ছত্রে-ছত্রে অনুস্যূত অতি গভীর এক আস্তিক্যবোধের অমৃতবাণীই এই কবিতাটির পরম সম্পদ।

'সূর্যখণ্ডিত ছায়া'-পর্বের আরেকটি উৎকৃষ্ট কবিতার নাম 'তিন প্রশ্ন', যেটিতে কবি মানবতার তিন পূজারী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী এবং দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা ও অনুভূতির কথা আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমেই রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। কবি কল্পনানেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ন্যুইয়র্ক মহানগরীর ষাটতলা অট্টালিকার পাশে দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন, কে বেশি উঁচু—চিন্ময় রবীন্দ্রনাথ, না মৃণ্ময় এই অট্টালিকা? আবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে তিনি বলেছেন, 'উচ্চতা/ চূর্ণ-চূর্ণ হ'লো দৈত্যরাজ্যে, কোটি জ্বলন্ত ডলার-অর্কের / আলো-নেভা কালো ছাইয়ে জমলো তুচ্ছতা। / গান জেগে রইলো মহাকালের মায়ায়। '—চৈতন্যের শুভ্র স্তম্ভ কবির উদ্ভাবনায়।' আর, রবীন্দ্রনাথ যদি বিশ্বকবি, তাহ'লে গান্ধীজি তাঁর দৃষ্টিতে ভারত-কৃষক, কেননা গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর উক্তি ঃ 'আর গান্ধীজির কাঁধে দেখো, কোটি কৃষকের লাঙলের চাপ, / চাষ করছেন ভারতের শুকনো মাটি বৃষ্টি-রোদে।' এবং এণ্ড্রুজ, তাঁর ধারণায় 'সর্বদেশী'; এণ্ড্রুজ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ঃ 'বর্মিত হৃদয়ীর দেশী তিনি সর্বদেশী / ভাবনায় নিয়ত কল্যাণ-রেখা, / হাতে অজিতের শক্তি।'

পরবর্তী পর্ব 'মন-মাধ্যাহ্নিকে' কবির মৃত্তিকাভিসারী মন মানবচৈতন্যের নূতন এক দিগন্তের সিংহদ্বারে উপনীত, মানব-অস্তিত্বের স্তরপরম্পরা, বিশেষত মনোময় স্তরের যথার্থ স্বরূপ, তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। তারই চমৎকার উদাহরণ এই পর্বের 'ঘুম' কবিতাটি। এই কবিতায় তাঁর বিশ্বাস ঃ 'ঘুম মনোময় / তার নীচে বয় মনোময় প্রাণ।' আশ্চর্য আশ্বাসের কবিতা এই পর্বের 'আশ্বাস', যেটিতে তাঁর প্রগাঢ় আত্ম-প্রত্যয়—'মৃত্যুর পূর্বরজনীতে এই কথা লিখে রাখি—'আমার মৃত্যু নেই।/ যাদের ভালোবাসি তাদের রক্তের রাখী / আমায় বাঁধলো ঃ শোকের কৃত্য নেই।…'

পরের পর্ব 'সংসার'। এই পর্বে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে একাধিক উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতাও সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'চিঠি', যেটি অমিয় চক্রবর্তীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। এই স্নিগ্ধ প্রণয়কবিতাটিতে এমন একটি প্রাণ-স্পর্শী সুর বেজে উঠেছে, এমনই একটি মাধুর্যের স্বাদ জড়িয়ে রয়েছে, যা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। শারীরিক বিচ্ছেদকে পরাজিত ক'রে মানসিক মিলনই কবিতাটিতে জয়যুক্ত হয়েছে, কেননা কবিতাটির অন্তিমে 'উড়ো চিঠির সন্ধ্যায়—/ সকালে অকূল সমুদ্রে কে কোথায়॥' পংক্তিতে ব্যঞ্জিত নায়ক-নায়িকার আপাত-বিচ্ছেদের

দুঃখকে অতিক্রম ক'রে চিরমিলনের আনন্দই আশ্বাসিত হ'য়ে উঠেছে 'শূন্য নেই ঘর। মাটির পাত্রে সেই সাদা সবুজ পদ্ম, তার কেন্দ্রে জানি / যে শুভশ্রী শুকোবে তার সত্যে আমরা আছি, তারি সুরভি বাণী।' পংক্তিটিতে।

'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ পর্ব 'দিনযাপন' সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে মাত্র এইটুকুই জানাবার যে এই পর্বে বিন্যস্ত কবিতাগুলি মূলত 'সংসার'-পর্বের কবিতা কতিপয়েরই সমগোত্রীয়—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, এই উভয়বিধ বিবেচনাতেই। অতএব এই পর্বের কবিতাগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণে আপাতত বিরত থাকছি।

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'দূরযানী' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। কাব্যগ্রন্থটির এবম্বিধ নামকরণের একটা ব্যাখ্যা রয়েছে 'রাত্রি প্রান্তরিক' কবিতায়, যে-কবিতাটিতে কবির 'শুয়ে মনে হয় পা দু'টো মিশেছে / কোন্ দূরে গিয়ে দিগন্তের—/ হাত চলে গেছে নদী পর্বতে—/ হাল্কা বোধের পৃথিবী প্রসার নিশ্বাস এই হাওয়া / মাটির কেন্দ্রে একই ধুক্-ধুক্ বুকে। আস্তে কখন দেহতান বাজে সমগ্র গ্রহ-চেতনার,... ।' অর্থাৎ, 'দূরযানী'র কবিতাগুলি রচনা করতে গিয়ে কবির মনে 'হাল্কা বোধের পৃথিবী প্রসার', কবির দেহে 'দেহতান বাজে সমগ্র গ্রহ-চেতনার'। কিন্তু এই গ্রন্থে কলিত কবিতা-বলীতে প্রতিভাত কবিমানস শুধু দূরযানীই নয়, তা একই সঙ্গে নিকটাভিসারীও বটে : কেননা এটির কোনো-কোনো কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের 'উদয়ন' এবং 'আরণ্যক', উল্লেখিত হয়েছে 'কলকাতা', উল্লেখিত হয়েছে 'শঙ্কর অমৃতের মন্দির'—যদিও, তা সত্ত্বেও, স্বীকার্য যে নিকটচারিতা নয়, দূরচারিতাই 'দূরযানী' কাব্যগ্রন্থের মূলসুর ; আর, সেই কারণেই এটির এই নামকরণ।

'দূরযানী'তে নানা আকারের আটাশটি কবিতা চয়িত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে একাধিক উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা এবং সেই উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেও সর্বোচ্চ স্থান 'বিয়াত্রিচে' কবিতাটির। নিবিষ্ট পাঠে এই কবিতাটি আমাদের মনে এই ধারণারই সৃষ্টি করে যে প্রেমচেতনায় 'দূরযানী'র কবি অমিয় চক্রবর্তী 'ডিভাইন কমেডি'র মহাকবি অলিঘিয়েরি দান্তের আত্মিক প্রেমভাবনায় উদ্দীপিত, তাঁর দেহ-নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক প্রেমসাধনায় উজ্জীবিত। আলোচ্য কবিতায়, কবির বিশ্বাস, বিয়াত্রিচে ধন্যা, বিয়াত্রিচে ঋদ্ধা ; কেননা দিব্য প্রেমের নিভৃত সাধনায় বিয়াত্রিচে সিদ্ধা। দান্তে-বিয়াত্রিচের সর্বদেশিক ও সর্বকালীক আশ্চর্য প্রেমের প্রসঙ্গে কবি তাই বলেছেন, 'কী এক অজানা শক্তি বহে অজানিতে, / শুভদৃষ্টি বিনিময় হয় অমরার। / তারপর শুরু হয় সে আশ্চর্য অন্তরের চলা / সে কি কেউ জানে।' কবির ধারণা, 'আশ্চর্য অন্তরের চলা'ই দান্তে-বিয়াত্রিচের প্রেমের মূলমন্ত্র এবং এই 'আশ্চর্য অন্তরের চলা'র সঞ্জীবনীশক্তিই দান্তে-বিয়াত্রিচের অমর প্রেমের মহিমোজ্জ্বল ভাবমূর্তি (image) টিকে নিখিল মর্ত্যলোকের প্রেমবুভুক্ষু নর-নারীর মনের মন্দিরে পরম শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেমমানসকে অনুপ্রাণিত করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। শুধু তা-ই নয় ; কবি নিজেও এই বিচিত্র বিয়াত্রিচেরূপিণী শাশ্বতী প্রণয়-প্রতিমাকে তাঁর প্রেমিকচিত্তের প্রণত অর্ঘ্য

নিবেদন করেছেন বিয়াত্রিচের উদ্দেশে তাঁর অন্তিম প্রশস্তি রচনার মাধ্যমে। অন্তিম সেই প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে তাঁর কবিপ্রাণে বেজে উঠেছে প্রণয়-প্রগাঢ় আশ্চর্য দু'টি পংক্তি-সুর ঃ 'তোমারই মাধুরী জপি অন্য নামে আজো ঘরে-ঘরে' এবং 'তোমাকেই পেয়ে বুকে চিনেছি আপন প্রেয়সীকে'।

কিন্তু 'দূরযানী' সম্পর্কে এতে সন্নিবদ্ধ কবিতাগুলির বিষয়বস্তুগত বিবেচনাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে এতে অন্তর্ভুক্ত কবিতাসমূহের আঙ্গিক ও ছন্দঘটিত—বিশেষত ছন্দঘটিত—গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা। 'দূরযানী'র কবিতাগুলির এই বৈশিষ্ট্যবিষয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যের সমালোচকরা প্রায় সকলেই একমত ; কিন্তু এই কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত ছন্দের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। 'দূরযানী'তে বিধৃত কবিতাসমূহে বিশুদ্ধ ছান্দসিকের আঙ্গিক-প্রকরণে কবির এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে সমালোচকদের কেউ-কেউ দেখতে পেয়েছেন অমিল মুক্তবন্ধ ছন্দের চরম চর্চাকারীকে, কেউ-কেউ খুঁজে পেয়েছেন ফ্রীভর্সপ্রেমিক নিবিষ্ট কবিতা-রচয়িতাকে, আবার কেউবা আবিষ্কার করেছেন বাংলা কাব্যে স্প্রাং রিদম্ প্রচলন-প্রয়াসীকে। কিন্তু যথার্থ ফ্রীভর্স কিংবা স্প্রাং রিদমের দৃষ্টান্ত এগুলির একটিতেও নেই। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটির মোট আটাশটি কবিতার মধ্যে তিনটি বিশুদ্ধ গদ্যকবিতার কথা বাদ দিলে বাকি পঁচিশটি কবিতার প্রত্যেকটিই অমিল মুক্তবন্ধ ছন্দের, যেগুলির মধ্যে পনেরোটি তানপ্রধান রীতির, ছ'টি ধ্বনিপ্রধান রীতির এবং চারটি শ্বাসাঘাত প্রধান রীতির। প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য যে পদ্যছন্দে কবিতা রচনা করতে গিয়ে কবি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কিছু-কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে হয়তো একটু বেশি মাত্রাতেই ; কিন্তু পদ্যছন্দের স্বীকৃত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই সেগুলি ধর্তব্য।

এখানে উল্লেখ করার যে এককালে, বিশেষত 'খসড়া' ও 'একমুঠো'-পর্বে অমিয় চক্রবর্তী যেমন ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে তাঁর কবিতায় বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দ নিয়েও একসময় তেমনই দু'-একটি পত্র-পত্রিকায় (বিশেষত 'কবিতা'য়) গবেষণামূলক কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। বলা নিষ্প্রয়োজন এবং অনেক সমালোচকই এ-বিষয়ে একমত যে 'খসড়া' ও 'একমুঠো'-পর্ব—এমনকি আরো কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্তও তিনি তাঁর কবিতায় অসম মাত্রা ও পর্ব নিয়ে বিচিত্র যে পরীক্ষা-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, সাহসী যে-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তা প্রকৃতপক্ষে স্প্রাং রিদম্ অপেক্ষা ফ্রীভর্সেরই অধিক সগোত্র। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে 'খসড়া' কিংবা 'একমুঠো' অথবা আরো কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্ত রচিত তাঁর কবিতা সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্ত সত্য হ'লেও 'দূরযানী' গ্রন্থে চয়িত কবিতাগুলি সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা এই গ্রন্থের কবিতাগুলির ছান্দসিক প্রকরণে কবি আসলে যা করেছেন, তা ফ্রীভর্স কিংবা স্প্রাং রিদমের চর্চা নয় অথবা নিছক পদ্যছন্দের সঙ্গে নিছক গদ্যছন্দের খেয়াল-খুশিমতো মিশ্রণ—যা বাংলা কাব্যের ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ

ইঙ্গিতবাহী—তা-ও নয় ; তা আসলে বাংলা পদ্যছন্দের যা শেষকথা, সেই অমিল মুক্তবন্ধ ছন্দেরই বহু বৈচিত্র্যময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমার এই মন্তব্যের অনুকূলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এখানে তাঁর মাত্র তিনটি কবিতার নামোল্লেখ করছি এই গ্রন্থ থেকে ; যান্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতিতে রচিত 'আয়না', অমিল মুক্তবন্ধ তানপ্রধান রীতিতে রচিত 'কালো পটে' এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতিতে রচিত 'সোনার ঘর'। এছাড়া, আরো তিনটি কবিতার নামও তাঁর এই গ্রন্থ থেকে আমি এই সঙ্গে যুক্ত করতে চাই—'মানুষের ঈশ্বর', 'মধুর নির্বাণ' এবং 'যান্ত্রিক উনোন', যে-তিনটি কবিতাও 'দূরযানী' কাব্যগ্রন্থে অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দবৈশিষ্ট্য নিরূপণে কিছুমাত্র কম উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর কবিতার অনুরাগী-অনুরাগিণীরা এ-রকম আরো উদাহরণ খুঁজে পেতে পারেন 'দূরযানী'র পাতা থেকে।

'দূরযানী'র কবিতাগুচ্ছের ছন্দ-প্রকরণে যারা স্প্রাং রিদমে্র সন্ধান পেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে এই সুযোগে নিবেদন করি যে বিশ্বকাব্যের ইতিহাসে স্প্রাং রিদমে্র প্রবর্তক বিগত শতাব্দীর জেসুইট পুরোহিত ও ভগবদ্ভক্ত জেরাল্ড ম্যান্‌লী হপকিন্স ছিলেন 'পোয়েট অব ওয়ার্ডস্' বা 'শব্দের কবি' মালার্মের মতোই 'পোয়েট অব ল্যাঙ্গুয়েজ' বা 'ভাষার কবি'। ঐশী চেতনার কবি হপকিন্স তাঁর প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত হৃদয়ে এটা অনুভব করেছিলেন যে আমাদের এই এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল জীবনে অতিদ্রুত বিলীয়মান এমন কতকগুলি ক্ষণিক (momentary) বা চকিত (sudden) অনুভূতি ও উপলব্ধি আছে, যে-অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলির যথাযথ বাণীরূপায়ণে ছন্দশাস্ত্র-নির্ধারিত প্রথাসিদ্ধ বাক্যবন্ধ ও ছন্দ-প্রকরণই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ভাষার আরো গভীরে ডুব দেয়া, তার আদিম প্রাথমিক স্তরে ফিরে যাওয়া ; কেননা এই অনুভূতি ও উপলব্ধি-গুলি ক্ষণিক বা চকিত হওয়া সত্ত্বেও মৌল অর্থে এতই আদিম যে সেগুলির প্রতি সহজ-সরল দৃষ্টিতে তাকানোই যায় না, কিঞ্চিৎ বক্র-তির্যক দৃষ্টি ভিন্ন গত্যন্তর নেই। মানব-সংসার ও নিসর্গপ্রসৃষ্টিসম্ভূত এই সমস্ত অনুভূতি এবং উপলব্ধিকে হুবহু বাণী-রূপায়িত করবার অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়েই তিনি একদা তাঁর বিখ্যাত স্প্রাং রিদম্ আবিষ্কার এবং নিজের কবিতায় তার কাব্যসম্মত রূপদান করেছিলেন। হপকিন্সের অগতানুগতিক, প্রচলিত প্রথা-বহির্ভূত, ব্যাকরণ-বিপর্যয়কারী ও বাক্‌রীতি-লঙ্ঘনকারী এই অভিনব ছন্দ-প্রকরণের স্বাধীন রূপকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়ে কাব্য-সমালোচক ডবলু. এইচ. গার্ডনার হপকিন্সের গদ্য-পদ্যের সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর এই বিশেষ ছন্দরীতিকে 'ক্রিয়েটিভ ভায়োলেন্স' অভিধায় অভিনন্দিত করেছেন। হপকিন্সের এই অতি-অভিনব শিল্পশৈলী পৃথিবীর বহু দেশের বহু সাহিত্য-শিল্পীকেই কমবেশী প্রভাবিত করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে মালার্মের কবিতা এবং হেনরী জেমসের গদ্যরচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে হপকিন্সের কাব্যশৈলীর মতোই ভাঙা-ভাঙা অসমমাত্রিক অসম্পূর্ণ পংক্তির এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল ব্যবহার, সজ্ঞান ও স্বেচ্ছাকৃত শব্দার্থবিভ্রাট, চিরাচরিত ব্যাকরণের স্বীকৃত রীতিনীতির নির্মম লঙ্ঘন, বাক্যপরম্পরায় পরস্পর-বিরোধী ভাবসৃষ্টি ইত্যাদি (যেগুলি কোনক্রমেই অকারণ বা

অচেতন কোনো হুজুগে ব্যাপারমাত্র নয়, বরং সম্পূর্ণভাবেই সকারণ ও সচেতন প্রয়াসের পরিণতি) কমবেশি উপস্থিত। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার—বিশেষত 'দূরযানী'র—ছন্দ-প্রকরণে হপকিন্সের স্প্রাং রিদমের প্রভাবের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। কেননা হপকিন্সের মতো অমিয় চক্রবর্তীও হয়তো প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত কবি-মানসের অধিকারী ছিলেন (যদিও তিনিও একই সঙ্গে ঐশী চেতনারও অধিকারী ছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই) এবং ফলে কবিধর্মেও হয়তো হপকিন্সের সঙ্গে তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য ছিলো, কিন্তু দু'জনের মনের জগৎ মূলত পৃথক। তাছাড়া, অমিয় চক্রবর্তীর গদ্যরচনায়—প্রবন্ধে-নিবন্ধে, ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক চিঠিপত্রে অথবা তাঁর 'কবিতা-সংগ্রহে'র 'ভূমিকা'য় কিংবা 'গ্রন্থপরিচয়ে'—কোথাও উল্লেখ নেই তাঁর কাব্যাদর্শে হপকিন্সের প্রভাবের কথা কিংবা তাঁর কবিতায় অনুসৃত ছান্দসিক প্রকরণে হপকিন্সের স্প্রাং রিদম্ অনুসরণের সচেতন প্রয়াসের কথা। বরং তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য ছন্দানুসৃতি সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য, যত সামান্যই হ'য়ে থাক না কেন, প্রায় সবটুকুই যায় ফ্রীভর্সের পক্ষে, কিন্তু কখনোই স্প্রাং রিদমের অনুকূলে নয়। এ-সম্পর্কে তাঁর 'কবিতা-সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়ে' তিনি জানিয়েছেন, 'আটপৌরে গদ্যের ঈষৎ ছন্দ-মিশ্রিত চালচলন আমার কাব্যসাধনার একান্ত পরিপন্থী।'…'অবশ্য ফরাসী Verse Libre-এর এলাকায় বারেবারে নেমেছি'…কিন্তু 'যতটা পারি কাব্যছন্দের মধ্যে থেকেই তাঁর পরিসর বাড়াবার কিছু আয়োজন করেছিলাম।' আবার এ-প্রসঙ্গেই তিনি ১৩৬২ সালের চৈত্র মাসে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন, 'আমার নিজের দিক্ থেকে বলব ঢের বেশী তৃপ্তি পাই অন্তর্লীন ঝঙ্কৃত এবং সংহত Verse Libre-এর রাজ্যে…।' লক্ষ্যণীয়, দু'টি উদ্ধৃতিতেই Verse Libre-র প্রতি তাঁর ঋণের স্বীকৃতি আছে, কিন্তু কোনোটিতেই Sprung Rhythm-এর নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই।

ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পারাপার' প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কাব্যসাধনার চতুর্থ পর্যায়ে প্রবেশ করলেন। চতুর্থ পর্যায়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা তিন ঃ 'পারাপার', 'পালা-বদল' এবং 'ঘরে ফেরার দিন'। এই পর্যায়ে তিনি পৃথিবী-পর্যটক ; ফলে, এই পর্যায়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে-ঘুরে যে-দর্শন তাঁর মনে গ'ড়ে উঠেছে, তার নাম দেয়া যেতে পারে চিরপথিকের দর্শন, চিরভ্রাম্যমানের দর্শন। ইতিপূর্বে আলোচিত তাঁর কবিজীবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের প্রধান অবলম্বন দৃষ্টির দর্শন বা দৃষ্টিবাদ এবং ধ্যানীর দর্শন বা ধ্যানবাদ এই পর্যায়ে আরো উদার ও ব্যাপক হ'য়ে সমগ্র মানব-সমাজের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে পরিভ্রমণ ক'রে, ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক পরিবেশের অন্তর্গত হ'য়ে দীর্ঘ বসবাসে একটি গভীর মানবসত্যের সন্ধান তিনি লাভ করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এই সত্য তিনি ক্রমশই উপলব্ধি করেছেন যে মৌলিক স্বরূপে মানবসমাজ পৃথিবীর সর্বত্রই এক, মানবিক মৌল মর্যাদায় পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই সমান মর্যাদাবান ; তাঁর মনে এই ধারণা ক্রমেই

দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে যে মানুষের সুখ-দুঃখের কিংবা আনন্দ-বিষাদের, মানুষের আশা-নিরাশার কিংবা মিলন-বিরহের প্রকাশ মনুষ্যসৃষ্ট সকল কৃত্রিম ব্যবধান এবং ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম ক'রে যায় ; পৃথিবীর সকল দেশেই সকল মানবিক চিত্ত-বৃত্তির প্রকাশের ভাষা এক এবং অভিন্ন। দম্ভোদ্ধত ইংরেজ কবি রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ্‌ সেই যে একবার আত্মম্ভরিতায় ব'লে উঠেছিলেন, 'The east is east, the west is west ; And never shall the twin meet', প্রাচ্য গোলার্দ্ধজাত বাঙালী কবি অমিয় চক্রবর্তীর সাহিত্যজীবনের চতুর্থ পর্যায়ের (বিশেষত 'পারাপারে'র) কবিতাগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ করলে, মনে হয়, যেন সংকীর্ণচেতা কিপ্‌লিঙের মানবসত্য-সম্পর্কিত এই বিকৃত ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ততর প্রমাণ করবার জন্যই এই কবিতাগুলি তিনি রচনা করেছেন। কেননা এই কবিতাগুলিতে বারেকের জন্যও তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অসেতুসম্ভব কোনো ব্যবধানকে স্বীকার করেন নি, বরং এ-ধরনের কোনো কাল্পনিক ব্যবধানকে তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য ও পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। বাস্তবিক, এই পর্যায়ের কবিতাগুলি রচনা করতে গিয়ে তাঁর কবিচিত্তে মানবমঙ্গলেচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, মানবকল্যাণব্রত সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে।

কবির এই ধরনের মানসিকতা গ'ড়ে ওঠার মূলে একমাত্র না-হ'লেও অন্যতম প্রধান কারণ যে তাঁর স্থায়ী প্রবাসজীবন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে সাময়িকভাবে প্রবাসীর জীবন যাপন করলেও ১৯৪৮ সালে গান্ধীজির দেহাবসানের পর থেকেই তিনি স্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হলেন। 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। কিন্তু, লক্ষ্য করবার বিষয়, এই কাব্যগ্রন্থে শুধু বৈদেশিক বিচিত্র আবহসমৃদ্ধ কবিতাই স্থানলাভ করেনি, এমন বহু কবিতা এতে সন্নিবদ্ধ হয়েছে, যেগুলি ভারতবর্ষের বুকে ব'সে সর্বধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর, ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির অন্ধকার পটভূমিকায় রচিত। সেজন্যই তিনি 'পারাপারে'র কবিতাগুলিকে চারটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন ঃ 'ছড়ানো মার্কিনি', 'ভারতী', 'য়ুরোপা' এবং 'দুই তীর'।

'পারাপারে'র কবিতাগুলিকে যদিও চারটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে, তবু লাক্ষণিক বিচারে এই গ্রন্থে মূলত দু'ধরনের কবিতা সন্নিবেশিত। প্রকরণ ও বক্তব্যের বিবেচনায় 'ছড়ানো মার্কিনি' ও 'য়ুরোপা' পর্বের অনেক কবিতা যেমন গভীর সাদৃশ্যযুক্ত, 'ভারতী' ও 'দুই তীর' পর্বের কিছু-কিছু কবিতাও তেমনই ভাবগত অভিন্নতার সূত্রে দৃঢ়গ্রথিত। অথচ চার পর্বে বিন্যস্ত এই দু'ধরনের কবিতার মধ্যে মৌলিক কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া কঠিন। একই গ্রন্থের অবয়বে পরস্পর শ্লথসম্পর্ক দু'ধরনের কবিতার সহ-সন্নিবেশ উৎসুক পাঠক-পাঠিকাদের নজর এড়িয়ে যাবার মতো নয়।

'ছড়ানো মার্কিনি' এবং 'য়ুরোপা' পর্বের কবিতাগুলি সতর্কভাবে পাঠ করলে আমাদের মনে স্পষ্ট হয়, কেন তাঁর কাব্যদীক্ষাদাতা রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁকে 'প্রকৃতই সর্বদেশীয় কবি' ব'লে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রতিফলিত

তাঁর কবিস্বভাবের যে-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'প্রকৃতই সর্বদেশীয় কবি' অভিধায় অভিনন্দিত করেছিলেন, তা হচ্ছে তাঁর কবিচিত্তের সর্বত্রচারিতা ও তাঁর কবি দৃষ্টির বহুদর্শিতা, যার পরিচয় এই পর্বদ্বয়ের বহু কবিতায় স্পষ্ট। অমিয় চক্রবর্তীর কবিমানসের যে-আন্তর্জাতিকতার পরিচয় তাঁর কবিতায় বারেবারেই আমরা লাভ করি এবং যা পরবর্তীকালে (বিশেষভাবে 'পালা-বদল' গ্রন্থে) তাঁর কবিতায় ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তার সূত্রপাত এই কবিতাগুলিতেই। এই কবিতাগুলির রচয়িতা একজন 'প্রকৃতই সর্বদেশীয় কবি' এবং এই কবিতাগুলি 'প্রকৃতই সর্বদেশীয়', কেননা এগুলিতে আধুনিক পৃথিবীর বহু শ্রেণীর মানুষের বহুবিধ সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা-নৈরাশ্য-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-উদ্বেগ-অনিশ্চয়তা এক আশ্চর্য কাব্যশিল্পরূপ লাভ করেছে।

এ-প্রসঙ্গে যে-কবিতাগুলি বিশেষভাবে আলোচ্য, সেগুলির নাম ঃ 'ছড়ানো মার্কিনি'র 'মার্কিনি', 'ওহায়ো', 'ওক্লাহোমা', 'কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি', 'কোনি আইল্যাণ্ড' ও 'সান্টা বার্বারা' এবং 'য়ুরোপা'র 'য়ুরোপা জাহাজে', 'ডুসেলডর্ফ', 'দক্ষিণ জার্মানি' ও 'ফ্রাই-বুর্গের পথে'। আরো দু'একটি কবিতার সঙ্গে এই দশটি কবিতাও শুধু যে নামকরণেই পাশ্চাত্যগন্ধী, তা-ই নয় ; এই কবিতা ক'টি বক্তব্য-ব্যঞ্জনা-বর্ণনাতেও স্পষ্টত পশ্চিম গোলার্ধ-সম্পৃক্ত। এগুলির মধ্যে আমরা পাই নিখুঁত বর্ণনাধর্মী কবিতা ('মার্কিনি', 'সান্টা বার্বারা', 'দক্ষিণ জার্মানি'), গভীর বিস্ময়রসাশ্রিত কবিতা ('ওহায়ো', 'কোনি আইল্যাণ্ড', 'ফ্রাইবুর্গের পথে'), অন্তর্মনাসুলভ চিন্তাপ্রসূত কবিতা ('ওক্লাহোমা', 'য়ুরোপা জাহাজে'), প্রগাঢ় মানবীয় অনুভূতির কবিতা ('ডুসেলডর্ফ') এবং সমর্পিত প্রেমের কবিতা ('কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি')।

'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের অন্য দু'টি পর্ব 'ভারতী' এবং 'দুই তীরে'র কবিতাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন মনস্ক্রিয়াজাত। এই দুই পর্বের কবিতাগুলির প্রেক্ষাপটে আধুনিক পাশ্চাত্য ভূখণ্ড নয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ভারতবর্ষই বিচিত্ররূপে বিরাজিত। পড়তে-পড়তে মনে হয় যেন এই কবিতাগুলি রচনার পরম প্রহরে চিরকালীন ভারতবর্ষ (এবং বিশেষভাবে বঙ্গভূমি) সামগ্রিক ভাবমূর্তিতে এই চিদ্সত্ত কবির মনের চোখের সামনে এসে দণ্ডায়মান হয়েছে, মানসনেত্রে সেই ভারতবর্ষীয় ভাবমূর্তিটি অবলোকন ক'রেই তিনি এই কবিতাগুলি একটির-পর-একটি রচনা করেছেন। এই দুই পর্বে রয়েছে ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোলভিত্তিক কবিতা ('উত্তরাপথ', 'হারাপ্পা', 'বোধগয়া'), ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা ('সাবেকি', 'সত্যাগ্রহ'), মানবতাবাদের কবিতা ('রবীন্দ্রনাথ', 'মুক্তি-মিল'), নিতান্ত নগণ্য ঘটনা ও বস্তুতেও জীবনের রহস্যানুসন্ধানের কবিতা ('বিধুবাবুর মতো', 'পিঁপড়ে', 'গাছের সারি') এবং দার্শনিক কবিতা ('লোকায়ত', 'মৃত্যুবাসর', 'প্রাণলক্ষ্মী' ও আলোচ্য গ্রন্থটির নাম-কবিতা 'পারাপার'—যে-কবিতাটিতে কবির কল্পনায় জীবন আর মৃত্যু একই অনন্ত অস্তিত্বমহাসমুদ্রের এ-পার ও-পার)।

অবশ্য এই উৎকৃষ্ট রচনাগুলিও কিন্তু 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের সর্বোত্তম রচনার উদাহরণ নয় ; সেই রচনাবলীর দৃষ্টান্ত 'অন্নদাতা', 'অন্ন দাও', '১৩৫০', 'দূরের ভাই'

ও 'নিমন্ত্রণ' এই পাঁচটি এবং সেই সঙ্গে আরো পাঁচটি—'সন্দ্বীপ', 'সাংঘাতিক', 'আহুতি' 'সনেট' ও 'সত্যাগ্রহ'। সব ক'টি কবিতাই 'ভারতী'-পর্বে গ্রথিত। প্রথমোক্ত পাঁচটি কবিতায় কবির চিত্তাকাশ বেদনার ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। বাস্তবিক, এই কবিতা ক'টিতে কবিসত্তার মানবিক ও কল্যাণকামী দিক্‌টি গভীর কারুণ্যরসে সিঞ্চিত হ'য়ে যেমন সহজ-স্বাভাবিকতায় প্রকাশিত হয়েছে, কবির অন্য অনেক কবিতাতেই তা দুর্লভ। কবিতা পাঁচটির মর্মস্থলে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শোকাবহ পরিণামে এবং পঞ্চাশের মহামন্বন্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত দুঃখিনী বাংলার অশ্রুমুখী ছবি। সেগুলির বুকে কান পাতলে এখনো যেন স্পষ্ট শোনা যায় সেই অমানিশার অন্ধকারে সর্বরিক্তা এক মৃত্যুপথযাত্রিনীর গগনবিদারী হাহাকার। অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-সহায়-সম্বলহীন কঙ্কালসার শত-শত নরনারী-পরিকীর্ণ শবের সেই মহাশ্মশানের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেদিন কবি এই পাঁচটি কবিতায় মরণের বিরুদ্ধে জীবনের যে-জয়গান গেয়ে উঠেছিলেন, তার রেশ বাংলা কবিতার পাঠক-পাঠিকার মনের কানে আজও অনুরণিত হচ্ছে। কবিতা ক'টিতে কবি কয়েকটি মর্মস্পর্শী রূপকল্পে নিষ্ঠুর বাস্তবকেও কাব্যমণ্ডিত করেছেন। নিছক বাণী-শিল্পের বিচারেও কবিতা পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

'সন্দ্বীপ', 'সাংঘাতিক', 'আহুতি', 'সনেট' ও 'সত্যাগ্রহ'—শেষোক্ত এই পাঁচটি কবিতার পটভূমিকা বাংলার সীমান্ত অতিক্রম ক'রে সমগ্র ভারতে প্রসারিত হয়েছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর শেষ সত্যাগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লক্ষ-লক্ষ ছিন্নমূল শরণার্থীর মর্মন্তুদ হাহাকার—ইত্যাদিকে আশ্রয় ক'রেই কবিহৃদয়ের আর্তি এই কবিতা ক'টিতে বাঙময় হ'য়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে কবির সামাজিক বিবেকও এগুলিতে প্রখররূপে জাগ্রত। ফলে, এই কবিতা পাঁচটি এ-সত্যই প্রমাণিত করেছে যে একজন সমাজ-সচেতন ও শিল্পীমনের অধিকারী মানুষের পক্ষে তাঁর সামাজিক সত্তা এবং শিল্পী-সত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, থাকতে পারে না।

'পারাপার' গ্রন্থটিতে কয়েকটি অতি মনোহর প্রেমের কবিতা স্থান লাভ করেছে ঃ 'শিল্প', 'বিনিময়', 'কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি', 'পরিচয়', 'শ্রীমান শ্রীমতী', 'লিরিক', 'চিরদিন', 'বৃষ্টি' এবং সর্বশেষে প্রথমেই গ্রথিত 'মাটি' কবিতাটি—হ্যাঁ, এটিকেও আমি প্রেমের কবিতা হিসেবেই বিবেচনা করি, তবে অন্য কবিতা আটটির মতো মানবীয় প্রেমের কবিতা এটি নয় ; এই কবিতাটি কবির সুগভীর মর্ত্যপ্রেমের এক আশ্চর্য কাব্যিক প্রকাশ। কবিতাটি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে শুধু এই কথাই বলবো যে সামগ্রিক বিবেচনায়, মানব-মানবীর মায়ামুগ্ধ মর্ত্যলীলার কাব্যরূপায়নে এটির সমকক্ষ কবিতা আমাদের সাহিত্যে খুব কমই রচিত হয়েছে। অন্য কবিতা ক'টির মধ্যে 'শিল্প', 'চিরদিন' ও 'বৃষ্টি' নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। সমগ্র অমিয়কাব্যেও এই কবিতা তিনটির বিশেষ স্থান আছে। 'প্রাণের বসন্ত দিনে কত কী উৎসবে' প্রণয়াবদ্ধ প্রেমিকরা প্রেমিকাদের নিয়ে যে-স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকে, 'শিল্প' কবিতাটি সেই প্রেমস্বপ্নেরই বাণী-গুঞ্জরিত শিহরণ। 'শিল্প' শুধু উৎকৃষ্ট একটি প্রেমের কবিতাই নয়, এটি একই সঙ্গে

প্রেমের শিল্প এবং কাব্যের শিল্পের সমন্বয়েরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। কবিতাটির বাক্‌ভঙ্গিমাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'চিরদিন' কবিতার প্রারম্ভিক ও অন্তিম পংক্তি 'আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো' এবং 'তুমি যেন বলো, আর আমি যেন শুনি'র 'আমি' ও 'তুমি' যে আমাদের চিরপরিচিত সংসারেরই প্রেমিক ও প্রেমিকা, কবিতাটির আদ্যোপান্ত পাঠে তা বেশ বোঝা যায়, বোঝা যায় যে আসলে এই কবিতায় কবি যুগল প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়োদ্বেল হৃদয়ের প্রতিদিনকেই চিরদিনে উন্নীত করেছেন, কবিতার মোহিনী মায়ায় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়স্পন্দিত প্রাত্যাহিক দিনকেই চিরন্তন দিনে রূপান্তরিত করেছেন। সর্বশেষে 'বৃষ্টি'-শীর্ষক সেই অদ্বিতীয় কবিতাটি, যেটি অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমচেতনার স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটিও যে প্রেমেরই কবিতা এবং সমগ্র বাংলাকাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও হৃদয়বিমোহন প্রেমের কবিতা, তা কবির স্বীকৃতি থেকেই স্পষ্ট। কবিতাটির মর্মসত্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'প্রেমের অনুরঞ্জিত মুহূর্তে নিয়েই এই কবিতার বিস্তার।' কবিতাটিতে প্রেমিক-চিত্তের অবিশ্রাম জপমন্ত্র হচ্ছে 'বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে-ঘুরে হাওয়া' আর কবিতাটির প্রথম পংক্তিটিই হচ্ছে কবিতাটির ধ্রুবপদ এবং সেই পংক্তিটিতেই নিহিত রয়েছে কবির প্রেমচেতনার স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।' 'কেঁদেও পাবে না'—কাকে? 'তাকে', অর্থাৎ প্রেমিকাকে, নায়িকাকে। প্রেমিকাকে এই না-পাওয়া কিংবা 'বারে-বারে পাওয়া' সত্ত্বেও 'হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে'—এটাই অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমচেতার যথার্থ স্বরূপ। তিনি প্রেমে মিলনের কবি নন, প্রেমে তিনি বিরহের কবি। দৈহিক মিলনে পরাঙ্মুখ এবং আত্মিক মিলনে অত্মুন্মুখ ব'লেই তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রেমিকার দেহকে ছাপিয়ে প্রাণই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। এবং এই একই কারণে তাঁর কাব্যের নায়িকা জীবনানন্দের কাব্যের নায়িকার মতো মৃতা কিংবা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়িকার মতো ক্ষণিকা নয়, তাঁর কাব্যের নায়িকা জীবিতা এবং শাশ্বতী, কিন্তু একই সঙ্গে সুদূরিকা—সে কেবলই দেহের নৈকট্য থেকে প্রাণের সুদূরে অন্তর্হিতা হ'য়ে যায়, হ'য়ে যেতে চায়। 'বৃষ্টি' কবিতাটি আমাদের সাহিত্যের একটি অতুলনীয় বর্ষাবিরহের কাব্যশিল্প।

পরিশেষে স্মর্তব্য যে 'পারাপার'ই অমিয় চক্রবর্তীর যুগপৎ বৃহত্তম ও মহত্তম কাব্যগ্রন্থ। বৃহত্তম, কারণ এই গ্রন্থের বহুসংখ্যক নিজস্ব কবিতার সঙ্গে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দীর্ঘদিন দুষ্প্রাপ্য কবির 'মাটির দেয়াল' কাব্যগ্রন্থিকার 'শঙ্করাভরণ', 'প্রবাসী', 'বিধুবাবুর মতো', 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' ইত্যাদি বেশ কিছু কবিতা। আর, মহত্তম এই কারণে যে এই গ্রন্থের কবিতাগুলি রচনা করতে গিয়েই তাঁর মধ্যে কবিসত্তা, সামাজিক সত্তা এবং মানবকল্যাণব্রতী সত্তার সহজ সম্মিলন ঘটেছে—এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতেই এক হ'য়ে ধরা দিয়েছে সত্য, শিব ও সুন্দর।

১৯৫৫ সালে প্রকাশিত কবির সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'পালা-বদল' মূলত তাঁর ষষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ 'পারাপারে'র পরিপূরক ; কেননা এই উভয় কাব্যগ্রন্থেই তাঁর মানসিকতা এক এবং

অপরিবর্তিত। এই প্রাণস্পন্দিত গ্রন্থে মানবঅস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ যে-ধরনের চিন্তা-ভাবনার আলোকে 'পারাপারে'র কবিতাবলী উদ্ভাসিত, 'পালা-বদলে'র অধিকাংশ কবিতাও সেই ধরনের চিন্তা-ভাবনারই দ্যোতক। পার্থক্য শুধু এখানটায়ঃ যে-চিন্তা-ভাবনা-গুলি, নিজস্বতার যে-লক্ষণগুলি 'পারাপারে'র কবিতাগুচ্ছে ইতস্ততঃ অসংবদ্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছিলো, সেই চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষণগুলিই 'পালা-বদলে'র কবিতাসমূহে সর্বত্র সুসংবদ্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এমন একটি নূতন মাত্রা 'পালা-বদলে' সংযোজিত হয়েছে, যা 'পারাপারে' বহুলাংশে অনুপস্থিত। তা হচ্ছে সর্বতোব্যাপ্ত এক অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত এবং অতি গভীর এক অনিকেত মনোভাব। পৃথিবীর বহু দেশে বসবাস ক'রে, সংসারের নানা পথে পদচারণা ক'রে, অভিজ্ঞতার বিচিত্র স্তরে বিচরণের অন্তে এই অরুন্তুদ বিশ্বে মানবীয় পরিস্থিতি বা the hnman situation-সম্পর্কে তাঁর কবিচিত্তে যে-ধারণা বদ্ধমূল হ'লো, তা থেকেই 'পালা-বদলে' তাঁর কবিতায় অনিবার্যরূপে জন্ম নিলো উদ্বাস্তুসুলভ এই অসহায়তা, এই অনিকেত মনোভাব। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তিনি শুধু যে লক্ষ্য করলেন 'বাসা ভেঙে গেছে মানুষের' কিংবা 'বুদ্ধিজীবী মাত্রেই উদ্বাস্তু' তা-ই নয়, পরম পরিতাপের সঙ্গে এটাও তিনি উপলব্ধি করলেন যে অনন্ত কালপ্রবাহের বর্তমান করালপর্বে পূর্ব-পশ্চিমের আপামর মানুষই গৃহচ্যুত, উত্তর-দক্ষিণের সমস্ত মানুষই বাস্তুহারা।

'পালা-বদলে'র বহু কবিতায় কবির এবম্বিধ উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। আবার এই বিশেষ ধরনের উপলব্ধির ফলেই এই গ্রন্থের কবিতাসমূহের বিষয়বস্তুতে দেখা দিয়েছে আধুনিক ইংরেজি কাব্যের প্রধান পঞ্চপুরুষ ইশেরউড-ডে লুইস-ম্যাকনীস-অডেন-স্পেণ্ডারের অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তুর মতো, যাকে বলা যেতে পারে, 'problems of being a refugee and an exile', অর্থাৎ বাস্তুচ্যুত ও নির্বাসিত হওয়ার সমস্যাবলী। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে একজন বাস্তুচ্যুত ও নির্বাসিত মানুষের সমস্যাসমাকীর্ণ হৃদয়ের বিলাপিত হাহাকার তাঁর কবিতায় তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই কমবেশি শোনা গেছে, 'পালা-বদলে'ই প্রথম নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া'র অন্তর্গত 'ঘর' কবিতার 'বেড়া পার হল, পা, চলো। / সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ ; / গাছের আড়ালে, বলো / কে স্থির দাঁড়িয়ে—/ আলো নিয়ে। / ফিরে আসার সাঁঝ।' (বিশেষত 'ফিরে আসার সাঁঝ') অংশ ; দ্বিতীয় ক্যাব্যগ্রন্থ 'এক মুঠো'র অন্তর্গত 'সংসার' কবিতার স্বদেশীয় স্মৃতিবহ অবিস্মরণীয় পংক্তি 'বিষণ্ণ পুকুরজলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের ফালি'র সমগ্রটুকু ; তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ (কাব্যগ্রন্থিকা) 'মাটির দেয়াল'-এর অন্তর্গত 'প্রবাসী' কবিতার 'নদী, শাখানদী, পুকুর, কচুবন, কলাবাগান, মাদার / দোঁপাটি, ছোলাখেত, শর্ষে, দূরে মাটির দেয়াল / কুমড়ো-লতানো চাল— / বাংলা—', 'গাঙে স্রোত, ভাটিয়ালি, কীর্তন, দেউল, মুর্শিদ্যার বাড়ি/ ওপারে যাব কেমনে ?' (বিশেষত মর্মান্তিক প্রশ্ন 'ওপারে যাব কেমনে ?'), 'হাটের ধারে ঘাটের নাও ; লণ্ঠন ঝোলানো গরুর গাড়ি / ছায়ায় ছায়া এঁকে চলে' কিংবা অন্তিমতম

পংক্তিতে খেদোক্তি 'বাঙলাহীন বারোমাস', 'বিধুবাবুর মতো' কবিতার 'চিড়ে গুড় খেয়ে তৃপ্তিটুকু, গাছতলায় শুয়ে শান্তি', 'পাড়ায় মেয়ের বিয়ের শঙ্খ, সারাদিন বাজাচ্ছে সানাই' কিংবা 'অনেকদিন পরে ধুতি-পাঞ্জাবি আর উড়োনি' এবং 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' কবিতার 'কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি / গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি। / আপন জনকে ভালবাসা, / বাঙলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি-ফেরার আশা' (বিশেষত বিহ্বল পংক্তি 'বাঙলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি-ফেরার আশা') কিংবা 'জন্ম জন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায় / তুলসী-মণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়। / থার্ডক্লাশের ট্রেনে যেতে জানালায় চাওয়া, / ধানের মাড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া। / মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা, / সুন্দর ফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা, / গঙ্গার ভরা জল : / ছোটো নদী : গাঁয়ের নিমছায়াতীর— / হায়, এ-ও তো ফেরা-ট্রেনের কথা' (বিশেষত বিষাদান্ত 'হায়, এ-ও তো ফেরা-ট্রেনের কথা') পংক্তি ; চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'অভিজ্ঞান-বসন্তে'র অন্তর্গত 'সংসার' পর্যায়ের মিলনান্ত হওয়া সত্ত্বেও, আশ্চর্য কবিতা 'চিঠি'র অন্তিমাংশের বিষাদান্ত পংক্তি 'নিরুদ্দেশের / পারাপারে দুজনার ডাক পাঠাই। / উড়ো এই চিঠি সন্ধ্যায়— / সকালে অকূল সমুদ্রে কে কোথায় ।।' : পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'দূরযানী'র অন্তর্গত 'সোনার ঘর' কবিতার 'নদীর ধারে বাড়ি ছিলো, ভোরে নৌকো ঘাটে, / ছলোছলো আলোর জলে রাঙায় রাতের শেষ ; /সানাই-শাঁখ ছায়ায় ছায় হাওয়ায় হারা, ঘুমো, / যাবো আবার সোনার ঘরের পার' (বিশেষত 'যাবো আবার সোনার ঘরের পাব') অংশ ইত্যাদি এবং এই কাব্যগ্রন্থপঞ্চকের বিভিন্ন কবিতার অন্তর্গত এ-ধরনের আরো কিছু-কিছু অংশের নিবিষ্ট পাঠ আমাদের কাছে স্পষ্ট করে প্রথমাবধি (যেহেতু তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই তিনি প্রবাসী) তাঁর হৃদয়ে প্রবাসীর জীবন-বেদনা এবং একই সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতা কত গভীর। অংশগুলি তাঁর দীর্ঘ প্রবাসজনিত নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত।

অবশ্য এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও সমানভাবেই স্মরণীয় যে কবির এই প্রবাসজনিত মানস-যন্ত্রণা কিংবা অন্তর্দ্বন্দ্ব যতই গভীর হোক না কেন, পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'দূরযানী' পর্যন্ত তা কিন্তু তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত। অর্থাৎ, তা তাঁর নিজের জীবনের দুঃখ-বেদনার পরিধি অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা মানুষের জীবনের এবম্বিধ দুঃখ-বেদনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পারাপারে' পৌঁছে পরিবর্তনের একটা আভাস সূচীত হ'লো, রূপান্তরের একটা সুর ধ্বনিত হ'লো। স্বদেশ-বিচ্ছিন্নতার এবং স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনাভিলাষের ব্যক্তিগত দুর্মর বেদনা-ব্যাকুলতাকে তিনি প্রসারিত হ'তে দেখলেন, ব্যাপ্ত হ'তে দেখলেন পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের স্বদেশ-স্বজাতি-স্বজন-বিচ্ছিন্ন সংখ্যাতীত মানুষের দুঃসহ হৃদয়-যন্ত্রণায়। 'পারাপারে'র বহু কবিতার মর্মকেন্দ্রে (core-centre) আধুনিক মানুষের বিজ্ঞানশাসিত যান্ত্রিক জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্নতার হাহাকার ও উদ্বাস্তুসুলভ অসহায়তা প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে নানাভাবে আভাসিত ; বহু

কবিতায় গম্ভীরনাদী জাহাজ, দ্রুতগামী মোটর, ঊর্ধ্বশ্বাস ট্রেন কিংবা বিদ্যুৎগতি প্লেন ইত্যাদি আধুনিক জীবনভিত্তিক গতিদ্যোতক প্রতীকের সুনিপুণ ব্যবহারে আধুনিক মানুষের বাস্তুচ্যুত ও ছন্নছাড়া অন্ধকার আস্তিত্বিক দিক্‌টি স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। এবং এই গ্রন্থের কিছু-কিছু কবিতার অনুচ্চ স্বরে উচ্চারিত আধুনিক মানুষের ভবঘুরে জীবনের অন্তর্নিহিত বিচ্ছেদের সুরটি, বর্তমান জীবনযাত্রার অংশীদার ছিন্নমূল মানুষের অন্তরের বিষাদের ছবিটি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পালা-বদলে'র কবিতা-সমূহে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পট-পরিবর্তনকে প্রতিফলিত ক'রে আরো তীব্র হ'য়ে উঠেছে, আরো স্পষ্ট হ য়ে উঠেছে—অর্থাৎ, 'of being a refugee and an exile'-এর সমগ্র সমস্যাটিই আরো জটিল ও ব্যাপক হ'য়ে মর্মান্তিক আকার ধারণ করেছে। গভীর যে-বেদনায় 'একমুঠো'র 'যুদ্ধের খবর' কবিতায় সমরবিক্ষত স্বদেশবিচ্যুত 'ডানজিগের মেয়ে'কে উদ্দেশ ক'রে একদা তিনি লিখেছিলেন, 'স্থান নেই / রাষ্ট্রের হিসেবে তোমার প্রাণ নেই' কিংবা 'অভিজ্ঞান-বসন্তে'র 'হাইফা' কবিতায় যুদ্ধবিতাড়িত অসংখ্য ইহুদি পরিবারের একটি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছিলেন, 'হোটেলটা খুলেচে মা বাপ মেয়ে—ইহুদি—/ বারুদাগ্নি য়ুরোপ হ'তে / পালিয়ে ঠেক্‌ল এই ডাঙায় বিপদের স্রোতে', গভীর সে-বেদনাই 'পারাপার' অতিক্রম ক'রে 'পালা-বদলে'র 'এস্পানোল্' কবিতায় যুদ্ধবিপর্যস্ত স্প্যানিশ উদ্বাস্তু বেহালা-বাদকের প্রতি করুণাসঘন জিজ্ঞাসায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, 'বঙ্কিম ভঙ্গিতে কাঁপা খেয়ালি পথের বেহালায় / দূর সমুদ্রের পথ চিনে / কেন এ ইস্পানি গান গাও এই কঠিন মার্কিনে'। 'যুদ্ধের খবর' কবিতার ডানজিগের মেয়ে, 'হাইফা' কবিতার ইহুদি পরিবার কিংবা 'এস্পানোল্' কবিতার স্প্যানিশ বেহালাবাদক—পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই জন্মাক না কেন, সকলেই একদিন স্বদেশে স্বজাতি পরিবৃত হ'য়েই জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, কিন্তু আজ, মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্বে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-জন্মভূমির বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও, অনিশ্চয়তা ও অসহায়তাজনিত একই বেদনার সাধারণ সূত্রে তাদের জীবন পরস্পর গ্রথিত হ'য়ে পড়েছে ; তাদের সকলেরই সাধারণ পরিচিতি হ'য়ে উঠেছে একটিই, এবং তা হচ্ছে এই যে তারা সকলেই বাস্তুহারা, তারা সকলেই ছিন্নমূল, ছন্নছাড়া। আর, এই বাস্তুহারা ও ছন্নছাড়ার পরিচিতিতেই এরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনের সীমা অতিক্রম ক'রে আধুনিক মানুষের সর্বগত জীবনকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে, এদের নিজ-নিজ জীবনের দুঃখ-দুর্দশা পৃথিবীব্যাপী আধুনিক মানুষের সমস্যাসঙ্কুল উদ্বাস্তু-জীবনের অনিশ্চয়তার দ্যোতক হ'য়ে উঠেছে। আধুনিক মানুষের নিত্যসঙ্গী এই অনিশ্চয়তা ও অনিকেত মনোভাবের অতি স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে 'পালা-বদল' গ্রন্থের 'ইতিহাস' নামক আশ্চর্য কবিতাটিতে, যেটি আসলে কবিতার আবরণে আবৃত নিটোল একটি গল্প। ক্রমবিস্তার্যমান যন্ত্রসভ্যতার নিষ্ঠুর আঘাতে-আগ্রাসনে একটি মার্কিন গ্রাম কী-ভাবে উঠে যাচ্ছে, কয়েক ঘর বাসিন্দা সেই গ্রামের বুকে তাদের সাধারণ জীবনের সামান্য সুখ-শান্তির যে-আশ্রয় নির্মাণ করেছিলো, সে-আশ্রয়টুকু কী-

ভাবে ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যেতে চলেছে, তার মর্মস্পর্শী কাহিনী এই কবিতাটিতে বিবৃত করতে গিয়েই কবিতাটির প্রথম অংশে কবি আধুনিক জীবনের ছন্নছাড়া রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন 'মস্ত গাছ আজও খাড়া' এবং 'খুড়োর হদিশ নেই'—এই দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে। সেই সঙ্গে কবিতাটির দ্বিতীয় অংশের (এবং সমগ্র কবিতাটিরও) অন্তিম বাক্যে দৃশ্যত অতি সাধারণ অথচ ব্যঞ্জনায় অতি অসাধারণ মাত্র পাঁচটি হৃদয়বিদারক শব্দে আধুনিক পৃথিবীর আপামর মানুষের নিয়তিলাঞ্ছিত ছিন্নমূল জীবনের মর্মান্তিক হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসকে তিনি ধ্বনিত ক'রে তুলেছেন—'এই গ্রাম / তাহ'লে / উঠে যাবে ॥'

'পালা-বদলে' কলিত কবিতাবলীতে পঞ্চাশোত্তর প্রবাসী কবির 'বাঙ্‌লাহীন বারো-মাসে'র ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর আধুনিক অনিকেত জীবনযাত্রার শরিক জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে আপামর ছিন্নমূল নরনারীর ভবঘুরে অস্তিত্বের বহুবিধ দুঃখ-বেদনা মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গিয়ে গভীরতর এক দুঃখ-বেদনার সঞ্চার ঘটেছে। গভীরতর সেই দুঃখ-বেদনার প্রবল তরঙ্গাঘাতে কবির চিদ্-সমুদ্র সতত চঞ্চল ; ফলে, কবিচিত্তের প্রশান্তি-সমাহিতি নিয়ত খণ্ডিত। স্বদেশ ও স্বজন-বিচ্ছেদের এই আত্মিক অভিঘাতে সংক্ষুব্ধ এবং তজ্জনিত তীব্র নস্ট্যাল্‌জিয়ায় আক্রান্ত হ'য়েই তিনি অসহায় কাঙালের মতো মনে-মনে বারংবার প্রত্যাবর্তন করেছেন মার্কিনের বিদেশী জীবন থেকে ভারতের (বিশেষত বাংলার) স্বদেশী জীবনে। কঠিন মার্কিনের কর্কশ ফুটপাথে স্প্যানিশ উদ্বাস্তুর বেহালার বিলাপিত ধ্বনিমূর্চ্ছনায় আবিশ্বপরিধিব্যাপ্ত অবগাঢ় অনিকেত সুর শুনতে-শুনতে তিনি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছেন ; স্মৃতিতাড়িত হ'য়ে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তিনি মনে-মনে ফিরে এসেছেন ভারতের মাটিতে, বাংলার বুকে। বেদনাবিক্ষত মনের বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তিনি দেখেছেন, 'কিছু নয়, মাছটা, পাখিটা, / কানাই ঘোরায় লাঠি, ছোটো ছেলেমেয়ে ভিড় করে, / হাঁ ক'রে তখুনি মানে জাদুবিদ্যে, ভেঁপু কেনে।' ('সংলাপ') ; তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছেন 'চমক পাথরে মোড়া উজ্জ্বল মনন সভ্যতায় / অতিথি, তবুও ফিরে গিয়ে / ব'সে থাকি ভাঙা ঘাটে, সেই শিবতলা পুলে / গঙ্গার ওপারে' ('সংলাপ') ; অনুকম্পায় বিগলিত হ'য়ে তিনি স্বগতোক্তি করেছেন, 'আহা, ঐ বোষ্টমী ভিখারি / কিছু না জেনেও গায় কত সে পুরোনো ধ্বনিভরা / গান, / ছন্দ তার যেন নান্দীপাঠ' ('সংলাপ')। আবার স্বদেশপ্রত্যাবর্তনাভিলাষের তীব্র তাড়নাতেই তার 'মনে হয় ফিরে-পাওয়া মৃন্ময়ী বাসায় / গোলকচাঁপার তলে ব'সে আছি, / খোয়াই-পেরোনো স্থির সম্পূর্ণ স্বীকৃতি / শান্তিনিকেতনে' ('মিল')। অর্থাৎ, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই তিনি নীড় নির্মাণ করুন না কেন, 'খোয়াই-পেরোনো' শান্তিনিকেতনে গোলকচাঁপার তলে মৃন্ময়ী বাসায় ফিরে এলেই তাঁর মনের অস্থিরতা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'তে পারে, তাঁর চিত্ত সামান্য সুস্থিরতা অর্জন করতে পারে। পান্থ-জীবনের মধ্য-পর্বে পোঁছে বারংবার রবীন্দ্রসাধনাপীঠ শান্তিনিকেতনে মানসপ্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন ইংরেজি কাব্যাদর্শে গোত্রান্তরিত কবির পুনরায় রাবীন্দ্রিক ঘরানায় ফিরে আসার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও অভিব্যক্ত হয়েছে।

মার্কিন-প্রবাসী কবি মনে-মনে বারে-বারে শুধু যে স্বদেশে ফিরে এসেছেন, তা-ই নয় ; মার্কিনের কঠিন বুকে অন্তরের স্বপ্নমায়াঘোরে কোমল স্বদেশকে তিনি বার-বার ফিরেও পেয়েছেন। 'পারাপার' এবং 'পালা-বদল'—এই উভয় কাব্যগ্রন্থেই তার নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে। 'পারাপারে'র 'ওহায়ো' কবিতায় মায়ামি সুন্দরী নদীর দু'চোখের ভাষায় তাঁর তৃষিত দু'চোখ খুঁজে পেয়েছে, 'সন্ধ্যায় সোনালি দূর যমুনার স্বপ্ন', 'সাণ্টা বার্বারা' কবিতায় প্রশস্ত প্রশান্ত মহাসমুদ্রের পরপারে তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি আবিষ্কার করেছে 'দিগন্তে লুকোনো পূর্বদেশ', যা 'অগাধ অদৃশ্যে লীন', আবিষ্কার করেছে 'ছবির ভারতী রেখা', 'য়ুরোপা জাহাজে' কবিতায় কয়েকশ' মার্কিন ও অন্যদেশির সঙ্গে জ্যৈষ্ঠের শেষা-শেষি য়ুরোপে যেতে-যেতে তাঁর অবোধ বাঙালী মন 'অদৃশ্য সানাই' শুনে 'তারি দূর ধেয়ান' বানিয়েছে ; 'পালা-বদলে'র 'বে-স্টেট রোডে' কবিতায় মধ্যে-মধ্যে স্বামীজি অখিলানন্দের কাছে গিয়ে কিংবা 'ঘরে ফিরে শুভলক্ষ্মী রেকর্ডের শুভ্রতা ভজন শুনে' প্রচ্ছন্ন স্বদেশকে তিনি আপনার বুভুক্ষু হৃদয়ে স্পষ্টত অনুভব করেছেন, 'এই বৃষ্টি' কবিতায় প্রবাসে 'রেলিঙের ধারে' 'অস্ফুট স্বদেশী ছাপ'ও তিনি দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু এ-সমস্তের প্রতিটিই সম্পূর্ণ সত্য হ'লেও কোনোটিই শেষ সত্য নয় : কেননা 'পারাপারে'র 'লাল মনসা' কবিতায় আরিজোনায় এসে তাঁর যে বিমূঢ় জিজ্ঞাসা 'কেন যে এখানে আছি ?' কিংবা 'পালা-বদলে'র প্রারম্ভিক 'এপারে' কবিতায় 'বাঙালি দূরবাসী' হ'য়ে বস্টনে গিয়ে তাঁর যে আর্ত প্রশ্ন 'আজো কোন্ খুঁজি বাসা ?'—তার কোনো উত্তর নেই, যেমন নেই 'পারাপার' গ্রন্থের 'নুইয়র্ক হাসপাতালে' কবিতায় ঐশ্বর্যনগরী নুইয়র্কের হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে-শুয়ে তাঁর যে তীব্র আর্তি 'কতদূরে এসেছি, কোথায় ; / জন্মভূমি গ্রাম সেই আর আজ প্রবাসী-শহর আলো-জ্বালা' অথবা 'পালা-বদলে'র 'বে-স্টেট রোডে' কবিতায় 'কত দিন হ'য়ে গেলো খুঁজেছি সে পথের লগন' পংক্তিতে তাঁর যে সুগভীর খেদ, তার কোনো সান্ত্বনা নেই। কোনো সান্ত্বনা নেই, কেননা তিনিও আধুনিক অনিকেত জীবনযাত্রার শরিক, বাস্তুবিচ্ছিন্ন সেই অভিশপ্ত মানুষদেরই একজন, যাদের জীবনে ঘর নেই অথচ দু'চোখে শুধু ঘরেরই স্বপ্ন।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনার চতুর্থ পর্যায়ের শেষ নিদর্শন 'ঘরে ফেরার দিন'। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে' উৎসর্গীকৃত, 'অন্তরা' এবং 'অধুনা'—এই দুই পর্বে বিন্যস্ত কবিতাবলীর সংকলন কবির এই অষ্টম কাব্যগ্রন্থের নামকরণটি তাৎপর্যময় ; কেননা 'ঘর' বলতে ভ্রাম্যমান কবি শুধু নিজের দেশকেই বোঝান নি, 'ঘর' অর্থে বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মানুষের ঘর, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকেই গ্রহণ করেছেন তিনি এবং এ-হিসেবে ঘরে ফেরার অর্থ নিছক নিজের দেশের পরিচিত পরিবেশে নিজের জীবনকে প্রত্যাবৃত্ত করা নয়, পৃথিবীর নিকট-দূর বিভিন্ন দেশের বহুবিচিত্র জীবন-স্রোতে নিজের জীবনধারাকে প্রত্যাবৃত্ত করানো। এবম্বিধ নামকরণ, তাঁর কবিজীবনের এই পর্যায়ের চিরপথিকের দর্শন-প্রসূত, কোনো সন্দেহ নেই। সেই কারণেই এই কাব্য-গ্রন্থটি রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রশ্রদ্ধ কবির অন্তরের প্রণাম হওয়া সত্ত্বেও এর অধিকাংশ

কবিতাতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র আবহ স্পষ্টত প্রতিভাত। নিদর্শনস্বরূপ ১৯৫৪ সালে আফ্রিকার গাবুন অঞ্চলের লম্বারণে নামক স্থানে আলবার্ট শোয়াইৎজ্যারের সঙ্গে অস্থায়ী বসবাসকালে শোয়াইৎজ্যারের আশ্রমের জীবনধারায় তিনি 'জীবিতের প্রাণের শ্রদ্ধায়' পাশ্চাত্য মানবপ্রেমিকের জীবনযজ্ঞকে প্রজ্জলিত দেখতে পেয়েছেন এই গ্রন্থের 'আফ্রিকা-স্বাক্ষর' কবিতায়, 'ট্রেনে যেতে যেতে, লুব্লিয়ানা পার হয়ে জাগ্রেবের ধারে এসে য়ুগোশ্লাভিয়ার শৈল পথে' 'স্মিত ক্লান্ত' 'করুণায় নত', 'অঙ্গে মনে নিভ-নিভ মঙ্গলপ্রদীপ ধরে'-থাকা প্রৌঢ়া শ্লাভ রমণীর সমস্ত-সংসারে-প্রসারিত কল্যাণদৃষ্টিতে 'ভারতী গ্রামে'র 'যে-কোনো অনন্ত পরিবারে'র 'দিদিমার শেষ শুভ-লাগা' কল্যাণদৃষ্টিকেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন ঐ একই গ্রন্থের 'ক্লান্ ১৯৫৫' কবিতায়।

এ-ধরনের বোধিনির্ভর কবিতা ছাড়াও বেশ কিছু দৃষ্টিনির্ভর কবিতারও সাক্ষাৎ বর্তমান গ্রন্থে লাভ করা যায়। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী-পর্যটক এক কবির বিচিত্র দিনলিপির কাব্যিক প্রকাশ, লিরিকের চেহারায় নিয়ত ভ্রাম্যমান এক পথিকের দিনপঞ্জীর কাব্যরূপায়ন। সাধারণভাবে এই পর্যায়ের এবং বিশেষভাবে এই কাব্যগ্রন্থের রচনাসমূহ সম্পর্কে কবির একটি উক্তি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় : তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেলো তার বিমিশ্র সহজ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুগ্ধ আত্মভাষায় স্বীকৃতি।'

নাট্যধর্মী দু'একটি কাহিনী-কবিতা, যা তিনি মাঝে-মধ্যে রচনা করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থেও খুঁজে পাওয়া যায়। আর, সেই সঙ্গে সন্ধান পাওয়া যায় এমন কয়েকটি কবিতার, যেগুলি তাঁর মৃত্যুচেতনার পরিচয়বাহী। মৃত্যুভাবনাবিষয়ক এই কবিতা-গুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'সান্টা মারিয়া দ্বীপে'র 'অ্যাণ্টনি, ভুলিনি আমরা, গির্জে ছেড়ে চলি যদি ঘরে,/পরে শেষ ঘরে যাওয়া, তফাৎ কেবল আগে পরে' পংক্তিদ্বয়ের 'শেষ ঘরে যাওয়া' ও 'তফাৎ কেবল আগে পরে' অংশে এবং 'কংগো নদীর ধারে' কবিতার 'পৌঁছতে হবেই বাড়ি কেনাবেচা শেষ ক'রে/গান কণ্ঠে ভ'রে/ঘরে ফেরা দিনক্ষণে/দিয়ে পাড়ি' পংক্তিপঞ্চকের 'পৌঁছতে হবেই বাড়ি' ও 'ঘরে ফেরা দিনক্ষণে/দিয়ে পাড়ি' অংশে তাঁর মৃত্যুবিষয়ক ভাবনা স্পষ্টত প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া, 'ওঁ কৃতং স্মর'—শীর্ষক সম্পূর্ণ কবিতাটি এবং 'সূত্রধর সংবাদ' কবিতার অন্তিম 'জ্বালানি কাঠে নমোঃ/দারু বহ্নি, দারু অন্ন, দারু মুক্তি শ্মশানের ধারে' অংশটিও এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় : কেননা শেষোক্ত কবিতাটিতে মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী 'জ্বালানী কাঠে'রই মাত্র উল্লেখ নেই, 'দারু' শব্দটিও এরই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি ধারণার দু'টি প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—'দারু অন্ন', অর্থাৎ জীবনের প্রতীক এবং 'দারু মুক্তি শ্মশানের ধারে', অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতীক। অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যুচেতনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অধিকাংশ আধুনিক কবির মৃত্যুচেতনার মতো তাঁর মৃত্যুচেতনা এই বিপর্যস্ত যান্ত্রিক যুগের সর্বতোব্যাপ্ত অবক্ষয়-চেতনার সঙ্গে কখনো মিলেমিশে এক হ'য়ে যায়নি ; ফলে, আত্মিক মৃত্যুই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে, দৈহিক মৃত্যু প্রধান হ'য়ে

ওঠেনি, কেননা তার মতো চিদ্‌সত্ত কবির দৃষ্টিতে শারীরিক মৃত্যু মৃত্যুই নয়, বরং তা পুনর্জন্মেরই পূর্বাভাষমাত্র। জৈবতাতেই প্রাণের একমাত্র প্রকাশ, নেহাৎই জৈব প্রাণের পূজারীসুলভ এ-ধারণাকে অস্বীকার করেছেন ব'লেই 'সংবিৎ' কবিতায় দৈহিক মৃত্যু-ভীতিকে উপেক্ষা ও অতিক্রমের সুরে তিনি গেয়ে উঠেছেন, 'যম নেয় প্রাণ—'রেখে দিই লুকিয়ে/তবু একরত্তি। /চোখে দিনের সোনা/কানে ভোরের আজান'। অর্থাৎ, এই জগৎপারাবারের তীরে এসে 'ইন্দ্রিয়ের কম্পন কুহকে' উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার যে-অভিজ্ঞান তিনি তাঁর জীবনসাধনায় রেখে গিয়েছেন, মানুষের চিন্ময় সত্তায় তা অক্ষয়, মানুষের স্মৃতির জগতে তা অমর ; কেননা তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে নিসর্গপ্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যরাশি, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানবহৃদয়ের মহত্ব-মহানুভবতার সমুন্নত আদর্শরাজি।

'পাগলা জগাইয়ের গান', 'চতুর্দশপদী', 'মূল্য-বদল' ইত্যাদি এবং আরো কয়েকটি কবিতায় কবি তথাকথিত আধুনিক জীবনের প্রাণহীন ও অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর এবং আধুনিক যান্ত্রিক যুগের কপটতা ও হৃদয়হীনতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্যটির নাম 'মূল্য-বদল', 'ঘরে ফেরার দিন' গ্রন্থের অন্তিম কবিতা। টেকচাঁদ ঠাকুরের আমলের আলালের ঘরের দুলালরা আজো আমাদের জীবনের চারপাশে বিরাজিত, 'পাপের তালে হাল্কা চালে' আজো তারা 'বিষের তোড়া' বাঁধে ; আমাদের সামাজিক জীবন আজো নানাভাবে তাদের 'লোভের ভারে কাবু' হয়, কেননা যুগবদলের সঙ্গে-সঙ্গে 'প্রতীক গেলো', কিন্তু 'আসল তারা খুবই আছে সাথে' ; আধুনিক যুগের অধঃপতিত মূল্য-বোধের এই প্রতিভূর দলের হৃদয়মূল্যের বদল ঘটানো, তাদের জীবন-মূল্যের রূপান্তর-সাধনই কবির অভীষ্ট। কবিতাটির সামগ্রিক আবহে একটি লৌকিক সুর কবিতাটির ধ্রুবপদ 'খুলে পড়বে কানের সোনা শুনে বাঁশির সুর'কে আশ্রয় ক'রে গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে। এই গুঞ্জরণ শুনতে-শুনতে আমাদের মনেও প্রতিগুঞ্জরণ জেগে ওঠে, কবির সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও ব'লে উঠি 'খুলে পড়বে কানের সোনা শুনে বাঁশির সুর'—যার অর্থ এই যে বর্তমানের অধঃপতিত মূল্যবোধের প্রতিভূর দলের ছদ্মবেশে অতীতের আলালের ঘরের দুলালদেরও আগামী দিনের কঠোর কায়িক শ্রমভিত্তিক জীবনের আহ্বান শুনতে হবে এবং অনাগত সেই জীবনের আহ্বানে সাড়া দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের আত্মশ্রমবিমুখ ও পরশ্রমজীবী জীবনের আলস্যবিলাসের সুখনিদ্রা টুটে যাবে, তাদের মোহমুক্তি ঘটবে। কবির এই প্রত্যাশা এবং তজ্জনিত আনন্দই কবিতাটির মূল আশ্রয়। কবিতাটিতে কবির বাণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মতো।

'হারানো অর্কিড', 'পুষ্পিত ইমেজ', 'অমরাবতী' এবং 'অনিঃশেষ'—এই গ্রন্থচতুষ্টয়ে সন্নিবদ্ধ রচনাসমূহ অমিয় চক্রবর্তীর কবিজীবনের পঞ্চম (এবং সর্বশেষ) পর্যায়ের সৃষ্টি। এই পর্যায়ে তাঁর কাব্যদর্শন তথা জীবনদর্শন একই সঙ্গে অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত গভীর। চোখে চিরপথিকের উৎসুক চাহনি নিয়ে নিসর্গ-প্রসৃষ্টিপরিবৃত এই

অপরূপ মানবসংসারের দিকে তাকিয়ে, অভিজ্ঞতার বিচিত্র স্তর-পরম্পরা অতিক্রম ক'রে যে-বিশ্বাসে এসে, যে-দর্শনে পৌঁছে তাঁর অস্থির কবিসত্তা সুস্থির হ'য়েছে, তাকে বলা যেতে পারে সর্বাস্তিবাদের বিশ্বাস, সর্বাস্তিবাদীর দর্শন। এই বিশ্বাস বা দর্শনে ক্ষুদ্রে-বৃহতে সমমর্যাদা, উচ্চে-নীচে সমদৃষ্টি, প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সমভাব এবং ভূত-ভবিষ্যতে সমচৈতন্য কল্পিত।

মনে রাখা প্রয়োজন, প্রচলিত ধারণায় সর্বাস্তিবাদ মূলত বৌদ্ধদর্শন ; কেননা তা বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসজাত। বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদে গভীর শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও, যেহেতু তিনি কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেননি, অতএব এটাই তো স্বাভাবিক যে তাঁর সর্বাস্তিবাদী ধারণার সঙ্গে বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদের কিছু-কিছু পার্থক্য থাকবে এবং তা রয়েছেও। সেজন্যেই তাঁর কবিজীবনের সর্বশেষ পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রতিফলিত তাঁর যে-জীবনদর্শন, তাকে বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ না-ব'লে বরং বলবো হিন্দু সর্বাস্তিবাদ ; কেননা এই কবিতাগুলি রচনা করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের অন্যতম আকরগ্রন্থ উপনিষদের মর্মসত্য 'সর্বভূতান্তরাত্মা' তাঁর চৈতন্যে সত্য হ'য়ে উঠেছে। এই বিপুল বিশ্বপরিধির অন্তর্গত উচ্চ থেকে নীচ, বৃহত থেকে ক্ষুদ্র, মহৎ থেকে তুচ্ছ—অর্থাৎ মহতো মহীয়ান থেকে অণোরণীয়ান সর্বভূতে একই সত্তার অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন ব'লেই বিভিন্ন দৃশ্যের আড়ালে, বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর ছদ্মবেশে তাঁর মনের চোখের সামনে কত সহজভাবে ধরা দিয়েছেন তিনি, যিনি অবর্ণনীয়, যিনি অবাঙ্-মানসগোচর ; তাঁর দৃষ্টিতে কত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছেন তিনি, যিনি 'যতো বাচো নিবর্তন্তে ; অপ্রাপ্য মনসা সহ'। এই বিশ্বচরাচরের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার আবিষ্কার ও উপলব্ধির ফলেই যা নেহাৎই নির্মাণ, তা-ই হ'য়ে ওঠে সৃষ্টি ; যা লয়হীন লিপিকর্ম, তা-ই হ'য়ে ওঠে রসাত্মক বাক্য ; হ'য়ে ওঠে কাব্য। অর্থাৎ, যিনি অবর্ণনীয় ও অবাঙ্মানসগোচর, তিনি যে একই সঙ্গে কত সহজ ও সুন্দরও—এই পরম সত্যের চকিত উপলব্ধি ঘটে।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, সর্বাস্তিবাদী দর্শনে তাঁর এই আস্থা তাঁর জীবনের অন্তিম অধ্যায়ের সহসা-উদ্ভূত কোনো ঘটনা নয় কিংবা কোনো অধ্যাত্মমার্গী মানবশ্রেষ্ঠের সতত সন্নিধানের পরিণামও নয় (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রবাস-পর্বের সূত্রপাত থেকেই বিবিধ সারস্বত কর্মের সূত্রে আন্তর্জাতিক সারস্বত সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই তিনি পরিচিত ছিলেন), কেননা ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা সর্বাস্তিবাদী দর্শনের বিশেষ অনুগত হ'য়ে জীবনযাপন করেছেন, সেই জেন্ (zen)-গুরু সুজুকী (যিনি তাঁর দীর্ঘ তিরানব্বুই-বৎসর-ব্যাপ্ত আয়ুষ্কালের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই ধারণায় স্থির বিশ্বাসী ছিলেন যে দৃশ্যমান এই জগতের যে-কোনো একটি সূত্র অবলম্বন ক'রেই দৃষ্টি-অতীত অনন্তের সন্ধান পাওয়া সম্ভব) এবং নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিভৃত জীবন-রীতি অনুযায়ী আমৃত্যু দিবারাত্রির প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র পঁচিশ মিনিট কথা বলতেন যিনি, সেই অসাধারণ সাধুপুরুষ ট্র্যাপিস্ট মঙ্ক্ টমাস মার্টনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-

পরিচয়ের বহু পূর্ব থেকেই তিনি যে এই দার্শনিক বিশ্বাসের সঙ্গে অস্পষ্টরূপে পরিচিত ছিলেন, তার নিদর্শন তাঁর প্রাক্-পঞ্চম পর্যায়ের বহু কবিতায় ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। সেগুলির সতর্ক পাঠ আমাদের কাছে এ-কথাই স্পষ্ট ক'রে যে একাগ্র অন্বেষা এবং গভীর অনুভূতির সামর্থ্যেই তিনি বস্তুজাগতিক সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই পরমতার অচিন্ত্য ও আশ্চর্য মুহূর্তকে আবিষ্কার করেছেন।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধার করা যেতে পারে তাঁর কবিজীবনের অন্তিম পর্যায়ের বহু পূর্বে রচিত ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পারাপারে'র প্রথম কবিতা 'মাটি'র 'বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে / আবার আকাশ ভরে রোদে। / তারি জন্যে শিশু আঙিনায় / দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়' অংশটুকু, যেখানে বৃষ্টির ঝ'রে পড়া, রোদে আকাশ ভ'রে যাওয়া, আঙিনায় শিশুর দৌড়ে খেলা, হাট বসা, গৌরীপুরে (তাঁর ব্যাল্যের সুখস্মৃতিরঞ্জিত আসামের প্রাক্তন গৌরীপুর স্টেট?) ব্যবসা জমে ওঠা—ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত ব্যাপার ও ঘটনাগুলিই, অতি সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর চোখে অতি অসাধারণ হ'য়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু কী-ক'রে এটা সম্ভব হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর, এই সূক্ষ্ম মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে উদ্ধৃত পংক্তিচতুষ্টয়ের প্রথমটির শেষ দু'টি শব্দে—'চৈতন্যের বোধে'—অর্থাৎ, জীবনের কয়েকটি স্বর্ণমুহূর্তের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গভীরতাই কবিতাটিতে ব্যবহৃত শব্দের উত্থানপতনময় ধ্বনিমাধুর্যে ও পর্বের অসমবিস্তারে রৌদ্রপ্লাবিত ও বৃষ্টিবিধৌত আকাশ, আঙিনায় ক্রীড়াচঞ্চল শিশু, কোলাহলমুখরিত হাট ও ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদি পরস্পর নিঃসম্পর্কিত কয়েকটি খণ্ডচিত্রকে কবির চৈতন্যের গহনে সমাহৃত করেছে, সমন্বিত করেছে। ফলে, এই পংক্তি কতিপয়ে অলৌকিক মুহূর্ত লৌকিক দৃশ্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে, পরমতার আভা লেগেছে, আভাসিত হয়েছেন তিনি, যিনি অনির্বচনীয়। সর্বাস্তিবাদী দর্শনে তাঁর গভীর আস্থার কথা আরো স্পষ্ট-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতাটিরই অন্তিম অংশে, যেখানে তিনি 'কঠিন লাবণ্যে' 'মনের অঙ্গুলি' ছুঁয়ে 'যে-রহস্য সর্বাতীত তারি সঙ্গে রেশারেশি' ক'রে 'অচিন্ত্য বিস্ময়' খুলে যেতে চেয়েছেন। তাছাড়া, zen-মনীষী সুজুকীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনেক আগের রচনা সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'পালা-বদলের' একত্রিশতম কবিতা 'zen-ধরনে'র 'সাটোরি' অংশের অন্তিমের 'শুধু অবাকের দেখা / শুধু ঝুঁকে থাকা দেখা / কাঠ খড় বেড়াল বা জল—'যেখানেই দেখা,—দ্যাখে; / যেখানেই ছোঁয়—সব ছোঁয়, / তাই এত খুশি।' অংশও তাঁর সর্বাস্তিবাদী বিশ্বাসের (যে-বিশ্বাসে জগৎ ও জীবনের নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছ বস্তু বা বিষয়ের প্রতিও উৎসুকতা উল্লেখযোগ্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ) পরিচায়ক। এ-ছাড়াও, এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় তাঁর অতি-বিখ্যাত 'পিঁপড়ে' কবিতাটি ('পারাপারে'র 'দুই তীর' পর্বের একাদশতম রচনা), যেটিতে সর্বাস্তিবাদী দর্শনপ্রসূত তাঁর ভালোবাসার দৃষ্টি ক্ষুদ্র ও সামান্য জীব পিঁপড়ের জীবনযাপনরীতির প্রতিও প্রসারিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর এই কবিতাটির সঙ্গে জর্মান কবি-সিংহ রিল্‌কের

সমভাবাপন্ন জীবনদর্শনপ্রভাবিত 'Oh, bliss of tiny creatures that remain/ For even in the womb that brought them forth' পংক্তি-সমন্বিত বিখ্যাত কবিতাটির ভাবগত সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

সে যা-ই হোক, পূর্বের বক্তব্যের পুনরুক্তি ক'রে আবার জানাই, তাঁর কবিতায় সর্বাস্তিবাদী বিশ্বাসের প্রতিফলন তাঁর কবিজীবনের অন্তিম অধ্যায়ের কোনো একান্ত ব্যাপার নয়, বিভিন্ন পর্যায়ের রচনাতেই এই বিশেষ দর্শনের প্রতি তাঁর আস্থার কথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবে মধ্যপর্যায় পর্যন্ত যা ছিলো এই দর্শনের প্রতি তাঁর আস্থা, তা-ই শেষ পর্যায়ে হ'য়ে উঠেছে তাঁর কবিসত্তার প্রতি তাঁর দার্শনিকসত্তার অমোঘ আজ্ঞা ; কেননা কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমের বিরল মুহূর্তে কচ্চিৎ-কদাচিৎ তাঁর কবিতায় বিসংগতির (discord) সুর ধ্বনিত হ'লেও (যেমন হয়েছে 'পালা-বদলে'র 'বিসংগতি' কবিতায়) প্রথম দিকের ('অভিজ্ঞান-বসন্ত' গ্রন্থের 'সূর্যখণ্ডিত ছায়া' অংশের বহু-আলোচিত 'সংগতি' কবিতায় প্রতিধ্বনিত) সংগতির (harmony) সুরই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে প্রবল ও প্রধান হ'য়ে উঠেছে।

কবির শেষ পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ, তাঁর পঞ্চান্ন থেকে আটষট্টি বৎসরের মধ্যবর্তীকালীন রচনা, 'হারানো অর্কিড' ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত। এটি মূলত মরণের অন্ধকার পট-ভূমিকায় জীবনের জ্যোতির্ময় জাগরণের, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জন্মের জয়লাভের কাব্য। কেননা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সহ্য ক'রেও প্রবল প্রাণশক্তিতে অর্কিড যেমন নিয়ত প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে, বস্তুজাগতিক বিপুল বিরূপতা স্বীকার ক'রেও মানুষের মনে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিতে প্রেম-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তেমনই সতত বিকশিত হ'য়ে ওঠে—এই চিরন্তন মানবহৃদয়তত্ত্বই গ্রন্থটির নামকরণে সত্য হ'য়ে উঠেছে। এ-সম্পর্কে গ্রন্থটির 'নান্দী' অংশ স্মরণীয় ; তাতে কবি লিখেছেন, 'সিকিমে অপর্যাপ্ত গিরিসংকট এবং শীততুষারকে পরাস্ত ক'রে অবর্ণনীয় অর্কিড-পুষ্পের বিস্তার ; গ্যাংটকে হিমালয়-পরিবেশে দেখেছি সেই অপ্রতিহত বীর্যের প্রতীক। আনন্দলহরী। কোনো শক্তির সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করে। আহত পুড়ন্ত ভিয়েৎনামের অরণ্যে চোখে পড়েছিলো অনিন্দ্যসুন্দর বিজয়ী অর্কিড, গাছের ডালে জড়ানো, বর্বর সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে। কোনো দিনই হারাবে না।' তাঁর মতে এই গ্রন্থটির অন্য একটি নামকরণও করা যেতে পারতো—'দূরের সাক্ষী'—কেননা এতে অন্তর্ভূত কবিতাগুলির অধিকাংশই পৃথিবীব্যাপী দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকার দিনে উজ্জ্বল 'কিছু কথার ছবি', দূরভ্রমণের কিছু 'কল্পনার রঙিন সাক্ষ্য' ; এগুলি বাংলা দেশের উদ্দেশে সেই বাঙালী কবির উপহার, যিনি দীর্ঘদিন প্রবাসী এবং যাঁর দিন 'বারোমাস' কাটে 'বাঙলাহীন'।

'চিন্তিত মানুষ', আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম রচনাটি, একটি আশ্চর্য কবিতা,—আশ্চর্য শুধু বাক্‌রীতি কিংবা বাণীভঙ্গিমাতেই নয়, বিষয়মাহাত্ম্যেও। অর্থাৎ, বক্তব্যের যুগপৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতাতেও কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র কবিতাটিতে সমগ্র পৃথিবীর নৈসর্গিক ভূগোলের পটভূমিকায় সমগ্র পৃথিবীর মানবিক ইতিহাস গভীর

কাব্যব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। কবিতাটি একই সঙ্গে আত্মজৈবনিক (autobiographical) এবং আত্মকথনমূলক (self-narrative); কেননা এতে বিষণ্ণ যে-'চিন্তিত মানুষ'টির বিচিত্র চিন্তা-ভাবনার পরিচয় আমরা লাভ করি, সেই মানুষটি কবি স্বয়ং, আর কবিতাটির কেন্দ্রস্থ চিরভ্রামণিক মানুষটির দূরপ্রসারিত যে-ভ্রমণকাহিনী এতে আমরা পাঠ করি, তা-ও আসলে কবির নিজেরই পৃথিবীপর্যটনের বিশদ বিবরণ। কবিতাটি প্রতীকধর্মীও বটে, বিশেষত এটির শিরোনামে প্রতীকাভাস অত্যন্ত স্পষ্ট। কবিতাটিতে উপস্থিত 'চিন্তিত মানুষ'টি, আধুনিক জীবনের নিত্যসঙ্গী যে-অভিশাপ-চিন্তা, সেই অভিশাপের দ্বারা আক্রান্ত বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতীক। ফলে, কবিতাটি a poetic document of the human situation of the modern age, অর্থাৎ আধুনিক কালের মানবিক পরিস্থিতি-সম্পর্কিত একটি কাব্যদলিল হ'য়ে উঠেছে। কবিতাটিতে একজন 'চিন্তিত মানুষ'রূপে কবির আবির্ভাব। কিন্তু কেন তিনি চিন্তিত? না, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে এই পৃথিবীর পান্থনিবাসে মানুষের জন্য আতিথ্যের আহ্বান ক্রমেই ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে। আধুনিক মানুষের এই বিষাদান্ত পরিণতির কথা ভেবে তিনি শুধু চিন্তিতই নন, তিনি দুঃখিতও। তাঁর সেই দুঃখই বাণীবদ্ধ হয়েছে কবিতাটির প্রারম্ভিক পংক্তি কতিপয়ে—'এবারের দিনচক্র প্রতিহত মাধুরীর ভারে, /যখন একলা বুকে শেষ হয় আহ্নিক সন্ধ্যায়,/আকাশ বলে না কথা, সোনার গম্বুজে/গলির কোনার বাড়ি উদ্ভাসিত ডাকে না বন্ধুকে,/সবুজ দরজা নিরুত্তর—/মাথা নেড়ে বলি, এই, এই তো হয়েছে পৃথিবীতে।' পরে, কবিতাটিতে অগ্রসর হ'তে-হ'তে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সভ্যতার ইতিহাসে শুধু বর্তমানেই নয়, অতীতেও মানুষের আতিথ্য-ভাগ্য মোটামুটি প্রায় একরকমই ছিলো। তাই মানুষের প্রতি, মানুষের দুঃখে দুঃখী কবির আকুল জিজ্ঞাসা, তার এই পরিণতি 'কতদিন ধ'রে হ'ল'? মানুষকে তাঁর আর্ত প্রশ্ন, 'এই হয়েছিল, শোনো, কতদিন ধ'রে হ'ল, মানুষ, তোমার ভাগ্যে'? তিনি জানতে চেয়েছেন, আতিথ্যহীনতাজনিত এই সংকট থেকে কোন্ পথে আসবে তার মুক্তি, কীভাবে ঘটবে তার উত্তরণ। দুঃখী মানুষের জন্য সেই ঈপ্সিত মুক্তির পথ-নির্দেশ করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে ভ্রামণিকের জন্য 'মুক্তি-পথ আছে', কিন্তু সেই পথ কাছে এসে পাওয়া নয়, সেই পথ 'দূরে চ'লে গিয়ে পাওয়া'। তাই মানুষের মুক্তি-পথের সন্ধানে তিনি ভ্রামণিক হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছেন, 'দূরে চ'লে গিয়ে' তিনি দেখেছেন, 'ইতিহাস দরজা খুলে ধুলো-পথ দেখায় মিশরে'। 'ফ্লরেন্সে' গিয়ে 'ব্রিজের কাছে' যখন তিনি 'প্রবাসী', 'থাম ধ'রে' দাঁড়িয়েছেন, তখন 'ফিয়েজোলে ঊর্ধ্বে মেঘে গাছে/স্বর্গবাস আভাসিত' হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা তিনি দেখেছেন 'বন্ধ জানালায়', অর্থাৎ আতিথ্য-বিহীনতায়। 'পশ্চিম ইন্ডিসে' 'অতলান্ত ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রেনাডিনে' গিয়ে 'সারা দীর্ঘ বেলা' তিনি যখন দাঁড়িয়েছেন, তখন সেই দ্বীপান্তরের কিনারায় যে নারিকেলকুঞ্জ তাঁর চোখে পড়েছে, সেগুলি 'প্রশ্নচিহ্ন' এবং 'ক্রন্দন-উদ্বেল'। সেই দ্বীপান্তরের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে 'হয়তো তীরে বাড়ি নেই', কিন্তু 'তবু

ভরসায়/ভালোবাসা পায় ঘর'। আধুনিক জীবনের অন্যতম অভিশাপ এই সর্বব্যাপী আতিথ্যহীনতার অন্ধকারে ভালোবাসার আলো আবিষ্কার করাই পৃথিবী-পর্যটক কবির অন্তরের অভিলাষ। তাই 'সত্তার সমগ্র মেলে' চিরদিন তিনি যার আবাহন করেছেন এবং যে 'সর্বকাল পথিকের চিরলোকে' 'শূন্যতাপূর্ণ চক্ষের আহ্বান' জানিয়েছেন, তাঁর সেই অন্তরান্বেষিত 'পরমা'কে উদ্দেশ ক'রে কবিতাটির অন্তিমে পৌঁছে তিনি বলেছেন, 'যেখানেই থাকি তাই বার্তা পাবে, চির-আকাঙ্ক্ষিতা'। অর্থাৎ, তাঁর এই আত্মিক আতিথ্য-অন্বেষা সহস্র বিরূপতার অন্ধকারেও একইভাবে জাগ্রত থাকবে।

'চিন্তিত মানুষ' কবিতায় আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের এই আতিথ্যহীনতার বর্ণনার পাশাপাশি 'শোয়াইটজারের মহাপ্রয়াণে' কবিতায় মানব মঙ্গলব্রতী কবির কল্যাণবোধের বিনম্র প্রকাশ ঘটেছে। যে মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণে 'বিশ্ববাসী' হয়েছে 'পরম-আত্মীয়হারা', সেই মহাপ্রাণ 'নিত্যযোগী মহাকর্মী'র উদ্দেশে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে শোকবিহ্বল কবি বলেছেন, 'ভয়ংকর যুগে তাঁর বুদ্ধসম কারুণ্যের দান/ রয়ে গেলো আর্তত্রাণে, শোকে আলোকের রেখা/ভাগ্যের আয়তি।'

'হেঁয়ালি নাট্য'রূপে বিশেষিত 'সর্বনাম'-শীর্ষক আরেকটি রচনাতেও কবির কল্যাণ-ব্রতী সত্তা প্রকাশিত হয়েছে—তবে একটু অন্যভাবে, নাট্যরসের আশ্রয়ে। রচনাটিতে রবীন্দ্র-নাটক 'বিসর্জনে'র শৌখিন অভিনয়কে কেন্দ্র ক'রে কিঞ্চিৎ রঙ্গরস পরিবেশন করা হয়েছে। এটিকে 'হেঁয়ালি নাট্য' বলা হ'লো কেন, তার কোনো ব্যাখ্যা কবি না-দিলেও রচনাটির তৃতীয় অঙ্কে পৌঁছে এটি সম্পর্কে এই বিশেষণ প্রয়োগের একটা হেতু খুঁজে পাওয়া যায়—কবির হেঁয়ালিপূর্ণ 'বোধের নাটকে ডুবে বোধাতীত বেশি—/ ঐ দেখো নিত্যচেনা দূর প্রতিবেশী' মন্তব্য থেকে 'সংসার'-সম্পর্কিত তাঁর ধারণার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সংসার, তাঁর বিবেচনায়, একটি 'হেঁয়ালি নাট্য'। আর, 'সর্বনাম' নামকরণের গূঢ়ার্থ স্পষ্ট করেছে রচনাটির চতুর্থ অঙ্কে 'তথাগত'সম মহামানবদের সম্পর্কে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীদের উক্তি 'তাঁরা সর্বনাম, / পালা তাঁদের সর্ব শহর গ্রাম।' রচনাটির পরবর্তী অংশে ঐতিহাসিক দিল্লী নগরীর বুকে সহিংস আততায়ীর গুলিতে অহিংস গান্ধীজির মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠোদ্গত 'দিল্লীতে সেই বধের দিনে, হে অহিংস গুরু, / হলো কি শেষ বলির পালা, হয়তো হলো শুরু / নাট্য জুড়ে তোমার বিসর্জন, / দেখার সময় পাবে কখন মন' থেকেও 'হেঁয়ালি নাট্য' 'সর্বনাম' সম্পর্কে কবির বক্তব্য স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-নাটক 'বিসর্জনে' এই সংসাররূপী রঙ্গালয়ে যে-পালা অভিনয়ের সূত্রপাত হয়েছিলো, 'অহিংসগুরু' গান্ধীজির জীবননাট্যে 'সর্ব শহর গ্রামে' সে-পালারই বিরতিহীন অভিনয় চলেছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং যথার্থই শ্লাঘনীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে শাশ্বত মহিমায় তথাগত কিংবা গান্ধীজির জীবনের সত্য শেষ পর্যন্ত জগতের সত্যে পরিণত হয়েছে, মহত্ত্ব-মহানুভবতায় তাঁদের ব্যক্তিগত নাম ধীরে-ধীরে সর্বগত নামে, অর্থাৎ 'সর্বনামে' পরিণতি পেয়েছে।

উত্তম পুরুষের একবচন থেকে, মধ্যমপুরুষ অতিক্রম ক'রে, প্রথম পুরুষের বহুবচন পর্যন্ত জীবনসত্যের এই যে ক্রমপ্রসারণ—এর গভীরেই নিহিত রয়েছে 'হেঁয়ালি নাট্য' 'সর্বনামে'র সামগ্রিক তাৎপর্য।

ক্রমাগত এই সম্প্রসারণই যে জীবনের ধর্ম, ক্রমান্বিত এই আত্মোন্মোচনই যে প্রাণের পরিণতি—এই সহজ সত্যের সরল স্বীকৃতি 'দিনযাপন' কবিতাটি। এই কবিতায় ঝাউগাছ প্রাণধর্মের প্রকাশ, প্রাণসত্তার প্রতীক। কবিতাটিতে ঝাউ-জীবনের বিকাশ-রহস্য উন্মোচন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'ভাবা নেই, হওয়া আছে, কী হওয়া জানে না / কে-ই বা তা জানে, / নীল শামিয়ানা স্বচ্ছ, কম্পিত সীমায় / মেঘে-লাগা বায়ু / তা-ই ছুঁয়ে আরো বেশি ঝাউ হওয়া।' 'আরো বেশি ঝাউ হওয়া', অর্থাৎ হওয়া, আরো হওয়া এবং আরো বেশি হওয়াতেই অন্যান্য প্রাণস্পন্দিত জীবের মতো বায়ুকম্পিত ঝাউয়ের জীবনের সম্পূর্ণতা, সার্থকতা। কিন্তু নিসর্গলালিত যে ঝাউ উজ্জ্বল, তারকাজালে বিন্যস্ত শাখায়, 'স্বর্ণশ্যাম পুষ্পপত্র বনের কিংখাবে' ছায়াছত্র মেলে ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে ছিলো, প্রতিবেশীর পার্থিব প্রয়োজনে একদিন 'কাঠ তার তক্তা হ'ল, ডাল কাটা—পুড়বে উনোনে।' সপ্রাণ ঝাউয়ের এই নিষ্প্রাণ পরিণতিতে কবির মন বিষাদে পূর্ণ হ'লো ; তাঁর মনে হ'লো, 'হঠাৎ সহস্র দিন শেষ যেন এক লহমায়।' কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাণশক্তির বিচিত্র বিকাশবিষয়ে সর্বাস্তিবাদী কবি বারেকের জন্যও সংশয়িত হন নি, কেননা একটি ঝাউয়ের মৃত্যুর বাধা অনেক ঝাউয়ের জন্মের প্রবাহকে অবরুদ্ধ করতে পারে নি। তাই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মরণকে অতিক্রম ক'রে জীবনের জয়, 'খোয়াই খয়ের রঙ, রাঙা দিগ্বলয় / চতুর্দিকে নবজাত বৃক্ষের সমাজ।'

তানপ্রধান রীতির দীর্ঘতম চরণে গ্রথিত, মিত্রাক্ষর ত্রিকবন্ধের দশটি স্তবকে রচিত 'তাজমহলের সন্ধ্যা' বর্তমান গ্রন্থের একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা। তাজমহল, কবির কল্পনায়, 'প্রেমতীর্থ যমুনার তীরে।' তাজমহল দর্শন, অতএব কবির কাছে, তীর্থ-দর্শনের সমান পুণ্যকর্ম। তাই তিনি 'বিরহ-মিলনে আঁকা গোধূলিতে একা যাত্রী' হ'য়ে 'অশ্রুর ভাস্কর্যে ঘেরা একটি নিবিষ্ট লগ্নে' 'শেষ তারি মুগ্ধ বাঁশি' শোনেন। বাক্‌শিল্পে কবিতাটি যেমন বরণীয়, রূপকল্পেও সেটি তেমনই স্মরণীয়।

'হারানো অর্কিডে' 'লিরিক-কণিকা' নামে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতা-কণিকাগুলির সংগীতধর্মিতা ও ছান্দসিক চটুলতা (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় rhythmic lilt) রীতিমতো উপভোগ্য। সেই সঙ্গে কবির সর্বাস্তিবাদী বিশ্বাসের সাক্ষ্য হিসেবেও এগুলি মূল্যবান। একটি 'লিরিক-কণিকা'র একটি অংশে তিনি লিখেছেন, 'পরেছো যে কানে ঝলক-দোলানো / হীরে-কাটা ইয়ারিং—/ বুকে তারি ধ্বনি পুলক-বোলানো / বাজে ডিং ডিং ডিং! / মায়ামুদগরতত্ত্ব মানিনি / প্রাণ সে তো নয় শুকনো পাণিনি / লট লুট বিধিলিং।' প্রাণ কিংবা আত্মা যে শুষ্ক পাণিনি-ব্যাকরণের নিছক নিয়ম-নিগড়িত কোনো ব্যাপারমাত্র নয়, তা যে মুক্ত, স্বাধীন—প্রাণের এই বিজয়বার্তাই উদ্ধৃতাংশের শেষ দুটি ছত্রে প্রধান হ'য়ে উঠেছে।

কবির পরবর্তী গ্রন্থ, প্রেমের কবিতার সঞ্চয়ন, 'পুষ্পিত ইমেজ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাসমূহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে তিনি বলেছেন, 'লৌকিক পদাবলী, প্যাস্টোরাল, পুরোনো এলিজাবেথান লিরিক এবং আধুনিক প্রত্যক্ষ ও প্রতীকে মিশিয়ে কিছু সাময়িক প্রেমের কবিতা গেঁথেছি।' কবিতাগুলি সম্পর্কে বিনয়বশত কবি যদিও বলেছেন 'সাময়িক প্রেমের কবিতা', তবু এগুলি সযত্নে পাঠ করলে কিন্তু তাঁর সেই বিনীত উক্তিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না, কেননা এগুলির বেশ ক'টিই অন্তর্নিহিত আবেদনে এবং প্রেমানুভূতির গভীরতায় সাময়িকতার সীমা অতিক্রম ক'রে চিরন্তনতাকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের সাহিত্যশাস্ত্রীদের মধ্যে প্রেম সম্পর্কে দৈহিক সম্ভোগ এবং আত্মিক মিলনকেন্দ্রিক যে-দু'টি পরস্পরবিরোধী মতবাদের প্রচলন রয়েছে, প্রেমের কবিতার লেখক হিসেবে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই সে-দু'টির মধ্যে দ্বিতীয়টিতে, অর্থাৎ শারীরিক সম্ভোগের মতবাদে নয়, আত্মিক মিলনের মতবাদে আস্থাশীল। এই কারণেই যাঁদের প্রেমচেতনা নিছক দেহসর্বস্বতাতেই সীমাবদ্ধ, তাঁরা যেমন তাঁর রচনায় প্রেমের কবিতার সন্ধান পান না, তেমনই তাঁর প্রেমের কবিতায় কোনো নারীই কখনো নিছক দেহসর্বস্বা হ'য়ে আবির্ভূতা হয়নি। তাঁর কবিতার প্রেমিক-প্রেমিকারা দেহের সঙ্গে দেহের ক্ষণবন্ধন রচনা করে নি, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের চিরবন্ধন গ'ড়ে তুলেছে।

গ্রন্থটির নামকরণের ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে 'পুষ্পিত ইমেজ'-শীর্ষক কবিতাটিতে, যে কবিতার একস্থানে তিনি বলেছেন, 'আমি তাকে চাই / সেই ধরণীতে—/ একটুও বদল নয়, ঠিক সেই গ্রীষ্মবেলা / যেন পাই / পুষ্পিত নিভৃতে' এবং অন্যত্র তাঁর উক্তি 'চোখ বুক শরীরের ধন, / একেবারে ঝাঁপ দেওয়া প্রাণ চিরন্তন।' স্পষ্টতই বোঝা যায়, কবির এই 'চাওয়া' দেশ-কাল-সীমায়িত কোনো বিশেষ প্রেমিকাকে চাওয়া নয়, দেশকাল-সমুত্তীর্ণা নির্বিশেষ প্রেমিকাই তাঁর চিরঅভিলষিত এবং এবম্বিধ নায়িকার অনুধ্যানেই তিনি 'গ্রীষ্মবেলা' পেতে চান 'পুষ্পিত নিভৃতে' ; অর্থাৎ, করুণাবিহীন অপ্রেমকে তিনি আবিষ্কার করতে চান করুণাসঘন প্রেমের পুষ্পিত ছায়ায়। তাছাড়া, তাঁর অভীপ্সিত প্রেমিকার 'চোখ বুক শরীরের ধনে'র প্রলোভন উপেক্ষা ক'রেও প্রেমে প্রাণবাদী কবি ঝাঁপ দিতে চান চিরন্তন প্রাণেরই গভীরে।

'পশ্চিম শহরে' নামক বর্ণনাপ্রধান আখ্যায়িকা-কবিতাটির উপস্থিতি সত্ত্বেও সুললিত ক্ষুদ্রাকৃতি লিরিকগুলিই এই পুস্তিকাটির শ্রেষ্ঠ রচনা। আবার এই লিরিকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটি 'যুগের পথ', যেটিতে তিনি নিজেকে 'প্রেমের যাত্রী' হিসেবে কল্পনা ক'রে বলেছেন, 'চলেছি কোথায় / ভুলে যাই আর সবি, শুধু জানি বুকের পকেটে / তার শাদা কাগজের চিঠি আছে, এ-জীবনে / পেয়েছি সে ডাক-চিঠি যেতে হবে শুধু / অনির্ণীত যুগ্ম পথে, হোক দুঃখে, হোক সুখে জাগা।' 'শুধু জানি বুকের পকেটে / তার শাদা কাগজের চিঠি আছে'—কবিকল্পনাটি ভারি চমৎকার। এই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় এই

গ্রন্থের 'সংগতি'-শীর্ষক কবিতাটির কথা, যেটি আসলে একটি প্রচ্ছন্ন প্রেমের কবিতা। এই কবিতায় আছে 'বৈরাগ্যপবনে'র সঙ্গে 'বসন্তসৌরভে'র মিলনের কথা, যার ফলে 'দু'টি ফুল সে-লগনে / দেখা দিলো' ; এবং সেই মিলন-লগ্নের কথা প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েরই 'প্রাণের গৌরব', অর্থাৎ নিভৃত প্রেম। লক্ষ্য করবার বিষয়, কবির 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' গ্রন্থের বিখ্যাত 'সংগতি' কবিতাটির মতো এই কবিতাটিরও বীজমন্ত্র মেলানো—প্রথমটিতে 'ঝোড়ো হওয়া'র সঙ্গে 'পোড়ো বাড়িটা'কে আর দ্বিতীয়টিতে 'বৈরাগ্যপবনে'র সঙ্গে 'বসন্তসৌরভ'কে। অথচ কবিতা দু'টির মধ্যে এই আন্তর-সাদৃশ্য অপেক্ষা বাহ্য বৈসাদৃশ্যই বেশি।

১৯৭২ সালে, কবির একাত্তর বৎসর বয়সে প্রকাশিত 'অমরাবতী'র 'পরিচয়'-প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'শেষ ক-বছরের কবিতা থেকে এই সংগ্রহ ; এর মধ্যে বিশেষ প্রসঙ্গিত অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রে গাঁথা রচনা বাদ দিইনি।' এই শেষের বাক্যটিই 'অমরাবতী' কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জিত করেছে। গ্রন্থটি প্রধানত 'দেশ-কাল-পাত্রে গাঁথা' কবিতার সংকলন। প্রারম্ভিক 'তীর্থ-পত্র' রচনাটি কবির ধরিত্রীজীবন-তীর্থ পরিক্রমার স্মৃতি-বিজড়িত ও ছন্দ-শিহরিত। কবিতাটির এক অংশে আছে 'প্লেনের-ট্রেনের-গোরুর গাড়ির / যাত্রা একই, সবার বাড়ির / বৃহৎ ধরায় সংসারে যাই— / —ঘোরাঘুরির ছন্দটা তাই।' প্লেন, ট্রেন অথবা গোরুর গাড়ি—যে-কোনো যানেই যাত্রা ক'রে তিনি 'সবার বাড়ির বৃহৎ ধরায়' তাঁর তীর্থ-পরিক্রমা শুরু করুন না কেন, পরিক্রমার অন্তে কিন্তু তাঁর স্মৃতিতে ও স্বপ্নে বিরাজিত সেই তীর্থ-নীড়, যার নাম স্বদেশ, যার নাম স্বভূমি ; কেননা 'তীর্থ শেষে' 'মীরার ভজন কুঞ্জগুলির / বৃন্দাবনে, পুষ্পকলির / মৌনী বীণায় জলের সাজে' এখনো তাঁর 'প্রাণ-যমুনায় নিত্য বাজে।' স্বদেশ-স্বভূমি-সশ্রদ্ধ তাঁর এই সরল স্বীকারোক্তি দ্বিতীয় কবিতা 'অনতিক্রান্তে' আরো স্পষ্ট হয়েছে। এই কবিতায় তিনি বলেছেন 'দশটা সাগর বারোটা দেশ / পার হয়েছি হাওয়াই যানে— / পরবাসী তবু জানে / দেশ পেরোনো যায় না। / চিরদিনই সেই অনিমেষ / প্রাণ রয়েছে গঙ্গাতীরে. / ...প্রাচীন দেউল শিমুল ছায়া / বুকের ঘাটে বাংলা মায়া / সুধার অতল পায় না— / দেশ পেরোনো যায় না।' এই অনতিক্রান্ত ও অনতিক্রম্য স্বদেশ ও স্বভূমিই তাঁর প্রাণের তীর্থ-নীড়, তাঁর আত্মার 'অমরাবতী'। এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'বাংলার ডায়েরি'। ত্রি-পার্বিক এই কবিতাটির প্রারম্ভ-পর্বে কবির স্বপ্নের অমরাবতীর, অর্থাৎ চিরন্তন স্বদেশের অনুপম সৌন্দর্য-মাধুর্যের বর্ণগভীর বাণীচিত্রায়ণ—'নদীচর কাঁচধান নয়ন-সবুজে দেখা তীর / ডুবে আছে চেতনায়, উলু-দেয়া বিয়ে, শাঁখ ধূপ / ময়নামতীর গান, গাঁথা সূক্ষ্ম রঙিন সুতোয় / নক্সিকাঁথার মাঠ, গুরু মুর্শিদার ভক্ত দোহা, / নমাজ ভজন গাঁয়ে, চৈত্রের চড়কে / চিত্রার্পিত ছায়াতটে মেলা বসে, হাটে-হাটে / কদমা বাতাসা স্তূপ, ঢাকাই শাড়ির শিল্পশোভা / মহরমে দশমীতে দামামা উৎসব'—তাঁর কবিতার পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে যেমন আবেগসঞ্চারী, রূপময়ী বাংলার আবহমান লোকজীবনের এই অবগাঢ় সৌন্দর্য-মাধুরীর উন্মোচন প্রবাসী কবির মনোলোকেও

তেমনই আবেশবিস্তারী। কিন্তু রূপসী বাংলার এই জীবনমাধুরীচিত্র বিভাগ-পূর্ব-কালের, কেননা বিভাগোত্তর কালে বাংলার সেই মনোহরণ জীবন-রূপ অনেকাংশেই অপগত, সেই লৌকিক জীবনপ্রবাহ বহুলাংশেই বিঘ্নিত। কবিতাটির মধ্যপর্বে কবি তাই বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন 'স্বাধীন ভারতে ঐক্য ভাঙা / অলীক ধর্মের ঝাণ্ডা' উড্ডীয়মান, তিনি লক্ষ্য করেছেন সাম্প্রদায়িকতার আগুন দিকে-দিকে বিস্তার্যমান, 'শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা'র স্রোত পথে-পথে প্রবহমান। তা সত্ত্বেও কবিতাটির অন্তিম-পর্বে কবিহৃদয়ের দুর্মর আশাবাদ আশ্চর্যভাবে উচ্চারিত হয়েছে, কেননা যেদিন তিনি আনন্দের সঙ্গে দেখতে পেয়েছেন যে নির্যাতনের শেষ সীমায় পৌঁছে, কালান্তরের ক্রান্তিলগ্নে, বুকের ক্ষরিত শোণিতশৌর্যে প্রাণহন্তা পৈশাচিক শক্তিকে পরাস্ত ক'রে পূর্ব-বাংলার মানুষ অর্জন করেছেন নিজেদের প্রাণসম স্বাধীনতা, সংহত শক্তিতে গঠন করেছেন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ,—সেদিন 'সমুদ্রপারের ব্যথা বুকে' নিয়েও নবজাত বাঙালীরাষ্ট্রে পদার্পণ ক'রে তিনি শুনতে পেয়েছেন, 'পৃথিবীর বায়ু আয়ুরঞ্জিত প্রাণের মহাবলে / বাজানো মুক্তির শাঁখ'।

'অমরাবতী' অন্য একটি তাৎপর্যেও মণ্ডিত। এই গ্রন্থের কবিতাসমূহেই কবি শুনতে পেয়েছেন তাঁর অমরাবতীর, অর্থাৎ স্বদেশ-জননীর আকুল আহ্বান—ঘরে ফেরো ; মৃত্তিকামায়ের করুণ কন্ঠ তাঁর কানে পৌঁছেছে—চলে এসো ঘরে, পরবাসী। এবং তিনিও সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত, উৎসুকপ্রাণ। তাই তাঁর অন্তরের নিভৃত-নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষাকে তিনি আর্ত আবেদনের আকারে নিবেদন করেছেন জননী-জন্মভূমির কাছে—'কচি ঘাস, মাঠ, পাশে জল / বসুমা, তোমার আঁচল / এখানে বিছাও— / মাথা রেখে শোবো আর দেখবো উধাও/ মেঘে-মেঘে চলে নীলাকাশ ; / শেষ ক'রে দূর পরবাস / ফিরে আসি ধরিত্রীর ছেলে, / মাটি, তুমি নাও বুক মেলে।' বলা বাহুল্য, বড়ো বেদনার, বড়ো বাসনার এই কবিতায় 'বসুমা' এবং 'মাটি' অভিন্নার্থক এবং একই ভাবের দ্যোতক। বহু স্মৃতিস্পন্দিত ও বহু স্বপ্নরঞ্জিত স্বদেশ এবং স্বভূমিকে সম্বোধন করেই কবি শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনাভিলাষের এই আর্তি ও আকুলতাই ঘুরে-ফিরে বারেবারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'অনিঃশেষে'র বহু মর্মস্পর্শী কবিতায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে এই গ্রন্থের অনেক কবিতার অনেক পংক্তির মধ্য থেকে উদ্ধার করছি মাত্র একটি বিষাদ-অবগাঢ় ব্যাকুল পংক্তি, যেটি এই গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'উজানী'র এবং একই সঙ্গে সমগ্র গ্রন্থটিরও সর্বশেষ পংক্তি—'সন্ধ্যায় কি পৌঁছবো না শেষবার যমুনায়, গঙ্গাতীরে, কলকাতায়।' কিন্তু এই বেদনার্ত সংশয় সত্ত্বেও এ-কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা বোধ হয় সমীচীন হবেনা যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের এই আকুলতাই তাঁর শেষ জীবনসত্য কিংবা স্বজন-পরিবৃত জীবনই তাঁর কবিপ্রাণের আন্তিম অন্বিষ্ট ছিলো, কেননা এই গ্রন্থেরই 'প্রাণের ভৎর্সনা'—শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় তাঁর উদার উক্তি—'লিপি এই রাখি তবে ; যৌথ পরিবার বিশ্বে জানি / মহাকাল

প্রবাহিত সর্বাস্তির বহে গূঢ় ধারা / ভাই বোন প্রতিবেশী বৃক্ষছায়া সূর্যের মুকুরে' থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে স্বদেশে স্বজাতি-পরিবৃত জীবন এবং বিদেশে বিজাতি-পরিকীর্ণ কালাতিপাত—এ-দু'য়ের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের সুগভীর দ্বন্দ্বাবর্তে কবিচিত্ত বারংবার দোদুল্যমান হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত প্রবাস অপেক্ষা স্ববাসের আকর্ষণই তাঁর নিকট প্রবলতর হয়ে উঠলেও যিনি বিশ্বকে এক 'যৌথ পরিবার' হিসেবে জেনেছেন এবং যাঁর চৈতন্যের গভীরে 'মহাকাল প্রবাহিত সর্বাস্তির বহে গূঢ় ধারা', পৃথিবী-পথিক সেই কবির কাছে স্বদেশের সীমান্ত-বহির্ভূত পরবাসের আকর্ষণও কিছুমাত্র কম প্রবল হবার কথা নয়। আসলে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিসত্তার গভীরে স্বদেশ-বিদেশের আপেক্ষিক আকর্ষণজনিত এক দ্বিস্তরচেতনা তাঁর দীর্ঘ ষড়দশকী কবিজীবনের আদ্যোপান্তই প্রায় সমানভাবে বিরাজিত ছিলো। তাঁর কবিমানসের এই পৌনঃপুনিক পৃথিবীপরিক্রমণবৃত্তের কেন্দ্রে বিরাজিত ছিলো অনতিক্রম্য স্বদেশ আর স্বদেশের কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু ক'রেই পৃথিবীর সর্বদেশে তাঁর সেই ভ্রমণবৃত্তের ক্রমপ্রসারণ ঘটেছিলো। সেজন্যই তিনি একই সঙ্গে স্বজাতি-বিজাতি-নির্বিশেষে পৃথিবীর সর্বজাতির সঙ্গেই অর্জন করতে চেয়েছিলেন অভেদত্বের আনন্দঘনত্ব। এবং সেখানেই তাঁর মানসিক যন্ত্রণার সূত্রপাত, সেখানেই তাঁর আত্মিক দ্বন্দ্বের তীব্রতা। কেননা যা কবিমানসে স্বপ্নের বাস্তব, মর্ত্যজীবনে তা সর্বদা সত্যের বাস্তবে পরিণত হয় না। ফলে, তাঁর ধ্যানলোক ও জ্ঞানলোকের মধ্যবর্তী এই ব্যবধান ও বিসংগতি—যা তাঁর কবিজীবনের পক্ষে ছিলো নিয়তির তুল্য—তাঁকে যুগপৎ ভিতরে-বাহিরে উদাসীন করেছিলো, বাহিরে-ভিতরে ধ্যানাসীন ক'রে তুলেছিলো। এবং সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ের নিবিড় অনুভূতি তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হ'তে পেরেছিলো। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'অভিজ্ঞান-বসন্তে'র অন্তর্গত 'কোথায় চলেছ পৃথিবী' কবিতায় আনুমানিক চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি অনুভব করেছিলেন যে সূর্যসনাথ এই পৃথিবীর মতো তাঁর নিজেরও 'নেই ঘর / আছে ঘরের দিকে যাওয়া।' আর, তার তেত্রিশ বৎসর ব্যবধানে, ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'অনিঃশেষে' এসে প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও তিনি সেই দীর্ঘ অতীতের অনুভূতির সত্যকেই গভীরতররূপে উপলব্ধি করেছেন, কবিজীবনের আয়ুর উপান্তে পৌঁছে নিজের সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট প্রতীতি জন্মেছে 'আমারও ঘর নেই / আছে ঘরের দিকে যাওয়া'।

এই প্রতীতিতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য; কেননা রবীন্দ্রনাথে এই অনিকেততার (rootlessness) অনুভূতি অনুপস্থিত। অবশ্য এ-কথা ঠিক (কোনো-কোনো আধুনিক কাব্যসমালোচক ইতিপূর্বেই যা বলেছেন) যে রবীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তী, উপাদানগত বিন্যাসপার্থক্য ছাড়া, সেই এক ও অভিন্ন মানসিক জগতেরই অধিবাসী, যে মানসিক জগৎ অপরাপর আধুনিক বাঙালী 'কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়'। এ-কথাও সমানভাবেই সত্য যে তাঁরা উভয়েই সেই একই বৈদান্তিক (অমিয় চক্রবর্তীর একটা কবিতার নামই

তো 'বৈদান্তিক') ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ, একই চিরন্তনতার চিন্তা-ভাবনায় অনুপ্রাণিত ; উভয়েই যুগপৎ সমকালীনতা ও চিরকালীনতার দ্বিস্তর চেতনার অধিকারী—এমনকি জীবন-চর্যাতেও তাঁরা উভয়েই ছিলেন সম্পূর্ণ সংগতির সাধক, অকলুষ আনন্দের আরাধক। কিন্তু এই পর্যন্তই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর তুলনা এর বেশি সাদৃশ্যের ভার বহন করতে পারবে না, কেননা ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এই দুই কবির মধ্যে সাদৃশ্য যেমন প্রকট, বৈসাদৃশ্যও তেমনই কিছু কম প্রবল নয়। ছন্দ, ভাষা এবং আঙ্গিকগত গৌণ পার্থক্যের পাতলা পর্দা ভেদ ক'রে আমাদের কাছে এ-দু'জনের মধ্যে প্রধান যে-পার্থক্যগুলি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেগুলির সংখ্যা চার। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী উভয়েই যথেষ্ঠ পরিমাণে আধুনিক (অমিয় চক্রবর্তী তো 'উগ্র রকমের আধুনিক'), কিন্তু আধুনিকতার ভিত্তিভূমি দু'জনের ক্ষেত্রে এক নয়। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা আন্তর্জাতিকতার (universalism) ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, যে-আন্তর্জাতিকতার একমাত্র ভিত্তি ভারতীয় অদ্বৈতবোধ ; অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতার ধারণাও আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে অন্বিত, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা দ্বি-ভিত্তিক ; তা একদিকে ভারতীয় অদ্বৈতবোধ এবং অন্যদিকে সর্ব-দেশীয় বিজ্ঞানচেতনা—এই উভয়েরই ওপর প্রতিষ্ঠিত। অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিক-তার ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে-বিজ্ঞান চেতনা, তাঁর কবিতায় নানাভাবেই তা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। এই তীক্ষ্ন বিজ্ঞানচেতনার ফলেই তাঁর দৃষ্টিতে যন্ত্র ও মন্ত্র অভিন্ন, তাঁর মন্ত্রদৃষ্টির মূলে যন্ত্রদৃষ্টির অস্তিত্ব, যন্ত্রের প্রতীকে তাঁর প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ। এবং বিজ্ঞানের শুধু ব্যবহারিক বা ফলিত (applied) দিক্‌টিই নয়, বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক (theoretical) দিক্‌ও তাঁকে যথেষ্ঠ ভাবিত করেছে। আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিভ্রান্ত ও বিধ্বংসী শক্তিকে পরাভূত ক'রে বিজ্ঞানের কল্যাণী ও শুভদা শক্তিই যে তাঁর কাছে প্রবলতর হ'য়ে উঠেছে, অথচ তা সত্ত্বেও, বিজ্ঞান যে আধুনিক জীবনের সর্ব সমস্যা সমাধানে অনেকাংশেই অপারগ, আর সেজন্যই বিজ্ঞানের খন্ডিত সত্যকে জানার চেয়ে অনুধ্যানের সমগ্র সত্যকে উপলব্ধি করাই যে অধিক আবশ্যক, মহত্তর জীবনসত্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য মানবকল্যাণের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের শুভ পরিণয় যে প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিক চেতনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার সম্পূর্ণ সমন্বয়ের গভীরেই যে নিহিত রয়েছে অখন্ড জীবনচৈতন্যের সামগ্রিক উপলব্ধি—বিজ্ঞানে এবং মানবকল্যাণে গভীর সম্পর্ক-বিষয়ক এবম্বিধ চিন্তা-ভাবনা রবীন্দ্রশিষ্য অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় যতখানি উজ্জ্বল, অমিয়গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সেই ধরনের ভাবনা-চিন্তায় ঠিক ততখানি উজ্জ্বল নয়। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর মিস্টিসিজম্ প্রকৃতপক্ষে পার্থক্যমন্ডিত। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক সাধনা 'সীমার মাঝে অসীমে'র সন্ধান-সাধনা ; অর্থাৎ, সসীম থেকে অসীমের দিকে তাঁর যাত্রা, বিশ্বাসের ক্রমান্বিত স্তর-পরম্পরা অতিক্রম করতে-করতে এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে, গভীর বিশ্বাস অতিক্রম ক'রে গভীরতর বিশ্বাসে তাঁর ক্রমোত্তরণ। আর,

মিস্টিক অনুভূতির পথে অমিয় চক্রবর্তীর পদচারণা 'না' থেকে 'হ্যাঁ'-এর দিকে, সংশয় ছেড়ে বিশ্বাসের দিকে : তাঁর মিস্টিক সাধনা মূলত বিসংগতি-সংগতির সাধনা। তৃতীয়ত, অমিয় চক্রবর্তীর জঙ্গমতার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথে যে অনুপস্থিত তা-ই নয়, এক ধরনের স্থাবরতাবোধে তাঁর কোনো-কোনো রচনা অংশত আক্রান্ত। তাঁর পরিচিত পৃথিবী যে ক্রমে-ক্রমে অবলুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, তাঁর বিশ্বাসের জগৎ যে ধীরে-ধীরে ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'তে চলেছে—এই নির্মম সত্যের চকিত উপলব্ধি সত্ত্বেও তাঁর রচনায় এর সামগ্রিক স্বীকৃতি নেই। অমিয় চক্রবর্তীর রচনা, পরিবর্তমান এই পৃথিবীর দেশে-দেশে, যুগে-যুগে মানুষের জীবনের দ্রুত পট পরিবর্তনের এই নিষ্ঠুর সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে চতুর্থ এবং শেষ পার্থক্য উভয়ের রচনাপরিধির। অমিয় চক্রবর্তীর রচনার পরিধি, তাঁর পর্যটনের পরিধির মতোই, বহুদূর বিস্তৃত ; অবিভক্ত বঙ্গদেশ, অখন্ড ভারতবর্ষ—এমন কি সমগ্র পৃথিবীই তাঁর রচনাপরিধির অন্তর্গত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিসীমা, সত্যি কথা বলতে গেলে, নিজের দেশ ও তার প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। কেননা স্বদেশের সীমার বাইরের কোনো দেশ তাঁর নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যায়নি। এবং সেই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি (যা আমাদের পক্ষে একই সঙ্গে আনন্দের ও বিষাদের বিষয়) যে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই রবীন্দ্রনাথের রচনা স্থান পেয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্থান পায়নি ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম যৌবনে অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় সংস্কৃতিকেন্দ্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' ছিলো তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। 'প্রগতি'র উল্লেখযোগ্যতা সেটির আয়ুর দৈর্ঘ্যের কিংবা প্রচারের প্রসারের ওপর নির্ভরশীল ছিলো না। বস্তুত, আবির্ভাবে 'কল্লোলে'র ঈষৎ পরবর্তী এবং 'কালি-কলমে'র সমকালীন, মাত্র ত্রি-বর্ষ-জীবিত (১৯২৭-২৯) এই স্বল্পায়ু পত্রিকাটি ছিলো সেদিনের তরুণ, নব্যপন্থী সাহিত্যিকদের রচনাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি প্রধান পত্র। এবং এই বিশেষ কারণেই পত্রিকাটির যা-কিছু সাহিত্যিক মূল্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব। 'প্রগতি'র অন্যতর সম্পাদক, প্রেমেন্দ্রের প্রথম যৌবনের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু বুদ্ধদেব বসু (অপর সম্পাদক ছিলেন অজিত দত্ত) 'প্রগতি'র এক সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র-প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। উক্ত সম্পাদকীয়তে তখনকার তরুণ প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার উৎকর্ষ সম্পর্কে মন্তব্যস্বরূপ তিনি যা লিখেছিলেন, পরোক্ষ উক্তিতে তা এই যে, বাংলা সাহিত্যের নূতন ধারার পথিকৃৎ হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সম্মানিত করা উচিত। বাস্তবনিষ্ঠ গদ্যরচয়িতাদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে অভিহিত ক'রে সেই-সম্পাদকীয়তে এমন উক্তিও করা হয়েছিলো যে তাঁর 'পুন্নাম'-এর সঙ্গে তুলনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'-কেও চেষ্টিত, জটিল ও কৃত্রিম ব'লে অনুভূত হয়; মাত্র একটি অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি যা প্রকাশ করতে পারেন, তা প্রকাশ করতে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয় চার-চারটি পৃষ্ঠার; তাঁর মতো লেখকদের সংহত অথচ সাবলীল রচনাশৈলী বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণভাবে অভিনব একটি ঘটনা। আর, সেই-সঙ্গে সেই সম্পাদকীয়তে কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্রের সৃজনী শক্তির মৌলিকতা সম্পর্কে সচেতন করাবার জন্য সে-দিনের পাঠক-পাঠিকাদের এ-কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে 'পাঁওদল' কবিতায় (এখানে জানিয়ে রাখি, নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'ইন্দ্রপতন' কবিতাটির মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতাটিও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক অকালপ্রয়াণের অভিঘাতপ্রসূত এবং এই কবিতাটিরই পরিচিত প্রারম্ভিক পংক্তিদ্বয়, 'পায়ের শব্দ শুনতে পাও? / নিযুত নগ্ন পায়ের মহাসঙ্গীত!) গদ্যকবিতা নিয়ে প্রেমেন্দ্রের বিচিত্র পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতাগ্রন্থ 'পুনশ্চ' প্রকাশের পূর্ব-বর্তীকালীন ঘটনা।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেবের সেদিনের সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক উক্তি নিছক ব্যক্তিগত মন্তব্যেই পর্যবসিত হয়নি, যুগগত তাৎপর্যেও তা মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিলো। 'প্রগতি' সম্পাদকের একদার সেই মন্তব্যে প্রকৃতপক্ষে তখনকার অতি-প্রগতিবাদী (ultra progressive)-

ও অতি আধুনিক (ultra modern) তরুণ সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাবের আত্যন্তিকতাই প্রকাশিত হয়েছিলো। অবশ্য তাতে সেই সঙ্গে বন্ধুকৃত্যও যে একেবারেই অনুপস্থিত ছিলো, তা নয়; কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধিতার অভিব্যক্তি অথবা বন্ধুকৃত্যের প্রকাশ, যেটাই ঘটে থাকুক না কেন, বন্ধু বুদ্ধদেবের মন্তব্যে বন্ধু প্রেমেন্দ্রের রচনারীতি সম্পর্কে এমন একটা ইঙ্গিত অবশ্যই প্রচ্ছন্ন ছিলো, যা পরবর্তীকালে, সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই পরিণত হ'য়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে একটি স্বীকৃত সত্যে। তা হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে (প্রধানত গদ্যে) ভাবনা ও ভাষার কেন্দ্রাভিগ (centripetal) সংহতির সঙ্গে সঙ্কেতনিগূঢ় ব্যঞ্জনার প্রকাশ। ভাবনার সঙ্গে তার প্রকাশ-মাধ্যমের, অর্থাৎ ভাষার, এই হরগৌরীমিলন অবশ্য কবিতারই এলাকাধীন এবং এই কঠিন কর্মে সিদ্ধি অর্জন প্রধানত কবিদেরই আয়ত্তসাধ্য। কিন্তু এই সহজ সিদ্ধান্ত এত সাবলীলভাবে গদ্যরচনা ও গদ্যরচয়িতাদের সম্পর্কেও সমানভাবেই প্রযোজ্য কি না, তা নিশ্চয়ই বিতর্ক ও বিবেচনার বিষয়—অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের গদ্যরচনার ক্ষেত্রে এ-সিদ্ধান্তের প্রয়োগ সম্পর্কে এ-ধরনের বিতর্ক বা বিবেচনার তেমন অবকাশ নেই, কেননা গদ্যকার হিসেবে তাঁর শিল্পীসত্তা কাব্যকার হিসেবে তাঁর স্রষ্টাসত্তারই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রসারণ, তাঁর গদ্যরচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতারই সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপান্তর।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের গদ্য ও কবিতার এই আন্তর-সামীপ্য ও মৌলিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওরা অবশ্যই অসঙ্গত যে গদ্যকার হিসেবে কবিবৈশিষ্ট্যনিরপেক্ষ তাঁর অন্য কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। গদ্যের রচয়িতারূপে কবিবৈশিষ্ট্যনিরপেক্ষ অন্যবিধ বৈশিষ্ট্যও তাঁর নিশ্চয়ই আছে, যা তাঁর গদ্যের অভিনিবিষ্ট পাঠ থেকে আমাদের নিকট স্পষ্টতই প্রতিভাত হয়। কবিতায় যখন তিনি প্রকৃতিকে শুধু অবলোকন করেছেন, গদ্যে তখন তিনি প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণও করেছেন; কবিতায় যেখানে তিনি জীবনকে মাত্র নিরীক্ষণ করেছেন, গদ্যে সেখানে তিনি জীবনকে বিশ্লেষণ পর্যন্ত করেছেন; বহুসংখ্যক কবিতায় তিনি যেমন আদ্যোপান্ত রোম্যান্টিক, অধিকাংশ গদ্যরচনায় তেমনই তিনি আদ্যন্ত বাস্তববাদী। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও কথা আছে, কথা থাকে; কেননা 'রোম্যান্টিক' এবং 'বাস্তববাদী'—এই বহুব্যবহৃত বিশেষণ-যুগ্মের যথার্থ স্বরূপ অদ্যাবধি সংশয়াতীতরূপে অনির্ণীত, অতএব বিতর্কসাপেক্ষ। সে-প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ কিংবা সে-বিতর্কের উত্থাপন, কোনোটাই আমি এখানে করবো না—এমন কি কী-অর্থে প্রেমেন্দ্র মিত্র গদ্যে বাস্তববাদী অথবা কোন্ বৈশিষ্ট্যে তাঁর গদ্যের বাস্তববাদ চিহ্নিত, সে-আলোচনাও এখানে আমি করছি না, যেহেতু তা-ও বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়পরিধির অন্তর্গত নয়। তবু, অতি সংক্ষেপে হ'লেও, এ-সম্পর্কে যে-কথাটুকু এখানে না-বললেই নয় সেটুকু হচ্ছে এই যে সামগ্রিক বিচারে জীবনকেন্দ্রিক অতি গভীর এক তৃষ্ণা এবং মানবাভিমুখী অতি আন্তরিক এক সহানুভূতি—এই দুই-ই হচ্ছে স্বভাবে অন্তর্মনা (introvert) এবং

সংবেদনশীলতায় সূক্ষ্ম গদ্য-শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাস্তববাদের উৎস ও বৈশিষ্ট্য। জীবন-সম্পৃক্ত এই বাস্তববতার সাগ্রহ অনুসরণ তাঁর সদ্যকৈশোর-পর্বে, মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে লিখতে-আরম্ভ-করা এবং ১৯২৭ সালে শ্রমজীবীদের মুখপত্র 'সংবত'' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'পাঁক', প্রথম যৌবন-পর্বে, কুড়ি বৎসর বয়সে রচিত সাড়া-জাগানো প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' ('প্রবাসী', চৈত্র, ১৩৩০) ইত্যাদির মতো তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনাকালীন গদ্যরচনা থেকে শুরু ক'রে পরিণত বয়সের এবং সমাপ্তিকালীন রচনাবলী পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত ছিলো। এই বাস্তবধর্মিতার পাশাপাশি এবং হয়তো তারই অঙ্গস্বরূপ, অন্য যে-বৈশিষ্ট্যটি তাঁর গদ্যে প্রায় প্রথমাবধি সমান্তরালভাবে প্রবাহিত, তা হচ্ছে এক সংশয়াচ্ছন্ন (বস্তুতপক্ষে এক ধরনের সংশয়-দোলায়িত মনোভাব এবং তৎপ্রসূত আত্মবৈপরীত্য তাঁর ব্যক্তিস্বভাবেরও ছিলো অন্যতম লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেকবার তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে 'সন্দেহবাদী'রূপে, অথচ ভাগ্যের অমোঘতায় তিনি ছিলেন 'সংশয়শূন্য'; অন্ধ ভক্তির ঘোর বিরোধী হ'য়েও 'একান্তভাবে মান্য' করতেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে; সমগ্র জীবনের আদর্শ হিসেবে কোনো একক মানুষকে গ্রহণ করা সম্পর্কে ছিলেন 'সন্দিগ্ধ', অথচ নিজের সমগ্র জীবনে আদর্শস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'নির্দ্বিধচিত্তে' অনুসরণের চেষ্টা করেছেন তিনি।) ও ইঙ্গিতগূঢ় রহস্যময়তা, যা, তাঁর বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন রচনায় 'হয়তো বা হ'য়ে থাকবে', 'হ'লেও হ'তে পারে', 'যদি', 'তাহ'লে', 'তবে', 'হয়তো' (তাঁর একটি গল্পের নামই তো তিনি রেখেছেন 'হয়তো') ইত্যাদি এবং এ-ধরনের আরো অনেক ইঙ্গিতবহ শব্দ ও শব্দবন্ধের ইতস্তত অথচ পরিকল্পিত নিপুণ প্রয়োগের মাধ্যমে শুধু প্রকাশিতই হয়নি, পরবর্তী প্রজন্মের রহস্য-লেখকদের অন্তত কিছুসংখ্যককে প্রভাবিত পর্যন্ত করেছে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বোল্লেখিত 'হয়তো', 'পরোপকার', 'অরণ্য-পথ', 'বৃষ্টি', 'স্টোভ', 'নিরুদ্দেশ', 'নতুন বাসা', 'পান্থশালা', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'কেশবলালের তিরোধান', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে', 'সাগর সঙ্গমে', 'মহানগর', 'অনাবশ্যক', 'জলপায়রা' এবং ছোটদের জন্য লেখা 'পুতুলের লড়াই' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস-রচয়িতারূপে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাফল্য সম্পর্কে যাঁরা সংশয়ান্বিত, তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করি যে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিশ্চিতরূপে সার্থকতা-মণ্ডিত না-হ'লেও নিঃসন্দেহে স্বকীয়তামণ্ডিত। সত্য বটে, তাঁর ছোটোগল্পের তুলনায় তাঁর উপন্যাসে কারুদীপ্তির বিকীরণ অনেক কম, অথচ তা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের আকর্ষণ কিন্তু কিছুমাত্র কম নয়। এর কারণ কী? কারণ এই যে পরিবেশরচনার বৈশিষ্ট্যে, কথনভঙ্গির অভিনবত্বে এবং লেখনশৈলীগত অন্যান্য দিকের বিবেচনায় (যেমন তাঁর লেখকজীবনের প্রথমদিকের গল্প 'শুধু কেরাণী'তে বর্ণনায় ক্রিয়ার কাল-রূপ হিসেবে অতীতকে নয়, ঐতিহাসিক বর্তমানকে গ্রহণ কিংবা তাঁর বহু গল্প

মধ্যম পুরুষে রচনা করার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মধ্যম পুরুষে গল্পরচনার রীতির প্রবর্তন, বুদ্ধি ও আবেগের নিখুঁত ভারসাম্য, অতিশয়োক্তিবর্জিত বর্ণনা, ঘটনা ও সংলাপের সমন্বয়. অনাড়ম্বর শব্দব্যবহার ইত্যাদি) বাংলা গল্পে বিপুল যে-বৈচিত্র্য তিনি এনেছেন এবং প্রধানত যে-কারণে আমাদের সাহিত্যের তিনি অন্যতম রাজা-গল্পকার. সে-বৈচিত্র্যের সন্ধান তাঁর সমস্ত উপন্যাসের সর্বত্র খুঁজে পাওয়া না গেলেও. তাঁর লেখা গল্পের মতো তাঁর রচিত উপন্যাসেও সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্বদীর্ণ প্রাত্যহিক দিনযাত্রার কঠিন ও কঠোর বাস্তবতার শিল্পঋদ্ধ রূপায়ণের এবং সেইসঙ্গে পরিশীলিত নাগরিক মননেরও সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ বিষয়বস্তু-নির্বাচন ও জীবন-পর্যবেক্ষণগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসকে কখনোই কোনো গল্পের চেষ্টিত (laboured) ও তরলিত (liquefied) সম্প্রসারণমাত্র ব'লে মনে হয় না। প্রথম জীবনের 'পাঁক' ছাড়াও তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস 'মিছিল', 'প্রতিশোধ', অমলতাস', 'প্রতিধ্বনি ফেরে', 'সূর্য কাঁদলে সোনা', 'মনুদ্বাদশ', 'শুক্রে যারা গিয়েছিলো', 'আগামীকাল' এবং 'তিত্তলীয় উপাখ্যান'। এগুলির মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশেষ পরীক্ষা-মনস্কতার পরিচায়ক। কোনো চরিত্রকে নায়করূপে গ্রহণ না-ক'রেও সম্পূর্ণ একটি উপন্যাস রচনা করা আদৌ সম্ভবপর কি না. এই কঠিন পরীক্ষা তাঁর 'আগামীকাল' উপন্যাসে তিনি করেছেন এবং সেই পরীক্ষায় যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে এককভাবে তিনি উত্তীর্ণও হয়েছেন। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে 'আগামীকালে'র মতো নায়কবিহীন উপন্যাস আর একটিও আছে ব'লে অন্তত আমার জানা নেই। আর. আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে 'তরুণের স্বপ্ন' মাসিকপত্রে অনেকগুলি সংখ্যা জুড়ে ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত অথচ অদ্যাবধি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত 'তিত্তলীয় উপাখ্যানে' তিনি অর্ধ-ঐতিহাসিক-অর্ধ-পৌরাণিক-অর্ধ-কাল্পনিক কাহিনীকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ ক'রে অপ্রচলিত ও অভিনব যে-ভাষায় উপন্যাসের অবয়ব গ'ড়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে তুলনীয় পরীক্ষামূলক উপন্যাসও সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দু'টি নয়, মাত্র একটিই আছে—সতীনাথ ভাদুড়ীর সটীক উপন্যাস 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'। সংজ্ঞাসিদ্ধ ও অঙ্গগত অন্যবিধ খুঁটিনাটি বিচারে তাঁর হাতে উপন্যাস সকল সময় ঠিকমতো জমে না-উঠলেও অন্তত পরীক্ষামনস্কতার বিবেচনায় তিনি যে আমাদের সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক, এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

'কোন্ প্রেমেন্দ্র মিত্র সার্থকতর, গল্পকার অথবা ঔপন্যাসিক ?'—প্রেমেন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ-সন্ধানে এই প্রশ্নের উত্থাপন যেমন অর্থহীন, 'কোন্ প্রেমেন্দ্র মিত্র তুলনামূলক-ভাবে বেশি বড়ো, বড়োদের লেখক, নাকি ছোটোদের লেখক ?'—এই প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানও তেমনই সমানভাবে অনর্থক। কেননা একই প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক বিচ্ছুরণ তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস, একই অখণ্ড ও অবিভাজ্য সৃজনী ক্ষমতার বলিষ্ঠ প্রকাশ বড়োদের এবং ছোটোদের জন্য তাঁর রচনা। তবে পাঠককল্পিত ও বিভাজিত গদ্যলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই দ্বিবিধ বা দ্বৈত সত্তা সম্পর্কে এ-কথা, যা তাঁর

পক্ষে কৃতিত্বের, স্পষ্টতই বলা চলে যে, একদিকে বড়োদের জন্য লিখতে গিয়ে যেমন তিনি সর্বপ্রকার ছেলেমানুষী একেবারেই বর্জন করেছেন, করতে পেরেছেন, অন্যদিকে ছোটোদের জন্য লেখার বেলাতে, বয়সের জ্যেষ্ঠতা সত্ত্বেও, তেমনই তিনি বিপরীতক্রমে পুরোপুরি ছেলেমানুষটি হ'য়ে গিয়েছেন, হ'য়ে যেতে পেরেছেন। শেষোক্ত গুণটি আমরা জানি, আমাদের সাহিত্যের তথাকথিত শিশুসাহিত্যিক কিংবা ছোটোদের লেখক-লেখিকাদের অনেকের মধ্যেই নেই এবং ছোটোদের জন্য সাহিত্যরচয়িতাদের কৃতিত্বের ও সাফল্যের এটি একটি মস্ত বড়ো পরিচায়ক। ছোটোদের লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গুণের অধিকারী ছিলেন এবং এই গুণের অধিকারবশতই ছোটোদের জন্য তাঁর রচনা-বলীতে আদ্যোপান্ত একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতপক্ষে 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ', হানাবাড়ি', 'আগ্রা যখন টলমল', 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' কিংবা 'শুক্রে যারা গিয়েছিলো' ইত্যাদি রচনার মধ্য দিয়ে এবং গোয়েন্দা পরাশর বর্মাকে রহস্যোদ্ঘাটনে নিযুক্ত ক'রে তাঁর ছোটোদের জন্য গ্রন্থ-রচনার যে-পথের শুরু, সে-পথেরই সমাপ্তি ঘটেছে অদ্বিতীয় শ্রীঘনশ্যাম দাস ওরফে 'ঘনাদা' (যার প্রথম আবির্ভাব দেবসাহিত্য কুটিরের কোনো এক পূজাবার্ষিকীতে, 'মশা' গল্পে, সেই সুদূর ১৯৩৭ সালে এবং আবির্ভাবের প্রাচীনতায় যে টেনিদা, ফেলুদা, ঋজুদা প্রভৃতি বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যান্য দাদাদেরও দাদা—অর্থাৎ বড়দা।) সিরিজের অপূর্ব রসঘন কাহিনীগুচ্ছে। গদ্যকার প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে অন্য যে গৌণ কথাটিও এইসঙ্গে সেরে নিতে হয় তা হচ্ছে এই যে কল্পবিজ্ঞানমূলক কাহিনীরচনায় আমাদের সাহিত্যে পথিকৃৎ এবং ইংরেজি থেকে বাংলার অনুবাদকর্মে যথেষ্ট পারঙ্গম হ'লেও মননশীল প্রবন্ধ রচনায় কিংবা রীতিনিষ্ঠ সাহিত্যসমালোচনায় তিনি তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে কদাচিৎ নিয়োগ করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ক্ষীণাকৃতি 'বর্বর যুগের পর' ও 'বৃষ্টি এলে' এবং স্থূলাকৃতি 'শত প্রসঙ্গ' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে সাহিত্যবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে নিজস্বতা প্রকাশিত হয়েছে, এতদ্দেশীয় পরিণত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে তার গুরুত্ব বড়ো সামান্য নয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃজনীসমৃদ্ধির একাধিক দিকের বিবেচনায় তিনি যে ছিলেন পুরোগামী, এ-বিষয়ে আমাদের মনে আজ আর কোনো দ্বিধা নেই ; কিন্তু তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের কোন্ বিশেষ বিভাগের উপচার শেষ পর্যন্ত তাঁকে মহাকালের দুয়ারে উপনীত করাবে অথবা তাঁর সৃষ্টির বিশেষ কোনো দিক্ মহাকালের দুয়ারে তাঁকে আদৌ উপনীত করাতে পারবে কিনা, এ-সম্পর্কে আমাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সংশয়মুক্ত নন। যাঁরা তাঁর সৃষ্টির দীর্ঘস্থায়িত্বে আস্থাশীল, তাঁদের বেশির ভাগই প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন তাঁর গল্পের—বিশেষত ছোটোগল্পের কথা, অনেকে বলেছেন পরাশর বর্মা ও ঘনাদার কথা, কেউ-কেউ বা তাঁর কবিতার কথাও। কিন্তু তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রায় কেউই তেমন আশাব্যঞ্জক কিংবা আস্থা-সূচক উক্তি করেন নি—বরং অ্যাক্যাডেমিক সমালোচকদের অধিকাংশই ঔপন্যাসিক

হিসেবে তাঁকে একবাক্যে ও সমস্বরে নস্যাৎই করেছেন। তাঁর সুব্যাপ্ত সৃষ্টিপরিধির অন্তর্গত এক বা একাধিক দিকের কালোত্তীর্ণতার সম্ভাবনা-সম্পর্কিত এইসব জল্পনা-কল্পনার অবসান না-ঘটিয়েও এ-সম্পর্কে বলা চলে যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-নির্বিশেষে জনচিত্তরঞ্জনের স্থূল মানদণ্ডে পরাশর বর্মা ও ঘনাদার অবস্থানই সর্বোচ্চে এবং তাদের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য হ'লেও কাহিনীগত কারুশিল্পের ও ভাববিষয়ক চারুশিল্পের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তাঁর ছোটোগল্প এবং কবিতাই কিন্তু গুরুভার। তাঁর ছোটোগল্পের পাশাপাশি তাঁর কবিতার কথাও একই সঙ্গে উচ্চারণ করলাম প্রধানত এই কারণে যে তাঁর রচিত কবিতাকেও, তাঁর লেখা ছোটোগল্পের মতো, আমাদের সাহিত্যের সামগ্রিক সমৃদ্ধির পক্ষে আমি সমমূল্যের ব'লে মনে করি, সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করি—যদিও এই দুঃখজনক সত্যটিকেও অস্বীকার করিনা যে ছোটোগল্পের কুশলী শিল্পীরূপে তাঁর ব্যাপক স্বীকৃতির মতো বাংলাভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি আজো তেমন ব্যাপকতা অর্জন করেনি। কাব্যে আধুনিকতা নির্ণয়ের চুলচেরা বিচারে তাঁর কবিসত্তার উষ্ণ অভ্যর্থনায় ও সাদর স্বীকৃতিতে বাংলা কাব্যের একালীন প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের মধ্যেও কেউ-কেউ আজ পর্যন্ত এক ধরনের 'তিক্ত দ্বিধা'য় আন্দোলিত। অথচ, ক্ষোভের বিষয়, এইসব সমালোচক (যাঁদের বেশির-ভাগই অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী এবং সেই ব্যবসায়ে অধিকতর মুনাফা অর্জনের সুবিধার্থে 'ডক্টরেট' ডিগ্রীধারী) দু'-একজন ছাড়া প্রায় কেউই কষ্ট ক'রে বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রমাণ করেন নি কী কিংবা কী-কী কারণে কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক নন অথবা কোন্ বা কোন্-কোন্ বিবেচনায় তিনি কবি হিসেবে অনাধুনিক। এক ধরনের অগোছালো, ভাসা-ভাসা ও দায়সাড়া-গোছের অ্যাক্যাডেমিক আলোচনাতেই তাঁদের সীমিত সামর্থ্য এবং অগভীর ঔৎসুক্যকে তাঁরা নিয়োজিত রেখেছেন। অথচ তাঁরা যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার মূল্যায়নে সমকালীন কাব্যবিচারের সঠিক মানদণ্ড ব্যবহার করতেন, তবে সহজেই উপলব্ধি করতেন যে কবি হিসেবে তিনি মাত্র আধুনিকই ছিলেন না, ছিলেন স্বকীয়তামণ্ডিত কবিদৃষ্টিরও অধিকারী। এবং সেইসঙ্গে এটাও বুঝে উঠতে তাঁদের বেগ পেতে হ'তো না যে কবি হিসেবে তাঁর সেই আধুনিকতা অথবা তাঁর কবিদৃষ্টির স্বকীয়তা—এর কোনোটাই তাঁর সমকালীন যুগের হুজুগানু-গত্যের সমর্থক বা নামান্তরমাত্র ছিলো না। অর্থাৎ, আরো খোলাখুলিভাবে জানাতে গেলে, কবি হিসেবে তার আধুনিকতা কেবল 'কল্লোল'-কেন্দ্রী আবর্তনেই অবসিত কিংবা তাঁর কবিদৃষ্টির স্বকীয়তা মাত্র 'কল্লোল'-প্রবর্তিত অন্ধ রবীন্দ্র-বিরুদ্ধাচরণেই সীমিত ছিলো না। এ-কালীন মনন-চিন্তন, আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন, তরঙ্গিত ইতিহাস ও ভূগোল (বিশেষত ভূগোল)-চেতনা ইত্যাদি আধুনিকতার স্বীকৃত লক্ষণাবলী তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন রচনায় বারে-বারে প্রকাশিত হয়েছে, ঘুরে-ফিরে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে—এমনকি, বলা যেতে পারে, তাঁর কবিতার বিচিত্র আবহও রচনা করেছে। আবার, এই আধুনিকতার অংশভাগিতা এবং চৈতন্য-সমৃদ্ধিই তাঁর

কবিদৃষ্টির স্বকীয়তার নেপথ্যনিয়ামক। অতএব কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আধুনিকতা এবং তাঁর কবিদৃষ্টির স্বকীয়তার পারস্পরিক সম্পর্ক-বিষয়ক ও স্বরূপ-সম্পর্কিত এই আলোচনার ভূমিকা-অংশের সমাপ্তি এই ভাষায় সূচীত করা যেতে পারে যে তাঁর আধুনিকতা যেমন স্বকীয়তা-সংস্পৃষ্ট, বিপরীতক্রমে তাঁর কবিদৃষ্টির স্বকীয়তাও তেমনই আধুনিকতা-সংসৃষ্ট।

কিন্তু আরম্ভের শেষে যেমন সমাপ্তি থাকে, সমাপ্তির অন্তেও তেমনই আছে নূতন ধরনের আরেক আরম্ভ। আর, সেই আরম্ভ-প্রসঙ্গেই নিবেদন করি যে এই আলোচনার প্রথম স্তবকে উল্লিখিত 'প্রগতি'-সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেবের প্রেমেন্দ্র-প্রশংসায় স্বয়ং প্রেমেন্দ্র কিন্তু আদৌ উৎফুল্ল হননি কিংবা স্তুতিবোধও করেননি, বরং তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁর রচনারীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির তুলনামূলক বুদ্ধদেবের সেই মন্তব্যে রীতিমতো মর্মাহতই হয়েছিলেন তিনি। বন্ধু বুদ্ধদেবের সেই মন্তব্যে তাঁর একদার মর্মবেদনার কথা, সেই ঘটনার বহু বৎসর পরেও তাঁর স্মৃতিতে যে সমানভাবে সজীব ছিলো, ১৯৮৬ সালের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার কোনো এক দৈনিক সংস্করণে মুদ্রিত একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে তার উল্লেখ থেকেই সে-সম্পর্কে আমরা অবহিত হ'তে পারি। 'স্টেটস্‌ম্যানে' মুদ্রিত সেই সাক্ষাৎকারের ভাষায়, বুদ্ধদেবের মন্তব্যের উত্তরে তিনি তাঁকে লিখেছিলেন, 'Such comments are futile attempts at belittling Tagore and bestow little honour on myself'—অর্থাৎ, বুদ্ধদেবের সেই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথকে খাটো প্রতিপন্ন করার নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র এবং তা প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও এতটুকু সম্মানিত করেনি। বলা বাহুল্য, পত্র-মারফৎ বুদ্ধদেবকে জানানো তাঁর সেই বক্তব্যে বুদ্ধদেবের মন্তব্যের মাত্র উত্তরই ছিলো না, তাতে প্রচ্ছন্ন ছিলো তীব্র প্রতিবাদও। বন্ধুর নিকট লিখিত বন্ধুর সেই প্রতিবাদপত্রটি সেদিনই সেটির লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তত তিনটি দিক্ স্পষ্ট ক'রে তুলেছিলো। সেই দিক্ তিনটি হচ্ছে প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বজনসম্মানিত গুরুস্থানীয়ের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়ত, তাঁর সত্যনিষ্ঠা এবং তৃতীয়ত, তাঁর আত্মচৈতন্য। অবশ্য এই তিনটি দিক্ কোনোক্রমেই নিঃসম্পর্কিত নয়—তিনটিই মূলত একই কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যের ত্রিবিধ প্রকাশ। বুদ্ধদেবকে লিখিত তাঁর সেদিনের সেই প্রতিবাদী বক্তব্যের মূলে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের মতো কালাতিশায়ী প্রতিভা-পুরুষের সঙ্গে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অবস্থান ও গুণগত দুরতিক্রম্য ব্যবধান এবং নিজের সৃষ্টিক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে গভীর সচেতনতা ক্রিয়া করেছে, অন্যদিকে তেমনই বুদ্ধদেবের উক্তি যে নিছক অতিশয়োক্তি, তাতে যে সত্যের অংশ নিতান্তই নগণ্য, বরং প্রকৃত সত্য যে একেবারেই অন্যরূপ, এই প্রত্যয়ও সমানভাবেই সক্রিয় হয়েছে। আর, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভক্তিবিমিশ্র সশ্রদ্ধ মনোভাব তো অবশ্যই বিরাজিত ছিলো।

এই শেষোক্ত বিষয়টি, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপোষণ,

বিশেষভাবে আলোচিত হবার অপেক্ষা রাখে ; কেননা এর থেকেই আমরা 'কল্লোলে'র অধিকাংশ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হই। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যই কবি হিসেবে তাঁর স্বকীয়তার অন্যতম নিদর্শন। সত্য বটে ১৯২৬ সালে 'দ্বার খোল, দ্বার খোল, রাত্রির প্রহরী' কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে 'কল্লোল' পত্রিকাতেই কবি হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং পরবর্তীকালে তাঁর আরো রচনা মুদ্রিত হয়, সত্য বটে 'কল্লোলে'র অপর দুই কুলোত্তম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে প্রথমজনের সঙ্গে 'জীবনের লেখা যে লেখে, সে সোজা লিখতে শেখেনি'-বাণীবহ পরীক্ষামূলক প্রথম সংযুক্ত-উপন্যাস 'বাঁকালেখা' এবং উভয়ের সঙ্গে 'বাঁশরী' নাট্যে ক্ষিতীশ চরিত্রের মাধ্যমে আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকদের রবীন্দ্র-কৃত ব্যঙ্গের প্রতিবাদ-উপন্যাস 'বনশ্রী' রচনা করেছেন, এবং এটাও সত্য বটে যে 'কল্লোলে'র অন্যবিধ বহু কর্মোদ্যমে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ক'রে অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেবের মতো তিনিও 'কল্লোলে'র ত্রি-স্তম্ভের অন্যতম বা 'One of the Kallol-trio' অভিধা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তা-ব'লে এটা কিছুতেই সত্য নয় যে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সংখ্যাগুরু লেখকের (যাঁদের দলনেতা ছিলেন উত্তরজীবনে আশ্চর্য ও সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-প্রত্যাবৃত্ত বুদ্ধদেব বসু) মতো তিনি রবীন্দ্র-বিদ্বেষীও ছিলেন। রবীন্দ্র-বিদ্বেষী হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-বিরোধীও তিনি ছিলেন না। বরং, বিপরীতক্রমে, কবি হিসেবে স্বকীয়তায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সশ্রদ্ধচিত্তে রবীন্দ্রানুসরণের দৃষ্টান্তই তাঁর জীবনে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'পলাতকা' প্রকাশের ঠিক পরে, মাত্র পনেরো থেকে ষোলো বৎসর বয়সের মধ্যবর্তী-কালীন, তাঁর কৈশোরিক পান্ডুলিপি কবিতাগুলির প্রায় সব ক'টিই রচিত হয়েছিলো হুবহু 'পলাতকা'রই ছন্দে, যদিও মিলবিহীনভাবে। লেখকজীবনের প্রথমদিকে, অভি-নিবিষ্ট অনুসন্ধানে দেখা যাবে, তাঁর শুধু সাবলীল ভাষাই নয়, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাও গঠিত হয়েছে 'ছিন্নপত্রে'র প্রভাবাধীন হ'য়ে—এমনকি তাঁর দার্শনিক চিন্তন-মননও, নাস্তিক্যবাদে দীক্ষাপূর্বপর্যন্ত, প্রধানত 'সাধনা'র প্রভাবেই প্রভাবিত ছিলো। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রস্বীকৃতিসূচক মনোভাব মাত্র সেই সময় কিংবা তাঁর সাহিত্যজীবনের বিশেষ কোনো পর্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না, তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবন সম্পর্কেই তা যে ছিলো একটা সাধারণ সত্য, সেটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না, তাঁর পরিণত বয়সের রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও ভাষণ এবং আলোচনা ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের সঙ্গে তাঁর 'রবীন্দ্র ঠাকুর' কবিতাটির কথাও যদি আমরা স্মরণ করি। এটা তাঁর কবিজীবনের মধ্যপর্বান্তিক্রান্তকালীন রচনা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা রচনা কেবল তাঁর পক্ষেই একটি ঘটনা নয় ; বাঙালী কবিদের মধ্যে অতীতে এমন কেউ-ই বা ছিলেন কিংবা বর্তমানেও এমন কে-ই বা আছেন, যিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কখনো কোনো কবিতা লেখেন নি অথবা যাঁর লেখনী অন্তত পরোক্ষত রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক কোনো কবিতাই প্রসব করেনি। 'কল্লোলে'র কবিরাও প্রায় সকলেই রবীন্দ্র-বিষয়ক কবিতা রচনা করেছেন এবং

তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের রচনাতেই কল্লোলীয় উন্মাদনায় ও হুজুগপ্রাবল্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতার একটা স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে—এমনকি তাঁদের মধ্যে যাঁরা যথেষ্ট মৃদুভাষী, তাঁদেরও কারো-কারো এবং কোনো-কোনো রচনাংশে. যেমন ১৯২৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক, ১৩৩৬) সংখ্যা 'কল্লোলে' প্রথম প্রকাশিত অচিন্ত্য-কুমারের চতুষ্পংক্তিক স্তবক-চতুষ্ক-সমন্বিত 'আবিষ্কার' কবিতার ঃ

> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার—
> যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
> কারেও ডরি না কভু, … … …
> … … … … … …
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর—
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো,
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে—মোর পথ আরো দূর।

পংক্তি-কতিপয়ে প্রচ্ছন্ন 'যুগ-সূর্য' (মারাত্মক ভ্রান্তি—রবীন্দ্র-প্রতিভা কোনোক্রমেই যুগসীমিত নয়, তা অন্ততপক্ষে কয়েক শতক ব্যাপ্ত) 'রবীন্দ্র ঠাকুর'কে আচ্ছাদন-অভিলাষী অহমিকায় অথবা বুদ্ধদেবের 'The age of the Rabindranath is over' মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারের স্পর্ধিত প্রকাশে। পদ্য ও গদ্য উভয় থেকেই এমন আরো দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে 'কল্লোলে'র কবিদের সংঘবদ্ধ রবীন্দ্র-বিরোধিতার। কিন্তু কল্লোলীয় তরুণদের রবীন্দ্র-বিরুদ্ধতার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থানীয় স্বল্পসংখ্যকদের অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কোনো সন্দেহ নেই. তিরিশের বিদ্রোহীদের তিনিও একজন নেতৃস্থানীয়ই ছিলেন ; কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ কখনোই নিছক ও নিষ্ফল রবীন্দ্রবিরুদ্ধতায় পর্যবসিত কিংবা অবসিত হয়নি। সেই কারণেই বুদ্ধদেব বসুর নামের সঙ্গে যেমন 'রবীন্দ্র-বিদ্বেষী' বিশেষণ তাঁর জীবনের অন্তত একটা বিশেষ সময়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলো, তেমন কোনো বিশেষণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের নামের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের কোনো পর্বেই জড়িত ছিলো না এবং ঐ একই কারণে বুদ্ধদেব বসুর মতো রবীন্দ্র-বিদ্বেষ প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তেও তাঁকে কখনো দেখা যায় নি অথবা বুদ্ধদেবের মতো অন্ধ রবীন্দ্রবিদ্বেষপ্রচারপ্রয়াসে নিজের সীমিত ক্ষমতাকে অনর্থক অপচয় করার নিষ্ফল একটি অধ্যায়ও তাঁকে তাঁর সাহিত্য-জীবনে কোনোদিন অতিক্রম করতে হয়নি। 'কল্লোলে'র বিদ্রোহীদের একজন হ'য়েও সাহিত্য রচনায় তাঁর বিদ্রোহকে কখনোই তিনি রবীন্দ্র-বিরোধিতায় নিয়োজিত করেন নি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার ক'রে নয়, স্বীকারের মাধ্যমেই আত্ম-আবিষ্কারে তিনি অভিনিবিষ্ট হয়েছেন ; রবীন্দ্র-পরিবর্জনে নয়, রবীন্দ্র-পরিগ্রহণে, রবীন্দ্র-বিরুদ্ধতায় নয়, রবীন্দ্র-আত্মস্থতাতেই তাঁর প্রতিভা আপন গতিপথ আবিষ্কার ক'রে নিয়েছে। তাঁর পূর্বোল্লেখিত 'রবীন্দ্র ঠাকুর'-শীর্ষক (অরুণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'উত্তরসূরী' -পত্রিকায় এবং 'বারো বছরের বাংলা কবিতা' সংকলনে কবিতাটি এই নামেই প্রকাশিত

হয়েছিলো : কিন্তু দে'জ পাবলিশিং-সংস্করণের 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় কবিতাটির শিরোনাম পরিবর্তন ক'রে রাখা হয়েছে 'নাম'। জানিনা, পাঠভেদ নয়, কবিতাটির এই নামভেদ কখন কিংবা কার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কবিতাটির 'নাম' অপেক্ষা 'রবীন্দ্র ঠাকুর' নামকরণটিই আমার বেশি মনঃপূত।) কবিতার ঃ

সব কথা স্তব্ধ হ'লে
দেখি এক পবিত্র যন্ত্রণা
সৃষ্টিমূল থেকে উৎসারিত
সময়ের শূন্য পটে
এঁকে যায় জ্বলন্ত বিস্ময়।
আনন্দাৎ এব খল্বিমানি—
জেনেও তা রক্তাক্ত সংশয়।

নিজেকে তা মাটিতেই বাঁধে,
কথা সুর ছবি হ'য়ে
সকলেরই সাথে হাসে কাঁদে।
তবু অনির্বাণ
সত্তার অতৃপ্ত প্রশ্ন বিদ্রোহের যন্ত্রণা বিধুর
উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ যুগে হয়তো কখনো
নাম নেয় রবীন্দ্র ঠাকুর!

এই সম্পূর্ণটুকুর নিবিষ্ট পাঠ কিংবা তাঁর রবীন্দ্র-সম্পর্কিত গদ্য-বক্তব্যের কোনো অংশের সহৃদয় বিশ্লেষণ থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব যা আমার প্রেমেন্দ্র-প্রাসঙ্গিক উপরোক্ত মন্তব্যের অনুকূলে না-গিয়ে প্রতিকূলে যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কবি হিসেবে তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাবিত—যে-কথাটা, এমন কি রবীন্দ্র প্রভাবের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হবার কথাটাও, প্রেমেন্দ্র-পূর্ববর্তী সাক্ষাৎ রবীন্দ্রশিষ্যকল্প কবিদের অনেকের সম্পর্কেই সত্য। প্রেমেন্দ্র-প্রসঙ্গে আমি মাত্র এই-টুকুই বলতে চাই যে কবি হিসেবে রবীন্দ্র-বিরুদ্ধ অথবা রবীন্দ্র-প্রভাবিত—কোনোটাই তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-স্বতন্ত্র এবং স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর কবিসিদ্ধি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে যেমন তাঁর সঙ্গে 'কল্লোলে'র কোনো-কোনো লেখকের স্পষ্ট পার্থক্য ছিলো, অন্য একটি বিষয়েও তেমনই 'কল্লোলে'র কিছুসংখ্যক লেখকের সঙ্গে তাঁর বিস্তর ব্যবধান ছিলো। সেই বিষয়টি হলো 'কল্লোল'-প্রচারিত আদর্শের মূল্যবোধ-সম্পর্কিত। এবং এই পার্থক্যও যথেষ্ট স্পষ্ট। পাশ্চাত্য-প্রভাবিত যে সাহিত্যাদর্শের প্রচারে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকরা নিজদিগকে নিয়োজিত করে-ছিলেন, সে-সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে তাঁর তরুণ বয়সেও (পরবর্তীকালে তো নয়ই) তিনি

তেমন আত্মিকতা অনুভব করেননি—যে-কারণে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে ও পরিপুষ্টিবিধানে 'কল্লোল' পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কোনো সমুন্নত (lofty) ধারণা কিংবা এর আদর্শ প্রচারে তাঁর আন্তরিক কোনো সমর্থন ছিলো না। এ-সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিই সুস্পষ্ট প্রমাণ—" 'কল্লোল' মোটেই বিরাট কিছু ঘটনা নয়।…কোনও বড় প্রতিভা এখান থেকে বেরোয় নি।" বরং, তুলনামূলকভাবে, তাঁর মনোভাব ঢের বেশি গর্বের ছিলো মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত 'কালি-কলম' সম্পর্কে। কিন্তু তবুও যে তিনি—অন্তত সাময়িকভাবে হ'লেও—'কল্লোলে'র কল্লোলে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার কারণ একদিকে যেমন নিহিত ছিলো 'কল্লোল'-প্রবর্তিত বোহিমীয় হাবভাবের আকর্ষণে (অচিন্ত্যকুমারের ভাষায়, 'তরুণ সাহিত্য-সেবীদের বন্ধুতা গ'ড়ে উঠেছিল, একটা আড্ডায় মিলেছিল'), অন্যদিকে তেমনই প্রোথিত ছিলো তাঁর নিজেরই স্বভাবের দুর্মর অস্থিরতা ও প্রাণচাঞ্চল্যের গভীরে। তাঁর স্বভাবের অফুরন্ত অস্থিরতাই তাঁকে অনিবার্যভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো 'কল্লোলে'র আড্ডায়, তাঁর স্বাভাবিক প্রবল প্রাণচাঞ্চল্য প্রশ্রয় পেয়েছিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অধিকাংশ-অনুসৃত বোহিমিয়্যান জীবনযাপনায়; কেননা 'কল্লোলে'র অধিকাংশের মতো তাঁর নিজেরও তখনকার আন্তরিক ইচ্ছেটাই ছিলো 'বোহেমিয়ান হ'য়ে জীবন কাটানো।' বটতলা বাড়ি, পাথরচাপতি, মধুপুর (তখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় মধুপুরে অবস্থান করছিলেন)—এই ঠিকানা থেকে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে অভিন্নহৃদয় অচিন্ত্যকুমারকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠির অন্তর্গত এই পংক্তি-কতিপয়ে তাঁর তদানীন্তন তরুণ বয়সের (আঠারো বৎসর) মনোভাব এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ "থামিস নি, কোনোদিন থামিস নি। থামব না আমরা, কিছুতেই না। ভয় মানে থামা, হতাশা মানে থামা, অবিশ্বাস মানে থামা, ক্ষুদ্র বিশ্বাস মানেও থামা। দেহের ডিঙা যদি তুফানে ভেঙে যায়, গুঁড়িয়ে যায়, গেল তো গেল—'হালের কাছে মাঝি আছে'।" বয়োধর্মে উঠ্‌তি-জোয়ানী-বয়সের অনেকের মধ্যেই এ-ধরনের অকুতোভয় ও বেপরোয়া মানসিকতার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়—যার সর্বশেষ চিহ্নটুকুও অল্পকালের মধ্যেই অবলুপ্ত হ'য়ে যায়।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষে কৃতিত্বের বিষয়টি হচ্ছে এই যে সদ্য-যৌবনের সেই glorious optimism বা শ্লাঘনীয় আশাবাদকে তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্তও তিনি সমানভাবেই ধ'রে রেখেছিলেন, রাখতে পেরেছিলেন; জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ব্যর্থতা তাঁকে বরণ করতে হয়েছে, কিন্তু কোনো ব্যর্থতাই সামগ্রিকভাবে জীবন-সম্পর্কে সেই জ্বলন্ত আশাবাদ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। জীবন-প্রারম্ভের সেই অব্যাহত গতির চরৈবেতি মন্ত্রকে তিনি তাঁর জীবনের বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে-ছিলেন ব'লেই জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই অবিরত দিক্‌-বদল করা সত্ত্বেও কোনো ক্ষেত্রেই—কি শিক্ষার্থী-জীবনে, কি জীবিকা-জীবনে কিংবা কি সাহিত্য-জীবনে, এমনকি পাঠক-জীবনেও—কখনো তিনি বিরত হননি, থেমে যাননি। বিস্ময়ের ঘোর আজীবনকে

আবিষ্ট করেছে যখন আমরা জানতে পেরেছি যে তাঁর বহু-অঙ্ক ও বিচিত্র জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে যখন তিনি নিতান্ত ক্ষীণদৃষ্টিবশত প্রত্যক্ষভাবে লেখা ও পড়ার জগৎ থেকে নির্বাসিত, তখনো সেই অনিবার্য নির্বাসনকে নিছক ভবিতব্য ব'লে মেনে না-নিয়ে মাস-হারা দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় পত্র-পত্রিকার পাঠক নিযুক্ত ক'রে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সর্বশেষ সংবাদ—কবিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন্ পথে এগোচ্ছে, গল্পকাররা কে কী ও কেমন লিখছেন, উপন্যাসের আঙ্গিক কতখানি পরিবর্তিত হ'লো কিংবা প্রবন্ধে-সমালোচনায় নূতন কথা কী পরিবেশিত হচ্ছে—তিনি সংগ্রহ ক'রে চলেছেন, কালীঘাটের আদিগঙ্গাতীরের সাবেক কালের বাড়ির পড়ার ঘরের জানলার পাশটিতে ব'সে যখন যাকে হাতের নাগালে পেয়েছেন তখন তাকে দিয়েই কোনো-না-কোনো বই পড়িয়ে নিয়েছেন, কিছু-না-কিছু বিষয়ে লিখিয়ে ছেড়েছেন,—এমনকি কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী এলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে তার কাছ থেকেও জানতে চেয়েছেন বিশ্বসংসারের সম্ভব-অসম্ভব যাবতীয় খবর। জিজ্ঞাসার এই বহুধা ব্যাপ্তি, মানসের এই সুগভীর গ্রহীষ্ণুতা আর সেই সঙ্গে অনবরত কথা লেখার অপরিসীম নেশা এবং প্রাণ খুলে কমা-ড্যাশ-সেমিকোলন-ফুলস্টপবিহীনভাবে অনর্গল একতরফা কথা বলার অপরিমেয় বিলাস, 'কল্লোল'কালীন অদম্য চাঞ্চল্য ও কর্মস্পৃহা, যৌবনসম্পৃক্ত মনের উত্তাপ—ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তিনি আমৃত্যু বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এটা তাঁর মনের নিছক ইচ্ছা মাত্র ছিলো না, বস্তুত সে-ক্ষমতাও তাঁর ছিলো যথেষ্ট রকম। এবং সেই কারণেই জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে, মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পূর্ব থেকে, শারীরিক কারণে (প্রধানত দৃষ্টি-ক্ষীণতাবশত) প্রত্যক্ষ সৃষ্টির সচল ধারাবাহিকতা থেকে যখন তিনি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লেন, পড়তে বাধ্য হলেন, তখন তিনি বিমূঢ় বোধ করেছেন, তাঁর মতো সজীব ও প্রাণবন্ত মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই তা বিশুদ্ধ অভিশাপ ব'লে প্রতিভাত হয়েছে এবং মৃত্যুকামনার মধ্য দিয়ে তিনি সে-অভিশাপ থেকে মুক্তির পথসন্ধান করেছেন। দেহাবসানের মাত্র পাঁচ মাস আগে (নভেম্বর, ১৯৮৭) 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর বিষণ্ণ উক্তি—'আত্মহত্যা মহাপাপ। নয়তো এক-এক সময় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। আমি কোন-দিন ভাবতে পারিনি, আমি বেঁচে থাকব অথচ লিখতে পারব না।'—থেকে আমরাও বিষণ্ণ চিত্তে উপলব্ধি করি যে কেবল মৃত্যুই তাঁকে নয়, তিনিও মৃত্যুকে সারাক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বস্তুত, তিনি অপেক্ষায় ছিলেন, নিঃশব্দে-নিভৃতে তিনি অপেক্ষা ক'রে ছিলেন সর্ব-শোক-দুঃখ-সন্তাপহারী মৃত্যু কখন আসবে, এসে চির-অব্যাহতি দেবে জীবন্মৃত শিল্পীকে তাঁর মর্মান্তিক অসহায়তা থেকে। তাই, অবশেষে, ১৯৮৮-র ৩রা মে মৃত্যু যখন সত্যি-সত্যিই এলো, এসে দয়ালু বন্ধুর মতো আপন অঙ্কে শায়িত ক'রে তাঁকে অন্তিম অন্ধকারে আবৃত ক'রে দিলো, তখন আমরা ইন্দ্রপতনের হাহাকারে উন্মথিত হ'য়ে উঠলেও পরিণত বয়সের তাঁর সেই মৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা পেয়েছি এই ভেবে যে, যাক্, তবু তিনি মুক্তি পেলেন, আচম্বিতে হ'লেও মৃত্যু এসে

তাঁকে মুক্তি দিলো। কিন্তু মৃত্যু কি তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহের মতো তাঁর স্মৃতিকেও গ্রাস করবে, করতে পারবে? শরীরের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই কি আমাদের মধ্য থেকে মুছে যাবে তাঁর সত্তার স্মৃতি? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করেনা এই কারণে যে আমাদের সাহিত্যকে আধুনিক ক'রে তোলার নিরলস প্রয়াসে একাধিক দিকের বিবেচনায় তিনি ছিলেন 'প্রথম', আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিকায় তাঁর স্থান কোনোক্রমেই অন্যান্যের মতো ছিলো না, নিশ্চিতরূপেই ছিলো অনন্যের মতো। অন্তত তাঁর মৃত্যুর পরেও যদি আমরা এই সত্য (যা তাঁর আয়ুষ্কালে অকারণে ও অন্যায়ভাবে আমরা অনেকে অস্বীকার করেছি) অকপটে মেনে নিই, তাহ'লে এক-দিকে বিবেকের বৃশ্চিকদংশন থেকে যেমন আমরা মুক্তি পাবো, অন্যদিকে তেমনই তাঁর এই স্বীকৃতি-অর্জনই হবে মৃত্যুর অন্ধকার হাত থেকে পাওয়া উজ্জ্বল উপহার।

আগেই বলা হয়েছে, কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠাতেই, ১৯২৬ সালে, 'দ্বার খোল, দ্বার খোল, রাত্রির প্রহরী'—শীর্ষক কবিতার মাধ্যমে। অতএব বোঝা যাচ্ছে, তাঁর কবিজীবনের সূত্রপাত আরো আগেই। কিন্তু কত আগে, আরো কত আগে? এ-প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে কবির নিজের উক্তিরই শরণাপন্ন হওয়া ভালো, তাতে সত্যের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা কম। ১৯৭৭ সালের শেষার্ধে 'বইপত্র'-প্রকাশিত তাঁর 'ছয় দশকের কবিতা' কাব্যসংগ্রহের ভূমিকাস্বরূপ 'পূর্বকথা'য় এ-সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, '····ঠিক ষাট বছর আগেই প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম দেখতে পাচ্ছি। বেশ যত্ন করে ধরে ধরে লেখা প্রথম কবিতার খাতাটি এখনো আমার কাছেই আছে। খাতাটির নাম দেখছি 'ঝলক' দিয়েছিলাম। ওপরে তারিখ দেওয়া আছে তেরশ পঁচিশ, পৌষ মাস। ইংরেজিতে ও তারিখ হবে উনিশ 'শ আঠার, ডিসেম্বর মাস।" অর্থাৎ তিনি তখন চতুর্দশবর্ষীয় কিশোর মাত্র। এভাবেই, তাঁর কবিজীবনের প্রাথমিক যে-পর্বকে তিনি বলেছেন 'হাতেখড়ির লেখা'র পর্ব', সে-পর্বে রচিত কবিতার খাতাগুলির নাম, 'অপরূপ', 'আমের বোল', 'রক্তরাঙা' ইত্যাদি। অবশ্য এই খাতাগুলির কোনো রচনাকেই তাঁর কোনো গ্রন্থে তিনি স্থান দেন নি। এবং সেটাই সঙ্গত হয়েছে; কেননা রচনাগত গুণমানের বিচারে এগুলি নিতান্তই নিম্ন স্তরের, ফলে নগণ্য। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এগুলিরও অন্তত ঐতিহাসিক একটা মূল্য আছে। এবং এই কারণেই, অন্য কোনো কারণে না-হ'লেও, এগুলিও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

'দ্বার খোল, দ্বার খোল, রাত্রির প্রহরী' কবিতার মধ্য দিয়ে 'কল্লোল' পত্রিকাতে যেমন কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তেমনই কবিরূপে তাঁর স্বাতন্ত্র্যও প্রথম সূচীত হয় এই 'কল্লোল' পত্রেই, 'কবি-নাস্তিক' কবিতায়। কবিতাটির, পাঠক-পাঠিকা চিত্তে প্রবলভাবে ধাক্কা মারার মতো নামকরণটিই (নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র নামকরণের মতো) শুধু নয়, সামগ্রিক আবহই স্পষ্টরূপে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এই স্বাতন্ত্র্যে মুগ্ধ হ'য়েই কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে তদানীন্তন প্রেমেন্দ্র-

প্রেমিক বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, 'মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়াও বাংলাদেশে আরও একজন কবি আছেন, এই আবিষ্কারে সমস্ত অন্তরাত্মা আলোড়িত হ'য়ে উঠলো। এই কবির ভাব, ভাষা, সুর, rhythm সব রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র থেকে একেবারে আলাদা।··· স্বপ্নলোকের অস্পষ্টতা ছেড়ে এই প্রাণ-উচ্ছ্বসিত সতেজ পেগানিজম—আমাদের নব যৌবনের রক্ত তার প্রভাবে টগবগ ক'রে ফুটতে লাগলো। মধুক্ষরা ঝঙ্কারের পরিবর্তে এই সাহসিক বন্ধুরতা, ভাষার এই স্পষ্ট ঋজুতা···মনে হ'লো হঠাৎ অবগুণ্ঠন স'রে গিয়ে বাংলা কবিতার নতুন একটি রূপ প্রকাশ পেলো।' 'কল্লোলে' প্রকাশিত প্রেমেন্দ্রের এই বিশেষ কবিতাটির মধ্যে বুদ্ধদেব সেদিন, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ভবিষ্যৎ ছবিটি হয়তো অবলোকন করতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর মন্তব্যে তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বন্ধুজনোচিত উচ্ছ্বসিত, অন্যদিকে তেমনই ছিলেন প্রকৃত সমালোচকসুলভ সত্যসন্ধ। কিন্তু আমরা জানি (যেহেতু ইতিহাস আমাদিগকে জানিয়েছে) যে 'কবি-নাস্তিক' কবিতাটি সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত অনেকাংশে সত্য হ'লেও ঐ কবিতাটিরই সমকালে (১৯২৩ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে) রচিত যে-পঁচিশটি কবিতার চয়নিকারূপে প্রেমেন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' ১৯৩২ সালে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে) প্রকাশিত হয়, সে-পঁচিশটি কবিতার সব ক'টি সম্পর্কেই তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সঠিক বা প্রযোজ্য নয়। কেননা সেগুলির মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক কবিতা অবশ্যই আছে সেগুলির 'ভাব, ভাষা, সুর, rhythm সব রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র থেকে একেবারে আলাদা' নয় কোনোক্রমেই। তবু 'প্রথমা'র কবির ওপর প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বের বিবেচনায় সত্যেন্দ্রনাথের কথা হয়তো উপেক্ষা করা চলে, কেননা প্রেমেন্দ্রের ওপর সত্যেন্দ্রের প্রভাব সত্যিই নগণ্য ; কিন্তু সামগ্রিকভাবে না-হ'লেও অন্তত 'প্রথমা'র কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্রের ওপর রবীন্দ্রের প্রভাবের প্রতিফলন আদৌ অলক্ষ্য নয়। বস্তুত, তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বে সর্বতোভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তির তেমন কোনো সচেতন ও সতর্ক প্রয়াসই প্রেমেন্দ্র পাননি। কেননা, আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার ক'রে নয়, বরং তাঁকে স্বীকার এবং এমনকি স্বীকরণপ্রয়াসের মধ্য দিয়েই কাব্যজগতে তিনি প্রথম পদক্ষেপ শুরু করেছেন। অতএব প্রকাশের ঈষৎ পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'প্রথমা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে সেটিকে যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত কাব্যগ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিলো, তার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য ছিলো না, ছিলো আংশিক সত্য। 'প্রথমা'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে জানাতে গেলে বলতে হয় যে, আবেগে উচ্ছ্বসিত অথচ ঋজু ও স্পষ্ট ভাষায় রচিত কতকগুলি যথার্থ কবিতার সমাহৃতি এটি। গ্রন্থস্থ কবিতাগুলির অভিনিবিষ্ট পাঠের ফলস্বরূপ আমাদের মনে এই ধারণাই জন্মায় যে মননজাত সংহতির তুলনায় ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্যই কবিচিত্তে প্রবলতর। অর্থাৎ, কবিতাগুলির উৎসকেন্দ্র মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়। অবশ্য প্রকৃতই অনুভূতিশীল যে-কোনো কবির পক্ষেই আবেগের এই আধিক্য এবং হৃদয়ের এই প্রাবল্য

—এর কোনোটাই অস্বাভাবিক কিংবা আশ্চর্যের কিছু নয় ; বরং এর বিপরীতটা ঘটলে (বিশেষত 'প্রথমা'র কবিতাগুলির রচনাকালীন এগুলির রচয়িতার সদ্য যৌবনোপনীত বয়সের কথা মনে রাখলে) সেটাই বোধহয় অস্বাভাবিক এবং আশ্চর্যের ব্যাপার ব'লে গণ্য হবার মতো। প্রকৃতপক্ষে সেদিনের তরুণ প্রাণোচ্ছলিত কবির পক্ষে কবিতা রচনা করতে গিয়ে ভাবোচ্ছ্বাসিত হ'য়ে ওঠা ভিন্ন গত্যন্তর ছিলো না, কেননা কবিজীবনের সেই বিকাশোন্মুখ পর্বে জাগতিক ও জৈবনিক বিভিন্ন বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন গভীরভাবে অনুভূতিশীল। এবং আমরা জানি, অনুভূতি যেখানে যত প্রবল, তার প্রকাশও সেখানে তত উচ্ছ্বসিত হ'তে বাধ্য। প্রথমা'র কবিতাগুচ্ছেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে, এই শিল্পমনস্তাত্ত্বিক সত্যের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। অথচ 'প্রথমা'য় প্রেমেন্দ্রের এই উচ্ছ্বাস 'প্রথমা'র মাত্র দু'বছর আগে (১৯৩০ সালে) প্রকাশিত 'অমাবস্যা'য় অচিন্ত্যকুমারের ভাবোচ্ছ্বাসের মতো বিরহবেদনা ও দহনজ্বালাসর্বস্ব রোম্যান্টিক হাহাকারে অবসিত অথবা 'বন্দীর বন্দনা'য় বুদ্ধদেবের আবেগোচ্ছ্বাসের মতো নিছক দেহজ কামনা-বাসনার সুতীব্র আর্তনাদে অপচিত নয়। 'প্রথমা'র কবির কৃতিত্ব এই যে প্রথম কাব্যগ্রন্থেই এমন একটি কাব্যসত্য তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন, যা সকল কবির পক্ষেই সমানভাবে ভেবে দেখার মতো। সেই সত্যটি হচ্ছে এই যে ভাবের আবেগ কিংবা উচ্ছ্বাস—কোনোটিকেই বর্জন করার প্রয়োজন নেই, উভয়কে পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেও শুদ্ধ কবিতা রচনা করা সম্ভব। আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে বিসর্জন নয়, শুধু প্রয়োজন ব্যক্তিগত ঘটনা বা বিষয়ের সংকীর্ণ বৃত্তে আবদ্ধ না-রেখে সামাজিক ও যৌথজীবনপ্রাসঙ্গিকতার বৃহত্তর বৃত্তে উভয়কেই প্রসারিত করে দেয়া। 'অমাবস্যা'র অচিন্ত্যকুমার এবং 'বন্দীর বন্দনা'র বুদ্ধদেব—দু'জনের সঙ্গেই 'প্রথমা'র প্রেমেন্দ্রের এখানে পার্থক্য, আর এই পার্থক্যের কারণেই কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'অমাবস্যা' এবং 'বন্দীর বন্দনা'র তুলনায় 'প্রথমা'র উৎকর্ষ।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় 'প্রথমা'র পঁচিশটি কবিতাই সমজাতীয় নয়—যদিও কয়েকটি কবিতায় বিষয়-সাদৃশ্য রীতিমতো স্পষ্ট। তবু বিষয়বস্তুর বিচারে কবিতাগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যার প্রতিটিই জীবনের এক-একটি বিশেষ দিকের প্রকাশক। অর্থাৎ, 'প্রথমা'র কবিতাগুচ্ছে মানব-অস্তিত্বের তিনটি দিক্ উন্মোচিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলির বিষয়বস্তু সাধারণভাবে সমগ্র মানবসমাজ এবং বিশেষভাবে নির্বিশেষ মানুষ। ব্যক্তিনির্বিশেষ মানুষের অস্তিত্বের যুগপৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতার বাণীচিত্রন, সাময়িকতা ও চিরন্তনতার উন্মোচন এবং সেই সঙ্গে বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানবজীবনপ্রবাহের নিবিড় ও নিহিত সম্পর্কের অন্বেষণ এই কবিতাগুলিকে মর্ত্যদার্শনিক (earth-philosophical) ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে। 'যদি ফিরে আসি', 'সংশয়' এবং 'মানে' এই শ্রেণীর মর্ত্যদার্শনিকতাব্যঞ্জক কবিতার উত্তম উদাহরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলির কেন্দ্রে রয়েছে সাধারণ মানুষ, শোষিত মানুষ, পীড়িত মানুষ, দলিত মানুষ—অর্থাৎ সমাজের নিচুতলার মানুষেরা।

এই শ্রেণীর কবিতাসমূহে সমাজের উনজনরা অনুপস্থিত এবং অধিজনদেরই আনাগোনা, আধিপত্য। এই কবিতাগুলির বুকে কান পাতলে সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের কলধ্বনি নয়, শোনা যায় সমাজের নিম্নকোটির মানুষদের অবিরাম পদধ্বনি। এই হতভাগ্যদের জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের বর্ণনাতেই কবিতাগুলি মুখর, এদের জীবনের ছোটো-খাটো সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার উন্মোচনেই কবিতাগুলি উদ্বেল। গোত্রগত অবস্থানে এই কবিতাগুলি গণসাহিত্যের অন্তর্গত। গণধর্মী এই শ্রেণীর কবিতার সর্বাপেক্ষা সতেজ দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থের 'বেনামী বন্দর', 'আমি কবি' এবং 'নমস্কার'। এই দুই শ্রেণীর কবিতার পাশাপাশি আরো যে-একশ্রেণীর কবিতা 'প্রথমা'র স্থান পেয়েছে, সেগুলি একেবারেই অন্য ধরনের—এমনকি, একমাত্র নজরুলের কয়েকটি কবিতার কথা বাদ দিলে, বাংলা কাব্যের সমগ্র আবহেই সম্পূর্ণ অভিনব। এই কবিতাগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য দুরন্ত গতিবেগ—যাকে সম্বল ক'রে কবিচিত্ত মহাবিশ্বের দিক্ হতে দিগন্তরে উল্কার মতো দ্রুত ধাবমান। এই সুদূরসতৃষ্ণ কবিমানসের প্রকাশ 'সুদূরের আহ্বান' এবং 'নটরাজ' কবিতাদ্বয়ে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। প্রধান এই তিন শ্রেণীর কবিতা ছাড়াও 'প্রথমা'য় রয়েছে সমর্পিত একটি প্রেমের কবিতা 'তুমি আছ তাই' এবং উৎকৃষ্ট একটি ছড়া 'হঠাৎ যদি'। 'প্রথমা'র এই বিভিন্ন ধরনের কবিতাগুলির অন্তত কিছু সংখ্যক সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষেপে সমাপনান্তে এটির পর্যালোচনা আমরা সমাপ্ত করবো।

প্রথমেই 'যদি ফিরে আসি'। 'প্রথমা'র আঠারো নম্বর এই কবিতাটির জন্মস্থান ঢাকা, জন্মকাল জগন্নাথ কলেজে মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠকালীন কবির অসমাপ্ত ছাত্রজীবন। কবিজীবনের প্রথম পর্বের অত্যুত্তম কয়েকটি রচনার অন্তর্গত এই কবিতাটি তাঁর সমগ্র কবিজীবনেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এবং তাঁর যে-সমস্ত কবিতায় মর্ত্যজীবনের প্রতি তাঁর গভীর মমতা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যেও এই কবিতাটির স্থান সর্বোচ্চে। এই মর্ত্যমায়া পৃথিবীর প্রতি সুগভীর আকর্ষণজাত, মানব-সংসারকে সামগ্রিকভাবে ভালোবাসার ফল। শতসহস্র সুখ-দুঃখ-তরঙ্গিত, আশা-নিরাশার বিচিত্র আলোছায়া-বিজড়িত এই ভঙ্গুর ও নশ্বর মর্ত্যসংসার কবিকে গভীর ভালোবাসায় আকর্ষণ করেছে, তিনিও এই মর্ত্যভুবনের প্রতি অতি নিবিড় এক টান নিজের অন্তরে অনুভব করেছেন। পৃথিবীর প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণবোধের কারণ এই যে জীবনের চরম দুর্দিনে 'বন্ধুর প্রেম', 'প্রিয়ার দৃষ্টি' এবং 'জননীর অযাচিত স্নেহে'র মাধ্যমেই পৃথিবী তাঁকে আপন অঙ্কে ঠাঁই দিয়েছে। তাই তিনি শপথ করেছেন, এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ আমি করব না', এই 'জীবনকে আমি তিক্তমুখে অভিশাপ দেব না।' কিন্তু জীবনের 'ভুলভ্রান্তি স্খলন-পতন', ব্যর্থতাজনিত 'চোখের জল', 'দীর্ঘশ্বাস', 'হতাশা-বেদনা' এবং সেই সঙ্গে কবির 'কল্লোলীয়'-কল্প (?) প্রবল আত্মানুভূতি বা অহং-চেতনা (ego-consciousness)—ইত্যাদি বিবিধ হেতু-সন্নিবেশে পৃথিবী ও তাঁর মধ্যের ভালোবাসা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। ফলে গভীর এক অতৃপ্তিতে কবিচিত্ত মথিত

এবং অতৃপ্তিমথিত কবি আগামী জন্মে এই জন্মের সর্ববিধ অসম্পূর্ণতার সম্পূর্ণতার অবোধ সান্ত্বনায় নিজেকে আশ্বসিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সংশয় (কবিতাটির শিরোনামে 'যদি' শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত) তাঁকে দোলায়িত করেছে; কেননা পরজন্মের অবশ্যম্ভাবিতার সুনিশ্চিত কোনো প্রমাণ তিনি পাননি—এমনকি আগামী জন্মে 'যদি' তিনি এই পৃথিবীতে আবার ফিরেও আসেন, তবু তাঁর সম্পূর্ণ শান্তি নেই, পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই; যেহেতু তাহ'লেও গভীর এই সংশয় থেকে গভীরতর অন্য এক সংশয়ে আন্দোলিত হওয়ার হাত থেকে তাঁর কোনো অব্যাহতি নেই। 'জন্ম-জন্মান্তরের বিবর্তনে বিবর্তিত মানবচেতনার সজ্ঞান ধারাটি পরজন্মেও অবিকৃতরূপে প্রবাহিত থাকে কিনা'—এই প্রশ্ন তাঁর মধ্যে আলোড়িত হওয়াতেই তাঁর মনে গভীরতর এই দ্বিতীয় সংশয়ের সৃষ্টি। আলঙ্কারিক পরিভাষার 'ভাব' এবং মনস্তাত্ত্বিক ধারণার 'সংস্কার',—এ-দু'য়ের যুগ্ম-অভিঘাতে মানুষের মনোরাজ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্ট এবং মানুষের জীবনে বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আত্মচেতনার ধারাটি কালব্যবধান অতিক্রম ক'রেও অবিচ্ছিন্ন থাকে ব'লেই মানুষের পক্ষে 'স্মরণ' প্রক্রিয়াটি সম্ভব, অতীতের কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সনাক্ত করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য। স্মৃতির এই ক্রিয়াশীলতায় কবি সংশয়শূন্য: কিন্তু ভবিষ্যজন্মেও এই স্মৃতি ঠিক একইভাবে ক্রিয়াশীল থাকে কিনা, সে-সম্পর্কে তিনি মোটেই সংশয়মুক্ত নন। সেজন্যই তাঁর মনে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা জেগেছে, এ-জন্মের সকল অপূর্ণতার পূর্তি এবং সকল অতৃপ্তির অবসান আগামী জন্মে ঘটবে কিনা, জন্মান্তরের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে বর্তমান জন্মের সঙ্গে আগামী জন্মের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ-বেদনার যোগ-সূত্রটি স্মৃতির মাধ্যমে অব্যাহত থাকবে কিনা। তাই কবিতাটির প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী একটি স্তবকে যথাক্রমে তাঁর প্রশ্ন ঃ

> ফিরে আসি যদি
> ... ...
> নূতন ধরণী 'পরে কারেও কি পারিব চিনিতে,
> কাহারেও পড়িবে কি মনে?
> এ-জীবনে যাহাদের ভালোবাসিয়াছি
> আজ ভালোবাসি যাহাদের
> তাহাদের সাথে হবে দেখা?
> —পারিব চিনিতে?

এবং

> যে মুকুল-আশাগুলি রেখে যাবো আজ
> জীবনের খেয়াঘাটে বিদায় সন্ধ্যায় অর্ধস্ফুট,
> তাহাদের সাথে আর
> হবে ফিরে দেখা?

কিন্তু যেহেতু কবিচিত্তে উত্থিত এ-সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাঁর জানা নেই কিংবা এইসব জিজ্ঞাসার আনুমানিক উত্তরের যাথার্থ্য বিষয়েও তিনি নিঃসংশয় নন, অতএব পরজন্মে তিনি কোথায়, কোন্ পরিবেশে অথবা কার ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন, সে-সম্পর্কে তাঁর খাঁটি রোম্যান্টিকসুলভ সম্ভব-অসম্ভব জল্পনা-কল্পনারও কোনো অন্ত নেই। কখনো ভাবছেন হয়তো কোনো 'ফেনশীর্ষ' সাগরের তীরে ডুবারীর ঘরে' তিনি জন্ম নেবেন, কখনো কল্পনা করছেন 'কোন পথের নটীর কোলে' তাঁর জন্মাবার কথা আবার কখনো বা 'কিংবা কোথা' সে-সম্পর্কে তিনি 'কিছু নাহি' জানেন। কিন্তু অন্তিম স্তবকে পৌঁছে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবং সকল সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত ক'রে এক মঙ্গলচেতনায় কবিতাটিকে তিনি উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছেন, এক শুভ আস্তিক্যবোধে (benevolent theism) কবিতাটির উত্তরণ ঘটিয়েছেন এবং ফলে, সাধারণভাবে প্রথম মহাসমরোত্তর বাঙালী কবিদের বিশ্বাসবিচ্যুত মানসিকতার ছাপ এবং বিশেষভাবে, 'কল্লোল'কালীন সন্দেহ-সংশয়ের যুগকালিমা থেকে মুক্তি পেয়ে যুগোত্তীর্ণতার স্পর্শে কবিতাটি সার্থক হ'য়ে উঠেছে, সিদ্ধি অর্জন করেছে ঃ

> ফের যদি ফিরে আসি,
> আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
> বুকে আরো প্রেম যেন আনি
> পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে ।
> এবারের যত ভুলভ্রান্তি
> স্খলন পতন
> ক্ষমায় ভুলিয়া আসি :
> আরো আনি পথের পাথেয়
> আনন্দ অক্ষয়।

পরিশেষে কবিতাটিতে প্রকাশিত কবির মর্ত্যপ্রীতির স্বরূপ সম্পর্কে দু'-একটি কথা অতি সংক্ষেপে সেরে নিতে চাই। এই কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' ও তাঁর প্রথম যৌবনকালীন 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রারম্ভিক 'প্রাণ' কবিতার এবং 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' সঙ্গীতের ভাবসাদৃশ্যের স্পষ্টতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতিতে প্রকাশিত জীবনাসক্তির তুলনায় প্রেমেন্দ্রের মর্ত্য-প্রীতিতে আভাসিত জীবনাসক্তির তীব্রতা অনেক কম। তাছাড়া, মানবজগৎ ও প্রকৃতি-জগৎ—রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যানুরাগের এই দুই দিকের দ্বিতীয়টির প্রকাশও প্রেমেন্দ্রের মর্ত্যানুরাগের কবিতায় অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রেমেন্দ্রের 'যদি ফিরে আসি' কবিতাটির সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎ অগ্রজ জীবনানন্দের "'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্বের শেষদিকের ফসল" 'রূপসী বাংলা'র শিরোনামহীন 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়' প্রথম পংক্তিবহ চতুর্দশতম কবিতাটিরও ভাবসাযুজ্য যথেষ্ট স্পষ্ট ; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে পার্থক্য এখানটায় যে জীবনানন্দের দৃষ্টির চেয়ে প্রেমেন্দ্রের দৃষ্টির পরিধি বেশি ব্যাপ্ত।

জীবনানন্দ আলুলায়িত পল্লীবাংলার ভৌগোলিক সীমাবৃত্তে প্রত্যাবর্তনাভিলাষী, কিন্তু প্রেমেন্দ্র ফিরতে চেয়েছেন বিশাল পৃথিবীর বিস্তৃত পরিবেশে। বিপরীতক্রমে, বাংলাতেই হোক আর পৃথিবীর যেখানেই হোক, প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে মনোভাবের বিচারে জীবনানন্দ যেখানে নিশ্চিতরূপে প্রত্যয়ী (confident) প্রেমেন্দ্র সেখানে স্পষ্টতই সংশয়ী (agnostic)। 'আবার আসিব ফিরে' এবং 'ফের যদি ফিরে আসি'—দুই কবির কবিতা দু'টির এই আরম্ভ-অংশ দু'টি থেকেই এ-বিষয়ে তাঁদের মনোভাবের পার্থক্য সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হওয়া সম্ভব। আবার, মর্ত্যদৃষ্টির ব্যাপ্তিগত সাদৃশ্য ছাড়া, অমিয় চক্রবর্তীর মর্ত্যপ্রীতির স্বরূপের সঙ্গেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্ত্যানুরাগের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। অমিয় চক্রবর্তীর বৈরাগ্য-বিমিশ্র 'ইহরাগে'র মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্ত্যরাগে এমন কোনো ভাবনা নেই যে, যেন তিথি-নক্ষত্রের হিসেববিহীন অজ্ঞাতপরিচয় কোনো গ্রহলোক থেকে দৈবাৎ তিনি অনিশ্চিত এই সংসারে বিরল ভাগ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন, যেন এই পৃথিবীতে তিনি ক্ষণিকের অতিথি, স্থায়ী বাসিন্দা নন। তাছাড়া, অমিয় চক্রবর্তীর মর্ত্যদৃষ্টির প্রসারণে ক্রবাদুরদের মতো দেশ থেকে দেশান্তরে অবিশ্রাম পথিকবৃত্তির যে-ভূমিকা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্ত্যদৃষ্টির সম্প্রসারণে তেমন কোনো ভ্রামণিকসত্তার সক্রিয় ভূমিকার কথাও আমাদের অজানা। এবং অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিও প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টির চেয়ে অনেক 'দূরযানী'। জীবনানন্দের বাংলা-সীমিত দৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে প্রেমেন্দ্রের দৃষ্টি যে-ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টি সে-ক্ষেত্রে পৃথিবীর সীমাকেও ছাড়িয়ে বিপুল বিশ্বে প্রসারিত। অর্থাৎ, অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টি বৈশ্বিক (cosmic) আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টি পার্থিব (earthly)। এবং এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই Meredith-এর 'earth-philosophy'-র সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্ত্যদৃষ্টির সর্বাধিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

'প্রথমা'র দ্বিতীয় যে-কবিতাটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্ত্যপ্রীতির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে, সে-কবিতাটির নাম 'সংশয়'। এই কবিতাটির সঙ্গে কবির সদ্যালোচিত 'ফের যদি ফিরে আসি'র গভীর ভাব-নৈকট্যের কথা উল্লেখের অপেক্ষা না-রাখলেও এই কবিতাটির প্রসঙ্গে যে-কথাটার উল্লেখ না-করলেই নয় সেটা হচ্ছে, 'ফের যদি ফিরে আসি'র ভাষা এবং প্রকাশরীতির তুলনায় এটির দুই-ই বেশি স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ, ব্যঞ্জনাবিহীনতার দরুণ ঋজু ও প্রত্যক্ষ। পৃথিবীর প্রতি কবির ভালোবাসা অসীম, কিন্তু এই অনিত্য সংসারে মানুষের আয়ু সসীম। অতএব এই জন্মের অসমাপ্ত ভালোবাসার ধারাটিকে আগামী জন্মেও তিনি প্রবাহিত দেখতে চান। সেই জন্যই পুনর্জন্মের জন্য তাঁর প্রার্থনা এবং সেই একই কারণে পরজন্মের পৃথিবীর প্রতি এই জন্মেই তাঁর চিত্তে জন্ম নিয়েছে অবোধ এক মমতা, আশ্চর্য এক দুর্বলতা। এবং আগামী জন্মের পৃথিবীর জন্য তাঁর এই আশ্চর্য দুর্বলতাই আলোচ্য কবিতাটিকে আশ্চর্য এক সবলতা প্রদান করেছে, যার প্রকাশ এই দৃপ্ত সংকল্পোচ্চারণে ঃ

যে শেষ নিশ্বাসটি পৃথিবীকে দিয়ে যাব তাতে বিষ থাকবে না,
থাকবে শুধু চিরকালের নব সূর্যোদয়ের জন্য চিরন্তন প্রণতি,
ভ্রূণ ভবিষ্যতের জন্য শাশ্বত আশীর্বাদ।

মন্ত্রকল্প অবগাঢ় এই সংকল্প তিনি নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছেন, করতে পেরেছেন, যেহেতু তাঁর 'ইহবাদী' ধারণা, 'মর-দেহের চেয়ে মূর্খ', মোক্ষ নয় মহার্ঘরে', যেহেতু তাঁর মর্ত্যবাদী প্রত্যয়, 'এই জীবন মোর সাধনা / স্বর্গ মোর এই ভুবন।' কবিচিত্তে কোথাও দ্বিধার দ্বন্দ্ব নেই, কবিতাটিতে কোথাও সংশয়ের আবরণ নেই ; অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, এহেন সংশয়শূন্য ও স্থিরপ্রত্যয়ী কবিতাটিরও নাম 'কল্লোলে'র কালপ্রভাবে রাখা হয়েছে 'সংশয়' এবং সেই সঙ্গে এটাও কিছুমাত্র কম বিস্ময়ের ব্যাপারে নয় যে এমন মর্ত্যমায়াঘন কবিতাটি এটির রচয়িতার বিচারে 'শ্রেষ্ঠ' পদবাচ্য রচনার মর্যাদা লাভ করে নি, যা 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় এটির অনুপস্থিতি থেকেই প্রমাণিত।

'মানে' 'প্রথমা'র এমন আরেকটি কবিতা, যেটিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্ত্যানুরাগের অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করলে কাব্যসমালোচনার পুরোনো ধারার কেউ-কেউ হয়তো রীতিমতো আপত্তি জানাবেন। তাঁরা হয়তো এটিকে মাত্র দর্শনধর্মী একটি কবিতা হিসেবেই বিবেচনা করবেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ক'রেও এবং তাঁদের মতামতকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েও প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতাটিকেও আমি তাঁর মর্ত্য-প্রীতির পরিচায়ক রূপেই গণ্য করবো। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, তাঁর মর্ত্য-চেতনায় প্রকৃতিজগতের তুলনায় মানবজগতেরই প্রাধান্য। অতএব যখনই এবং যেখানেই তিনি মানুষ সম্পর্কে কিছু-না-কিছু বলেছেন, তখনই এবং সেখানেই তা হ'য়ে উঠেছে তাঁর মর্ত্যপ্রেমের প্রকাশক। 'মানে'র ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তবে এই কবিতাটিতে সংসার-চলতি কোনো গড় মানুষ বা average man-এর কথা আমরা পাই না। এই কবিতায় কবি তাঁর মর্ত্যদৃষ্টিকে আপৃথিবীপরিধি প্রসারিত ক'রে মানুষকে দেশ ও কালের সর্ব-সীমাতিক্রমীরূপে দেখতে চেয়েছেন। ফলে, এই কবিতাটিতে তেমন মানুষেরই মানে তিনি তন্ন-তন্ন ক'রে সন্ধান করেছেন, যেমন মানুষকে আমরা বলতে পারি **total man**, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানুষ। এই সম্পূর্ণ মানুষের অর্থসন্ধানই 'মানে' কবিতাটিতে কবির অভীষ্ট। কবিতাটির আরম্ভেই আছে ঃ

মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে!
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।

কিন্তু কেন তিনি 'গোটা মানুষে'র মানে খুঁজছেন ? উত্তরস্বরূপ তিনি জানাচ্ছেন ঃ

—নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না !
এই নিখিল-রচনার অর্থ মানুষের অর্থকে
আশ্রয় করে আছে যে—!
তাই, তোমারও মানে চাই আর আমার।

এই প্রাণময় গ্রহে কাল-পরম্পরায় আবর্তিত মানবেতিহাসের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনার অন্তে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে ঃ

মানুষের মানে কি কাফ্রী-ক্রীতদাস ?—হারেমের খোজা ?
... ...
মানুষের মানে কি ল্যাংড়া তৈমুর ?—হূন আত্তিলা ?
... ...

অথবা

মানুষের মানে কি শুধু বুদ্ধ ?—শুধু খৃষ্ট ?

কিন্তু 'মানুষের মানে'-সংক্রান্ত তাঁর অন্তর্মথিত এই প্রশ্নাবলীর কোনোটিরই কোনো সদুত্তর বিশ্ববিধানের কোথাও তিনি খুঁজে পান নি। তাই উত্থাপিত এই প্রশ্নগুলির চেয়েও আর্ত ও গূঢ় অন্য একটি প্রশ্নের উচ্চারণে কবিতাটিকে তিনি সমাপ্ত করেছেন ঃ

মানুষ কি তার সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা ?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলই লেখা আর মোছা চলেছে ?

ফলে, এই প্রশ্নসর্বস্বতা এবং উত্তরবিহীনতার দরুণ কবিতাটি ভারসাম্য হারিয়ে একপাশে ঝুঁকে পড়েছে, কবিতাটির কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেছে।

'প্রথমা'র দ্বিতীয় ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনটি—রচনার কালানুক্রমে 'বেনামী বন্দর' 'আমি কবি যত কামারের' এবং 'নমস্কার'। এই তিনটির মধ্যে আলোচনা হয়েছে সর্বাধিক 'আমি কবি যত কামারের' কবিতার এবং সর্বনূ্যন 'নমস্কার'কে নিয়ে। অথচ তিনটি কবিতাই সমানভাবে আলোচিত ও আদৃত হবার যোগ্য ; কেননা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যে নূতন ধারা প্রবর্তনে তিনটিরই ভূমিকা সমগুরুত্বের। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় অভিনব ধারাসূচনায় এই ভূমিকাগত গুরুত্বের সমতা ছাড়াও সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন অন্য একটি দিকের বিবেচনাতেও, কবিতা তিনটি, বলা চলে, সমমূল্যের। এবং সেই অন্য দিক্‌টি হচ্ছে বিষয়বস্তুর এবং ভাবের। বস্তুত, শব্দের চয়নে, ছন্দের প্রয়োগে এবং উপস্থাপনার রীতিতে কবিতা তিনটি অবশ্যই পৃথক, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পার্থক্যের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, কবিতা তিনটির ভেতরে প্রবেশ করলে, স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়, বিষয়বস্তুর উপজীব্যতায় এবং ভাবের প্রকাশে তিনটি কবিতাই গভীরভাবে সাদৃশ্যসম্পন্ন। আর, এই সাদৃশ্যও কোনোক্রমেই আপাতিক নয়, তা নিশ্চিতরূপেই আন্তরিক। অর্থাৎ, কবিতা তিনটির এই বিষয় ও ভাবগত সাদৃশ্য কোনো আকস্মিক ব্যাপারমাত্র নয়, বরং কবির সজ্ঞান ও সচেতন

মানসিক প্রক্রিয়ারই পরিণতি। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই কবি একটি মূল বিষয়কে তিনটি কবিতায় উপজীব্য করেছেন, একই প্রধান ভাবকে তিনটি কবিতাতেই প্রবাহিত করেছেন। কিন্তু কী সেই বিষয় আর কী-ই বা সেই ভাব, যা তিনি এই কবিতা তিনটিতে আশ্রয় করেছেন, ব্যঞ্জিত করেছেন? খুব সহজ কথায় সেই বিষয় সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষ, খেতে-না-পাওয়া মানুষ, খেটে-খাওয়া মানুষ, শ্রমজর্জর ও শ্রমসর্বস্ব মানুষ—অর্থাৎ, এককথায় সমাজের ভিত-মানুষ (plinth-man)। আর, সেই ভাব হচ্ছে এদের প্রতি অসীম দরদ, এদের জন্য গভীর মমত্ব। সমাজের এই ব্রাত্য-জনদের নিঃস্ব ও নির্যাতীত জীবনের বিরতিহীন সংগ্রামের প্রতি কবির অকুণ্ঠ সমর্থনে কবিতা তিনটি যেমন উষ্ণ, এদের অসহায়তাহেতু এদের জন্য কবিচিত্তের গভীর দরদের সিঞ্চনেও কবিতা ক'টি তেমনই আর্দ্র। সমাজব্রাত্যদের জন্য এই যে অকৃত্রিম সহানুভূতি,—যা প্রেমেন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য,—পদ্যে তার সূচনা কিন্তু মাত্র সতেরো বছর বয়সে লেখা তাঁর জীবনের প্রথম পরিণত ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত কবিতা 'বেনামী বন্দরে'র প্রারম্ভিক ও আন্তিক এই পংক্তি কতিপয়েঃ

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়!
মাল বয়ে-বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।
... ...
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়॥

পরে, নিজের কাব্যবিশ্বাসের পথে এগোতে-এগোতে, যখন তিনি 'জগতের মত··· হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের' জন্য মমতায় উদ্বেল হ'তে-হ'তে, তাদের দুঃখে গ'লে নদী হ'য়ে তাদের জীবনের সাথে মিশে গিয়ে 'আমি কবি যত কামারের' কবিতায় আত্মপরিচয় জানাতে নির্দ্বিধায় ব'লে উঠলেনঃ

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!

এবং নিজের জীবনকৃতির তালিকা এই ভাষায় প্রকাশ করলেনঃ

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন.
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুন !
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
হাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় :
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই কুঠারঘায় ।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই পথ বানাই,

তখন, তাঁর সেই ব্রাত্যজীবনতৃষ্ণার উৎস সন্ধান করতে-করতেই আমরা পৌঁছে গেলাম বহু সহস্র যোজন ব্যবধানের মহাদেশ আমেরিকার গণতন্ত্র-প্রেমিক ওয়াল্ট হুইটম্যানের গণকবিতার রাজ্যে এবং মার্কিন হুইটম্যানের সঙ্গে বাঙালী প্রেমেন্দ্রের সাদৃশ্য অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। বস্তুত, বহু দূরের এই দুই কবির মধ্যে সাদৃশ্য যে একেবারেই ছিলো না, তা মোটেই সত্য নয়। দু'জনের মধ্যে জীবনপর্যবেক্ষণের মিল ছিলো এখানটায় যে তাঁরা দু'জনেই ছিলেন দূরদৃষ্টিনিবদ্ধ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁদের দৃষ্টি কাছের ঘটনা বা বস্তুকে এড়িয়ে-যাওয়া ; এর অর্থ আসলে এই যে কাছের সমস্ত কিছুও তাঁরা ঠিকই দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের কাছের কিছু দেখাটাও ছিলো দূরের প্রেক্ষিতে দেখা, নিকটকেও দূরের সঙ্গে অন্বিত ক'রে পর্যবেক্ষণ করা। অবশ্য জীবন পর্যবেক্ষণগত এই মিলকে ছাপিয়ে অন্য যে-মিলটি এই দু'জনের মধ্যে সেদিন স্পষ্ট-ভাবে ধরা পড়েছিলো, সেটি ছিলো বিষয়বস্তু নির্বাচনের। নিজেদের কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এঁরা উভয়েই ছিলেন গণজীবনমুখী। উভয়ের কবিতায় গণজীবন-আহৃত বিষয়বস্তুর সমাবেশই একের সঙ্গে অন্যের তুলনাকে অনিবার্য ক'রে তুলেছিলো সেদিন। এবং এই প্রসঙ্গেই সমালোচকদের কেউ-কেউ প্রেমেন্দ্রের 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাটির আলোচনা করতে গিয়ে এটির ওপর হুইটম্যানের দু'টি কবিতার—'Pioneers ! O Pioneers' এবং 'Crossing Brookly Ferry'—প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যৌক্তিকতার সঙ্গেই। কেননা হুইটম্যানের এই কবিতা দু'টির একটির অন্যতম পংক্তি 'I was one of a living crowd'-এর সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের এই কবিতাটির 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, / মুটে মজুরের, / —আমি কবি যত ইতরের !' পংক্তি ক'টির ভাবগত সাদৃশ্য সত্যিই সতর্ক পাঠকের লক্ষ্যে পড়ার মতো। কিন্তু এ-দুটি ছাড়াও আরো একটি কবিতা আছে এবং একজন মার্কিন কবিরই, যেটির 'I am the people, the mob—the crowd—the mass' পংক্তিটির ভাবধ্বনিকে প্রেমেন্দ্রের কবিতাটির উপরোক্ত পংক্তি ক'টিতে স্পষ্টত প্রতিধ্বনিত

হ'তে শোনা যায়। কবিতাটির নাম 'I am the people, the mob' এবং এটির রচয়িতা কার্ল স্যাণ্ডবার্গ।

কিন্তু এই প্রভাবের অস্তিত্ব সত্ত্বেও 'আমি কবি যত কামারের' কবিতায় প্রেমেন্দ্রের নিজস্ব স্বরটি আদৌ অশ্রুত বা অস্পষ্ট নয়। কিন্তু কী সেই স্বর, কবিতাটিতে তাঁর নিজের বলার কথাটি কী? কথাটি হচ্ছে এই যে 'ঐক্যতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে কবির বাণীর জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে ছিলেন, এই কবিতাটিতে সেই কবির ভূমিকায় নিজেকে তিনি অবতীর্ণ করাতে চেয়েছেন; যে গণজীবনবন্দনায় মুখর হ'তে চেয়েও মুখর হ'তে পারেননি ব'লে রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্ত্য-পর্বে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন, রবীন্দ্রা-ভিলাষের পূর্ণায়ন ঘটিয়ে সেই গণজীবনবন্দনায় প্রেমেন্দ্র তাঁর এই কবিতাটিতে মুখর হ'য়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী-নির্বিশেষ কবি; 'আত্মপরিচয়'-এ তাঁর আত্মপরিচিতি, 'আমি কবিমাত্র'। কিন্তু, অন্তত এই কবিতায়, প্রেমেন্দ্র তেমন নন, তিনি স্পষ্টতই শ্রেণীবিশেষের কবি। নিজের পরিচয় জানাতে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের / মুটে মজুরের /—আমি কবি যত ইতরের!' অর্থাৎ, ব্রাত্যজীবনস্পর্শই তাঁর কবি-আভিমুখ্য। এবং কবি হিসেবে তাঁর এই আভিমুখ্যের কথা কবিতাটিতে তিনি মাত্র ব্যক্তই করেননি, তাকে তিনি বাস্ত-বায়িতও করেছেন—ব্রাত্যজনজীবনকে সত্যি তিনি স্পর্শ করেছেন, করতে পেরেছেন। এখানেই সূচীত হয়েছে রবীন্দ্র-প্রেমেন্দ্রে পার্থক্য আর এই পার্থক্যেই কবিতাটির সার্থকতা।

কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে কবিচিত্তের বিচরণশীলতায় বৈচিত্র্যের পরিচয় আছে। প্রথম ও ষষ্ঠ স্তবকে কবি ব্রাত্যজীবনস্পর্শী, দ্বিতীয় স্তবকে 'পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু'র অপেক্ষমানতা অনুভবকারী, তৃতীয় স্তবকে বিশ্ব-অভিযাত্রী, চতুর্থ স্তবকে প্রিয়া-সান্নিধ্যাভিলাষী, পঞ্চম স্তবকে 'বিশ্বকর্মা'র 'চারণ' এবং সর্বশেষে, সপ্তম স্তবকটিতে, বৈশ্বিক কর্মযজ্ঞের শরিক। কবিমানসের এই বহুমুখিনতা কবির অস্থিরচিত্ততার পরিচায়ক নয়, কবি স্বভাবের বৈচিত্র্যাভিলাষেরই পরিজ্ঞাপক। বিচিত্র সেই অভিলাষের তাড়নাতেই এই কবিতাটিতে তিনি অংশীদার হ'তে চেয়েছেন বিশ্বময় যে-কর্মযজ্ঞ চলেছে, তার; ত্বরান্বিত করতে চেয়েছেন জগৎজুড়ে মানুষের যে-অগ্রগতি চলেছে, তাকে। তাঁর এই বিশ্বজীবনাভিলাষের কাছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যাভিসারও তাই আজ হ'য়ে উঠেছে তুচ্ছ।

বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির সুচারু মেলবন্ধ এবং গভীর জীবনানভূতিসমৃদ্ধ ও আবেগ-উচ্ছ্বসিত এই কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে কয়েকটি সুন্দর শব্দপ্রতিমা আছে: দ্বিতীয় স্তবকে 'পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু' ও 'দুরন্ত নদী', তৃতীয় স্তবকে 'দুঃসাহসের পাখা' এবং সপ্তম স্তবকে 'স্বপ্নবাসরে বিরহিনী বাতি'। আর আছে 'হায়' অব্যয়পদটির চারবার পরিকল্পিত প্রয়োগ। এই প্রায়োগিক পৌনঃপুনিকতায় রোম্যান্টিক বেদনার ব্যঞ্জনা গাঢ়তা অর্জন করেছে। অবশ্য শুধু রোম্যান্টিক বেদনাই নয়, কবিতাটিতে

রোমান্টিক আশাবাদের অভিব্যক্তিও অতিশয় স্পষ্ট। এবং কবিতাটির আশাবাদী আবহে আত্মসংশয়ের যে-সুর অংশত ধ্বনিত, তা আধুনিকতার লক্ষণসমূহের অন্যতম।

'নমস্কার' কবিতাতেও লক্ষ্য করি, ব্রাত্যমানবের প্রতি কবির সীমাহীন সমবেদনার প্রকাশ। কবিতাটির প্রথমেই আছে ঃ

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহো নমস্কার!
লহো এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

কিন্তু সমবেদনা-বিগলিত কবি নিজেকে 'বিদ্রোহী' ব'লে অভিহিত করেছেন কেন, কিংবা 'জীবন-বিধাতা'র প্রতি তাঁর 'প্রণিপাতখানি' 'প্রীতিহীন'ই বা কেন? এর হেতু হিসেবে তিনি আমাদিগকে জানিয়েছেন ঃ

জর্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী
. ...
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবসরাত্রির ঘৃণিত জীবনযাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ,
সযতনে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু বয়ন।

সেই কারণেই তাঁর প্রণিপাতখানি' 'প্রীতিহীন' এবং তিনি 'বিদ্রোহী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ। অর্থাৎ, গণমানুষের নিপীড়িত জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনাই 'নমস্কার' কবিতাটিরও প্রধান চালিকাশক্তি।

'সুদূরের আহ্বান' এবং 'নটরাজ' 'প্রথমা'র তৃতীয় ধারার কবিতার প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হবার মতো। দু'টি কবিতারই প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে দুরন্ত গতিবেগ, বিশ্বজীবনের প্রচণ্ড স্পন্দনে দু'টি কবিতাই প্রবলভাবে প্রতিস্পন্দিত। বৈশ্বিক অস্তিত্বের দুই দিক্—একটি স্থাবর, অন্যটি জঙ্গম। স্থাবর দিক্‌টি নয়, জঙ্গম দিক্‌টিই কবিতা দু'টিতে কবির উপজীব্য। এই দিক্‌টিকে অবলম্বন ক'রে বাংলা সাহিত্যে আরো অনেক কবিই বিভিন্ন সময়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। অতএব এটা বলবার কথা তেমন কিছু নয়। কিন্তু যে-কথাটা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে জানাবার, তা হচ্ছে, বিশ্বজীবনের এই জঙ্গমতার উপজীব্যতায় কবিচিত্তের প্রমত্ত যে-উল্লাস আলোচ্য কবিতা দু'টির ছত্রে-ছত্রে সমুৎক্ষিপ্ত হয়েছে, সর্বাংশে তার তুল্য উল্লাসের প্রকাশ আমাদের কাব্যের এই ধারার খুব কম রচনাতেই লক্ষ্যগোচর হয়। প্রাণাবেগের এই স্বতোৎসারণই এই কবিতা দু'টির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য

'সুদূরের আহ্বান' কবিতাটি বিশেষভাবে 'কল্লোলে'র যুগলক্ষণাক্রান্ত। কবিতাটির অন্তঃস্থ দুর্বার যে-গতিশীলতা, বিশ্বজীবন পরিক্রমার দুর্নিবার যে-অভিলাষ, সুদূরের আহ্বানে একাগ্র যে-উৎকর্ণতা—ইত্যাদি সমস্ত কিছুই একান্তভাবে 'কল্লোলে'রই

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ-সমস্ত লক্ষণে আক্রান্ত কবিতা নজরুল ইসলামের কাছ থেকেও আমরা বেশ কিছু পেয়েছি। অর্থাৎ, নজরুলের কবিমানসেও এই শক্তিগুলি কমবেশি সক্রিয় ছিলো। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে-অর্থে আমরা 'কল্লোলে'র প্রতিভূ হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে গণ্য করি, সে-অর্থে নজরুল ইসলাম কোনোক্রমেই একান্তভাবে 'কল্লোলে'র প্রতিনিধি ছিলেন না। বস্তুত, অজস্রপ্রসূ নজরুল ছিলেন একই সঙ্গে এবং একাদিক্রমে কলকাতার 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' এবং ঢাকার 'প্রগতি'র গতিউন্মাদ কবিতালেখক।

বিশ্বজঙ্গমতার প্রতি সুগভীর আকর্ষণ যারা যুগে-যুগে অনুভব করেছে এবং 'সুদূরের আহ্বানে' সাড়া দিয়ে 'অগ্নিআখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম', এই কবিতায় কবি তাদের নিকটআত্মীয়। এই আত্মীয়তার স্বীকৃতিতে তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন :

বলি তবে ভাই, শোনো তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী ;

এবং এই আত্মীয়তা বোধের ফল সম্বধে তিনি লিখেছেন :

রক্তে আমার অমনি গতির নেশা ;
... ...
উত্তর মেরু মোরে টানে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে,

আর, এই আত্মীয়তা অনুভবের কারণ সম্পর্কেও তিনি বলেছেন :

দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
... ...
পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,

অর্থাৎ, অনন্ত মহাজীবনোন্মাদনা এবং বিশ্বভুবনের বিশালতার অনুভূতি—এই দুই দুর্বার শক্তিই এই চিরদুরন্ত অভিযাত্রীদের জীবনের সঙ্গে কবির নিজের জীবনকে গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে তুলেছে। এবং বিশ্বজীবনের বিরাটত্বের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা-বশতই প্রথানিগড়িত প্রাত্যহিক জীবনের সহজ পেলবতা, 'আশা', 'সুখ' ইত্যাদি কবির চোখে 'ছোট'। ফলে, এগুলির প্রতি তিনি নিরুৎসুক—যদিও এতটুকু 'ঈর্ষা' কিংবা 'ঘৃণা' এজন্য তাঁর মনে স্থান পায়নি। কবিতাটির সপ্তম স্তবক এ-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

সুশীতলধারা নদীটি বহুক মন্থরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক ঢাকা তোমাদের গৃহখানি,
স্তোত্র রচিত্ত, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি।
ছোট এই আশা, সুখ,
ঈর্ষা করিনা, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।

আর, দিনানুদৈনিকের এই 'ছোট' 'আশা' ও 'সুখে'র প্রতি ঔৎসুক্যহীনতাহেতুই কবি ও তাঁর মানসসঙ্গীদের জীবনের নৌকো কোথাও নোঙর না-বেঁধে কেন যে 'শুধু চলে স্রোতে ভাসি—', তা তিনি বোঝেন না, এমন কি বুঝতে চানও না।

'নটরাজ' কবিতাটিও 'সুদূরের আহ্বানে'র মতো প্রচণ্ড গতিতাড়িত এবং এই অর্থে কল্লোলীয় বৈশিষ্ট্যবাহী। কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও কবিতা দু'টির স্বাতন্ত্র্য এখানটায় যে 'সুদূরের আহ্বান' যেমন একটি মৌলিক কাব্যকৃতি, 'নটরাজ' কিন্তু তেমন নয়। নজরুল ইসলামের রচনারীতির কোনো-কোনো দিকের প্রভাব এই কবিতাটির আদ্যোপান্ত স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। রচনারীতিগত নজরুলধর্মিতা ছাড়াও কবিতাটির মূল সুরটিও নজরুলের 'দেখবো এবার জগৎটাকে' কবিতার কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। 'নটরাজে'র প্রতিটি স্তবকই নজরুল-প্রভাবিত—কি বিষয়ে-বক্তব্যে, কি প্রকাশ-ভঙ্গিতে, এমন কি শব্দচয়নেও—যেমন প্রথম স্তবকে ঃ

> বিসুবিয়াস্-বিষ খেয়ে কে উগ্‌রে তোলে আগুন উগ্‌রে তোলে,
> গ্রহ-তারার ঘূর্ণিপাকে মাথা ঘুরে উল্কা পড়ে টলে ;

এবং দ্বিতীয় স্তবকের ঃ

> তেপান্তরে লাগলো আগুন—ছুবলে আকাশ খুবলে নিলে আঁখি,
> সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধ'রে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি ;

তৃতীয় এবং চতুর্থ (শেষ) স্তবকেও এ-ধরনের গতিবেগে-ট'লে-পড়া পংক্তি আরো আছে। কবিতাটির আগাগোড়াই দুরন্ত বিশ্ব-পর্যটন ; কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রতিটি স্তবকের অন্তিমাংশে সত্যেন্দ্র দত্তীয় আমেজ-লাগা গৃহকোণের এবম্বিধ কোমল চরণ ঃ

> আবার কোথায় মাকড়শাতে বুনছে ব'সে জাল, (প্রথম স্তবক)
> প্রজাপতি হলুদ-ক্ষেতে বেড়ায় দুলে-দুলে ! (দ্বিতীয় স্তবক)

এবং

> আবার কোথায় হাঁস চরে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে ; (তৃতীয় স্তবক)

ইত্যাদি।

কবিতাটির প্রতিটি স্তবকের আরম্ভ এই দু'টি পংক্তি সাজিয়ে ঃ

> জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস, শুনিস কিরে কানে ?
> মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !

'যথার্থ কবির প্রকৃত কর্তব্য কী ?'—এই পুরাতন প্রশ্নের উত্তর-সংকেত রয়েছে 'নটরাজ' কবিতায়। কবিতাটিতে নিপুণ কৌশলে বিশ্বের মহাজীবনের সঙ্গে মর্ত্যের ক্ষণজীবনকে সুদূরপ্রসারিত কবিকল্পনার সামর্থ্যে সম্মিলিত করা হয়েছে। কবিতাটিতে, প্রেমেন্দ্রের ভাবানুসারে, জীবনের কঠোর ও কোমল দুই রূপেরই উন্মোচন প্রকৃত কবির কর্তব্য ; কেননা তাঁর বিশ্বাস, জীবন কোমলে কঠোরে প্রিয়তমা। জীবনের কঠোর দিকের প্রকাশে নজরুল এবং কোমল দিকের উন্মোচনে সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতায় তাঁকে বিশেষ-

ভাবে সহায়তা করেছেন। 'নটরাজ' প্রেমেন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি নয়, কিন্তু প্রভাবের অধীনস্থ হ'য়েও যে রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা সম্ভব, তার চমৎকার উদাহরণ।

'প্রথমা'য় প্রেমের কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্রের প্রকাশ উত্তম, কিন্তু সর্বোত্তম নয়। তাঁর প্রেমিক কবিসত্তার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সম্রাটে'র একাধিক কবিতায়—যে-প্রসঙ্গ 'সম্রাটে'র আলোচনায় আমরা উত্থাপন ও কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত করবো। এখানে এ-সম্পর্কে মাত্র এইটুকুই বলতে চাই যে 'প্রথমা'র একমাত্র প্রেমের কবিতা 'তুমি আছ তাই' এমন একটি রচনা, যেটিতে কবি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতিকেও সহজ লিপিকুশলতায় নিখিল নিসর্গে প্রসারিত ও প্রতিফলিত করেছেন, চিরন্তন প্রেমের সঙ্গে প্রাত্যহিক প্রেমের সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। আর, এ-কাজে তাঁর সাফল্যের নিদর্শন কবিতাটির যথাক্রমে আরম্ভের ও শেষের এই পংক্তি-পঞ্চক ঃ

কালো দীঘিজল তারই সুশীতল
মায়া তব দু'টি চোখে।
ও-দেহে শ্রাবণ মেঘ-ছায়া ফেলিল কে ?

এবং

তুমি আছ তাই গৃহদীপ সনে
তারকারা কথা কয়।

'হঠাৎ যদি' রচনাটি ছড়ার সামগ্রিক লক্ষণাক্রান্ত। ছড়ার লক্ষ্য কল্পনার মায়ালোক সৃজন এবং ছড়ার উপলক্ষ্য অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকারা। সার্থক ছড়াকারের পক্ষে ছোটোদের মানসিকতার অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক, অংশীদার হওয়া প্রয়োজন ছোটোদের ছোটো-ছোটো সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ—এমনকি সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা-কাল্পনিকতারও। যাঁর মনে চিরকালের শিশুটি মৃত, তাঁর পক্ষে এই কাজ সত্যিই কঠিন। যে-কোনো সার্থক ছড়ার মতো 'হঠাৎ যদি' ছড়াটিতেও কোনো তত্ত্বের বিচার কিংবা কোনো মতবাদের প্রচার নয়, ছড়াকারের উদ্দেশ্য ঃ

অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে

প্রস্থান এবং 'পদ্মাবতী'র সেই মায়াপুরীতে কোনোক্রমে একবার উপনীত হ'তে পারলে, ছড়াটির চতুর্থ স্তবকে, তাঁর মনের বাসনা ঃ

সুপ্তিমগন পদ্মাবতীর পুরে
মহল বেড়াই টহল দিয়ে ঘুরে।
ধীরে গিয়ে বসি শিয়রদেশে
একটি মালা পরায়ে দিই কেশে,
হৃদয়খানি জোর করে নিই কেড়ে ;
বুকে বেঁধে দিই তাহারে সাজা।

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ছড়ার মায়াবী পরিমণ্ডলে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করা! প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ-রকম আরেকটি সার্থক ছড়া, পরবর্তীকালে রচিত, 'আদ্যিকালের বুড়ি'।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা'র কয়েকটি কবিতার আলোচনা ইচ্ছে ক'রেই একটু দীর্ঘ করলাম; কেননা কবি হিসেবে তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যের সূচনা 'প্রথমা'র কবিতাগুচ্ছেই ঘটেছে। ফলে, তাঁর সমগ্র কবিজীবনের পক্ষেই এই গ্রন্থটি ভূমিকা স্বরূপ এবং তাঁর সমগ্র কবিজীবনেই এই গ্রন্থটির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য কাব্যপরিণতির বিচারে, বলাই বাহুল্য, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সম্রাটে'র স্থান 'প্রথমা'র অনেক ঊর্ধ্বে। এই পরিণতির লাক্ষণিক প্রকাশ (symptomatic manifestation) সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখবো, 'প্রথমা'র তুলনায় 'সম্রাটে' (১৯৪০) কবি হৃদয়ের আবেগ অনেক সংযত, উচ্ছ্বাসও বহু প্রশমিত। এবং সেই সঙ্গে ঘটনা ও বস্তুপর্যবেক্ষণে কবিদৃষ্টির পার্থক্যও আমাদের লক্ষ্যগোচর না-হওয়ার মতো নয়। তাছাড়া, শব্দচয়ন ও শব্দপ্রয়োগ এবং বাক্যবন্ধের গঠন ও উপস্থাপনাঘটিত আঙ্গিকগত পরিণতির দিক্ তো রয়েছেই।

'সম্রাটে' দু'-ধরনের কবিতা রয়েছে—চব্বিশটি মৌলিক এবং ছ'টি অনূদিত কবিতা। মৌলিক কবিতাগুলি গ্রন্থটির প্রথমে বিন্যস্ত হয়েছে; অতএব এগুলির কথাতেই আগে আসি। এই কবিতাগুলির যে-বৈশিষ্ট্য প্রথমেই নজরে পড়ে, তা হচ্ছে এগুলির বিষয়বৈচিত্র্য। মাত্র চব্বিশটি কবিতার পরিসরে কবি কমপক্ষে পাঁচ প্রকারের বিষয়-স্পৃষ্ট রচনা আমাদিগকে পরিবেশন করেছেন। বিষয়গত শ্রেণীভেদে এগুলির মধ্যে রয়েছে পেলব প্রেমের স্পর্শকাতর কবিতা ('পুরাতন নাম', 'তুমি এস', 'নীল দিন', 'সৌরভ' ও 'ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে'), অরুগ্ন ও আদিম জীবনের বলিষ্ঠতাব্যঞ্জক কবিতা ('বাঘের কপিশ চোখে' ও 'নীল কণ্ঠ'), বিশালতার ও ব্যাপ্তির অনুভূতিবাহী কবিতা ('কাঠের সিঁড়ি', 'ছাদে যেওনাক' ও 'জাহাজের ডাক'), ইতিহাসাশ্রিত ভূগোল চেতনার কবিতা ('পথ', 'বিনিদ্র', 'অবতারণা', 'শস্য-প্রশস্তি' ও গ্রন্থটির নাম-কবিতা 'সম্রাট') এবং সংখ্যায় মাত্র একটি হ'লেও, বিজ্ঞানচেতনার কবিতা ('তামাশা')। অন্যবিধ কবিতার উপস্থিতিও গ্রন্থটিতে একেবারেই অলক্ষ্য নয়।

প্রেমের কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে-লক্ষণাবলীর স্ফুরণ 'প্রথমা'র 'তুমি আছ তাই' কবিতায় লক্ষ্য করা গেছে, সে লক্ষণাবলীর প্রায় সব ক'টিই 'সম্রাটে' সন্নিবদ্ধ প্রেমের কবিতাগুলিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যাদর্শগত কোনো-কোনো দিকের বিবেচনায় কঠোর বাস্তববাদী হ'য়েও প্রেমের কবিতায় প্রেমেন্দ্র বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক কবি। নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে তার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং প্রেম-সম্পর্কিত এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেই প্রেমের কবি হিসেবে তাঁর সমকালীন অন্য কবিদের থেকে তিনি পৃথক। কেননা তাঁর সমকালের কবিরা (একমাত্র ব্যতিক্রম অমিয় চক্রবর্তী—যাঁর 'রচনায় রক্তমাংসের সংক্রাম সবচেয়ে কম' এবং 'যাঁর রচনায় নারী তাঁর শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি') সাধারণত প্রেমের যে-ধরনের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে

তাঁদের রচনায় নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিচিত্র ভাষা-চিত্রণের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন, প্রেমেন্দ্রের কবিতায় প্রেমানুভূতির সে-ধরনের ইন্দ্রিয়ানুগত্য প্রায় দুর্লক্ষ্য। এবং এই ইন্দ্রিয়পারবশ্যহীনতার কারণেই তাঁর প্রেমের কবিতা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ ও নিরুত্তাপ। প্রেমের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি, তার সার্বিক বক্রতা-জটিলতা—এমন কি প্রেমের স্বতন্ত্র অনুভাবনা বিষয়েও সচেতনতার প্রকাশ তাঁর কবিতায় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, 'পুরাতন নাম' কবিতায় বড়ো দুঃখে যিনি প্রশ্ন করেছেন ঃ

> সে নাম কি সত্যি গেছ ভুলে ?
> —পুরাতন সেই নাম !

অনেক দ্বিধায় কম্পিত হ'য়েই যিনি জানতে চেয়েছেন, আজকের প্রেমহীন জীবনে 'বহু যুগ আগের বসন্ত' আর কি ফিরে আসবে না, জীবন থেকে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে শুধুই কি একটা 'কঠিন বাকল' প'ড়ে থাকবে, 'তুমি এস' কবিতায় ঃ

> এই নেভালেম আলো ;
> ঘরে এল তৃতীয়ার
> চাঁদ-ছোঁয়া মদির আঁধার।

পংক্তিতে তিনিই প্রেমের মদিরতায় বিহ্বল হ'য়ে উঠেছেন ; 'সমস্ত দিন তোমার সৌরভ আমায় ঘিরে আছে'—এই প্রসন্নতায় আরম্ভ ক'রেও 'সৌরভ' কবিতায় সমাপ্তিতে হতাশায় ভেঙে প'ড়ে যিনি ব'লে ওঠেন ঃ

> তোমার সৌরভ আমায় নিয়ে যাক সেই শূন্যতায়,
> যেখানে পথ আর কোন দিকে নেই,
> যেখানে পরম নিস্ফলতার
> তীব্র মধুর হতাশা !

তিনিই আবার 'নীল দিন' কবিতায় ঃ

> তুমি আছ, তুমি আছ
> এ বিস্ময় সওয়া যায় নাক ;

উচ্চারণে গভীর বিস্ময়বিমোহিত এবং 'ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে' কবিতায় ঃ

> বাতি দিয়ে কি হয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যা ?
> সাগরের অর্থ মেলে সরোবরে ?

প্রশ্ন উত্থাপনে প্রেমের অতলস্পর্শিতায় অভিভূত। 'পুরাতন নাম', 'তুমি এস', 'সৌরভ', 'নীল দিন' কিংবা 'ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে' ইত্যাদি প্রতিটিই প্রেমের কবিতা এবং এই সমস্ত কবিতায় প্রেমের দুঃখ, হতাশা, বিস্ময়, মদিরতা এবং অতলস্পর্শিতার সব ক'টি দিকই পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত, কিন্তু যা একেবারেই উপস্থিত নেই, তা হ'লো প্রেমের শারীরিক দিক্। তাঁর প্রেমের কবিতার মর্মকেন্দ্রে শরীর নয়, বেদনাঘন এক অনুভূতি বিরাজিত। এই অনুভূতির প্রভাবেই ইতিপূর্বে তিনি লিখেছিলেন, 'শুধু

তার সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি'। প্রতিক্রিয়ার বিচারে এই 'সকরুণ প্রেম' যতই 'মহৎ' পদবাচ্য হোক না কেন, এর নিবিড় মাধুর্য কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতির চৌহদ্দি-বহির্ভূত—এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক স্বীকৃতির স্থানও এই প্রেমে গৌণ। এ-প্রেম নৈর্ব্যক্তিক, পাত্র-পাত্রী-বিচার-বাহুল্য-মুক্ত। এই উদারতার কারণেই দেহ-সংস্কারমুক্ত আদর্শবাদী মনকে এই প্রেম আকর্ষণ করলেও এ-প্রেমের আবেদন, প্রাত্যহিকের পরিচিত প্রেমের অস্থিরতা-আনন্দ-উচ্ছলতার কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ের বিচিত্র টানাপোড়েনের অনুপস্থিতির কারণে এবং প্রেমের সার্বিক রহস্যময়তার অবিদ্যমানতা-হেতু, বহুজনমনগ্রাহ্য নয়। তবু কবির স্বপক্ষে এ-সম্পর্কে অন্তত এটুকু বলা চলে যে প্রেম-ভাবনায় তিনি হয়তো ছিলেন কিছুটা প্লেটো-প্রভাবিত এবং প্রেম-বিষয়ক এবম্বিধ কবিতা রচনার মাধ্যমে বৃহত্তর ও নির্বিশেষ মানবপ্রেমে উত্তীর্ণ হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভবত অসম্ভব ছিলো না ; কিন্তু সে-উত্তরণের পূর্বশর্ত স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার অধীনতা স্বীকার করা। এবং সে-অভিজ্ঞতা, প্রেমের কবি হিসেবে, বোধ হয় শেষ পর্যন্তও তাঁর অলব্ধই থেকে গিয়েছিলো।

'বাঘের কপিশ চোখে' এবং 'নীলকণ্ঠ' কবিতা দু'টিতে জীবনের এমন একটি দিক্ উন্মোচিত হয়েছে, যে-দিক্‌টির সঙ্গে আমরা—তথাকথিত মার্জিত মানুষরা, অনেকাংশেই অপরিচিত। সে-দিক্‌টি অরুগ্ন ও আদিম জীবনের অমার্জিত বলিষ্ঠতার দিক্। বিশেষ যে-ভাবনার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে আদিম জীবনের অরুগ্ন বহিঃপ্রকাশের দিকে প্রেমেন্দ্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্য ডি. এইচ. লরেন্সের জীবন-দর্শনের। আমেরিকান হুইটম্যানের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের কোনো-কোনো দিকে্র মিলের মতো ইংরেজ লরেন্সের সঙ্গেও যে তাঁর আংশিক সাদৃশ্য বর্তমান, তার কারণ উভয়ের জীবনদৃষ্টিগত এই সামীপ্যের গভীরেই নিহিত। অবশ্য ভারতীয় রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতায় আদিম জীবনের 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'কে ভালোবাসতে চেয়েছেন। কিন্তু অমার্জিত জীবনের প্রতি সাময়িক এই আকর্ষণের অনুভূতি মার্জিত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছিলো আসলে ইচ্ছাপূরণের মতো, অস্থায়ী অভিলাষমাত্র। কেননা সেই জীবনের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভবের জন্য অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত নাগরিক সভ্যতার বিরুদ্ধে সামগ্রিক যে-বিদ্রোহের প্রয়োজন, তার সুযোগ কিংবা সম্ভাবনা কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের অভিজাত-বংশোদ্ভূত ও উচ্চবিত্ত-সংস্কার-শাসিত জীবনে ছিলো না। কিন্তু লরেন্সের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিলো একেবারেই অন্যরকম, এমনকি প্রায় বিপরীত। এই আদিম জীবনাভিসার লরেন্সের পক্ষে কোনো-ক্রমেই নিছক সাময়িক ভাববিলাস কিংবা কবিত্বমাত্র ছিলো না, তাঁর পক্ষে সেটা ছিলো প্রতি মুহূর্তে উন্মথিত প্রচণ্ড একটা প্যাশনবিশেষ। সেই জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তা তিনি শুধু কল্পনাতেই অনুভব করেননি, বাস্তবে আদিম ও অমার্জিত ব্যক্তিগত জীবন-যাপনার মধ্য দিয়েও তার সঙ্গে তিনি অভিন্নতা অর্জন করেছিলেন। বস্তুত, যন্ত্রনির্ভর নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার সার্বিক অন্তঃসারশূন্যতা বড়ো মর্মান্তিকভাবে তাঁর

চোখে উদ্ঘাটিত হয়েছিলো ; মর্মে-মর্মে এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এই কৃত্রিম সভ্যতার মোহিনীমায়া আসলে সেই অক্টোপাসেরই বাহুবন্ধন, যা বৃহত্তর সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের বিস্ময়বিমুগ্ধ স্ফূর্তিতা থেকে বঞ্চিত ক'রে, সমস্ত প্রাণরস নিংড়ে নিয়ে, ক্রমাগত আমাদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার এই সর্বাত্মক বৈনাশিক প্রভাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে লরেন্সের মতো প্রেমেন্দ্রও সম্যকরূপে সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই এই সভ্যতার প্রতি তাঁরও অনীহা এত প্রবল, আদিম জীবনের প্রতি তাঁরও আকর্ষণ এত প্রচণ্ড। আর, সেজন্যই 'বাঘের কপিশ চোখে' তিনি 'জঙ্গলের ছায়া' দেখতে পেয়েছেন, দেখতে পেয়েছেন সেই বাঘের 'দুর্বোধ দৃষ্টিতে' 'টেরাই-এর জঙ্গলের ছবি!' এবং 'কাঁটায় কাঁটায় দ্বন্দ্ব, শিকড়ে শিকড়ে, / মহীরুহ রুদ্ধশ্বাস লতিকার মৃত্যু-আলিঙ্গনে' সংক্ষুব্ধ তার সেই আদিম আরণ্যক জীবনের পরিচয় পেয়ে লরেন্সের মতো তিনিও আতঙ্কে-আনন্দে শিহরিত-উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছেন। আবার, আধুনিক সভ্যতার শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে লরেন্সের খেদোক্তিকেই হুবহু প্রতিধ্বনিত করেছে 'নীলকণ্ঠ' কবিতায় প্রেমেন্দ্রের আক্ষেপোক্তি :

আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাগরার দুরন্ত সমুদ্র-দোলা ?
... ...
আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার !
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু !
আছে শুধু স্তিমিত হ'য়ে নিভে যাওয়া,
—ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা !

এবং এই 'ফ্যাকাশে রুগ্ন' 'সভ্যতা'র বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ এই ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে :

হে-ইঁডি, হা-ইঁডি হা-ই !
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই !
... ...
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই !

সেই আদিম ও অকৃত্রিম জীবনে আর তার উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল বহিঃপ্রকাশেই, যেখানে মৃত্যুভীতিকেও অতিক্রম ক'রে জীবনের মৌল স্বরূপের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎলাভ সম্ভব, মৃত্যুকে তিনি জীবনের সার্থক সমাপ্তিরূপে গণ্য করেছেন। খগোল-ভূগোলের সকল সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম ক'রে এই কবিতাটিতে এমন এক আশ্চর্য নূতন জগৎ তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, মৃত্যুর এমন এক অভিনব দর্শন তিনি গ'ড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন, যে-জগৎ এবং যে-দর্শন আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'লেও জীবনসম্ভোগগত গভীর এক তাৎপর্যে মণ্ডিত।

'সম্রাটে'র এ-দু'টি কবিতায় মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের ক্লান্তিকর গতানুগতিকতায় বীতশ্রদ্ধ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সভ্যতা-বিদ্রোহ ইংরেজ সমাজের ভিক্টোরীয় যুগপ্রচলিত তথাকথিত শালীনতা ও শিষ্টতার কৃত্রিমতায় তি-তি বিরক্ত লরেন্সের ভব্যতা-বিদ্রোহের সঙ্গেই তুলনীয়। যন্ত্রসভ্যতার জটিল নাগপাশ ছিন্ন ক'রে আদিম ও অমার্জিত জীবনের উৎস-কেন্দ্রে উপনীত হ'লে এখনো হয়তো আমরা আমাদের অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ এবং তার সার্থকতা সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারি—প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ-ধরনের নস্ট্যালজিক্ অনুভূতির প্রকৃতি অনেকটা লরেন্সের জীবনানুভূতিরই মতো এবং এমনই এক বোহি-মিয়্যান জীবনাদর্শে নিজের কবি-কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করার মূলে রয়েছে তাঁর ওপর লরেন্সের বিশেষরূপে নিজস্ব জীবনদৃষ্টির প্রভাব। তবে আদিম জীবনানুরক্তিতে লরেন্সের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের প্রধান পার্থক্য এখানটায় যে লরেন্সের পক্ষে যা স্থায়ী ও সামগ্রিক, প্রেমেন্দ্রের ক্ষেত্রে তা অস্থায়ী ও আংশিক।

নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার সার্বিক কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে দ্রোহপরায়ণতার পাশাপাশি অন্য যে-মনোভাবটি প্রেমেন্দ্রের মধ্যে ক্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠেছে, সেটি হ'লো বিশালতার ও অন্তহীনতার প্রতি সুগভীর উৎসুকতা। এই উৎসুকতা তাঁর পক্ষে মাত্র রোম্যান্টিকতার পরিচায়কই ছিলো না, ছিলো জীবনজিজ্ঞাসারও দ্যোতক। কেননা জগতে ও জীবনে যা কিছু বিশাল ও বিরাট, অনন্ত ও অসীম, তার প্রকাশ দেখে তিনি শুধু বিস্মিতই হন নি, হয়েছেন হেতুসন্ধানীও। এই হেতুসন্ধানমনস্কতা যথার্থ জীবন-তন্ত্রী কবিরই লক্ষণ। 'ছাদে যেওনাক' কবিতায় যে-অসীমতার বিস্ময়-ঘোরে তিনি আমাদিগকে ছাদে যেতে নিষেধ করেছেন, ('ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,/ সীমানাহীন!'), 'জাহাজের ডাক' কবিতার 'চায় মন সীমান্ত-নির্ণয়' পংক্তিতে' সেই অসীমতারই হেতুনির্ণয়াভিলাষের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এবং এই কবিতায় তাঁর 'দিগন্ত-পিপাসা'র তীব্রতায় তাড়িত হ'তে-হ'তেই বিখ্যাত 'কাঠের সিঁড়ি' কবিতাতে পোঁছে এই সুস্থির সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন যে প্রকাশত যা অনন্ত, স্বরূপত তা-ই সান্ত ; অর্থাৎ, সান্তের মধ্যে সুপ্তিমগ্ন অনন্ত বিদ্যমান। আর, সান্ত ও অনন্তের মধ্যবর্তী আপাত-অদৃশ্য-অথচ-বোধিদৃষ্টিগ্রাহ্য এই গোপন যোগসূত্রটির আবিষ্কারের ফলস্বরূপই তাঁর ভবিষ্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে ঃ

জানি,—'পামে'র চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য।
কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না!
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে ;
একদিন তার স্থানুত্ব যাবে ঘুচে।'

ইতিহাস ও ভূগোলগত যে-চেতনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে প্রথমাবধি সক্রিয় ছিলো, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের 'পথ', 'বিনিদ্র', 'অবতারনা', 'শস্য-প্রশস্তি' ও 'সম্রাট' কবিতায় তা আরো প্রখর হয়েছে। অবশ্য তাঁর ইতিহাসচেতনা স্বরূপত জীবনানন্দের মায়া-

কুহেলিত কালচেতনা কিংবা সুধীন্দ্রনাথের সংক্ষুব্ধ কালজ্ঞানের সমার্থক নয়—এমনকি বয়ঃকনিষ্ঠ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ইতিহাসসজ্ঞানতার সমকক্ষও তাকে বলা চলে না। তাঁর ইতিহাসচেতনায় নিরবচ্ছিন্ন সময়প্রবাহের বিচিত্র উত্থান-পতনই শুধু স্বীকৃত নয়, তরঙ্গিত অগ্রগামিতাও তাতে অঙ্গীকৃত। আর, তার ভূগোলচেতনার বৈশিষ্ট্য এখানটায় যে ভূগোলকে তিনি অমিয় চক্রবর্তীর মতো ভ্রামণিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে দেখেননি, ভূগোলকে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে এবং তার পরিপূরকরূপে গ্রহণ করেছেন। এবং ভূগোল পর্যবেক্ষণে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিবশতই তাঁর ভূগোল-চেতনার কবিতা নিছক ক্যালিডোস্কোপিতে অবসিত নয়, তা ছায়াছবির দৃশ্যচাঞ্চল্য-অতিক্রমী। 'অবতারণা' কবিতায় ইতিহাসচেতনাসঞ্জাত তাঁর যে ইতিবাচক জিজ্ঞাসা, 'শুভ্রজ্যোতি পবিত্র প্রভাত' মানুষের অন্ধকার ইতিহাসে দেখা 'দেবে কি কখনো?' কিংবা 'শস্য-প্রশস্তি' কবিতার অন্তিমাংশে উত্থাপিত তাঁর যে নেতিবাচক প্রশ্ন :

সমস্ত ভাবীকালের ইতিহাসে,
মানবের কীর্তিকাহিনীর তলায় অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী লেখা
থাকবেনা কি?

'সম্রাট' কবিতায় তারই উত্তর তিনি অন্বেষণ করেছেন এই সান্ত্বনায় :

এখনো কুরুবর্ষ আছে প'ড়ে—অজেয় আত্মার অরণ্য পর্বত!

আবার, 'পথ' কবিতায় দিগন্তবিস্তৃত মরু-পরিবেশ যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, 'কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে, / খোরাসান থেকে বাদক্‌শান' পর্যন্ত প্রসারিত যে পথে 'তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ', তার প্রতি যেমন তিনি আকর্ষণ বোধ করেছেন, 'বিনিদ্র' কবিতার :

পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর,
সুমের, মেম্ফিস্‌, উর, নিনেভে, ওফির,
মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর ;

পংক্তি-চতুষ্কেও তেমনই তিনি অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিস্ময়ের মায়াবন্ধন অনুভব করেছেন। এই সমস্তই তাঁর যুগপৎ ইতিহাস ও ভূগোল-চেতনার পরিচায়ক।

'সম্রাট' কাব্যগ্রন্থে কবির এই সমস্ত লক্ষ্যণীয় কৃতিত্ব ছাড়াও 'তামাসা' কবিতার 'ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাসা', 'বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে' কিংবা 'সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি' ইত্যাদি পংক্তিতে তাঁর বিজ্ঞান-প্রাসঙ্গিক অনুভূতির প্রকাশও একেবারে অলক্ষ্য নয়। এবং সেই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয় কয়েকটি কবিতায় তাঁর চমৎকার ভাষাচিত্রাঙ্কননৈপুণ্যও। মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত :

১. সোনালী রোদের সুরা
পান করে ধরণীর
প্রসারিত সবুজ রসনা ! ('কোন দূর বনে')

এবং

২. মেঘের রঙীন পাড় বুনেছে পড়ন্ত রোদ
আর মাটির তরঙ্গ গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তে। ('তামাসা')

'সম্রাটে' সন্নিবদ্ধ যে-ছ'টি অনূদিত কবিতার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার তিনটি ('কাজ', 'প্রেম', 'দেবতা') লরেন্সের আর বাকি তিনটি ('বিশ্লেষণ', 'রাত্রি', 'স্টেশন') চেস্টারটনের। এর মধ্যে 'কাজ', 'প্রেম' এবং 'রাত্রি' অনুবাদকর্ম হিসেবে যথেষ্ট সৃজনাত্মক। ফলে. মূলের স্বাদ প্রায় অবিকৃত। কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারলাম এই কারণে যে সৌভাগ্যক্রমে এই তিনটি কবিতারই মূল রূপের সঙ্গে বহুদিন ধ'রে আমি শিক্ষকতার সূত্রে পরিচিত। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা প্রেমেন্দ্র-অনূদিত এই কবিতা ক'টিকে মূল কবিতা ক'টির পাশাপাশি রেখে নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করলেই এ-সম্পর্কে আমার মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

'সম্রাটে'র পর, কয়েক বৎসর পর-পর, প্রেমের মিত্রের আরো পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৫). 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৫৮), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০), 'কখনো মেঘ' (১৯৬১) এবং 'অথবা কিন্নর' (১৯৬৫)। এই কাব্যগ্রন্থপঞ্চকে, বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায়. মোটামুটি দু'রকমের কবিতা স্থান পেয়েছে। 'সাগর থেকে ফেরা' এবং 'ফেরারী ফৌজে'র কবিতাগুলির মধ্যে যতখানি সাদৃশ্য, শেষোক্ত গ্রন্থত্রয়ের কবিতাসমূহের সঙ্গে এই গ্রন্থ দু'টির কবিতাবলীর বৈসাদৃশ্য তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এর কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিবর্তনের দু'টি ধাপ এই পাঁচটি গ্রন্থে অতিক্রম করেছেন—একটি 'সাগর থেকে ফেরা' ও 'ফেরারী ফৌজে' এবং অন্যটি 'হরিণ চিতা চিল', 'কখনো মেঘ' ও 'অথবা কিন্নরে'।

'প্রথমা' ও 'সম্রাটে' কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে-বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমরা পরিচিত হয়েছি, তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা' এবং 'ফেরারী ফৌজে'ও সেগুলি এতটুকু অপসৃত হয়নি। তবে আগের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে নূতন কিছু-কিছুও যে যুক্ত হয়েছে, সে-কথা বলা তো অবশ্যই বাহুল্য ; কেননা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিস্বভাবের অন্তর্গত ছিলো না কোনোদিনই। এই গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবদ্ধ কবিতাবলীতে তাঁর বক্তব্য যা বা যে-রকমই হ'য়ে থাক-না-কেন, সেই বক্তব্যের প্রকাশ কিন্তু ঘটেছে আগেরই মতো খুবই স্পষ্টভাবে এবং খুবই স্পষ্ট ভাষায়—প্রকাশের কোনোরূপ জড়তা কিংবা ভাষার কোনোরকমের আড়ষ্টতা এই কবিতাগুলিকে স্পর্শ করেনি। এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে চিন্তা-ভাবনায় কবিচিত্ত এই কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও সংশয়শূন্য ; কেননা আমরা জানি, চিন্তা যেখানে দ্বিধা-আন্দোলিত, তার প্রকাশ এবং প্রকাশের মাধ্যম, অর্থাৎ ভাষাও, সেখানে অস্পষ্ট ও আড়ষ্ট

হ'তে বাধা। অবশ্য এই কবিতাগুলিতে তাঁর ভাবপ্রকাশের ও ভাষার ঋজু-সারল্যের অন্য একটি কারণও বিদ্যমান। সেই কারণটি এই যে, এগুলি রচনা করতে ব'সে, বেশ বোঝা যায়, পাঠক-পাঠিকাদের নিজ-নিজ কল্পনাবৃত্তির ওপর তিনি বিশেষ নির্ভরশীল থাকেন নি। সেই কারণেই ইঙ্গিতাশ্রিত কিংবা সাংকেতিক বাচনভঙ্গির জটিল কাব্য-কৌশলের পথে পা না-বাড়িয়ে সরল ও সহজভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পরিবেশন করেছেন, তাঁর যা জানাবার খোলাখুলিভাবেই তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন। ব্যঞ্জনানিগূঢ় প্রকাশরীতির আশ্রয়গ্রহণ এবং সংকেতপ্রধান ভাষাব্যবহারকে যাঁরা আধুনিক কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেন, তাঁরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতাগুলিতে উৎসাহিত হবার মতো তেমন কোনো কারণ খুঁজে না-পেলেও আঙ্গিকগত কলা-কৌশলের চেয়ে অনুভূতির গভীরতাই যাঁদের কাছে কবিতার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বের এবং পাঠক-পাঠিকাচিত্তে কবির হৃদয়ানুভূত ভাবের সংক্রমণগত সার্থকতা (communicative success)-ই আধুনিক-অনাধুনিক-নির্বিশেষে সকলকবিতার প্রাণ, তাঁদের পক্ষে এগুলি কিন্তু মোটেই নিরুৎসাহিত হবার মতো নয়। কেননা এই কবিতাগুলির অধিকাংশেই কবিচিত্তের যে-অনুভূতি, তা বেশ গভীর এবং গভীর সেই অনুভূতির সংক্রমণশীলতাও যথেষ্ট প্রবল। এবং এই শেষোক্ত কারণেই আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের সংখ্যায় অল্প হ'লেও অন্তত কয়েকটি কবিতা—যেমন 'সাগর থেকে ফেরা' এবং 'ফেরারী ফৌজ' গ্রন্থের নাম কবিতাদ্বয় 'সাগর থেকে ফেরা' ও 'ফেরারী ফৌজ' এবং 'কাক ডাকে', 'প্রেতায়িত', 'ফ্যান' ইত্যাদি—সরাসরি আমাদের হৃদয়রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়, আলোড়নের সৃষ্টি করে। আর, এখানেই কবিতা ক'টির সার্থকতা।

'সম্রাটে' পৌঁছে 'প্রথমা'র অসংবৃত যে-আবেগ ও উচ্ছ্বাস অনেকটা সংযত হ'য়ে এসেছে, তৃতীয় ও চতুর্থ কাব্যগ্রন্থের রচনাসমূহে তা প্রায় প্রশমিত এবং দুর্বার গতিবেগ ও দুরন্ত চঞ্চলতার অবসানে এই কবিতাগুলিতে দেখা দিয়েছে এমন এক ভাব-সংহতি, যা প্রেমেন্দ্রের মধ্যবয়সে-লেখা কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে। সংহত ভাব ও সংযত ভাষা—এই দু'য়ে মিলে তাঁর কবিতাকে মধ্যযৌবন থেকে একেবারে মধ্যপ্রৌঢ়ত্বে উপনীত করেছে। আবার এই সংহত ভাব ও সংযত ভাষার অনুষঙ্গী হিসেবে তাঁর জীবনদৃষ্টিতে আভাস সূচীত হয়েছে প্রৌঢ়ত্বের পরিণতির—এক স্পষ্ট অনাসক্তির। সমস্ত কিছুই তিনি দেখেছেন এবং দেখেছেন জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতেই, কিন্তু কোনো কিছুর মধ্যেই ডুবিয়ে না-ফেলে নিজেকে তিনি রেখেছেন দূরে। বিষয়-বিতৃষ্ণ বৈরাগী তিনি নন, অথচ সংসার-সম্পৃক্ত বিষয়ীও তাঁকে বলা চলে না। তাঁর চোখে জাগ্রত দৃষ্টি কিন্তু মনে নেই মোহ ; কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর নেই নিবিড় আসক্তি, অথচ সকল কিছুর প্রতিই আছে নিগূঢ় ভালোবাসা। এই ঔদাস্যবিমিশ্র জীবনাসক্তি ইতিপূর্বে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রে দেখা যায়নি। এই নূতন জীবনদৃষ্টির সাহায্যে পার্থিব অস্তিত্বের সমূহ রহস্য তিনি উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন ব'লেই অপূর্ব চিত্রময় 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতার ঃ

নীল! নীল!
সবুজের ছোঁয়া কিনা, তা বুঝি না,
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম-বেশি নীল!
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙচিল।

পংক্তি-ষষ্টকের 'চিত্ররূপময়' আবহাওয়ার সঙ্গেই একাত্ম হ'য়ে গিয়েছেন, 'ফেরারী ফৌজ' কবিতার তিপান্ন পংক্তির দীর্ঘ পরিসরে 'সেই সব' 'সূর্যসেনা'দের দুঃসাহসী জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঃ

এক একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে বলে,
তারা সব হয়েছে বাহির।

উক্তিতে এবং অন্তিম স্তবকের প্রারম্ভিক পংক্তিদ্বয়ে 'সব পলাতক সেনা'দের গৃহে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে, তারা 'এখনো ফেরারী কেন ?'—এই প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আত্মসাযুজ্য অনুভব করেছেন, 'কাক ডাকে' কবিতায় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আলস্যমন্থর দ্বিপ্রাহরিক শান্ততা ও বিশ্রামের মধ্যে কাকের কর্কশ কণ্ঠ নিতান্ত বেসুরো শোনালেও সেই 'সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি'কে তিনি অনর্থক জ্ঞানে অবহেলা করেননি, কেননা কাকের তীক্ষ্ম কণ্ঠ শ্রবণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি অনুভব করেছেন ঃ

কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধূধূ-করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।

এবং একই সঙ্গে এটাও তাঁর উপলব্ধ হয়েছে ঃ

ক্ষণে ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর।
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে।

'সাগর থেকে ফেরা' এবং 'ফেরারী ফৌজে'র উল্লেখিত কবিতা পাঁচটির শেষ দু'টি, অর্থাৎ 'প্রেতায়িত' ও 'ফ্যান', একটু অন্য ধরনের। ফলে, এই কবিতা দু'টি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র বক্তব্য আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে-সমস্ত কবিতায় পরিবেশসৃষ্টির নৈপুণ্যে কাব্যপাঠের উপযুক্ত আবহ গ'ড়ে উঠেছে, এই দু'টি সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে

উল্লেখ করার মতো। দু'টির মধ্যে 'প্রেতায়িত' কবিতাটি নামকরণ থেকে শুরু ক'রে সমাপ্তি পর্যন্ত অতীন্দ্রিয়তার আবেশ-লাগা। আদ্যোপান্ত বিরাজিত এই অতীন্দ্রিয়তার কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' গল্পের সঙ্গে এই কবিতাটির 'thematic' বলবো না, বরং বলবো 'atmospheric' affinity খুঁজে পাওয়া যায়। আবার, ভৌতিক যে-পরিমণ্ডল কবিতাটিকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে, সেই পরিমণ্ডল আমাদের মনে 'bizarre' অনুভূতির সৃষ্টি করে, যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বোঝানো প্রায় অসম্ভব। কবিতাটিতে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বলতে তেমন কিছুই নেই, কিন্তু প্রত্যাশিত পরিবেশ-সৃষ্টির গুণে এই বক্তব্যদৈন্য ঢাকা প'ড়ে গেছে এবং দেখা দিয়েছে জীবন ঘনিষ্ঠতা ঃ

সমস্ত দুপুর ধরে
একা-একা ঘাটের কিনারে,
ঝাঁকড়া অশথ গাছে একটি কি দু'টি পাতা নড়ে,
দু'-একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে-ঘুরে খ'সে-পড়া শুকনো পাতায়।
কখনো বা স্তব্ধ হ'য়ে শোনে,
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'ফ্যান'। 'ফ্যান' 'প্রেতায়িতে'র থেকে ভিন্ন ধরনের, এমনকি সম্পূর্ণভাবে বিপরীতধর্মী কবিতা। কোনো 'bizarre' অনুভূতির প্রকাশ কিংবা অতীন্দ্রিয়তার আবেশ তো দূরের কথা, কোনোরূপ অবাস্তবতার স্পর্শমাত্র কবিতাটিতে নেই। কবিতাটিতে রয়েছে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, নির্মম বাস্তবের মর্মস্পর্শী বিবরণ। এই কবিতাটি কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাস্তবসচেতনতার নিখুঁত ও নির্ভুল একটি নিদর্শন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত এই কবিতাটির সমগ্র পরি-মণ্ডলই যে শুধু বিষাদ-ভারাক্রান্ত কিংবা বেদনা-পরিকীর্ণ তা-ই নয়, কবিতাটির ঃ

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সংভাই চায় শুধু ফ্যান ;
তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান !

এই পংক্তি ক'টি পড়তে-পড়তে সেই বিষাদে আমাদের মনও ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। এবং

অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান,
মনে হয় ঃ সাধি এ কি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ ;

অংশটুকুর নিহিত ভাবনায় ভাবিত হ'তে-হ'তে সেই বেদনায় আমরাও বিদীর্ণ হ'য়ে

যাই। এখানেই কবিতাটির সার্থকতা। আর, সেই সঙ্গে এটাও অবশ্যস্বীকার্য যে কবিতাটির শেষ দু'টি ছত্রে উত্থাপিত :

> রাজপথে কাঁচ-কাঁচ এইসব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
> দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?

এই মর্মান্তিক প্রশ্নটির সুগভীর মানবীয় দিক্‌টিই, কবির ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার সুত্রে সীমাবদ্ধ না-রেখে, এটিকে ব্যাপ্ত ক'রে তুলেছে, একটি সার্বজনীন মাত্রা এটিতে সংযোজিত করেছে। এখানেই কবিতাটির মহত্ত্ব।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'হরিণ চিতা চিল' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। অর্থাৎ, তখন তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন। ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স কোনো গড় আয়ুর মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই বার্ধক্যের তেমন আধিক্য সূচীত করেনা, যার ফলে তার দেহমনের সজীবতা বিনষ্ট কিংবা সৃজনীক্ষমতা অবসিত হ'য়ে যেতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রেও তার কোনোটাই হয়নি। কেননা কেবল দৃষ্টিশক্তির ক্রমক্ষীয়মানতা ছাড়া তাঁর দেহমনের সজীবতা যে তখন পর্যন্ত বিশেষ নষ্ট হয়নি, তার পরিচয় তো আমরা এই আলোচনার অন্যত্র ইতিমধ্যেই পেয়েছি। আর, সে-পর্যন্ত তাঁর সৃজনীক্ষমতারও যে অবসান ঘটেনি, তা-ই বা অস্বীকার করি কী-ভাবে, যখন জানি যে তার পরেও দীর্ঘদিন ধ'রে বহু বিচিত্র গদ্যরচনায় আমাদের সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। এবং জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে কবিতাও তিনি লিখেছেন, এমন কি কাব্যগ্রন্থও তাঁর প্রকাশিত হয়েছে একাধিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এবং এখানেই একটি বিনীত প্রশ্নের উত্থাপন প্রেমেন্দ্র-প্রতিভার নিরপেক্ষ মূল্যায়নের পক্ষে অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, সাহিত্যজীবনের অন্তিম অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর গদ্যে (বিশেষত ঘনাদা-সিরিজের রচনায়) সমুন্নত যে-মান তিনি বজায় রাখতে পেরেছিলেন, মানগত সেই সমুন্নতি কি তাঁর কবিতাতেও শেষ পর্যন্ত সমানভাবেই অব্যাহত ছিলো ? 'সম্ভবত' ছিলো না। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে সরাসরি কোনো বিরূপ মন্তব্যকরণে আন্তরিক অনীহাবশত 'সম্ভবত' শব্দটা ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। কেননা তাঁর চতুর্থ-পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহের অধিকাংশ রচনাই এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করে। বস্তুত, 'হরিণ চিতা চিল' গ্রন্থেই তাঁর কবি-কল্পনায় চড়ার আভাস দেখা দিয়েছে এবং আরো পরে প্রকাশিত 'কখনো মেঘ', এবং 'অথবা কিন্নর' কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিপ্রতিভার অস্তগামিতার লক্ষণও মোটেই অস্পষ্ট নয়। এই গ্রন্থদ্বয়ভুক্ত কবিতাগুলি পাঠ করতে-করতে এ-কথাই আমাদের মনে হয়, যেন 'প্রতিভা' কথাটার সংজ্ঞার্থই এগুলিতে লঙ্ঘিত হয়েছে ; কেননা 'নিত্য নব উন্মেষ-শালিনী ক্ষমতা' হিসেবে 'প্রতিভা'কে যে আমরা সংজ্ঞাবদ্ধ করেছি, সে-রকম কোনো ক্ষমতার প্রকাশ এই কবিতাগুলিতে বড়ো একটা ঘটেনি। অথচ আমরা জানি, 'নিতুই নব' প্রকাশেই প্রতিভার যা-কিছু সার্থকতা, নচেৎ তাঁর নিজস্ব বা স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই।

এই গ্রন্থ দু'টি থেকে কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে আরো বিশদ করা যেতে পারে। 'হরিণ চিতা চিল' গ্রন্থের নাম-কবিতাটির কথাই প্রথমে ধরা যাক। যন্ত্রশাসিত কৃত্রিম নগর-সভ্যতার দ্রুত বিস্তার্যমানতায় অসহায় অরণ্যপ্রাণী হরিণ ও চিতা এবং নভোচারী চিলের প্রতি যথাক্রমে 'পালাতে পালাতে কতদূর ?', 'চিতা, ও তীব্র চিতা ! / আঁধারে দু'চোখ কার লালসায় জ্বালবে ?' এবং 'নীড় কি তখন খুঁজে পাবে আর / কোনো দুর্গম শিখরে ?' প্রশ্নোচ্চারণে অবলা প্রাণীকুলের প্রতি উথলিত তাঁর সহানুভূতিতে যতই গভীরতা থাক না কেন, নেই সেই সহানুভূতিকে এই যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রূপান্তরপ্রয়াস, যা 'সম্রাটে'র একাধিক কবিতায় স্পষ্টতই বিদ্যমান। অথবা 'অথবা কিন্নর' কাব্যগ্রন্থের 'কিন্নর' রচনা থেকেও দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সম্ভব। 'কিন্নর' কবিতার তৃতীয় স্তবকের ঃ

> সময় শাসিত হোক, ধেনু ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা,
> প্রাণের বিক্রম নিত্য দিগ্বিজয় ছড়াক উল্লাসে।

পংক্তিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছা ধ্বনিত হ'লেও সেই ধ্বনির অন্তরালে আমরা যেন 'সম্রাটে'র 'শস্য-প্রশস্তি' কবিতার মূল সুরকেই প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনি। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্বে রচিত এই গ্রন্থকতিপয়ের অন্যান্য কবিতার বিশ্লেষণ থেকেও আমরা উপলব্ধি করি যে এই কবিতাগুলিতে আপাতমনোহারিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও প্রতিভার সেই বিচ্ছুরণের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাতে কবিতা মৌলিক সৃষ্টিতে উন্নীত হয়। এগুলি নির্মাণমাত্র, মৌলিক সৃষ্টিকর্ম নয়। অতএব 'কবিজীবনের শেষ পর্বে'র প্রেমেন্দ্র মিত্রও প্রথম এবং মধ্য পর্বে'র প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো সমান প্রতিভাশালী' —এ-দাবি যদি কেউ উত্থাপন করেন, তা হ'লে সেই দাবী প্রেমেন্দ্র-প্রীতির পরাকাষ্ঠা হ'লেও, মেনে নেয়া সম্ভব নয় এই কারণে যে শেষ পর্বে'র প্রেমেন্দ্র মিত্রে, আমরা লক্ষ্য করি, যথার্থ সৃষ্টি নেই, আছে নেহাৎ নির্মাণ ; আত্ম-অতিক্রম নেই, আছে আত্ম-আবর্তন। অবশ্য সত্যের সম্মানে এ-কথা অনস্বীকার্য যে শেষ পর্বে'র প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যকৃতি সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্তকে, সাময়িকভাবে হ'লেও, ভ্রান্ত প্রতিপন্ন ক'রে, সেই পর্বেও তিনি 'মুখ' এবং 'ঝাপসা নাম'-এর মতো আশ্চর্য অন্তত কয়েকটি কবিতায় শেষবারের মতো জ্ব'লে উঠেছেন। 'মুখ' কবিতায় তাঁকে যে-'একটা মুখ কাঁদায় হ'য়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু', সে-মুখের মর্মান্তিক অসহায়তায় খান-খান হ'তে-হ'তেই তাঁর কণ্ঠে প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে, 'কার সে মুখ, কার ?' এবং পরম প্রজ্ঞায় তিনি উত্তর দিয়েছেন, 'প্রাণেশ্বরী পরম যন্ত্রণার ॥' আর, 'ঝাপসা নাম' কবিতাতে, 'মৃগতৃষার যায় কি কান্না গড়ানো', এই সংশয়ে ক্রমে-ক্রমে আন্দোলিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত শেষ পংক্তিতে 'জীবন মানে শুধুই ছায়া জড়ানো'—এই অনুভূতির শূন্যতার অতল গহ্বরে নিজেকে তিনি নিক্ষিপ্ত করেছেন। অনুভূতির যুগপৎ গভীরতা ও ব্যাপ্তিই কবিতা দু'টির প্রাণ। অবশ্য এ-রকম উত্তীর্ণ কবিতা তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্বে তিনি খুবই কম লিখতে পেরেছেন। এ-পর্বে'র বেশির ভাগ কবিতাতেই তিনি মৌলিক নন,

তিনি পুনরাবৃত্তিপরায়ন (repetitive)। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবন অবসিত হবার বহু পূর্বেই তাঁর প্রতিভাদীপ্ত কবিজীবনে অবসানের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিলো।

কিন্তু সেই অন্ধকারের চেয়েও ঢের বেশি অন্ধকার কবি প্রেমেন্দ্রের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে আমাদের মনেই সঞ্চিত হ'য়ে আছে। কেননা আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়করূপে তাঁকে স্বীকৃতিপ্রদানের ব্যাপারে একালীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাবশালী সমালোচকদের অনেকেই অদ্যাবধি রীতিমতো দ্বিধাপরায়ণতার পরিচয় প্রদান করেছেন। 'কবি হিসেবে তিনি সংজ্ঞাসম্মতভাবে আধুনিক ছিলেন কিনা' কিংবা তাঁর কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণাবলী যথেষ্ট পরিমানে বিদ্যমান আছে কিনা'—এই মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁদের মনে এ-সম্পর্কে যা-কিছু সংশয়। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের কেউবা সিদ্ধান্তস্বরূপ মন্তব্য করেছেন, 'তাঁকে আধুনিক কবি বলা অপেক্ষা রবীন্দ্র-যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি বলাই অধিকতর সঙ্গত।' আবার কেউ-কেউ আধুনিক বাংলা কবিতা-সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর নাম পুরোপুরি অনুল্লিখিত রেখে কবি হিসেবে তাঁর অনাধুনিকত্ব প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু আধুনিকতার স্বকল্পিত সংজ্ঞা-উদ্ভাবনে কিংবা কবিতায় আধুনিকত্বের বৈশিষ্ট্য-লক্ষণাদির তালিকা-প্রণয়নে তাঁরা যতই আত্মশ্লাঘা অনুভব অথবা পটুত্ব প্রদর্শন ক'রে থাকুন না কেন, কাব্যবিচার-সম্পর্কিত একটি মৌলিক সত্য (fundamental truth) তাঁরা কিন্তু সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে উঠতে পারেন নি। এই মূল সত্য তাঁদের যথার্থভাবে উপলব্ধ হয়নি যে কাব্যের আধুনিকতার বিচারে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির যে-সমগ্রতা অত্যাবশ্যক, তা অর্জনের পথে কবিতার উৎকর্ষগত ইতি বা নেতিবাচক বিশেষ কোনো একটি দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ শুধু প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করেনা, কাব্য-সমালোচনায় নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতার পক্ষেও তা সমূহ ক্ষতির কারণ হ'য়ে ওঠে। কেননা কাব্যবিচারে কবিতার ভাব ও ভাষা, বিষয় ও আঙ্গিক কিংবা প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি—এর কোনোটারই পৃথক বা স্বতন্ত্র মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়, যেহেতু এগুলির প্রতিটিই 'একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্তান্তে'। কাব্যবিচারের এই মৌল নীতি সম্পর্কে যদি তাঁরা সম্যকরূপে অবহিত থাকতেন, তাহ'লে কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আধুনিকতা বিষয়ে কোনো দ্বিধা কিংবা দ্বন্দ্ব তাঁদের মনে বাসা বাঁধতে পারতো না। কেননা তাহ'লে তাঁরা এটা ঠিকই বুঝতে পারতেন যে কবিতায় প্রেমেন্দ্র মোটেই অনাধুনিক ছিলেন না—তবে বাংলা কবিতায় 'আধুনিক মেজাজ' প্রবর্তন-প্রসঙ্গে তাঁর সমসাময়িক যে-ক'জন কবির নাম সাধারণত একসঙ্গে উচ্চারিত হ'য়ে থাকে, তাঁদের থেকে তিনি অনেকটা স্বতন্ত্র ছিলেন ব'লেই কাব্যের আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর ধারণাটাও ছিলো অন্যদের ধারণার চেয়ে অনেকাংশে অন্যরকমের। তাঁর আধুনিকতার ধারণায় ঐতিহ্য অঙ্গীকৃত ছিলো ব'লেই ঐতিহ্যকে কখনো অস্বীকার করেন নি তিনি, অথচ তার ধারাবাহিকতায় গা ভাসিয়েও দেননি। ঐতিহ্য থেকে যেটুকু গ্রহণ করবার সেটুকু আত্মস্থ ক'রে নিয়ে

তা থেকে স'রে গিয়ে আবার নিজের পথে ফিরে এসেছেন তিনি এবং আধুনিক সময় ও পরিবর্তের পরিস্থিতির নূতন তাৎপর্যকে উপলব্ধি ক'রে বাংলা কবিতার গতিকে নূতন পথে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করেছেন। তথাকথিত আধুনিকতার উগ্র চমকে পাঠক-পাঠিকা-চিত্তকে বিভ্রান্ত করা অথবা 'আধুনিক' শীলমোহরে নিজেকে চিহ্নিতকরণ অপেক্ষা ঐতিহ্যলালিত হ'য়ে কাব্যসাধনা করাতেই চিরদিন তাঁর আগ্রহ ছিলো বেশি। এবং তাঁর কাব্যসাধনা ঐতিহ্যাশ্রিত হওয়ার দরুণই কবি হিসেবে স্বদেশী-বিদেশী কোনো নির্দিষ্ট কবির কাছেই তিনি বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন না।

যদিও এ-কথা সত্য যে জীবনানন্দের মতো স্থিতপ্রজ্ঞ কবিও একদিকে যেমন সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতায় মননধর্মের শোকাবহ অভাবে ব্যথিত বোধ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিস্বভাবে আত্মস্থতার অনুপস্থিতিতে বিমর্ষতা অনুভব না-ক'রে পারেন নি এবং বুদ্ধদেবের মতো বিদগ্ধ কাব্যবোদ্ধা ও উদার কাব্যসমালোচকও প্রেমেন্দ্রের ছন্দোবদ্ধ কবিতাতে কথ্যছন্দের প্রতি অনবধানতা প্রদর্শনে এবং গদ্যকবিতায় গদ্যের পরিমিতিকে আত্মস্থ করার পরিবর্তে গদ্যের মাত্র সারল্যকে গ্রহণে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হ'য়েই শেষদিকে তাঁর সম্পর্কে শীতল নিরুৎসুকতার নীতি অবলম্বন করাকেই শ্রেয় ব'লে বিবেচনা করেছেন, তবু তাঁর কবিতায় বিষয়বস্তুর যে-বৈচিত্র্য, প্রাণপ্রাচুর্যের যে-প্রকাশ, আবেগ ও উচ্ছলতার যে-স্ফুরণ এবং সর্বোপরি জীবনানুভূতির যুগপৎ যে-ব্যাপ্তি ও গভীরতা—ইত্যাদির কথা সামগ্রিকভাবে ভেবে দেখলে, তাঁর কাব্যকৃতির কোনো বিশেষ এক বা একাধিক দিকের এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি বহুলাংশেই গৌণ হ'য়ে পড়ে, অন্তত উল্লেখযোগ্য ব'লে অনুভূত হয়না আর। আত্মসচেতনতার আত্যন্তিকতা অর্জনের পরিবর্তে আত্মউদাসীন হ'য়েই তিনি কবিতা রচনা করতে চেয়েছিলেন। কালের পালা-বদলজনিত নানা দ্বন্দ্বে তিনি বিক্ষত হয়েছেন, পরিবেশের পরিবর্তনে এবং মানব-মনের আধুনিকায়নের (modernisation) প্রেক্ষিতে নানা সংশয়ে তিনি আন্দোলিত হয়েছেন ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টির বিভ্রম ঘটেনি। জীবনের রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে ভরপুর, বেদনায় অন্তর্লীন ও আবেদনে গভীর তাঁর কবিতা সূর্যের রশ্মির মতো দীপ্ত, প্রখর রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল। তাঁর কবিতার এই প্রাণোজ্জ্বলতা তথা প্রাণোচ্ছ-লতার কারণেই বাংলা কবিতার বিস্তৃত পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই শতকের তৃতীয় দশকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুবেদী সমালোচক শিবনারায়ণ রায়ের 'The thirties gave us the poetry of barrenness, but it was not barren in poetry'—এই সুচিন্তিত মন্তব্যের প্রথমার্ধ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। গ্রামীন জীবনের কবি তিনি নন, তিনি মূলত নাগরিক জীবনেরই কবি। নগরে-বন্দরে যারা অসহায়ের মতো ঘুরে বেড়ায়, যারা 'ভাড়াটে কুঠি'তে জঞ্জালের মতো এসে জোটে, যারা পুরোনো খবরের কাগজ কেনাবেচা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে—সমাজের এইসব হতভাগ্যদের কাহিনী এবং পিডেস্ট্রিয়ানদের কথাই তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে তিনি বলেছেন ; অথচ তাঁর কবিতা নগরজীবনের জটিল অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি মাত্র হ'য়ে থাকেনি,

তা সেই জীবনের ভাবচ্ছবিও হ'য়ে উঠেছে। জীবনের কেবল অনুভূতিকেই নয়, নিংড়ে-নেয়া নির্যাসকেও তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় ছেঁকে তুলেছেন তিনি। এই ক্ষমতা বিস্ময়কর। জীবনের আপাতমাধুর্যের আড়ালে বীভৎস যে-নগ্নতা আছে তা যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, তেমনই তাঁর কবিদৃষ্টির অগোচরে থাকেনি জীবনের আদিম নগ্নরূপের গভীরে নিহিত তার অকৃত্রিম মাধুর্যও। তাঁর কবিতায় সমাজনিবদ্ধ মানুষের কথা যখন বলেছেন, তখন তিনি তাকে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে শুধু প্রশংসাই করেন নি, একই সঙ্গে তার আদিম পাপ সম্বন্ধে সচেতনতারও প্রমাণ দিয়েছেন।

তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় এমন একটা ভাব ঘুরে-ফিরে প্রকাশিত হয়েছে যে মানুষের দেবতা পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত, তার গন্তব্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে বৃহৎ মানবসমাজের অঙ্গীভূত ক'রে সামগ্রিক জীবনসত্যের সন্ধানে অনেক কবিতায় তাঁর স্রষ্টাসত্তাকে তিনি নিয়োজিত ক'রে গিয়েছেন। কবি হিসেবে এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। সামগ্রিক জীবনসত্যের সন্ধানী হওয়ার দরুণই 'ব্যক্তি', 'সমাজ' কিংবা 'বিপ্লব'—ইত্যাদি বহুব্যবহৃত পুরোনো শব্দগুলি তাঁর কবিতায় কোনো বিশেষ তাৎপর্যের বাহক নয় ; বরং মানব, মানবতা এবং মানব-ইতিহাসের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি প্রখর-নিবদ্ধ। এই প্রাণময় গ্রহে মানুষ ও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনা-চিন্তা এতদ্দেশীয় কোনো কবির এতৎসম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির মতো নয়, তা কিছুটা মার্কিন কবি হুইটম্যানের মনুষ্যপ্রজাতির ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত ভাবনার মতো। এ-সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাবনাকে এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

'হুইটম্যান যখন sexless love-এর কথা প্রথম প্রচার করেছিলেন অনেকেই মনে-মনে হেসেছিল, এখনও অনেকে হয়তো হাসে। কিন্তু আমি জানি, মানুষ পশুত্বের সে-স্তর ছাড়িয়ে এখন যে-স্তরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে সেখানে যৌনসম্বন্ধ ছাড়াও আর একটা সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের হওয়া সম্ভব।' দেশকাল-নির্বিশেষ নরনারীমাত্রেই যে পরস্পরের সাথী বা কমরেড, এ-কথা হুইটম্যানই যেমন কবিতায় প্রথম বলেছেন এবং যে-কমরেডশিপের বন্দনায় তিনি ব'লে উঠেছিলেন, 'আসল কথাটি হ'লো মানুষ মানুষকে চিনবে বন্ধু ব'লে, ভাই হিসেবে' (অনুবাদ, বর্তমান সমালোচকের)—নরনারী নিরপেক্ষভাবে মানববন্দনার সেই সুরটি প্রেমেন্দ্রের কবিতাতেও একেবারে অশ্রুত নয়। স্বকৃত একটি অনুবাদ-কবিতায় তাঁর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি, 'যত মানুষের জন্ম হয়েছে তারা যে আমার ভাই / নারী যে আমার ভগ্নী ও প্রিয়তমা—'।

মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই বলিষ্ঠ আশাবাদ প্রাণে-প্রাণে সঞ্চারিত হবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে সুখের সঙ্গে কল্যাণের আর কল্যাণের সঙ্গে আনন্দের অনভিপ্রেত বিরোধ, যে-কারণে আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছেন, 'সুখ আর কল্যাণ কোথায় এক হচ্ছে বুঝতে পারি না।' এবং 'কল্যাণের সঙ্গে আনন্দ মেশে না, তাই গোল।' (অংশ, অচিন্ত্যকুমারকে লিখিত চিঠি)। অথচ এই আক্ষেপে ভেঙে না-প'ড়ে কবিতার-পর-কবিতায় মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভাবনায় তিনি

আবেগে আপ্লুত হয়েছেন, উচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতার উত্তাপ যেমন তথাকথিত বামপন্থী কবিদের মতো ভাড়া-করা নয়, তাঁর নিজস্ব, তাঁর দুরন্ত আবেগও তেমনই আমদানীকৃত নয়, তাঁর অনুভূত। আবেগের প্রকাশে তিনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নজরুলের সমীপবর্তী হ'লেও মূলত নজরুলের 'মতো' নন। আবেগ নজরুলে উপচিত তথা অপচিত, কিন্তু প্রেমেন্দ্রে সংযত তথা সংহত। নজরুলের মতো তিনি 'জাতবিদ্রোহী' কিংবা 'নাস্তিক-বিদ্রোহী'ও ছিলেন না নজরুলের সমবয়স্ক জীবনানন্দের মতো তিনি ছিলেন 'জন্ম-রোম্যান্টিক' এবং 'রোম্যান্টিক বিদ্রোহী'। রোমান্টিকতার স্বপ্নময়তায় তিনি মানবভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন, আমৃত্যু ব্যথিতচিত্তে সমাজের নিপীড়িত ও নিঃস্বের দুঃসহ জীবনযাত্রার সুখ-সমুজ্জ্বল পরিবর্তনের প্রত্যাশা ক'রে গিয়েছেন। সেজন্যই তাঁর কবিমানসের এই মর্মসত্য উপলব্ধি ক'রে তাঁর সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের—'Premendra is a broken-hearted dreamer, still hoping for the best from a revolution.' মন্তব্যকেই মনে হয় প্রেমেন্দ্রের কাব্য-মানসিকতার আপাত-স্পষ্টতম উন্মোচন ॥

এটা আদৌ অত্যুক্তি নয় যে বুদ্ধদেব বসুর স্রষ্টাসত্তা জীবনের প্রত্যন্ত পর্যন্ত প্রসারিত বিশেষ এক সৌন্দর্যের সন্ধানে আদ্যোপান্ত নিয়োজিত ছিলো। (এই সিদ্ধান্তের আদি উৎস তাঁরই একটি উক্তি—'আমাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে-প্রেরণা আমাদের মনে সবচেয়ে প্রবল ছিলো, আজ যদি তার কোনো নাম দিতে হয়, সেটাকে সৌন্দর্যানুভূতি বলা যেতে পারে।') এবং তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সব ক'টি পর্বেই সেই সৌন্দর্যসন্ধানের প্রধানতম সূত্র ছিলো প্রেম। প্রেমের আলোকেই তিনি জীবন সৌন্দর্যের অনুধ্যান করেছেন, জীবনের বিচিত্র রূপকে প্রত্যক্ষ ও উন্মোচিত করেছেন, পৃথিবী নামক প্রাণময় এই গ্রহে এবং অরুন্তুদ এই সংসারে মানবিক অস্তিত্বের যা-কিছু সার্থকতা, তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত, এই প্রেমপ্রেক্ষিত সৌন্দর্যসন্ধানেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত ও সমাপ্তি এবং এ-দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়-সীমায় তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপের সংঘটন—ছাত্রাবস্থায়, প্রথম যৌবনে, ঢাকা শহরে বসবাসকালে, বাল্যসুহৃৎ অজিত দত্তের সঙ্গে 'প্রগতি'র যুগ্ম-সম্পাদনায়, অত্যুজ্জ্বল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম) ছাত্রজীবনের অন্তে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চ'লে আসার অল্পদিনের মধ্যেই তদানীন্তন আধুনিকতার অগ্রদূত 'কল্লোল' (১৯৩০) ও 'কালিকলম' (১৯৩৩) পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখকরূপে আত্মপ্রকাশে ও আত্মপ্রতিষ্ঠায়, ১৯৩৫ সালে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশে এবং তৎপরবর্তী সিকি-শতাব্দী-ব্যাপী (শততম সংখ্যার প্রকাশ পর্যন্ত) সেটির সম্পাদনাকর্মে একনিষ্ঠ প্রেমিকের মতো লগ্ন হ'য়ে থাকায়, নিত্য নূতন কবিপ্রতিভার আবিষ্কারে ও আত্মবিকাশের পথ-প্রস্তুতিতে, গদ্যে ও পদ্যে নিজস্ব রচনার বহুমুখী অজস্রতায় ও নিরন্তর প্রসাধনপরায়ণতায়, দেশ-বিদেশের শিল্প-সাহিত্যের সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহে ও সংরক্ষণে, সাহিত্যগতপ্রাণ গোষ্ঠী-গঠনে এবং সাহিত্যিক বাক্-বিতণ্ডায় ন্যায়কোচিত আত্মপ্রত্যয়ে স্বীয় মতামতের উপ-স্থাপনায়। অর্থাৎ, এককথায়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক সত্তার সামগ্রিক সক্রিয়তায়।

তাঁর সেই সৌন্দর্যসন্ধানপরায়ণতাই কালক্রমে তাঁর পক্ষে তাঁর জীবনের সাধনার সমার্থক হ'য়ে উঠেছিলো, সাধনায় পরিণত হয়েছিলো। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর প্রথম জীবনের ঢাকার রমনা ও পুরানা পল্টন, মধ্যজীবনের কলকাতার রমেশ মিত্র ও যোগেশ মিত্র রোডের ভবানীপুর, প্রৌঢ় জীবনের ২০২ রাসবিহারী অ্যাভেনু এবং শেষ জীবনের নাকতলা—এই দীর্ঘ চার অধ্যায়ের দীর্ঘতর পাঁচ দশক সময় জুড়ে সেই সাধনায় কখনো স্থায়ী যতিপাত ঘটেনি, নিতান্ত সাময়িক ছাড়া তাতে নামেনি কোনো বিরতি। আর, অতি আশ্চর্যরকমের নিষ্ঠাপ্রগাঢ় ছিলো সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সেই জীবন-সাধনা—

ভাবের সঙ্গে ভাষার চিরন্তন দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় নিরন্তর ক্ষত-বিক্ষত হ'তে থাকা, ভাবনার সঙ্গে প্রকাশের সুগভীর বিরোধভঞ্জনের পন্থা উদ্ভাবনে নিয়ত নিয়োজিত হ'য়ে থাকা। যেহেতু ভাবকে ভাষার অনুগামী হ'তে হবে অথবা ভাষাকে ক'রে তুলতে হবে ভাবের অনুসারী, অতএব, তাঁর প্রত্যয়, ভাবের ঘরে সামান্যতম চৌর্য'ও দুরপনেয় কলঙ্কের, ভাষাব্যবহারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যও অমার্জনীয় অপরাধের। সেই জন্যই সাহিত্যের শিল্পী হিসেবে তাঁর সাধনা ছিলো ভাব ও ভাষার বিরহমোচন, চিন্তা ও প্রকাশের বিবাহ-বন্ধন। রম্য রচনার রম্যতার আপেক্ষিক উৎকর্ষসাধন, ছোটোগল্পের অবসানের আকস্মিকতার তীব্রতাবর্ধন, উপন্যাসের উপকরণপরিধির ক্রমবিস্তৃতিসাধন, প্রবন্ধের তথ্যাশ্রিত যুক্তিশীলতা সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তন, সমালোচনার সারবত্তা নিরূপণে নূতন রীতির উদ্ভাবন, অনুবাদকর্মকে প্রসাদগুণান্বিত শিল্পে রূপান্তরিতকরণ এবং সর্বোপরি কবিতার গহন-গভীর-শীতল সলিলে সম্পূর্ণ আত্মনিমজ্জন—এ-সমস্তই ছিলো তাঁর সাহিত্যিক সাধনার অন্তর্গত ভিন্ন-ভিন্ন দিক্, এইসব নিয়েই তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি প'ড়ে ছিলেন, লেগে ছিলেন, আকৃষ্ট ও আবিষ্ট হ'য়ে ছিলেন। বস্তুত, এই সমস্ত বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমস্যা তাঁকে মাত্র উদয়াস্ত শিরঃপীড়িতই করেনি, অহরহ নিষ্পিষ্টও করেছে।

আগেই বলেছি, প্রেমদৃষ্টিই বুদ্ধদেবের সৌন্দর্যদৃষ্টি তথা তাঁর জীবনদৃষ্টি। সেই দৃষ্টির দীপ্তিতেই তিনি নিসর্গপ্রকৃতির ঋতুক্রমিক রূপবৈচিত্র্য এবং সংসার-সন্নিবদ্ধ মানুষের মোহরঞ্জিত মর্ত্যলীলাকে অবলোকন করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন সেই দৃষ্টি কিংবা কী-ই বা তার বৈশিষ্ট্য? তা কি 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'র উদাত্ত উদ্গাতা আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের দেহারতির নির্ভীক প্রশস্তি-রচনার প্রভাব-পরিপুষ্ট, না কি নরনারীর সুরতলীলার নব্য ভাষ্যকার ইংরেজ লেখক ডেভিড হারবার্ট লরেন্সের কাম-দর্শনের সংরাগ-রঞ্জিত কিংবা তা বাংলা কাব্যে দেহবাদের প্রথম পূজারী 'স্বভাবকবি' গোবিন্দ দাসের দুরন্ত প্যাশন-প্রভাবিত অথবা আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তনায় অন্যতম প্রধান পুরোধা পারনাশিয়ান মোহিতলালের আদেহ-চৈতন্যব্যাপ্ত সুগভীর ভোগতৃষ্ণার মর্মান্তিক হাহাকার-সংক্ষুব্ধ—হীডোনিস্টিক বুদ্ধদেবের প্রেমদৃষ্টির নিয়ন্ত্রক প্রভাব কোন্‌টি? এগুলির সব ক'টি? কোনও একটি? কিংবা কোনোটিই নয়? সঠিকভাবে বলা মুস্কিল—হয়তো সম্ভবই নয়। কেননা যে-কোনো লেখকের জীবনদৃষ্টির স্বরূপসন্ধানে স্বদেশী-বিদেশী অন্য কোনো লেখকের প্রভাব এভাবে বাহ্যত আবিষ্কারের প্রয়াস পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর, যেহেতু প্রত্যেক লেখকই স্বতন্ত্র ও স্বরাট; তাঁদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব অনুভূতি ও উপলব্ধির আলাদা জগৎ, স্বকীয় অন্বেষা ও অভিজ্ঞতার পৃথক পরিধি। সেই জগতের অন্তর্গত হ'য়ে এবং সেই পরিধিকে মান্য ক'রেই তাঁরা তাঁদের নিজ-নিজ রচনায় নিজেদের মনের মতো ক'রে নিজেদের মনের কথা পরিবেশন করেন। তাঁরা কেউই একে অন্যের 'মতো' নন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লেখিক-লেখিকামাত্রেরই (এমনকি মৌলিকতাসম্পন্নদের ক্ষেত্রেও) প্রভাবের

একটা দিক্ থাকেই থাকে,—যদিও সেই প্রভাবের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া বহু ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা-সম্ভব নয়। স্থলবিশেষে তা প্রবল হ'য়েও পরোক্ষ। জন্মসূত্রে অর্জিত বংশধারা এবং পরিবেশ-পরিমন্ডলের যুগ্ম-শক্তির জটিল সংঘাতে যে-ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মূলত তা-ই গ'ড়ে তোলে যে-কোনো লেখক-লেখিকার তথা ব্যক্তির জীবনদৃষ্টিভঙ্গি—প্রভাবের ভূমিকা এ-ক্ষেত্রে গণ্য হ'লেও গৌণ।

বুদ্ধদেব বসু-সম্পর্কিত এই আলোচনার ভূমিকাস্বরূপ ওপরের স্তবক দু'টিকে যাঁরা স্বীকার ও গ্রহণ করবেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করি যে বুদ্ধদেবের প্রেম-চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে পূর্বোল্লিখিত কবিচতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই কমবেশি প্রভাব রয়েছে এবং সে-প্রভাবের অস্তিত্ব কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ ও প্রকরণগত দিকের তুলনায় ভাব ও ভাবনাগত দিকের বিবেচনাতেই অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যা এর চেয়েও বেশি উল্লেখের, তা হচ্ছে তাঁর নিজের চিন্তা ও দৃষ্টির কথা,—যে-চিন্তা ও দৃষ্টি সমস্ত প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে তাঁর প্রেমচেতনার বিবর্তন ও পুষ্টিসাধনে ক্রমশই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। তাঁর প্রেমচেতনায় তথা জীবনভাবনায় প্রভাবের প্রকাশের অন্য সব ক'টি দিকের—আবেগাশ্রিত উপন্যাসের, ইঙ্গিতধর্মী ছোটোগল্পের, হৃদয়সংবেদী সমালোচনার, মূলানুসারী অনুবাদের কিংবা বর্ণনাবহুল ভ্রমণকাহিনীর—পর্যালোচনার প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত থাক; ভবিষ্যতের সাহিত্যসমালোচকদের জন্য তা মুলতুবী রেখে এখন বরং তাঁর কবিতার গহন সুড়ঙ্গে প্রবেশের পথান্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

'A Woman Waits For Me' কবিতায় বিশ্বকাব্যের ইতিহাসে 'sexless love'-এর প্রথম প্রচারক হুইটম্যানের আশ্চর্যরকমের দুঃসাহসিক ও বেপরোয়া ঘোষণা—'Sex contains all, bodies, souls,… …'—কিংবা 'I brace myself effectually, / I listen to no entreaties, / I dare not withdraw till I deposit / what has so long accumulated within me.' পংক্তি-চতুষ্কে স্বীকৃত শালীনতার সর্ব-সীমাতিক্রমী সিসৃক্ষু রিরংসার এই অলজ্জিত ও অসংকোচিত উচ্চারণ যেমন একদা প্রচলিত নীতিবোধের ভিৎ-এ ফাটল ধরিয়েছিলো, বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা'র অন্তর্গত 'মানুষ'-শীর্ষক চারটি সনেটের একটি পরম্পরার প্রথমটিতে পরিবেশিত ঃ

> যেখানে পেতেছে কাম আপনার স্বর্ণ-সিংহাসন,
> … … … … …
> বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন ঃ
> আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা—প্রলুব্ধ, অস্থির,
> আসঙ্গ-বাসনা-পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক ঃ
> … … … … …
> সেখানে আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটে না,
> কটুগন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা।

অথবা তাঁর সমগ্র কবিজীবনের সর্বাধিক বিদ্রোহাত্মক রচনা ঐ কাব্যগ্রন্থেরই নাম-কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'য় অসংকোচে ও অনায়াসে উদ্গীত :

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি ;— ।

ইত্যাদি পংক্তিও তেমনই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই রবীন্দ্রকাব্যআবহে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশীলিত এতদ্দেশীয় পাঠকমহলে প্রবল প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু হুইটম্যানের 'sexless love' বুদ্ধদেবের প্রেমভাবনার অন্তর্গত ছিলো না কিংবা হুইটম্যানের মতো 'Sex contains all, bodies, souls' প্রত্যয়েও তিনি অবিচলিত ছিলেন না। তাঁর ধারণায় Sex মাত্র body-কেই contain করে, soul-কেও contain করার কোনো স্বকৃতি তাতে নেই। তাছাড়া, হুইটম্যানের মতো নিছক সিসৃক্ষাই বুদ্ধদেবের রিরংসার একমাত্র, এমন কি প্রধান প্রেরণা নয়। মনুষ্যপ্রজাতির 'বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনাহীন' বংশ-বিস্তারকেই তিনি প্রেমের পরিণতি হিসেবে কখনো গ্রহণ করেন নি কিংবা নিছক বংশবৃদ্ধিতেই তিনি প্রেমের সার্থকতারও সন্ধান পান নি। 'অন্ধকার' কবিতায় 'শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর' প্রেমিক জীবনানন্দকে যেমন বিমর্ষ করেছিলো, নির্বিচার মনুষ্যসৃষ্টির অনর্থকতাও প্রেমিক বুদ্ধদেবকে তেমনই বিষণ্ণ করেছে, এর অহেতুকতায় তিনিও বিমূঢ় বোধ করেছেন। সেই বিমূঢ়তারই প্রকাশ ঘটেছে সদ্যোল্লেখিত সেই সনেট-পরম্পরার একটির এই 'মর্মান্তিক আত্মঅপমান'ব্যঞ্জক পংক্তিত্রয়ে ঃ

মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন :
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ-বীভৎস ইন্দ্রিয়-মিলন—
নির্বিচারে প্রাণীসৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।

'And wed me, to ease my yearnings.'—বিখ্যাত 'Gipsy' কবিতার প্রথম স্তবকের চতুর্থ পংক্তিতে নারীর প্রতি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ এই নিঃসংকোচ আহ্বানে ডি. এইচ লরেন্সের আদিম আকাঙ্ক্ষার যে-তীব্রতা প্রকাশিত, যৌনতৃষ্ণার তেমন তীব্রতাতীক্ষ্ন পংক্তি বুদ্ধদেবের এক 'বন্দীর বন্দনা' কবিতা থেকেই (পূর্বোদ্ধৃত পংক্তি চতুষ্কের মতো) অনেক উদ্ধার করা সম্ভব। এছাড়া, 'Leaves of Grass' প্রকাশের অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল অতিক্রান্ত হবার পর, লরেন্সের হুইটম্যান-প্রশস্তি—"The first to smash the old moral concept that the 'soul' of man is something 'superior' and 'above' the flesh."ও বুদ্ধদেবের দেহকেন্দ্রিক প্রেমচেতনার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যসম্পন্ন। কিন্তু লরেন্সের সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রেমদৃষ্টিগত এই মিল সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গরমিল এখানটায় যে 'man's hope of salvation lay in the rediscovery of passionate life'—লরেন্সীয় দর্শনের এই মর্মবাণী বুদ্ধদেবের জীবনভাবনায়

মর্মকেন্দ্রে আমূলে বিদ্ধ হ'তে পারে নি। অধিকন্তু "civilization had corrupted the 'natural' behaviour of men and women."—লরেন্সের সভ্যতাবিদ্বেষী এই চরম সিদ্ধান্তের প্রতিও বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের আন্তরিক সমর্থন নেই। তিনি সভ্যতাবিশ্রদ্ধ ছিলেন না, ছিলেন সভ্যতাসশ্রদ্ধ। আদিম পাশব মানুষকে আধুনিক পরিশীলিত মানুষে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে সভ্যতার ভূমিকা, তাঁর বিবেচনায়, শুধু ইতিবাচকই নয়, তা পরম শুভঙ্করও। তাই পারিবেশিক প্রতিকূলতাকে পরাস্ত ক'রে এবং মানসিক রিপুনিচয়ের ঊর্ধ্বায়ণ (sublimation) ঘটিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের মূলে সভ্যতার অবদানকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, মানব-প্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে সভ্যতার অবদানের ভিন্ন-ভিন্ন দিকের মহিমা-কীর্তনে তাঁর কবিতায় তিনি মুখর হ'য়ে উঠেছেন ঃ

হেরিতেছি একসঙ্গে শত শিল্প, সংগীত, কবিতা,
কারুকার্য, চারুকলা, মাধুর্যের নাহি পরিসীমা।
বিধির বিধান লঙ্ঘি' মানুষের জ্বলন্ত মহিমা—
ব্রহ্মাণ্ড-অম্বর-মধ্যে অনির্বাণ গৌরব-সবিতা।

(অংশ, অন্তিম কবিতা, 'মানুষ' সনেট-চতুষ্ক ঃ 'বন্দীর বন্দনা')

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, সভ্যতা-সম্পর্কে লরেন্সের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি কোথায় এবং কতখানি পৃথক। এবং সভ্যতাসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিগত এই পার্থক্যের দরুণই লরেন্সের মতো অমার্জিত আদিম জীবনের প্রতি কোনো আকর্ষণ বুদ্ধদেব কোনোদিনো অনুভব করেন নি।

বাঙালী কবি গোবিন্দ দাসের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সামান্য যে-সাদৃশ্য, তার সবটুকুই এখানটায় যে নিজেদের দেহবাদী কবিতায় দেহতৃষ্ণ আবেগের উৎসারণে তাঁরা দু'জনই সমানভাবে আন্তরিক; কিন্তু নরনারীর রভসলীলার বর্ণনায় পূর্বজ গোবিন্দ দাসের তুলনায় অনুজ বুদ্ধদেব অনেক বেশি অনুপুঙ্খ। আর, মোহিত-লালের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সমধর্মিতার দিক্? মোহিতের মোহ নিজের কবিজীবনের একটা বিশেষ পর্বে বুদ্ধদেবকে নিশ্চিতরূপেই আবিষ্ট করেছিলো, তা তিনি মোহিতলালকে যতই 'রক্ষণশীলতার প্রতিভূ'রূপে অভিহিত করুন না কেন। অন্তত সেই পর্বে বুদ্ধদেব মোহিতলালের মতোই দেহসম্ভোগের বাসনায় সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল, আত্মহারা। দ্বিতীয়ত, ভোগবাদী মোহিতলাল যেমন তাঁর দেহ-দর্শনে (corporeal philosophy) দেহদেবতার বন্দনা-সংগীতে দেহের গরলকেই অমৃতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন, বুদ্ধদেবের নিঃশঙ্ক দেহবাদেও তেমনই কামকে প্রেমে ঊর্ধ্বায়িত (sublimated) করার আকুতি লক্ষ্য করা যায়। এই আলোচনায়,— বিশেষত 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনাকালে—আমরা লক্ষ্য করবো যে বুদ্ধদেবের দেহবাদী চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রীয় সমস্যাই হচ্ছে দৈহিক কামকে মানসিক প্রেমে রূপান্তরিত করার সমস্যা। কিন্তু মোহিতলালের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সাদৃশ্য এই

পর্যন্তই। কেননা এই বিশেষ দিকটি ছাড়া উভয়ের দেহবাদে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের বিদ্যমানতাই বেশি। বস্তুত, মোহিতলালের ভোগবাদ বুদ্ধদেবের ভোগবাদের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর। সমগ্র জীবনকে মন্থন ক'রে অমৃতের অন্বেষণ-প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় মোহিতলালে ; অস্তিত্বের গরলসম্ভূত অমৃতের সন্ধানে ইংরেজ কবি আলফ্রেড টেনিসনের বীরনায়ক এনক্ আর্ডেন-এর কণ্ঠোদ্গত 'I shall drink life to the leese' উক্তির প্রতিধ্বনিকেই আমরা যেন তাঁর কবিতায় শুনতে পাই। কিন্তু বুদ্ধদেবের ভোগদৃষ্টি দেহসীমায়িত ; জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করার পরিবর্তে তা কেবল দেহের পরিধিতেই প্রতিহত। পরিধির প্রসারের মতো মোহিতলালের ভোগবাদের গভীরতাও বুদ্ধদেবের ভোগবাদের গভীরতার তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি। এই গভীরতার কারণেই তার প্রকাশ মোহিতলালে গম্ভীর আর এই গভীরতার অভাবেই বুদ্ধদেবে তা চটুল ও চঞ্চল। এছাড়াও, মোহিতলালের ভোগবাদ মননসমৃদ্ধ, সুস্থ ও স্বাভাবিক : কিন্তু বুদ্ধদেবে তা অনেক ক্ষেত্রেই আবেগসর্বস্ব অসুস্থ ও বিকৃত —এমনকি কবিতা বিশেষে purely morbid। বস্তুত, বুদ্ধদেবের স্রষ্টামানসের একটা অংশ morbid হওয়ার ফলেই সমগ্র সাহিত্যজীবনে এখানে-ওখানে গ্লানিকর অনেক অশ্লীল অধ্যায় তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সমর সেনের কাব্যপংক্তিকে প্রতিধ্বনিত ক'রে বলা চলে, ঝলমলে জড়োয়া গয়নায় মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত শরীর আবৃত ক'রে জীবনের আদিম ভ্রান্তির গণিকা তাঁকে অনেকবার অন্ধকার গলিতে টেনে নিতে সফল হয়েছে।

অধিকাংশ কবির মতো, বুদ্ধদেবেরও কবিপ্রতিভার স্ফুরণ তাঁর কৈশোরকালে, ঢাকায়। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে, কবির ষোলো বৎসর বয়সে, তাঁর ছেলেবেলায় রচিত ত্রিশটি কবিতার একটি চয়নিকা 'মর্মবাণী' নামে ঢাকার ছাব্বিশ নম্বর বাঙ্গালাবাজার থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি নামেই মর্মবাণী, আসলে কিন্তু ওটি মোটেই কবির মর্মের বাণী নয়। আর, তা হবেই বা কী-ক'রে ; কিশোর কবির তখনো যে মর্মসন্ধানই শুরু হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থের একটি কবিতাতেও এটির রচয়িতা নিজের পথে পদক্ষেপ করেন নি, করতে পারেন নি ; অন্যের পথেই তিনি পদচারণা করেছেন। 'মর্মবাণী'র কবিতাগুলির কোনো-না-কোনোটিতে কোনো-না-কোনোভাবে অন্তত যে-তিনজন কবির প্রভাব অতিশয় প্রকট, তাঁরা হলেন বয়ঃক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নজরুল ইসলাম। এঁদের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই সর্বাধিক মাত্রায় বিরাজিত। 'যাত্রী', 'তৃপ্তি', 'অরূপ', 'অতিথি', 'মিনতি', 'মিথ্যা কথা', 'আনন্দময়', 'জীবনদেবতা', 'গোপন কামনা', 'তোমার পরশ' এবং আরো অনেকগুলি কবিতার সামগ্রিক আবহই সম্পূর্ণত রাবীন্দ্রিক—ভাব ও ভাষার ব্যবহারে, সুর ও ছন্দের প্রয়োগে, শিরোনাম ও বিশেষণের নির্বাচনে। 'ব্যর্থ যামিনী', 'নীলপাহাড়' এবং বিশেষভাবে 'নির্ঝর' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের চটুল ছন্দপ্রয়োগরীতি অনুসৃত হওয়ায় এক ধরনের গীতি-মূর্ছনা (musical lilt) অস্পষ্টভাবে হ'লেও সঞ্চারিত

হয়েছে। 'শঙ্খ' কবিতাটির নামকরণে রবীন্দ্রনাথের এবং অন্তঃকরণে নজরুলের উপস্থিতি কিছুতেই লক্ষ্য এড়াবার নয় ঃ

ধ্বংসের রূপে দেখা দিক আজ
স্রষ্টা মধুসূদন
মহারুদ্রের হউক উদ্বোধন !

বুদ্ধদেবের কবিজীবনে ষোলো-বৎসর-বয়সে-প্রকাশিত 'মর্মবাণী'র ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে তাঁর চোদ্দ-বৎসর-বয়সে-রচিত কাব্য 'বনফুলে'র ভূমিকার মতোই মুখ্যত ঐতিহাসিক ; কেননা এই উভয় গ্রন্থের কবিতাগুলিই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই দুই কবির 'কাঁপিবুক যুগের কবিতা'—যে-'কাঁপিবুক যুগের' চৌকাঠ অতিক্রম না-ক'রে কোনো কবিই উপনীত হ'তে পারেন না স্বকীয়তার প্রশস্ত প্রান্তরে। কিন্তু কেবল এই ইতিহাসগত অর্থেই নয়, অন্য একটি দিকের বিবেচনাতেও 'মর্মবাণী'র বিশেষ একটি মূল্য আছে। সেই মূল্য এই যে তিরিশের দশকের অপর কয়েকজন প্রধান বাঙালী কবির মতো বুদ্ধদেবেরও কাব্যচর্চার হাতেখড়ি যে রবীন্দ্রনাথের কাছেই হয়েছিলো এবং প্রত্যক্ষত রবীন্দ্রবিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার আগে তাঁরও যে রবিপ্রদক্ষিণের একটা পর্ব ছিলো, তারই সমূহ সাক্ষ্য 'মর্মবাণী'র পাতায়-পাতায় সমুৎকীর্ণ হ'য়ে আছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণের (এমনকি কবিতা বিশেষে অনুকরণের) প্রচেষ্টা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের বাঙালী কবিদের তথা বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তরুণ বুদ্ধদেব এই পরিণত প্রত্যয়ে উপনীত হলেন যে রবীন্দ্রপ্রভাবের প্রলম্বিত ছায়া থেকে বেরিয়ে আসা ভিন্ন ভাবীকালের বাঙালী কবিদের আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জনের দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই—অর্থাৎ, বাংলা কবিতার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই প্রত্যয়ভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি নির্দ্ধারণে প্রয়াসী হলেন তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্য-পন্থা, আর সেই প্রয়াসেরই সার্থক পরিণতিরূপে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হ'লো ১৯২৬ থেকে ১৯২৯—এই কালসীমায় (অর্থাৎ, তাঁর আঠারো থেকে একুশ বৎসর বয়সের মধ্যে) রচিত মাত্র দশটি কবিতার ক্ষীণাবয়ব সংকলন, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা'। 'বন্দীর বন্দনা'র আরো দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৪০ ও ১৯৪৭ সালে। তিনটি সংস্করণের প্রকাশ পাঠক-পাঠিকামহলে গ্রন্থটির সমাদৃত হবারই নিদর্শন। প্রথম সংস্করণের দশটি মূল কবিতার সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে আরো দু'টি—'ক্ষণিকা' ও 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখান' এবং সংখ্যায় ষোলোটি সনেট। রচনাবর্ষের বিচারে দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত এই রচনাগুলির মাত্র একটি ছাড়া (সেটি 'বিবাহ'-শীর্ষক একটি সনেট, যেটির রচনার বৎসর ১৯৩৩) অন্য সবগুলিই ১৯২৬ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যবর্তী—অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের মূল কবিতা দশটির সমকালীন।

'বন্দীর বন্দনা'র প্রথম প্রকাশের তিন বৎসর আগেই, ১৯২৭ সালে, বুদ্ধদেব ঢাকা থেকে অজিত দত্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'প্রগতি' সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। কলকাতার

'কল্লোলে'র মতো ঢাকার 'প্রগতি'ও ছিলো যথার্থই সার্থকনামা ; কেননা 'কল্লোল' যেমন আত্মপ্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যকে অভিনব ধারায় কল্লোলিত ক'রে তুলেছিলো, সেই ধারায় তোলপাড় তুলে আপন অস্তিত্বকে জাহির করেছিলো, 'প্রগতি'ও তেমনই, স্বল্পজীবী হওয়া সত্ত্বেও, তার আবির্ভাবকালীন বঙ্গসাহিত্যে প্রগতির প্রবাহকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলো, সেই প্রবাহে নূতন বেগ সঞ্চারিত করতে পেরেছিলো। এটা সম্ভব হয়েছিলো, যেহেতু সেই উভয় পত্রিকাতেই ছিলো তারুণ্যের অভ্যর্থনা, নবত্বের প্রবর্তনা এবং সৃজনের উন্মাদনা। বস্তুত, উত্তরকালে, কলকাতা মহানগরীতে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হবার পর, 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা কাব্যের আধুনিকত্ব অর্জনের যে-আন্দোলনে দীর্ঘকাল ধ'রে বুদ্ধদেব নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন, সে-আন্দোলনের আরম্ভ কিন্তু সেই তিরিশের দশকেই, ঢাকার সাহিত্যপত্র 'প্রগতি'র সময় থেকেই।

'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিলো 'প্রগতি', 'কল্লোল' ও স্বল্পখ্যাত 'মহাকাল' পত্রিকায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই তিনটি পত্রিকার মধ্যে প্রথমোক্ত 'প্রগতি'র প্রতিই ছিলো বুদ্ধদেবের সর্বাধিক পক্ষপাত, কেননা এটিই ছিলো তাঁর স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা। কিন্তু এই পত্রিকাটির ভূমিকা, অন্য একটি কারণে, তাঁর তখনকার জীবনে এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। যে-পত্রিকায় তাঁর কবিতা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, একমাত্র সেই 'তোষিণী'র কথা বাদ দিলে, 'প্রগতি'ই ছিলো তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাপ্রসবের প্রথম সূতিকাগৃহ। স্বাভাবিকভাবেই এটি পরিণত হয়েছিলো তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে। তাই 'প্রগতি'র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ যখন ক্রমেই আসন্ন থেকে অত্যাসন্ন হ'য়ে উঠলো, তখন তাঁর মনোবেদনা যে কত তীব্র হ'য়ে উঠেছিলো, তারই প্রকাশ ঘটেছে বন্ধু অচিন্ত্যকুমারকে লিখিত একটি ব্যাকুল পত্রের এই ব্যথিত পংক্তিটিতে —' "প্রগতি উঠে গেলে আমার জীবনে যে vacuum আসবে তা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করবার মতো নয়—"। আর, অবশেষে, যখন সত্যি-সত্যি তাঁর জীবনের সেই অবিচ্ছেদ্য অংশের সঙ্গে তাঁর চিরবিচ্ছেদ ঘ'টে গেলো, একই বন্ধুকে লিখিত, তখনকার একটি মর্মন্তুদ পত্র-পংক্তি—'আমার ইহকালে-পরকালে, অন্তরে-বাহিরে, বাক্যে-মনে আর আপনার ব'লে কিছু রইলো না।' কত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কত গভীরভাবেই না তিনি 'প্রগতি'কে ভালোবেসেছিলেন !

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থেই বুদ্ধদেব প্রথম পায়ের নিচে শক্ত মাটি খুঁজে পেলেন, নিজের পথটি আবিষ্কার করলেন। আর, এই আত্ম-আবিষ্কারই তাঁর কাব্যসাধনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ক'রে দিলো। আবার এই আত্ম-আবিষ্কার, মৌল অর্থে, তাঁর আত্মবিরোধেরই আবিষ্কার ; কেননা তাঁর কবিমানসে হিতাহিতের মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিকতা, মঙ্গলামঙ্গলের মধ্যে একটা দোদুল্যমানতা আগাগোড়াই লক্ষ্য করা যায়—যার প্রকাশ তাঁর প্রেমভাবনার বিবর্তনে বিশেষভাবে স্পষ্ট। এবং তাঁর এই আত্ম-বিরোধের অস্তিত্ব বিষয়ে তিনি নিজেও যে আদৌ অনবহিত ছিলেন না, তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থের 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা' প্রবন্ধের অন্তর্গত এই আত্ম-প্রাসঙ্গিক

অংশটুকুতে—'একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা—এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত।' এবং সেই সঙ্গে সমানভাবেই স্মরণীয় 'বন্দীর বন্দনা'য় এই আত্ম-বিরোধের বিদ্যমানতার স্বীকৃতিসূচক তাঁর ঐ একই গ্রন্থের একই প্রবন্ধের উদ্ধৃত বাক্যটির ঠিক পরের এই বাক্যটি—"এই অভিসম্পাতের অংশটা অবশ্য আমাকেই মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, কেননা আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম, তার মূলে এই কথাটাই ছিলো।"

লক্ষ্য করা যাক, এই আত্ম-বিরোধ 'বন্দীর বন্দনা'য় কী-ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, এই দ্বন্দ্বরক্তিমতা কতটুকু কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। 'বন্দীর বন্দনা'র প্রথমেই যে-কবিতাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেটির নাম 'শাপভ্রষ্ট'। গ্রন্থটির প্রারম্ভেই এমন একটি অভিশাপের পরিণামবাহী শিরোনামাঙ্কিত কবিতার সন্নিবেশ রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এর থেকে গ্রন্থস্থ কবিতাগুলির মূল সুরের সন্ধানলাভ সম্ভব এবং সেই সঙ্গে এগুলিতে অভিব্যক্ত তৎকালীন কবিমানসেরও। 'শাপভ্রষ্ট'—এই আত্মপ্রযুক্ত অভিধায় নিজেকে সনাক্ত করার মাধ্যমে কবি স্পষ্টতই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে তিনি অভিশাপ-তাড়িত, আদেহমন তিনি অভিশাপগ্রস্ত। তারই ফলে তাঁর অধঃপতিত অবস্থা এবং সে-সম্পর্কে তাঁর নিজেরই উপলব্ধি ঃ

> আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
> আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
> সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
> হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।
> সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে ;
> দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।

এবং শেষ পর্যন্ত, যে-যৌবন প্রাণীমাত্রেরই প্রতি বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, সেই যৌবন সম্পর্কেই তাঁর মর্মান্তিক স্বীকৃতি ঃ

> —যৌবন আমার অভিশাপ।

কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, কার অভিশাপে তাঁর এই শোচণীয় দশা অথবা কোন্ কারণে তাঁর এই অভিশাপগ্রস্ততা? উত্তরে, পরোক্ষভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবেই তিনি আদি রিপুর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, আপনার অন্তরে বাসনার প্রাবল্যের কথাই অকপটে আমাদিগকে জানিয়েছেন। কামনার কারাগারে বন্দীত্বই তাঁর এই শাপগ্রস্ততার কারণ! সেই কুৎসিত কারায় যতদিন তিনি বন্দী থাকবেন, ততদিন এই অভিশাপমুক্তির পথ তাঁর কাছে অবরুদ্ধই থেকে যাবে। কেননা প্রেমই হচ্ছে কামনা-কারায় শৃঙ্খলিত মানুষের শৃঙ্খল মোচনের একমাত্র উপায়। গ্রন্থস্থ 'অমিতার প্রেম' কবিতাটিতে রয়েছে এই শাশ্বত সত্যেরই সহজ স্বীকৃতি। এই কবিতায় তিনি বলতে চেয়েছেন, কামনার কালিমায় তাঁর যে-জীবন অন্ধকার হ'য়ে রয়েছে, প্রেমের আলোকে তাকেই ক'রে তুলতে হবে আলোকিত। তাঁর বিশ্বাস, নারীর প্রেমই হচ্ছে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র যার উচ্চারণে ঘটবে তাঁর জীবনের এই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, নারীর প্রেমই হচ্ছে সেই পূতসলিলা স্রোতস্বিনী

যাতে অবগাহন ক'রে ঘটবে তাঁর কল্মষমুক্তি, তাঁর মুক্তিস্নান। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর স্বপ্নের প্রেমিকা অমিতার উদ্দেশ্যে তাঁর নিবেদন ঃ

> তুমি মোর মুক্তি স্নান ;
> একবার তুমি মোরে গাহন করিতে দাও যদি,
> উঠিয়া আসিবো তবে শুভ্র, সুস্থ, সবল, সুন্দর ;
> হবো চির-জ্যোতিষ্মান
> আকাশের নক্ষত্রের মতো।

কিন্তু 'শাপভ্রষ্ট' কবিতা 'অমিতার প্রেমে'র এই উপলব্ধির পূর্বে জাত। কামকল্মষহারী প্রেমের আবির্ভাব তখনো তাঁর জীবনে ঘটে নি। এবং ঘটে নি ব'লেই 'যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে' ব'সে থেকেও 'যৌবন'কে তাঁর মনে হয়েছে 'অভিশাপ'স্বরূপ, নিজেকে তিনি গণ্য করেছেন 'শাপভ্রষ্ট'রূপে। কিন্তু সেই তামস প্রহরেও এই বিশ্বাস থেকে তিনি বিচ্যুত হননি যে তাঁর এই কামনাকলুষিত পরিচয় আপাত ও বাহ্য ; প্রকৃত পরিচয়ে তিনি 'দস্যু' নন, 'পশু' নন, 'তুচ্ছ কীট'ও নন, তিনি 'দেব'। প্রেমের দেবতার আশীর্বাদের অভাবেই আজ তিনি স্বর্গচ্যুত, সেই দেবতার অভিশাপের প্রভাবেই আপাতত তিনি 'শাপভ্রষ্ট'। আর, তা-ই যখন সত্য, তখন, তাঁর প্রগাঢ় প্রত্যয়, অচিরেই এমন এক শুভদিন আসবে, যখন তার উজ্জ্বল আলোয় তাঁর জীবনের সমস্ত অন্ধকার অপসৃত হবে, তাঁর 'পশু' পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাঁর 'দেব' পরিচয় স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হবে। এবং তাঁর আশা, এটা সম্ভব হবে তাঁর অন্তরে কামের পরিবর্তে প্রেমের জাগরণে। এই দীপ্ত আশাবাদেই তরুণ কবির যাত্রাপথের আরম্ভ, এই আত্মপরিচিতি-জ্ঞাপনেই তাঁর কাব্যসাধনার সূত্রপাত ঃ

> শাপভ্রষ্ট দেব আমি।
> আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
> দেহের বন্ধন ছিঁড়ি' শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
> আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
> ... ...
> দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
> ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় ;—
> তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
> নিষ্কলঙ্ক রবি।
> ... .
> পঙ্কের কলঙ্ক-বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
> পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে !
> ... ...
> অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।
> শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি !

উদ্ধৃত অংশের (এবং সমগ্র কবিতাটিরও) শেষ পংক্তি দু'টি বুদ্ধদেবের কবিসত্তার বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস ও ব্যঞ্জনাবাহী। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা এ-ক্ষেত্রে প্রকৃতিজাগতিক ঘটনামাত্র নয়, তা জীবজাগতিক সর্বাত্মক আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্যের দ্যোতক। এই নিহিত অর্থেই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পরিণয়ে তিনি পৌরোহিত্যপ্রয়াসী ; অর্থাৎ, জীবনের অশুভকেও তিনি শুভর সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন, সমন্বিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অস্তিত্বের আলো-অন্ধকারের সর্বতোব্যাপ্তির এই সহজ স্বীকৃতিতেই কবির আত্মবিরোধ আভাসিত এবং এই মঙ্গলেচ্ছাতেই কবিতাটির সমাপ্তি। কাব্যধরাণায় বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তীর থেকে সর্বৈথ স্বতন্ত্র ; কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম-সাড়া-জাগানো 'সংগতি' কবিতাটির সঙ্গে বুদ্ধদেবের এই কবিতাটির পরোক্ষ ও সুদূর হ'লেও বাণী (message) গত একটি সাদৃশ্য রয়েছে। 'সংগতি' কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী যেমন সকল অসংগতির মধ্যে সংগতি স্থাপন করতে চেয়েছেন, বুদ্ধদেবও তেমনই তাঁর 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় জীবনের বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। কবিতা দু'টির সাদৃশ্য মাত্র এই পর্যন্তই।

'বন্দীর বন্দনা' গ্রন্থের নাম-কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'ও মূলত 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় অভিব্যক্ত কবির মানসিকতারই অভিব্যঞ্জনা, চিন্তা-ভাবনারই সম্প্রসারণ। এই কবিতাতেও কেন্দ্রীয় সমস্যা সেই একই—কামের তাড়নার সঙ্গে প্রেমের অনুভূতির বিরোধ এবং তজ্জাত কবিহৃদয়ের অত্যয়। এখানেও তিনি বন্দী এবং সেই কামনার কারাগারেই। কেননা তাঁর 'নির্মম নির্মাতা' তাঁকে 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' ক'রে রচনা করেছেন। সেই বন্ধনের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তি :

> সে-বন্ধন চলে মোর সাথে-সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
> সুন্দরের মন্দিরের পানে।
> সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
> আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
> সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
> কলুষিত করিয়াছে নিশ্বাসের বাতাস আমার—
> লোহিত শোণিত মম নীল হ'য়ে গেছে সে-বন্ধনে।

কিন্তু সেই বন্ধনের অমোঘতা সত্ত্বেও কবি তাকে চরম ব'লে স্বীকার করেন নি। কেননা তাঁর উপলব্ধি :

> না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
> গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
> শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।

এবং এই আত্মোপলব্ধিহেতুই, যে-বিধাতা তাঁকে প্রবৃত্তি-কারায় বন্দী করেছে, সে-বিধাতার উদ্দেশেই তাঁর আর্ত উক্তি :

> বিধাতা, জানো না তুমি কী-অপার পিপাসা আমার
> অমৃতের তরে।

কিন্তু, যে 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী', সে, প্রশ্ন জাগে, বিধাতা-বন্দনার অধিকার অর্জন করে কোন্ পুণ্যে? প্রশ্নটির উত্তর ঃ এই পুণ্যে যে 'কামনার কুৎসিত দংশন', 'জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা' এবং 'বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা'কে অতিক্রম ক'রে সে-ও 'অমৃতাভিলাষী'। আর, এই অমৃতাভিলাষের পুণ্যেই নিজের 'নির্মম নির্মতা'র প্রতি তাঁর নম্র নিবেদন ঃ

> তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম,
> তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।
> তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
> ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
> সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান
> অনন্তের চির-বার্তা নিয়া ;
> ... ...
> রক্তমাঝে মদ্যফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
> শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
> লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনালেহন।
> তবু আমি অমৃতাভিলাষী !—

বিধাতাপ্রদত্ত 'অন্ধকার অমা-রাত্রি সম' কামনার সঙ্গে নিজের অন্তরের 'স্বপ্নসুধা'র সংমিশ্রণে যে-প্রেম কবি গ'ড়ে তুলেছেন, সে-প্রেমের অমৃতস্পর্শে সঞ্জীবিত হ'য়েই তিনি নিখিল স্রষ্টার উদ্দেশে গেয়ে উঠেছেন বন্দনাগান। 'শাপভ্রষ্টে' যে-কবি 'শাপভ্রষ্ট' হ'য়েও 'দেবশিশু,' 'বন্দীর বন্দনা'য় তিনিই কামের কারায় বন্দীত্ব সত্ত্বেও প্রেমের অমৃত-লোকে উত্তরণাভিলাষী। এই অর্থেই দ্বিতীয় কবিতাটি প্রথম কবিতাটির সম্প্রসারিত রূপ।

'বন্দীর বন্দনা'র অন্য কবিতাগুলিতে এ-যাবৎ আলোচিত কবিতা চারটির ('মানুষ' সনেট-পরম্পরা, 'শাপভ্রষ্ট', 'বন্দীর বন্দনা' এবং 'অমিতার প্রেম') spirit বা ভাবচেতনার অনুসরণ প্রায় দুর্লক্ষ্য—কবিতাগুলি এতই আলাদা ধরনের। তবু এই কবিতাগুলি, যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, কেন যে পূর্বোক্ত কবিতা ক'টির সঙ্গে একই গ্রন্থের অবয়বে সন্নিবদ্ধ হ'লো, সেটা আমার কাছে একটা রহস্য। তবে যদি রচনার সমকালিনতাকেই রচনা গ্রন্থভুক্ত করার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহ'লে অবশ্য বলার কিছু নেই। কিন্তু কেবল কালগত সামীপ্যকেই বিভিন্ন রচনার একই গ্রন্থভুক্তির মানদণ্ডরূপে গণ্য করলে চলবে কেন, সেইসঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্যকেও অবশ্যই মান্য করতে হবে। কেননা, আমার ধারণা, একই গ্রন্থের পরিসরে কেন্দ্রীয় সাদৃশ্যশূন্য রচনার সহ-সন্নিবেশ যে-কোনো গ্রন্থের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধেজনক। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও কথা আছে, কথা থাকে—যেহেতু গ্রন্থপ্রণয়নে লেখকের রচনাই মুখ্য, প্রকাশকের পরিকল্পনা এবং পাঠকের সমালোচনা দুই-ই সমানভাবে গৌণ। বস্তুত,

এ-প্রসঙ্গে 'কালের পুতুল' প্রবন্ধের দ্বিতীয় স্তবকের এক স্থানে স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলেছেন, 'একটি ভালো রচনা সমস্ত সমালোচনার সারাৎসার।' কিন্তু সে যা-ই হোক, এই অবশিষ্ট কবিতাগুলির অন্তত তিনটি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আমার কিছু জানাবার আছে। সেই কবিতা তিনটি 'প্রেমিক', 'বিবাহ' এবং 'মোরা তার গান রচি'। এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি ১৯২৯ সালে রচিত এবং দ্বিতীয়টির রচনাকাল ১৯৩০। প্রকাশিত ভাববৈশিষ্ট্যে 'প্রেমিক' কবিতাটির স্থান হওয়া উচিত ছিলো কবির 'পৃথিবীর পথে'রও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কঙ্কাবতী'তে ; কেননা এটি আসলে তাঁর 'কঙ্কাবতী'-পর্যায়েরই মানসিকতাপ্রসূত কাব্যফসল। 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা 'কঙ্কাবতী'রও রচনা সাল ১৯২৯। কিন্তু রচনাসালের অভিন্নতা ছাড়াও এই কবিতা দুটির মধ্যে অন্যবিধ সাদৃশ্যও যথেষ্ট প্রকট। 'কঙ্কাবতী' কবিতার মতো 'প্রেমিক' কবিতাতেও কবি কামের অন্ধকার গলি অতিক্রম ক'রে প্রেমের জ্যোতির্ময় রাজপথে উপনীত। সেইজন্য ঃ

> নতুন ননীর মতো তব তনুখানি
> স্পর্শিতে অগাধ সাধ, সাহস না পাই।

কিংবা

> সেই চুল, সেই চোখ, তাহারা আমার কাছে অরণ্য গভীর,
> সেথা আমি পথ খুঁজে নাহি পাই,

ইত্যাদি পংক্তিতে কামুকের হাহাকারের নয়, প্রেমিকের স্বপ্নভারাতুরতারই প্রকাশ ঘটেছে। 'প্রেমিক' কবিতায় 'শাপভ্রষ্ট' অথবা 'বন্দীর বন্দনা' কবিতার মতো বাসনা-বিক্ষত চিত্তে তাঁর কাঙ্ক্ষিতাকে কামনা করেন নি, এই কবিতায় 'প্রেমিক'রূপী কবি ঃ

> রাতের ধূসর মাঠে নিরিবিলি বটের পাতারা
> টিপটাপ শিশিরের ঝরাটুকু
> যেমন নীরবে ভালোবাসে।

তেমনই নীরবে তাঁর প্রেমিকাকে ভালোবেসেছেন। জীবনানন্দগন্ধী এই উপমাটির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কবির প্রেমপিপাসার প্রকাশ কত শান্ত ও সংযত! অবশ্য 'কঙ্কাবতী' কবিতার সংগীতমুখরিত গতিময়তা 'প্রেমিকা' কবিতায় অনুপস্থিত। 'বিবাহ' কবিতাটিতে মাত্র চতুর্দশটি পংক্তির পরিমিত পরিসরে বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা-নিয়ন্ত্রিত ব্যাপারটির তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার আপাত দিক্ এবং দিব্য যুগ্মতার চিরন্তন দিকের পার্থক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে সুন্দরভাবে আকর্ষণ করা হয়েছে। আর, 'মোরা তার গান রচি' উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই কবিতাটিতেই বুদ্ধদেবের কবিমানসের একটি নূতন দিক্ সর্বপ্রথম উন্মোচিত হয়েছে। সেটি তাঁর জীবন-বাস্তবতাসচেতনতার দিক্। কবিতাটির ঃ

> অলস আবেশে মোরা জীবনেরে দেখিনি মধুরে ;—
> ললাটে ঝরিছে স্বেদ—তারি স্বাদ মোদের অধরে,

হৃদয়ে দুঃখের যজ্ঞ—তারি জ্বালা প্রত্যেক অক্ষরে,
মোদের আকাশ রুক্ষ, শ্যাম স্বপ্নে নহে সে মেদুর।

পংক্তি-চতুষ্কে বাস্তব জীবনবোধের যে-পরিচয় আভাসিত, পরবর্তীকালীন 'কবিজীবনী' কবিতার ঃ

হাঁটুজলে মাঠে যারা কাটায় আষাঢ়, যারা নামে
খনির তিমিরে, করাল রৌদ্রের দিনে, রাজপথে
হাঁটু ভেঙে খাটে যারা,—মৃত্তিকার, খনির, যন্ত্রের
ঐশ্বর্য তাদেরই। তাদেরই তা হোক। আনন্দের উৎস
হোক সকলেরই স্বীয় শ্রম—কৃষকের, যন্ত্রীর, কবির।

এই ভবিষ্যৎপ্রত্যয়ী পংক্তি-পঞ্চকে সে-পরিচয়ই কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে প্রকাশিত। অবশ্য এই পরিচয় তাঁর সমগ্র কবিজীবনেই নিতান্ত সাময়িক এবং অত্যন্ত পরোক্ষ, যে-কারণে 'বাস্তববিমুখ', 'সমাজঅনীহ', 'বৃহত্তর জীবনবাস্তবতা নিরুৎসুক'—ইত্যাদি বিশেষণ তাঁর নামের পূর্বে, সাহিত্যে বামপন্থার একনিষ্ঠ পূজারীগণ কর্তৃক, নির্বিচারে এবং বারেবারে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

১৯২৬ থেকে '২৯ যেমন 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলির রচনাকাল, তেমনই ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পৃথিবীর পথে'র কবিতাগুলিও রচিত হয়েছিলো ১৯২৬ থেকে '২৮-এর মধ্যে। অর্থাৎ, প্রকাশসালের পার্থক্য সত্ত্বেও 'বন্দীর বন্দনা' এবং 'পৃথিবীর পথে'—এই উভয় গ্রন্থের কবিতাগুলিই প্রায় সমকালজাত। কিন্তু জন্মকালগত অভিন্নতাকে অতিক্রম ক'রে প্রকাশবৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতাই এই দু'টি গ্রন্থের কবিতাগুলিতে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। যে-অর্থে 'বন্দীর বন্দনা' কামনার কাব্য, সে-অর্থে 'পৃথিবীর পথে' কখনোই তা নয়। কামনার শিহরণ এটিরও কবিতাবিশেষে আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কোনোটিতেই এবং কোনোক্রমেই 'বন্দীর বন্দনা'র প্রধান দুই কবিতা 'শাপভ্রষ্ট' ও 'বন্দীর বন্দনা'র মতো উত্তপ্ত ও অশালীন নয়; তা বহুলাংশেই শীতল ও শীলিত।

একই কালসীমার রচনা হ'লেও কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'পৃথিবীর পথে'র স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এটির প্রণেতা নিজেও যে কিছুটা সচেতন ছিলেন এবং তাঁর কবিতার পাঠক-পাঠিকাদের মনে এটির স্মৃতিকেও দীর্ঘস্থায়ী করার একটা ইচ্ছা তাঁর মধ্যে যে ছিলো, তার প্রমাণ এই যে তাঁর প্রতিনিধিমূলক কবিতার সঞ্চয়ন 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রথম মুদ্রণে এই গ্রন্থের তিনটি কবিতাকে তিনি স্থান দিয়ে গিয়েছেন—'অসূর্যম্পশ্যা', 'সুন্দরিকা' এবং 'আর-কিছু নাহি সাধ'। কবিতা তিনটির মধ্যে, উৎকর্ষের বিচারে, শেষেরটিই অবশ্য প্রথম; কেননা এটিতেই 'পৃথিবীর পথে'র কবির প্রকাশরীতির পার্থক্য সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কবিতাটির অন্তিমাংশের ঃ

তোমারে যে পেয়েছিনু সর্বদেহে, মর্মে-মনে-প্রাণে,
পেয়েছিনু বিরহের স্পন্দমান অন্ধকারে, মিলনের নিস্পন্দ বাসরে—

সে-কথা কহিতে চাই আকাশেরে, ধরণীরে, তৃণপত্রে, সমুদ্রের কানে ;—
পারি না বহিতে এই পরিপূর্ণতার ভার একা-একা আপন অন্তরে,
সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ ক'রে যাই লক্ষ গানে গানে !

পংক্তি ক'টিতে অভিব্যঞ্জিত মিলনোত্তর উদার প্রসন্নতা 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় অভিব্যক্ত মিলনপূর্ব সংকীর্ণ উন্মত্ততা থেকে কত বেশি দূরের, কত ভিন্ন সুরের ! 'আর-কিছু নাহি সাধ' কবিতাটির মতো 'অসূর্যম্পশ্যা' কবিতাটিও প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধে রচিত। কিন্তু সর্বশেষ পংক্তিদ্বয়ে আপন প্রেমিকার প্রতি উদ্দিষ্ট কবির ঃ

হৃদয়ের সব সুধা সঞ্চিত করিছো যেথা গোপনের আবরণ টানি',
মনের কামনা মোর একটি কুসুম হ'য়ে সেখানে করুক নমস্কার।

এই শুভ ইচ্ছার উচ্চারণ ব্যতীত পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে আস্বাদ্য অন্য কোনো উপাদান কবিতাটিতে তেমন বিশেষ নেই। এবং এ-দু'য়ের মধ্যবর্তী 'সুদূরিকা' কবিতাটি, সকল অর্থেই, আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণের পক্ষে সুদূরের বস্তু ; অর্থাৎ, কবিতাটি সর্বতোভাবেই একটি অনুল্লেখযোগ্য রচনা —যদিও কবির বিবেচনায়, এটিও তাঁর অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ' কবিতা। জানিনা, কোন্ মানদণ্ডে তিনি এটির শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করেছিলেন।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে রচিত কবিতার সংকলন 'কঙ্কাবতী' বুদ্ধদেবের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩৭ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ; পরে, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, কিছু নূতন কবিতা যোগ ক'রে, এটির একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'কঙ্কাবতী'র কয়েকটি কবিতা, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে, 'একটি কথা' নামে পুস্তিকার আকারেও ১৯৩২ সালে প্রকাশ করা হয়েছিলো—যদিও অধুনা আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তে 'একটি কথা'র স্মৃতি একেবারেই অস্পষ্ট।

'কঙ্কাবতী' চিরমধুর ও চিরনূতন প্রেমের কাব্য। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে প্রেমের কবি হিসেবে বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট যে-স্থান, তা অধিকারের মূলে 'কঙ্কাবতী'র অবদান অনেকখানি। বস্তুত, তাঁর কবিতায় যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমানতায় বুদ্ধদেব প্রেমের কবি হিসেবে স্বীকৃত, 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুচ্ছে সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই বর্তমান ; কিন্তু অন্য সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম ক'রে বুদ্ধদেবের কবিসত্তার বিশেষ যে-দিক্‌টি এই কাব্যগ্রন্থে প্রধান হ'য়ে উঠেছে, সেটি তাঁর সাঙ্গীতিক দিক্, তাঁর সঙ্গীত-প্রিয়তার পরিচয়। প্রেমকে আশ্রয় ক'রে, এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে, সঙ্গীতের স্রোতস্বিনীতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রেমের কবিতায়, কবিস্বভাবের মৌল বৈশিষ্ট্যে, এখানেই তিনি জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে— তাঁর সমসাময়িক এই চার প্রধান কবির থেকে স্বতন্ত্র এবং তাঁর সেই স্বাতন্ত্র্য, অন্তত 'কঙ্কাবতী'তে, যথেষ্ট স্পষ্ট। প্রেমের প্রকাশে জীবনানন্দ চিত্রনিপুণ, অমিয় চক্রবর্তী ভাবনা-নির্ভর, আর সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে চাপল্য-চঞ্চল। কিন্তু বুদ্ধদেব সঙ্গীত-সমর্পিত। 'কঙ্কাবতী'র 'বিরহ' কবিতায় সামান্য পতঙ্গ ভ্রমরকে উদ্দেশ ক'রে ঃ

ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, কত করবি গুনগুন !
ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে দিলি সংগীতের আগুন।

উচ্চারণের মধ্য দিয়ে, হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই, তিনি কাব্যগ্রন্থ হিসেবে সমগ্র 'কঙ্কাবতী'র সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। কেননা গানের এই গুনগুনানিতেই এর কবিতাগুলি মুখরিত, সঙ্গীতের এই আগুনের আভাতেই এর কবিতাগুলি উদ্ভাসিত। এই সঙ্গীতধর্মিতার পাশাপাশি দ্বিতীয় যে-লক্ষণটি 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুলিকে সুচিহ্নিত করেছে, তা হচ্ছে আবেগের উৎসার। অবশ্য এই দ্বিতীয় লক্ষণটির প্রকাশ 'কঙ্কাবতী'তেই প্রথম ঘটে নি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা'তেও আমরা এর বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী'র আবেগের প্রকাশের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এখানটায় যে 'বন্দীর বন্দনা'য় আবেগের উৎসারণ ছিলো আত্মঘোষণাধর্মী, কিন্তু 'কঙ্কাবতী'তে তা আত্মগুঞ্জরণমূলক। ফলে, 'কঙ্কাবতী'তে আবেগের বলিষ্ঠতা যথেষ্ট মাত্রায় থেকে থাকলেও 'বন্দীর বন্দনা'র আবেগের উদাত্ততা তাতে অনুপস্থিত। কিন্তু সাত বৎসরের ব্যবধানে প্রকাশিত একই কবির দুই কাব্যগ্রন্থে আবেগের প্রকাশগত এই পার্থক্য কেন ? সঙ্গত কারণেই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটি শুধু উত্থাপন করলেই চলবে না, এর উত্তরটিও আমাদিগকেই সন্ধান করতে হবে। এবং সেই উত্তরসন্ধানে ব্রতী হ'লে আমরা দেখবো যে তাঁর মূল নিহিত রয়েছে এই দুই গ্রন্থের প্রকাশমধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত কবির মনোজাগতিক পরিবর্তনের গভীরে। কল্লোলীয় বোহিমিয়ানিজমের প্রভাব-ছায়ায় রচিত 'বন্দীর বন্দনা'র ব্যক্তিগত বিদ্রোহের উৎস ছিলো কবির নিজেরই সঙ্গে নিজের সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং তৎপ্রসূত গভীর এক আত্মবিরোধ। এই আত্মবিরোধের একদিকে ছিলো কবির দীন সত্তা, অন্যদিকে তাঁর মহৎ সত্তা ; একদিকে কামনার দংশন এবং আরেক দিকে প্রেমের অন্বেষণ। অর্থাৎ, এ-আত্মবিরোধ আসলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ছোটো আমি' ও 'বড়ো আমি'র অনিবার্য সংঘাতজনিত। 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলিতে (ব্যতিক্রম 'প্রেমিক', 'বিবাহ' এবং 'মোরা তার গান রচি') এই আত্মবিরোধের অবসান ঘটে নি—এমনকি অবসানের ইঙ্গিতমাত্র সূচীত হয় নি ; শুধু এই আত্মবিরোধের বেদনাবিদ্ধতা থেকে মুমুক্ষার অভিলাষটুকুই ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থে কবির আত্মবিরোধের অবসানের আভাস সূচীত হ'লেও সেই বিরোধের বিধুরতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পান নি। 'কঙ্কাবতী'তে পৌঁছে ঘটলো সেই বিরোধের অভিলষিত অবসান, আত্মকেন্দ্রিক জীবনের কামনা-কলুষিত অন্ধকার থেকে প্রেমের অমৃতলোকে ঘটলো তাঁর উত্তরণ। অর্থাৎ, নিজের 'যথার্থ নিজেকে' খুঁজে পেলেন তিনি। সেই কারণেই 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুচ্ছ আবেগের উচ্ছলতায় এত উদ্বেল এবং আবেগের উচ্ছলতার প্রকাশবৈশিষ্ট্যে 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাসমূহের আবেগপ্রকাশরীতি থেকে এত পৃথক।

আবেগের এই প্রকাশপার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'কঙ্কাবতী'তে কবির কাব্য-

ভাষাও বিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনের সাক্ষ্য রয়েছে এই গ্রন্থের কবিতা-গুচ্ছের ছন্দ-প্রকরণে। 'বন্দীর বন্দনা'য় কবিতাগুলির অবলম্বন ছিলো তানপ্রধান রীতির পয়ারধর্মী পৌরুষব্যঞ্জক ছন্দ ; কিন্তু 'কঙ্কাবতী'তে কবি তাঁর কবিতার বাহন করলেন ধ্বনিপ্রধান রীতির সঙ্গীতধর্মী পেলবতাব্যঞ্জক ছন্দ। এই সঙ্গীতমুখর কোমল ছন্দে বাহিত হ'য়েই আত্মদ্বন্দ্বের দংশনমুক্ত কবি উপনীত হলেন 'কঙ্কাবতী'র প্রেমের ভুবনে এবং তাঁর কন্ঠে উচ্ছ্বসিত আবেগে উদ্গীত হ'লো গান, প্রেমের গান, তাঁর প্রাণের কঙ্কাকে নিয়ে অন্তহীন শঙ্কা ও নিঃশঙ্কার গান :

তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্মের মাঝে মর্মরি বাজে, 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'

... ...

বাজে দিন-রাত, বাজে সারা-রাত, বাজে সারা-দিন আমার প্রাণে
ঢেউয়ের মতন ইতস্তত ;
ঢেউয়ের মতন গান গেয়ে যায় : 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী।'
কঙ্কাবতী গো !

... ...

গূঢ় গম্ভীর মন্দির-মাঝে ঘন্টার মতো সুগম্ভীর
পলকে-পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে—'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'

... ...

ডাহিনে ও বামে, উপরে ও নীচে, এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি :
প্রতিধ্বনি !
'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী গো—কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী—'
এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি।

('কঙ্কাবতী')

'সেরিনাড' কবিতাতেও দেখি সেই একই কঙ্কাকীর্তন, সম্পূর্ণ সম্মোহিতের মতো পুনঃপুনঃ কঙ্কাবতীর নামোচ্চারণ, তার বন্দনাগীতি বা invocation রচনা :

ঘুমাও, ঘুমাও ; আঁখি দু'টি তব এসেছে ঢুলে,
কঙ্কাবতী !
ঘুমাও, ঘুমাও ! রেখো না জানালা, রেখো না খুলে,
কঙ্কাবতী !
প্রদীপ নেবাও, নেবাও নয়ন—তন্দ্রা নামে,
তন্দ্রার ঢেউ সুমুখে-পিছনে, ডাহিনে—বামে,
কঙ্কা, শোনো !

হাওয়ার আওয়াজ গান গেয়ে যায় তোমার নামে ;
হাওয়ার আঙুলে চুলবুলে করে তোমার চুলে ;
কঙ্কা গো !

অর্থাৎ, কবি-প্রেমিকা কঙ্কাবতীর প্রেমে প্রেমিক কবি যে কত গভীরভাবে নিমজ্জিত, সেই উপলব্ধিটুকুই তিনি আমাদের চিত্তে সংক্রামিত ক'রে দিতে চান, যেহেতু বহু নামের তিলোত্তমা যার নাম এবং বহু প্রেমের সমাহৃতি যার প্রেম, সেই কঙ্কাবতীই 'অন্ধকার অমা-রাত্রি সম' কামনার কারাগারে বন্দী 'শাপভ্রষ্ট' কবিকে প্রেমের আলোয় উদ্ভাসিত উন্মুক্ত প্রান্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সেইজন্য প্রেমিকার প্রিয় নামটি কবির বিহ্বল প্রাণে পাগল-ক'রে-দেবার-মতো উদয়াস্ত ধ্বনিত হয়েছে, উৎকর্ণ কানে জপমন্ত্র উচ্চারণের মতো অহর্নিশ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে—" 'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !' "।

'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু যে-ক'টি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, তার সব ক'টিই আসলে একটিই অখণ্ড প্রেমের কবিতা। ভিন্ন-ভিন্ন কবিতায় যতই তিনি ভিন্ন-ভিন্ন নামের নারীর অবতারণা ক'রে থাকুন না-কেন, তাঁর ধ্যানের এক এবং অদ্বিতীয়া নারীর মিতাক্ষরা নাম 'কঙ্কা'। তাঁর এই একই নারীর রূপকে তিনি নানা নারীর রূপে অবলোকন করেছেন, নানা নারীর নামে এই একই নারীর নাম তিনি প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনেছেন। একই নারীর নামরূপকে বহু নারীর মধ্যে ধ্যান করেছেন ব'লেই কবির চোখে তাঁর ধ্যানের নারী 'কঙ্কাবতী' তিলোত্তমা। বহু নারীর অন্তরবাসিনী এই এক নারীকে লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য ক'রেই 'কঙ্কাবতী'র কয়েকটি কবিতায় কবির প্রেমবিজড়িত গীতিগুঞ্জরণ—যা, নাম-কবিতাটি এবং 'সেরিনাড' ছাড়াও 'গান' 'আমন্ত্রণ—রমাকে', 'কোনো মেয়ের প্রতি', 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি', 'বন্যা' ইত্যাদি কবিতায় যথেষ্ট স্পষ্ট। 'কবিতা' এবং 'আরশি' কবিতা দু'টি যেমন রূপকথার আমেজ-লাগা (অবশ্য গ্রন্থটির 'কঙ্কাবতী' শিরোনামটিই বিশুদ্ধ রূপকথাধর্মী), 'বিবাহ' কবিতাটি তেমনই সম্ভোগতৃষ্ণার তীব্রতাব্যঞ্জক। এবং এই সঙ্গে আরো অন্তত দু'টি কবিতার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, যে-দু'টিতে সম্ভোগের শুধু বলিষ্ঠতাই ব্যঞ্জিত হয় নি, কবির সম্ভোগলীলার নিজস্ব রীতিটিও প্রকাশিত হয়েছে। সেই কবিতা দু'টির নাম 'চুল' এবং 'শেষের রাত্রি'। রূপকথার মায়াপুরীতে পাশাবতী কন্যার মতো কেশবতী কন্যার অস্তিত্বের কথা আমরা যেমন শুনে থাকি, ভারতীয় রতিশাস্ত্রেও নায়িকার কেশরাশির তেমনই একটি স্বীকৃত স্থান আছে। ভারতের প্রাচীন কাব্যসমূহের অধিকাংশেই এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সম্ভোগ-কল্পনাতেও এই বিশেষ অনুভাবের সঞ্চার লক্ষ্যগোচর হয়। তবে 'কঙ্কাবতী'-পর্বের কবিতাবলীতে ধ্যানের নারীকে নিয়ে কবির কাল্পনিক যে-হ্লাদিনী-লীলা, তা প্রাচীন কাব্যানুসৃত সম্ভোগরীতির অনুকরণ বা অনুসরণ মাত্র নয়, তাতে তাঁর কিছুটা নিজস্বতাও আছে। নায়িকার কেশকলাপকে নিয়ে—

শুকনো চুলের স্বাদ মোর উষ্ণ, বিশুষ্ক অধরে ;
দন্তাগ্রে কেশের গুচ্ছ, কাটি তারে তৃণের মতন,
উরজ পুষ্পের মতো চুল ছানি দুই হাত দিয়ে ;
—খসখসে চুলগুলি, তার স্পর্শে নাসিকা স্ফুরিছে,
চুলগুলি পান করে মোর উষ্ণ, সতৃষ্ণ নিশ্বাস ;
('চুল')

অথবা

তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
আদিম রাতের আঁধার বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জ ফুঁড়ে :—
সময় ছাড়ায়ে, মরণ মাড়ায়ে—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
('শেষের রাত্রি')

এই কবিকল্পনায় কুন্তল কেবল ইন্দ্রিয়ঘনতার (sensuousness) উদ্বোধক কিংবা কাম-কেলির উদ্দীপক মাত্র নয়, তার মূল্য আরো অনেক বেশি। প্রেমিকার 'ঘুমের মতন ঠাণ্ডা' নিবিড় কেশরাশি কবির কাছে মধ্যদিনের প্রখর দিবালোকে স্বপ্নিল আশ্রয়, নায়িকার 'একমুঠো জমানো আঁধারে'র মতো রহস্যময় কমনীয় কেশকলাপ কবির পক্ষে সময়ের সীমানা-ছাড়ানো এবং মরণের শাসন-এড়ানো আশ্চর্য কল্পলোকের দ্বারোন্মোচক। 'কঙ্কাবতী'র আলোচনা শেষ করার আগে এর অন্তত আরো একটি কবিতার কথা পাঠকদের স্মরণ করাতে চাই ; সেটি 'মধ্যরাত্রে'—যেটির সমকক্ষ ভাবপ্রগাঢ় কবিতা সমগ্র 'কঙ্কাবতী'তেও সম্ভবত দ্বিতীয়টি নেই। অথচ 'কঙ্কাবতী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই রচনাটিকে নিয়ে কোথাও কোনো যোগ্য আলোচনা আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি।

'নতুন পাতা' বুদ্ধদেব বসুর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে রচিত কবিতার এই সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। প্রেমের কবিতা, প্রকৃতির কবিতা এবং বিদ্রূপের কবিতা—এই তিনটি অংশে কবিতাগুলি বিন্যস্ত। 'নতুন পাতা'য় বুদ্ধদেবের কবিমানসের একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তনহেতুই তাঁর কাব্যবক্তব্যের বাহনও, অন্তত সাময়িকভাবে হ'লেও, রাতারাতি পাল্টে গিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তাঁর কাব্যিক ভাবনা-কল্পনার প্রকাশমাধ্যম ছিলো মুখ্যত পদ্যকবিতা। অবশ্য গদ্যকবিতা যে তিনি এ-পর্যন্ত একেবারেই লেখেন নি, তা নয় ; কিন্তু এতকাল প্রধানত পদ্যকবিতার চৌহদ্দীতেই তাঁর কাব্যপ্রয়াস মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিলো। এই সর্বপ্রথম তিনি একটি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করলেন, যার প্রতিটি রচনাই এক-একটি গদ্যকবিতা। গদ্যকবিতা রচনার প্রয়াস 'নতুন পাতা'য় বুদ্ধদেবের পক্ষে প্রথম হ'তে পারে, কিন্তু সমগ্র বাংলা কাব্যের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই প্রয়াস আদৌ অভিনব কিছু নয়। কেননা ইতিমধ্যেই 'পুনশ্চ'-'শেষ সপ্তক'-'পত্রপুট'-'শ্যামলী',—এই গ্রন্থ-চতুষ্কে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা-সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

করেছেন এবং আমাদের কাব্যের এই বিশেষ ধারাটির প্রতি এতদ্দেশীয় কবিকুল ধীরে-ধীরে আকৃষ্টও হয়েছেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'নতুন পাতা'য় বুদ্ধদেবের কাব্যপ্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। কেননা এই গ্রন্থের কোনো-কোনো রচনায় বাংলা গদ্যকবিতার বিচিত্র সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি কিছুটা পরীক্ষামনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এই পরীক্ষামনস্কতার প্রকাশ ঘটেছে দু'টি দিকে—প্রথমত বিশুদ্ধ গদ্যপংক্তিতেও সান্তর্মিল (internal rhyme)-যোজনায় (এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় 'জন্ম' কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তি-চতুষ্ক) এবং দ্বিতীয়ত পদ্যের চেহারায় বিন্যস্ত না-ক'রে গদ্যকবিতাকে গদ্যের ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ করায়। শেষোক্ত পরীক্ষাটির মধ্য দিয়ে তিনি পদ্যের ও গদ্যের স্বীকৃত ও দৃষ্টিবেদ্য আকৃতিগত বিভেদকে বিলুপ্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসের সার্থকতা বিচার-প্রসঙ্গে এ-কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বাণীশিল্প হিসেবে কবিতাকে শুধু শ্রুতি-শুভগ বাক্যসমষ্টি হ'লেই চলবে না, তাকে একই সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টির পক্ষে অভিরামও হ'য়ে উঠতে হবে। গদ্য-পদ্যের আকৃতিগত পার্থক্যভঞ্জন কাব্যশিল্পের এই শর্তপূরণে কতখানি সক্ষম, তা আজো নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নি। অধিকন্তু এই পরীক্ষায় তিনি পথিকৃৎ নন, এ-ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর পদ-প্রদর্শক। কেননা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লিপিকা' ও 'পুষ্পাঞ্জলী'তে—বিশেষত 'লিপিকা'য়—এ-পরীক্ষা ইতি-পূর্বেই ক'রে গিয়েছেন। কাব্যপ্রকরণগত এ-সমস্ত দিকের সাফল্য বৈফল্যের কথা বাদ দিলেও এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে গদ্য কবিতার পথের নূতন পথিক বুদ্ধদেব তাঁর 'নতুন পাতা'য় এমন কয়েকটি কবিতা ও এমন কতকগুলি পংক্তি আমাদের উপহার দিয়েছেন, যেগুলি সত্যিই স্মৃতিতে ধ'রে রাখবার মতো। সেই কবিতা ক'টি 'চাঁদ', 'সন্ধ্যায়', 'সমুদ্র-স্নান', 'এই শীতে', 'নতুন দিন', 'বিচ্ছেদের দিন', 'পাণ্ডুলিপি' এবং অবশ্যই 'চিল্কায় সকাল' আর, সেই পংক্তি সমূহ—

১.

আজ পৃথিবী আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে
তার সমস্ত মধুরতা নিয়ে।

২

রুপালি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর

৩.

সমুদ্র ধু-ধু করছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
যেন চিরকাল এক বিরাট মুহূর্তে প্রসারিত।

৪.

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ;

৫.

লাল-আলো-জ্বালা টালিগঞ্জের ট্রাম
অন্ধকার পার হ'য়ে আসছে

৬.

হঠাৎ একটা কোকিল
রাত্রির বুকের ভিতর থেকে ডেকে উঠলো।

৭.

সময়কে আলোর করাত দিয়ে চিরে-চিরে যায়
এক-একটি মণিময় মুহূর্ত।

৮.

দৃষ্টি-অন্ধ-করা আলো, আর
সৃষ্টি-লুপ্ত-করা অন্ধকার, জরাযৌবনহীন রাত্রিদিন-কে ছুঁয়ে এসেছে।

৯.

তোমাকে ডাকছি সময়ের সরু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে,
তার দু'দিক মৃত্যুর দেয়াল দিয়ে ঠাসা।

১০.

যদি, আমিও ম'রে থাকতে পারতুম—
যদি পারতুম একেবারে শূন্য হ'য়ে যেতে,
ডুবে যেতে স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে—

'নতুন পাতা'র সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'চিল্কায় সকাল'-এর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এ-ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ব'লে বিবেচিত হবে না। কবিতাটির মুখ্য দু'টি দিক্—প্রকৃতি ও প্রেম। অথবা কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, এই দু'টি দিক্ কবিতাটিতে একাকার হ'য়ে গিয়েছে, আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছে। রোম্যান্টিক কবিচিত্তে প্রকৃতি ও প্রেম যে অনেক সময়ই একীভূত হয়ে বিরাজ ক'রে এবং প্রকৃতি ও প্রেমের হরগৌরী-মিলিত রূপ যে রোম্যান্টিকতার প্রবর্ধক, এই কবিতাটিতে তার নিদর্শন রয়েছে। কবিতাটির আরম্ভ প্রকৃতির রূপের উন্মোচনে, কিন্তু সমাপ্তি প্রেমের নিবিড় অনুভূতিতে।

কবিতাটি একটি বিশেষ দিনের একটি বিশেষ সময়ের—সকালবেলার। কবিতাটিতে যে-স্থানের উল্লেখ আছে, তা-ও নির্দিষ্ট—চিল্কা হ্রদের তীর। এই উভয়েরই, অর্থাৎ সময়ের ও স্থানের বর্ণিমা বা colour-এর উপস্থিতি কবিতাটিতে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এই সময়বর্ণিমা (time colour) এবং স্থানবর্ণিমা (local colour) কবিতাটিতে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত জীবনের ব্যঞ্জনাবাহী হ'য়ে উঠেছে। এবং এই ব্যঞ্জনাধর্মিতার কারণেই চল্তি মুহূর্তের এই কবিতাটি (স্বয়ং কবির মতেই) মৌহূর্তিক

(momentary) সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। কবিতাটির এই বিষয়াত্মক প্রসারণ (thematic expansion)-এর সঙ্গে-সঙ্গে কবিচিত্তেরও যেন পুনর্জাগরণ ঘটেছে। কবিচিত্তের এই জাগরণ প্রক্রিয়া স্বরূপত romantic epiphany-রই সমগোত্রীয়।

পটভূমিকার বিচারে কবিতাটি নৈসর্গিক। চিল্কাহ্রদতীরস্থ রৌদ্র-ঝল্‌মল্‌ এক উজ্জ্বল সকালের আনন্দঘন অনুভূতিকে কেন্দ্র ক'রেই কবিতাটি রচিত। সেই সহজ আনন্দের সুনিবিড় অনুভূতিতে কবিচিত্ত আবিষ্ট। চারপাশের 'নির্মল', 'নীল', 'অসহ্য সুন্দর' আকাশকে 'গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তানে'র মতো মনে হয়েছে কবির। চিল্কার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন সৌন্দর্যের মূর্তি ধ'রে তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছে; সেই সৌন্দর্যে তিনি বিস্মিত, তিনি আত্মহারা। চিল্কার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে তাঁর সেই বিস্ময়ের বিহ্বলতা 'renascence of wonder'-এর সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু যেহেতু সেই সৌন্দর্যানুভূতির উৎস শুধু চিল্কার নিসর্গই নয়, কবিপ্রিয়ার সান্নিধ্যও, অতএব কবিতাটি কেবল নিসর্গেরই নয়, একই সঙ্গে প্রেমেরও। এইভাবে কবিতাটির নৈসর্গিক পটভূমি প্রেমের একটা আলম্বন পেয়েছে।

কবিতাটিতে কলাকৃতিঘটিত লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য তেমন বিশেষ নেই। কোনোরূপ অলঙ্কারিকতার আশ্রয় কবিতাটিতে গ্রহণ করা হয় নি, কেবলমাত্র 'যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান'—এই বাচ্যোৎপ্রেক্ষাটি ছাড়া। অলঙ্কারশাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়ার চেয়ে আবেগের উৎসারণের দিকেই কবি মনোযোগ দিয়েছেন বেশি। কিন্তু 'কী-ভালো আমার লাগলো'—কবিতাটির ধ্রুবপদকল্প এই পংক্তিখণ্ডের পুনঃপৌনিক ব্যবহারে আবেগের সেই উৎসারণের অতিসারল্য এবং আতিশয্য কবিতাটিকে স্পষ্টতই দুর্বল ও শ্লথ ক'রে তুলেছে। তদুপরি, কবিতাটি অতিরিক্ত রকমের অহংময় এবং ফলত নৈর্ব্যক্তিকতার দৈন্যপীড়িত। এইসব কারণেই বুদ্ধদেবের এই কবিতাটি সম্পর্কে তাঁর বন্ধু সুধীন্দ্রনাথের উক্তিকে যথেষ্ট সঙ্গত ব'লে মনে হয়—'কবিতাটি উপাদেয় বটে, কিন্তু অমৃতের স্পর্শবিরহিত।'

'নতুন পাতা'র পরে এবং 'দময়ন্তী'র আগে বুদ্ধদেব বসুর দু'টি চটি আকারের কবিতাপুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো—'এক পয়সায় একটি' এবং '২২শে শ্রাবণ'। দু'টি পুস্তিকাই তাঁর উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় 'কবিতা ভবন'-প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্গত। প্রথমটি এই পুস্তিকা-সিরিজের প্রথম সংখ্যক এবং দ্বিতীয়টি পঞ্চম সংখ্যক গ্রন্থ। 'এক পয়সায় একটি'র রচনা ও প্রকাশসাল যথাক্রমে ১৯৩৭-৪১ এবং ১৯৪১; আর, '২২শে শ্রাবণে'র কবিতাক'টি রচিত হয়েছিলো ১৯৪১ ও '৪২ সালের মধ্যে এবং এটি প্রকাশিতও হয়েছিলো ১৯৪২ সালে।

এই কাব্যগ্রন্থিকাদ্বয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা তেমন কিছুই নেই—মাত্র দু'টি ছাড়া, প্রথমটির 'যামিনী রায়-কে' এবং দ্বিতীয়টির 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'। সৌভাগ্যক্রমে এই দু'টি রচনাই 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পেয়েছে। দু'টি কবিতারই প্রধান

প্রেরণা দুই শ্রেষ্ঠ মানবের জীবনসাধনা এবং দু'টি কবিতাই উৎকর্ষের নিদর্শনবাহী। তবু, স্বীকার করি, ব্যক্তিগতভাবে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির প্রতিই আমার অনুরাগ অধিক। এর কারণ প্রথম কবিতাটির তুলনায় দ্বিতীয় কবিতাটি বাণীমূল্যে (message-value) অধিক সমৃদ্ধ। প্রথমোক্ত কবিতায় যামিনী রায়ের মতো নরোত্তমের সঙ্গে স্রষ্টা হিসেবে কবি নিজের এবং নিজের সমকক্ষদের স্বরূপগত পার্থক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে আপেক্ষিক বিচারে নিজেদের অপকর্ষের কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন। এই অকপট স্বীকৃতিতেই এবং যামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তনেই কবিতাটি অবসিত। অবশ্য—

পাপের প্রাচীর দিকে-দিকে হবে ভগ্ন,
আবার আসবে শিল্পীর শুভলগ্ন—

এই আশাব্যঞ্জক সুরের অনুরণনও কবিতাটিতে একেবারে অশ্রুত নয়। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত কবিতাটি কবির মর্মে রবীন্দ্রনাথের বাণী সঞ্চারিত হবার অভিজ্ঞানবহ। আসন্ন মহাযুদ্ধের দুর্যোগ-পিঙ্গল দিনে, যখন 'সভ্যতার শ্মশান-শয্যায় / সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়', যখন 'প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা' এবং 'দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো / উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ', তখন কবি পরম বরাভয় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্টই স্বীকার করেছেন ঃ

এত দুঃখ, এ-দুঃসহ ঘৃণা—
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হ'তো রক্তে মোর, বিদ্ধ হ'তো গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র। অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাইতো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

এই অভীমন্ত্র উচ্চারণেই কবিতাটির সমাপ্তি এবং এই বাণীমূল্যেই কবিতাটির মহত্ব।

বুদ্ধদেবের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম 'দময়ন্তী'। 'দময়ন্তী'র কবিতাগুলির রচনাকালের ব্যাপ্তি ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত; অর্থাৎ কবির বয়স তখন সাতাশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে (জৈষ্ঠ, ১৩৫০)। 'দময়ন্তী'র কবিতাগুলি দু'টি অংশে বিন্যস্ত—'দময়ন্তী' ও 'বিচিত্রিত মুহূর্ত'। প্রথম অংশ 'দময়ন্তী' এবং দ্বিতীয় অংশ বিচিত্রিত মুহূর্ত'। প্রতি অংশেই একটি ক'রে উৎসর্গ-কবিতা রয়েছে। প্রথম অংশেরটি সমর সেন-কে এবং দ্বিতীয় অংশেরটি জীবনানন্দ দাশ-কে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-কবিতা দু'টি সহ উভয় অংশে কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে বারো এবং ষোলো। অর্থাৎ, সমগ্র 'দময়ন্তী'তে সর্বসমেত আটাশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রথম অংশের নামানুসারে সমগ্র গ্রন্থটির নামকরণ।

যে-কোনো কবিতা-পুস্তকের সামগ্রিক মূল্যায়নের যেমন দু'টি দিক্ থাকে—কাব্যকৃতি এবং কলাকৃতি, 'দময়ন্তী'রও তেমনই আছে। এই উভয় দিকের বিচারেই গ্রন্থটি বুদ্ধদেবের সে-পর্যন্ত প্রবাহিত কাব্যধারায় নবযুগের সংকেত সূচীত করেছে। প্রথমেই

আসি কলাকৃতির কথায়। ইতিপূর্বে কোনো কাব্যগ্রন্থ রচনাকালে যা করেন নি, 'দময়ন্তী'তে বুদ্ধদেব তা-ই করেছেন। 'দময়ন্তী'র কবিতাগুলি লিখতে গিয়ে তিনি নিজের জন্য নিজেই ছ'টি কাব্যঅনুশাসন রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি সাধ্যমতো মেনে চলার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটির পরিশিষ্টস্বরূপ সন্নিবদ্ধ শেষ বারোটি পৃষ্ঠায় (৭১-৮২) এর 'কবিতাগুলির বিষয়ে আঙ্গিকের দিক্ থেকে' আলোচনায় এই অনুশাসন ক'টি তিনি লিপিবন্ধ করেছেন। এই অনুশাসনগুলি রচনায় ও পালনে তাঁর 'সাধনা' ছিলো 'বাক্ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন' সাধন করা। এগুলি অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছেন 'গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে'। কেননা, তাঁর মতে, 'দেখা গেছে এ-দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়।' এ-ছাড়াও, তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'পদ্যকে দিয়েও গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার করেছেন।' পরিশেষে গদ্য-পদ্যের এই মিলনসাধনপ্রয়াসের পরিণাম সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মন্তব্য—'পদ্য, অথচ গদ্যকবিতার মতো মৌখিক ভাষায় গঠিত, বাংলা পদ্যের নতুন পরিণতি বোধহয় এই দিকেই।' অধিকন্তু, এই নব্য-রীতির কাব্যের সর্বোত্তম বাহন হিসেবে পয়ারের যোগ্যতা সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্তেও তিনি উপনীত হয়েছেন—'বাক্রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হ'লে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন।' আর, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার হেতু, তাঁর বিবেচনায়, 'বাঙালির কথা বলবার স্বাভাবিক ছন্দই পয়ার ছন্দ।'

বলা বাহুল্য, 'দময়ন্তী'র সমস্ত কবিতায় সেই অনুশাসনগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা বুদ্ধদেবের পক্ষে সহজ কিংবা সম্ভব হয়নি—যদিও সেগুলি ছিলো তাঁরই স্বেচ্ছা-নির্ধারিত। বেশ কিছু কবিতায় সেগুলির নানাবিধ ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং অগত্যা তাঁকে সেই ব্যতিক্রম স্বীকার করে নিতে হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে গ্রন্থটির পরিশিষ্টাংশে তিনি আমাদের জানিয়েছেন, 'বলা বাহুল্য, তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি (অনুশাসানগুলি) সম্পূর্ণ মেনে চলা সম্ভব হয়নি। বিচ্যুতি ঘটেছে।' ···'এই অনুশাসনগুলি মেনে নিয়ে কাব্যরচনা সহজ হয়নি। "বন্দীর বন্দনা" বা "কঙ্কাবতী"র কবিতা হু-হু ক'রে লিখেছিলুম,কিন্তু "দময়ন্তী"র এক-একটি কবিতা লিখতে বিস্তর সময় লেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশা করি সে-পরিশ্রমের চিহ্ন কবিতাগুলির মুখশ্রীকে মলিন করতে পারেনি।'

কিন্তু তিনি যতই আশা পোষণ করুন না কেন, কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কবিতারচনার প্রয়াসে কবিতার স্বাভাবিক সাবলীলতা পুরোপুরি বজায় রাখা কখনোই সম্ভব নয়। 'দময়ন্তী'র ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হয়নি। এই অনুশাসনগুলি মেনে চলার চেষ্টার ফলে এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক রচনায় আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততার স্থলে দেখা দিয়েছে এক ধরনের অনভিপ্রেত আড়ষ্টতা। অর্থাৎ, এগুলি হ'য়ে উঠেছে চেষ্টাকৃত বা efforted। কিন্তু এই ত্রুটিকে অগ্রাহ্য করলেও যে-কথাটা এ-প্রসঙ্গে একেবারেই অস্বীকার করা চলে না তা হচ্ছে, বাংলা কবিতায় বাক্রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির সমন্বয়-

সাধনপ্রয়াসেরও পথিকৃত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অন্য কেউ নন। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই নব্যরীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন প্রধানত গদ্যকবিতায়। তাঁর প্রথম গদ্য-কবিতা-সংগ্রহ 'পুনশ্চে'র সমুদয় রচনাই সেই প্রয়াসের সার্থক পরিণাম। এ-ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের বিশেষত্ব এই যে পদ্যকবিতাতেও এই নূতন কাব্যরীতি তিনি অনুসরণ ক'রে গিয়েছেন—যদিও পদ্যকবিতার এলাকাতেও এই নব্যরীতির পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ নিজে। তাঁর 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি রচনায় পদ্যকবিতাতেও এই নব্যরীতি প্রবর্তনে তিনি সচেতনভাবে প্রথম প্রয়াসী হন। এই প্রয়াসের অঙ্গস্বরূপ সেই রচনা-কতিপয়ে পদ্যছন্দের বিশুদ্ধি বজায় রেখেও 'পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি' তিনি পুরো-পুরি বর্জন করেছেন। কিন্তু সে যা-ই হোক, মোট কথা, কলাকৃতির বিবেচনায় 'দময়ন্তী'র কবিতাগুচ্ছে রবীন্দ্র-প্রদর্শিত নব্যরীতির কাব্যপথেই বুদ্ধদেব কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন।

কলাকৃতির মতো কাব্যকৃতির বিবেচনাতেও 'দময়ন্তী' বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কেননা এই গ্রন্থের একাধিক কবিতায়—বিশেষত নাম-কবিতাটিতে—বুদ্ধদেবের প্রেম-ভাবনার বিবর্তন অতিশয় স্পষ্ট। গ্রন্থটির প্রথম এবং নাম-কবিতা 'দময়ন্তী'র সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকেই এই বিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। এই কবিতা-টিতেই প্রেমের সহজ শরীরী ভোগের চালু পথ পরিত্যাগ ক'রে প্রেমের দার্শনিক উত্তুঙ্গতায় কবি সর্বপ্রথম মানসারূঢ় হলেন, তাঁর প্রেম-সম্পর্কিত সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতেই একটা পরিবর্তন ঘটলো। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রেমের উচ্ছ্বাস-উল্লাসের তুলনায় প্রেমের গভীর রহস্যসন্ধানই তাঁর কাছে প্রধান হ'য়ে উঠলো। অর্থাৎ sub-jectivity-র চেয়ে objectivity-ই তাঁর পরিবর্তিত প্রেমদৃষ্টিতে প্রাধান্য পেলো। ফলত, আমরা লক্ষ্য করি, যৌবনের অন্ত্য-পূর্ব পর্বেই অনন্ত মহাকালের প্রতি দেহ-ভোগক্লান্ত কবির অন্তরের প্রার্থনা ঃ

> হে কাল, হে মহাকাল !
> যৌবনের ব্যাকুল বৈকাল
> তারে স্তব্ধ করো, স্তব্ধ করো থরোথরো বাসনারে ;
> ('হে কাল')

'দময়ন্তী' কবিতাটিতেও তাঁর প্রেম-ভাবনায় 'থরোথরো বাসনা' নয়, যৌবনান্তিক প্রেমের গাম্ভীর্যই প্রবল হ'য়ে উঠেছে। এই কবিতায় কবি তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন, যৌবনের মূল রহস্যই এখানটায় যে ব্যক্তিমানবের জীবনে তার অবসান 'সূর্যের মৃত্যুর মতো নিশ্চিত' হ'লেও কালপরম্পরায় সমাগত সর্বমানবের সামগ্রিক জীবনে তার অবলুপ্তি 'অসম্ভব মনে হয়' ; 'দাম্ভিক যৌবনে'র কাছে 'মনে হয় কাল, তা-ও তুচ্ছ যেন'। মধ্য তিরিশে পৌঁছেই কবির জীবনে যৌবন অস্তায়মান, অকাল-বার্ধক্যহেতু নিজেকে তাঁর মনে হয়েছে ঃ

অবাস্তব, তুচ্ছ, অনর্থক,
পরিত্যক্ত, বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এ-ই আমি, এ-ই আমি।

অথচ নিজের অতীত সম্বন্ধে তিনি জানেন :

সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়।

কিন্তু আজ তাঁর যৌবনাবসিত জীবনে সেই 'বসন্ত'ও নেই, সেই 'চৈত্রের রাত্রি'ও নেই। অথচ তৎসত্ত্বেও তিনি হতাশ্বাস হন নি ; কেননা পরম বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, যে-যৌবন তাঁর নিজের জীবনে বিদায়োদ্যত, সে-যৌবনই তাঁর কন্যার জীবনে বিকাশোন্মুখ। কন্যাকে উদ্দেশ ক'রে তাই তাঁর উক্তি :

সেই রাত্রি, পুঞ্জ-পুঞ্জ বসন্তের মন্থিত অমৃত
যেদিন শরীরে তোর মঞ্জরিবে, রে কন্যা আমার,
তোর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে দেবত্রয় আসিবে সেদিন,
স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি, কালান্তক যম।

কন্যার জীবনে নিজের বিগত যৌবনের পুনরাবির্ভাবে কবি যেমন পুলকিত, বংশ-পরম্পরায় সঞ্চালিত যৌবনের এই আবর্তনলীলায় প্রেমের রহস্যের সন্ধান পেয়েও তিনি তেমনই রোমাঞ্চিত। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-ব্যাপ্ত অনন্ত কালপ্রবাহ জুড়ে যৌবনের এই যে জয়যাত্রা, কবি একেই বলেছেন যৌবনের 'বিশ্ববিজয়'। প্রেমের দর্শনগত এই প্রতীতি থেকেই তাঁর সিদ্ধান্ত :

যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে-সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।

ব্যষ্টিগত যৌবনের অনিত্যতার অন্তরালবর্তী সমষ্টিগত যৌবনের নিত্যতার এবং 'নব-জীবনের অঙ্গীকার'বদ্ধ প্রেমের বিনম্র বন্দনাগানেই, ভারতের জাতীয় মহাকাব্য 'মহাভারতে'র নল-দময়ন্তীর প্রণয়োপাখ্যানের প্রতীকী প্রেক্ষাপটাশ্রিত, এই অপূর্ব কবিতাটি আদ্যোপান্ত মুখরিত। এবং এই বন্দনাগানেই যৌবনোত্তীর্ণ কবি যৌবনোত্তর প্রেমের মুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছেন।

দার্শনিক সমৃদ্ধির মতো, বিষয়বৈচিত্র্যও 'দময়ন্তী'র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিচিত্র স্বাদের সব কবিতা গ্রন্থটির দু'টি অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, 'দময়ন্তী'র অধিকাংশ কবিতাই আকারে দীর্ঘ—তবু এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে

উল্লেখ করার মতো প্রথম অংশের 'দময়ন্তী', 'হে কাল!', 'বিরহ', 'চলচ্চিত্র', 'পূর্বরাগ,' 'কবিজীবনী' ও 'ছিন্নসূত্র' এবং দ্বিতীয় অংশের 'এখন বিকেল' ও 'পদ্মা'। কবিতাগুলির নাম একসঙ্গে উল্লেখিত হ'লেও একমাত্র দৈর্ঘ্যগত সাদৃশ্য ছাড়া এগুলির মধ্যে দ্বিতীয় কোনো মিল নেই। কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই আলাদা ধরনের। 'দময়ন্তী' ও 'হে কাল!'-শীর্ষক কবিতা দু'টির দর্শনগত দিক্ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সদ্য করা হয়েছে। 'বিরহ' কবিতাটি কবির ব্যক্তিগত বিরহানুভূতির বিধুরতাকে অতিক্রম ক'রে—

জ্বলন্ত লাভার
ভীষণ অক্ষর বার-বার
আকাশে, অরণ্যে, জলে লিখে যায় অন্তিম হতাশা—
সর্বশেষ আশা—
নেই, তুমি নেই।

এই অন্তিম পংক্তি কতিপয়ে সকল বিরহার্তের হৃদয়দাহকে বাণীমূর্ত ক'রে তুলেছে। 'চলচ্চিত্র' কবিতাটিও মর্মক্ষতেরই উন্মোচন—তবে কোনো বিরহ-পীড়িতের নয়, জনৈক বেকার যুবকের—যার জবানীতে সম্পূর্ণ কবিতাটি লিপিবন্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা-কালীন অন্ধকার দুর্দিনে 'ভদ্রবংশজাত, বি. এ.'-পাশ এই যুবক সামান্য একটা চাকরির উমেদারিতে বড়োলোকের দুয়ারে-দুয়ারে ধরনা দিয়ে যে কী-বিরূপ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলো, তারই কাহিনী এটি। এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তার স্বীকৃতি—'পাৎলুন আঁটলুম, বড়োলোক চাটলুম, এখন তাহ'লে করা / কী ?···ট্যাঁকে নেই কানাকড়ি, / নই ধড়িবাজ বাটপাড়। এই নিয়ে আটবার / চাকরির চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো।' এবং এই বিরূপ অভিজ্ঞতা থেকেই তার বিমূঢ় উপলব্ধি—'এ যে জীবনে মরণ দেখি মরণই জীবন।' অতএব এই অসহ্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণলাভের সম্ভাব্য পন্থা হিসেবে 'অন্তত হতাম যদি কেরানি কি ইস্কুল মাস্টার!'—এই আক্ষেপোক্তি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সে মনের ভার লাঘব করে। 'পূর্বরাগ' কবিতাটি এবং 'কবিজীবনী'ও একটু অন্য ধরনের। দু'টি কবিতাই কবির বাস্তবমুখিনতা এবং সমাজ-সচেতনতার সাক্ষ্যস্বরূপ। 'পূর্বরাগ' কবিতাটির মুখ্য আলম্বন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। কবি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ের একজন হ'য়েও এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও অনর্থকতা সম্পর্কে কবিতাটিতে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ঃ

বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন।

তিনি ভেবে দেখেছেন, এদের কৃত্রিম জীবনে 'প্রেম তো শুধু বায়স্কোপের দাবি মেটায়।' এবং এদের 'শান্তি শুধু গ্রন্থাগারের অন্ধকারে।' সেজন্য, কবির বিবেচনায়, এখন প্রয়োজন এদের আত্মচৈতন্যে প্রত্যাবৃত্ত করা, এদের আত্মজাগরণ ঘটানো। আর, সেই কারণেই এদের প্রতি তাঁর দীপ্ত আহ্বান ঃ

এবার তবে নতুন করো।
তনুমনের তরুণতার আগুন জ্বালো
... ...
কল্পনারে মুক্ত করো, কর্ম-রথে যুক্ত করো—

এবং পরিশেষে 'সব্যসাচী, তোমার হোক জয়!'—এই শুভেচ্ছাজ্ঞাপনে কবিতাটির সমাপ্তি। 'কবিজীবনী' কবিতায় তিনি আরো দু'-ধাপ নেমে এসেছেন—মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের পেছনে ফেলে, এমনকি নিম্নবিত্ত জীবনকেও অতিক্রম ক'রে একেবারে রিক্তবিত্ত শ্রমজীবীদের জীবন পর্যন্ত দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন তিনি। 'মাঠে যারা ধান কাটে, পাটখেতে কাটায় আষাঢ়, / রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙে', তাদের জন্য শুধু সহানুভূতিতে আর্দ্র হওয়াই নয়, এমন এক আদর্শ সমাজব্যবস্থারও তিনি কল্পনা করেছেন, যেখানে সমাজের ঊনজনরাও অধিজনদের পাশে যথার্থ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'তে পারবে। কবিকল্পিত সেই সামাজিক ব্যবস্থার মূল কথা উচ্চারিত হয়েছে কবিতাটির অন্তিম অংশে :

হাঁটুজলে মাঠে যারা কাটায় আষাঢ়, যারা নামে
খনির তিমিরে, করাল রৌদ্রের দিনে রাজপথে
হাঁটু ভেঙে খাটে যারা, মৃত্তিকার, খনির, যন্ত্রের
ঐশ্বর্য তাদেরই। তাদেরই তা হোক। আনন্দের উৎস
হোক সকলেরই স্বীয় শ্রম—কৃষকের, যন্ত্রীর, কবির।

অপরপক্ষে 'ছিন্নসূত্র' কবিতাটিতে একটি গল্পের বীজ উপ্ত হ'য়ে আছে—একটি নিটোল গল্পের সম্ভাবনা কবিতাটিতে মুখ বুজে প'ড়ে রয়েছে। 'চৈত্র মাসে দুপুরবেলায় / পাতা-ঝরা গাছের তলায় / এসেছে বেদের দল।' এদের যাযাবর জীবনের 'ক্ষণিকের ঘরকন্না দর্শকের হৃদয় ভোলায়।' কবিরও হৃদয় ভুলেছে। কিন্তু অন্য দর্শকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এখানটায় যে এদের জঙ্গম জীবনযাত্রায় অনাদের মতো তিনি শুধু বিস্মিত বা বিস্মৃতহৃদয়ই নন, এদের 'নিত্য পরিবর্তনের বিচিত্র লীলায়' আন্দোলিত জীবনের সূত্র ধ'রে অনেক সুদূর ধূসর অস্পষ্ট অতীতের তীরে তিনি উপনীতও। কল্পনার সমুদ্রকে পাড়ি দিয়ে সেখানে উপনীত হ'য়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই বেদের দলের আদিম জীবনের মতো তাঁর নিজেরও একদা একটা আদিমতামণ্ডিত জীবন ছিলো—যে-জীবনকে তিনি চিরকালের মতো অতীতের গর্ভে বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। অথচ সেই জীবনই ছিলো এই বসুন্ধরার বুকে মানুষ হিসেবে তাঁর প্রথম পরিচয়। সভ্যতারূপী অক্টোপাসের দৃঢ় নিষ্পেষণে আদিম জীবনের সঙ্গে তাঁর সেই একদার সম্পর্কের সূত্র আজ ছিন্ন। সেই কারণেই নিজের বর্তমান জীবনকে তিনি বলেছেন 'ছিন্নসূত্র', আর সেই হেতুই কবিতাটির নামকরণটিও সার্থক। অজ্ঞাত ও অখ্যাত বেদের দলই যে তাঁকে নিজের জীবনের ছিন্ন সূত্রের সন্ধান দিয়েছে, সে-সম্পর্কে কবির অকপট স্বীকারোক্তি রয়েছে কবিতাটির এই অনাড়ম্বর পংক্তি যুগলে :

ঐ যে বেদের দল
ওঁর মধ্যে আমার আদিম বাসা।

এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধদেবকে আমরা জৈব জীবনের কবি ব'লেই জানতাম, কিন্তু এই প্রথম—অন্তত এই কবিতাটিতে—তাঁকে আমরা আদিম জীবনের কাব্যকাররূপেও জানলাম।

'দময়ন্তী'র দ্বিতীয় অংশের, অর্থাৎ 'বিচিত্রিত মুহূর্তে'র 'এখন বিকেল' এবং 'পদ্মা'—এই কবিতা দু'টির নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি বটে, কিন্তু কয়েকটি সুমিত বাক্য-বন্ধ, কিছুসংখ্যক নিবিড় তুলনা (close comparison) ও সুরেলা ছন্দের মনোহারিত্ব ছাড়া এই বর্ণনামূলক কবিতা দু'টির অন্যাবিধ কাব্যমূল্য তেমন বিশেষ কিছু নেই। সদ্যোল্লিখিত কাব্যকৃতিত্ব কতিপয়ের নিদর্শনস্বরূপ দু'টি কবিতা থেকেই কথঞ্চিৎ উদ্ধার করছি ঃ 'কড়া ইলেকট্রিক আলো কাঁচা চর্বির মতো শাদা', 'তোমার শরীর যেন পাল-তোলা নৌকার মাস্তুল / ছল্ছল্ জলের ঢেউয়ের মতো চুল।" 'এখনো বিকেল আসে চুপেচুপে কলকাতায় / এখনো কোকিল ডাকে হঠাৎ-ব্যথার মতো / দক্ষিণে হাওয়ায়।' ও 'এখনো এ-কলকাতার আকাশের সিঁড়ি ভেঙে / চুপি চুপি উঠে আসে চাঁদ / এখনো রক্তের স্রোতে চাঁদের জোয়ার।' ('এখন বিকেল') এবং 'মেঘের পাখার ঝাপ্টা নিতে দূরের গ্রামে ছায়া নামে', 'এই আষাঢ়ের উদ্দামতায় উদ্ধত উচ্ছল / বাংলাদেশের হৃদয়জোড়া পদ্মানদীর জল। / মস্ত বড়ো নদী পদ্মা, যেন সমুদ্দুর। / দুই হাতে সে জড়িয়ে আছে ঢাকা ফরিদপুর।" 'খালের পাড়ের ইষ্টিশানের আটটি টিনের ঘর, / বিকেলবেলার বাঁকা আলোয় তা-ও হ'লো সুন্দর, / ইষ্টিমারের একদিকে তীর, অন্যদিকে চর।' ও 'ঢেউ উঠলো, হাওয়া ছুটলো, ফুটলো তারার গন্ধহারা কুন্দ, / আরো ঘন্টা তিনেক পরে আসবে গোয়ালন্দ।' ('পদ্মা')।

'দময়ন্তী'র দ্বিতীয় অংশের শেষ চারটি কবিতা মনুষ্যেতর প্রাণীদের নিয়ে রচিত—'ইলিশ' 'ব্যাং, 'কুকুর' এবং 'জোনাকি'। কবিতা চারটির মধ্যে 'ইলিশে'র স্থান অবশ্যই সর্বোচ্চে। কিন্তু শুধু প্রাণীবিষয়ক এই কবিতা ক'টির মধ্যেই নয়, বুদ্ধদেবের সমস্ত কবিতার মধ্যেও 'ইলিশে'র আসন অতি উচ্চে। বস্তুত, সমগ্র 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম অংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটি যেমন 'দময়ন্তী', দ্বিতীয় অংশের সর্বোত্তম কবিতাটিও তেমনই 'ইলিশ'। 'ইলিশ' কবিতায় কবির দৃষ্টি পুরোপুরি জীবনরসিকের দৃষ্টি। খাদ্য-রসিক বাঙালীর জীবনে ইলিশের স্থান একমাত্র রাজমৎস্য রুই-এর নিচে, অন্য কোনো মাছের নয়। বঙ্গজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ইলিশের এই বিশিষ্ট স্থানকেই এই কবিতায় কবি কাব্যরূপায়ণের মাধ্যমে স্বীকৃতি জানিয়ে গিয়েছেন। ইলিশ ধরার মরশুম বর্ষাকাল ; অতএব বর্ষাঋতু কবির চোখে ইলিশ নিয়ে ভোজনের আনন্দ করার ঋতু। সেইজন্য বর্ষাকে তিনি বলেছেন 'ইলিশ-উৎসব'। কবিতাটিতে এই উৎসবের আরম্ভ 'মেঘবর্ণ মেঘনার' জলে এবং সমাপ্তি 'কলকাতার বিবর্ণ সকালে··· কেরানির গিন্নীর ভাঁড়ারে'। চতুর্দশপংক্তিতে গ্রথিত, দৃঢ়োপনদ্ধ এই কবিতাটির

প্রারম্ভেই আছে একটি মনোরম বাণী-চিত্র—আষাঢ়ের আগমনে মেঘনার ও পদ্মার তীরবর্তী দৃশ্য :

মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেল সারি
বৃষ্টিতে ধূমল ; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল ।

পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত পংক্তি-চতুষ্কে রয়েছে যারা 'অর্ধনগ্ন', 'খাদ্যহীন' অথচ 'খাদ্যের সম্বল', তারা কী-ভাবে মধ্যরাত্রির 'মেঘ-ঘন অন্ধকারে' 'দুরন্ত উচ্ছল আবর্তে কুটিল নদী'র বুকে মাছ ধরে, তার নিপুণ বর্ণনা । কবিতাটির শেষ ছ'টি পংক্তির প্রথম তিনটিতে রাত্রিশেষে গোয়ালন্দ থেকে ইলিশ সরবরাহের কথা :

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভ'রে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড় ।

আর, 'নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়' অতিক্রম ক'রে, এর পরেই, পরবর্তী পংক্তিত্রয়ে, কবি আমাদিগকে নিয়ে গিয়ে একেবারে রান্নাঘরে হাজির করেছেন, যেখানে 'ইলিশ ভাঁজার গন্ধ' এবং 'সরস শর্ষের ঝাঁজ' তীব্র হ'য়ে উঠেছে । এই স্তর-পরম্পরাতেই জীবনরসিক কবি ভোজনরসিক বাঙালীর অতি প্রিয় একটি খাদ্যবস্তুকে নিয়ে তাঁর কবিতাটি পরিসমাপ্ত করেছেন । এই পর্যায়ের অন্য কবিতা তিনটির মধ্যে 'ব্যাং' ও 'জোনাকি' ছন্দকুশলতার কারণে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু 'কুকুর' সর্বৈথ অনুল্লেখ্য ।

বুদ্ধদেবের মনুষ্যেতর প্রাণীবিষয়ক কবিতাসমূহের মধ্যে 'ইলিশ'-এর পরেই 'ব্যাং'-এর স্থান । বাইরে থেকে দেখতে গেলে এটি বর্ষাঋতুর আবহলালিত একটি সরল, সহজ ও সুলিখিত কবিতা । নববর্ষার আগমনে বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-পরিবর্তন সূচীত হয়, ব্যাঙের সম্মিলিত উল্লসিত ডাক তাকেই মূর্ত ক'রে তোলে । এই সময় খাল-বিল-নদী-নালা এবং সমুদয় নিম্নভূমি জলে পরিপূর্ণ এবং সেই নবজলে ভেককুল উদয়াস্ত সমস্বরে সঙ্গীতরত—বঙ্গভূমিতে বর্ষাঋতুর আবির্ভাবের এই হচ্ছে প্রাথমিক অভিঘাত (primary impact) । কিন্তু পংক্তি-পরম্পরায় কবিতাটির ভেতরে প্রবেশ করতে-করতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়, বর্ষাঋতুর আগমনজনিত এই প্রাথমিক অভিঘাতকে কবি নিখিল মনুষ্যপ্রজাতির গভীর এক হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে গভীরতর ব্যঞ্জনা প্রদান করেছেন । এই অর্থেই কবিতাটির ভাববস্তু এর বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে আরো অনেকদূর (মানুষের মনোজগৎ) পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়ে পড়েছে এবং এই কারণেই কবিতা হিসেবে এটির যা-কিছু উৎকর্ষ । কেননা কাব্যোৎকর্ষের অন্যান্য দিকের বিবেচনায় এই কবিতাটি বুদ্ধদেবের কবিমানসিকতার প্রতিনিধিত্বের দাবি কোনোক্রমেই করতে পারে না ।

কবিতাটির দ্বি-পংক্তিক দ্বিতীয় স্তবকে কবি শুনতে পেয়েছেন বর্ষার ব্যাঙের 'উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চ সুরে'র 'আদিম উল্লাসে' জাগতিক ভীতির অবিদ্যমানতার সুর : 'আজ

কোনো ভয় নেই—বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।' কবিতাটির এই স্তরে ব্যাঙের মতো নিতান্ত নগণ্য একটি জীবের ডাকও নিছক একটি জীবের ডাকেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, হ'য়ে উঠেছে সমস্ত সংসার জুড়ে বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার ডাক। অর্থাৎ, ব্যাঙের ডাক কবির মধ্যে একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার (mental process) সৃষ্টি করেছে এবং সেই প্রক্রিয়ার বশেই 'ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক' শব্দে (ইংরেজি croak-এর অনুকৃতিতে) শ্লোকের মতো উচ্চারিত সম্মিলিত ভেকসঙ্গীতে মানবহৃদয়ের চিরন্তন শোককে তিনি ব্যক্ত হ'তে শুনেছেন।

নবাগত বর্ষার মতো, আদিমতাও কবিতাটির আবহে বিদ্যমান। দ্বিতীয় স্তবকের 'আদিম উল্লাসে' শব্দযুগ্ম সেই আদিমতারই (primitiveness) স্মারক, সেই আদিম অবচেতনারই দ্যোতক, যাকে বলা যেতে পারে archetypal বা primordiald। আবার এই অবচেতনা যেহেতু গোষ্ঠীচেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, অতএব স্বরূপত তা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় collective বা সমষ্টিগতও। ঐ একই স্তবকে 'কন্ঠের' বিশেষণরূপে 'উন্মুক্ত' শব্দটির প্রয়োগও এ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো। এই শব্দটি সাধারণত 'অবাধ' ও 'স্বাধীন'-এর প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তাহ'লে 'আদিম', 'উল্লাসে' আর 'উন্মুক্ত'—এই শব্দত্রয়ের পাশিপাশি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কবি আদিম অবচেতনার (primitive subconscious) মুক্তিকেই আভাসিত করতে চেয়েছেন। এর থেকেই যন্ত্রশাসিত ও যন্ত্রসেবিত আধুনিক সভ্যতায় অবচেতনার অবদমনের প্রতি কবির পরোক্ষ ইঙ্গিতটিও অনুমান ক'রে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয় না।

কবিতাটিতে ইন্দ্রিয়ময়তার একটি দিক্‌ও আছে এবং তা বেশ স্পষ্ট। চতুর্থ পংক্তি-যুগলের 'স্পর্শময় বর্ষা এলো ; কী মসৃণ তরুণ কর্দম !' অংশটুকুতে 'স্পর্শময়' শব্দে যেমন বর্ষাঋতুর ইন্দ্রিয়ঘনতা (sensuousness) স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, 'মসৃণ তরুণ কর্দম' শব্দগুচ্ছে তেমনই নরনারীর রতিবিহারের প্রতিও পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। এই পংক্তিযুগ্মেরই চতুর্থটিতে আছে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদভঞ্জক একটি মিশ্র শব্দপ্রতিমা (amalgamated image)—'সঙ্গীতের শরীরী সপ্তম'। এই অনুমিশ্রিত শব্দ-প্রতিমাটিকে বিশ্লেষণ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ' (সোনা) ব্যাঙের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি কবির অনুভূতিতে প্রতিভাত হয়েছে 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'র সপ্ত-স্বরের শরীরী প্রকাশরূপে।

'আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে !'—এই নরম পংক্তিটিতে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে কবির নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং ঈষৎ ব্যঙ্গপ্রবণ মনোভাব।

বুদ্ধদেবের 'দময়ন্তী'-পরবর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থই—'রূপান্তর' (জুলাই, ১৯৪৪), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (মার্চ, ১৯৪৮) এবং 'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫)—একই সুরে বাঁধা। দর্শনগত অভিন্নতার সূত্রে এই গ্রন্থত্রয়ের কবিতাগুলি অন্তর্গ্রথিত। এই দর্শন অবশ্যই 'দময়ন্তী'তে কবির যৌবনের ও প্রেমের দর্শনের পরবর্তীকালীন ; কিন্তু তাঁর এই অধুনাতন দর্শনের সঙ্গে পূর্বতন দর্শনের কোনো অনিবার্য বিরোধ

নেই। বরং, বিপরীতক্রমে বলা যেতে পারে, এই দর্শন তাঁর আগের দর্শনেরই সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্প্রসারণ—যদিও 'রূপান্তর'-'দ্রৌপদীর শাড়ি'-'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর'-পর্বে তাঁর দার্শনিক সমস্যার ব্যাপ্তি ও গভীরতা, দুই-ই বেশ বেশি এবং সেই সঙ্গে তার জটিলতাও। 'দময়ন্তী'তে কবি নিজের কন্যার জীবনে নিজের তিরোহিত যৌবনের পুনরাভির্ভাবে যৌবনশক্তির বংশানুক্রমিক চিরজীবিত্ব (eternity)-র সন্ধান পেয়ে স্বস্ত ছিলেন। কিন্তু এই পর্বে সেই স্বস্তি তিনি আর অব্যাহত রাখতে পারলেন না ; কেননা অকাল প্রৌঢ়ত্বের প্রবেশপথে উপনীত কবির নিকট এটা ক্রমশই উপলব্ধ হচ্ছিলো যে যৌবনের প্রজন্মক্রমিক সঞ্চরণশীলতা (generationwise transmission) যেমন সত্য, যৌবনরিক্ত মানুষের হৃতসর্বস্বতাও তেমনই সমানভাবে সত্য। যৌবনগত এই ব্যাপক দার্শনিক উপলব্ধিহেতুই, 'দময়ন্তী'তে তাঁর মানসিকতায় প্রশান্তির যে-আধিপত্য ছিলো, এই পর্বের গ্রন্থত্রয়ে তা আর বিরাজিত রইলো না, পরিবর্তে তার স্থলে তাঁর মানসে দেখা দিলো এক ধরনের অসন্তোষ—এমনকি আত্মধিক্কার, যার প্রথম স্ফুরণ 'রূপান্তরে' এবং চূড়ান্ত পরিণতি 'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর'-এ। 'রূপান্তরে'র নাম-কবিতাটিতে নিজের তদানীন্তন বিরূপ অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

> দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
> রাত্রি মোর জলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।

কিন্তু যন্ত্রণাময় সেই জীবন-সংগ্রামে পরাজয় তাঁর কাম্য নয়, সত্তার অন্তঃস্থলে কঠিন ধাতুর সংঘর্ষজাত 'শুভ্র অগ্নিশিখা'র জাগরণই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। তাই ঐ একই কবিতায় তাঁর অন্তরের প্রার্থনা ঃ

> ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
> ... ...
> জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
> চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
> ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।

'রূপান্তর'ও পূর্ববর্তী 'কঙ্কাবতী'র মতো প্রেমেরই কাব্য,—কিন্তু 'কঙ্কাবতী'র মতো মিলনপূর্ব পূর্বরাগের নয়, মিলনোত্তর প্রেমের। এই কবিতা-পুস্তিকাটি থেকেই বুদ্ধদেবের স্রষ্টামানসে সংগমপূর্ব রতির পরিবর্তে সংগমোত্তর রতি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। 'রূপান্তরে'র কবিতা কতিপয়ে কবিচিত্তের এই স্বীকৃতির স্বাক্ষর রয়েছে যে মনুষ্যজীবনে প্রৌঢ়ত্বের সূত্রপাত যৌবনেরই স্বাভাবিক পরিণতি। প্রৌঢ়তা, প্রকৃতপক্ষে, যৌবনেরই রূপান্তর—অথবা বিপরীতভাবে, কবির ভাবনায়, রূপান্তরিত যৌবনেরই আরেক নাম প্রৌঢ়ত্ব। এই কারণেই পুস্তিকাটির নাম 'রূপান্তর'। অন্য একটি অর্থেও এই নামকরণটি সার্থক। পূর্বযুগের 'কঙ্কাবতী'-নাম্নী কবি-প্রিয়ার এ-যুগে নির্দিষ্ট নামবিহীনা কবিজায়ায় রূপান্তর ঘটেছে। কল্পনার প্রিয়ার প্রেম নয়;

বাস্তবের স্বকীয়ার প্রেমই এই পর্বে কবিমানসের মুখ্য আলম্বন। এই স্বকীয়া প্রেমে কবি-প্রেমিকার নামরূপকে ছাপিয়ে তার সত্তারূপই কবির পক্ষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। তাই কোনো নির্দিষ্ট মানুষী-নামের পরিবর্তে একটি কাব্যমন্ডিত বিশেষণে তিনি তাকে বিশেষিত করেছেন। যৌবনোত্তর কবির চোখে এই স্বকীয়া নায়িকা 'অতলান্ত' সত্তাস্বরূপিনী। প্রৌঢ়ত্বের অকালআগমনে কবি স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে অসহায় বোধ করছিলেন ; অধিকন্তু এই পর্বে এই অনুভূতিও তাঁকে ভীতিতাড়িত ক'রে তুললো যে, জীবনের প্রধান-প্রবাহ থেকে তিনি ক্রমবিচ্ছিন্ন, তিনি গৃহচ্যুত, তিনি আশ্রয়হারা। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিত 'নির্বোধ প্রাসাদ' কবিতাটি এই অনিকেত মনোভাবেরই ইঙ্গিতবহ ঃ

> বার-বার করেছি আঘাত,
> খোলে নি দুয়ার ;
> নিরুত্তর নির্বোধ প্রাসাদ ;
> অবরুদ্ধ অন্তঃপুর নিঃসাড় পাষাণে।

সেই কারণেই অকালবিগতযৌবন কবির অকালআগত প্রৌঢ়ত্বের অপ্রতিরোধ্য নিঃসঙ্গতায় তাঁর একমাত্র অবলম্বন তাঁর স্বকীয়া নায়িকা, তাঁর 'অতলান্তা'—যার প্রসঙ্গে ঐ ১৯৪৪ সালেরই ১৫ই মে তারিখে রচিত 'অতলান্তা' কবিতায় তাঁর অন্তর-মথিত উচ্চারণ ঃ

> অতলান্তারে হারাতে পারি না, পারি না।

অবশ্য প্রৌঢ়োচিত প্রাজ্ঞতার স্পর্শেও 'রূপান্তর' একেবারে বঞ্চিত নয়। আসক্তি যৌবনের ভূষণ, প্রৌঢ়ত্বের অনাসক্তি। 'মুক্তি' কবিতার এই পংক্তিদ্বয়ে রয়েছে সেই স্বীকৃতিসূচক প্রার্থনা ঃ

> অনাসক্তির শান্তি আসুক,
> বন্ধন হোক ছিন্ন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে প্রৌঢ়ত্বের প্রত্যাশিত প্রাজ্ঞতার নয়, প্রৌঢ়ত্বের বিপ্রলব্ধ বেদনারই কাব্যঋদ্ধ বাণীরূপ 'রূপান্তর'।

'দ্রৌপদীর শাড়ি'র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ সাল। এই কবিতাগুলি, আগেই বলেছি, 'রূপান্তর'র কবিতাগুলির সঙ্গে দর্শনগত অভিন্নতার সূত্রে গ্রথিত। এজন্য 'দ্রৌপদীর শাড়ি'কে 'রূপান্তরের' পরিপূরক-গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে কবি 'রূপান্তরে'র দর্শনকেই অনুসরণ করেছেন এবং ভাবনা-চিন্তার একই পারম্পর্যে। এই গ্রন্থেও তাঁর মৌল মানসিকতা যৌবনের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে প্রৌঢ়ত্বকে স্বীকৃতির। যৌবনের চিরবিদায়ে প্রৌঢ় মানুষের যে-হৃদয়বেদনা 'রূপান্তরে' মর্মরিত, সেই হৃদয়বেদনার শিহরণ 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তেও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু সেই বেদনার সঙ্গে নূতন যে-বেদনাটি 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে যুক্ত হয়েছে, সেটি কবির জীবনঋতুচক্রে শীতের আকস্মিক আবির্ভাবজনিত। তাঁর

জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে আগত এই শীতার্ত প্রৌঢ়তার জন্য তিনি মানসিকভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ তাঁর জীবনে তা এসেছে এবং যৌবনের সঙ্গে ঘটিয়ে দিয়েছে তাঁর চিরবিচ্ছেদ। 'প্রৌঢ় প্রেম' কবিতাটি বিগতযৌবন প্রৌঢ়ের সেই মনোবেদনারই বাণীবদ্ধ প্রকাশ :

নবীন আমার প্রৌঢ় বয়স, প্রৌঢ় তোমার যৌবন,
তোমাতে আমাতে এক জনমের ব্যবধান।
তোমার জীবনে এখনো ফলিত ললিতকলার রূপরস,
আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান।

জীবন থেকে যৌবনের বিদায়ের ফলস্বরূপ তাঁর এ-ও মনে হ'লো, তাঁর যৌবনঋতুর নিত্যসঙ্গিনীও তাঁর জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। 'নববর্ষের জল্পনা' কবিতায় আমরা শুনি কবিকন্ঠে সেই বেদনারই গুঞ্জরণ :

ছেড়ে দিলাম, তোমায় আমি ছেড়ে দিলাম
আমার ভালোবাসার বাঁধন থেকে।

প্রেমলীলায়িত একদা-যৌবনের এবম্বিধ স্মরণ-বেদনায় 'দ্রৌপদীর শাড়ি' বিকম্পিত। আংশিকভাবে সদ্য-উদ্ধৃত কবিতা দু'টি ছাড়াও এই গ্রন্থের অন্য যে-কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট, কিঞ্চিৎ ভিন্নধর্মী এবং দর্শনগত কারণে নয়, অন্যবিধ (প্রধানত আঙ্গিকগত) বিবেচনায় অনুধাবনযোগ্য, সেগুলির নাম 'মায়াবী টেবিল', 'কোনো মৃতার প্রতি', 'শীত', 'শীত সন্ধ্যার গান', 'প্রত্যহের ভার', 'অন্য প্রভু' এবং 'কার্তিকের কবিতা'।

জীবনে অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় আবির্ভূত শীতপাণ্ডুর যে-প্রৌঢ়ত্বকে কবি 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে সহজে মেনে নিতে পারছিলেন না অথচ মেনে নিতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন, 'রূপান্তর'-'দ্রৌপদীর শাড়ি'-'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-পর্বের শেষ গ্রন্থ 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তরে' (রচনাকাল ১৯৪৪-৫৩, প্রকাশসাল ১৯৫৫) দেখা গেলো তিনি শেষবারের মতো তা মেনে নিতে চেষ্টা করছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় প্রধান সহায়ক-সূত্রের সন্ধান তিনি পেলেন রবীন্দ্রনাথে, রবীন্দ্রনাথের ঋতুদর্শনে। কবিগুরুর ঋতুদর্শনের সর্বোত্তম কাব্যরূপ 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ'। তা-ছাড়া, 'ফাল্গুনী' কাব্যনাট্যে এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন কবিতাতেও তাঁর ঋতুদর্শনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই দর্শনে মানবজীবনে জরা ও যৌবনের আবির্ভাবপ্রক্রিয়াকে ঋতুচক্রের আবর্তনে শীতের অবসানে বসন্তের সূত্রপাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই ঋতুদর্শনের প্রভাবকে শিরোধার্য ক'রে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তরে' বুদ্ধদেবের কাব্যযাত্রা। এই প্রভাবের স্বীকৃতিস্বরূপই এই গ্রন্থের একাধিক কবিতায় লোলচর্ম শীতের মধ্যেও চলেছে তাঁর সৌন্দর্যসন্ধান, অনুজ্জ্বল ও নিরুত্তাপ জরার গভীরেও অব্যাহত রয়েছে তাঁর সৃজনসম্ভাবনার আবিষ্কারপ্রয়াস। এই প্রয়াসেও যৌবনই তাঁর মুখ্য অবলম্বন, ভালোবাসাই তাঁর প্রধান প্রকাশমাধ্যম। অর্থাৎ, এ-ক্ষেত্রেও তিনি যৌবনেরই অক্লান্ত বন্দনাকার এবং ভালোবাসারই আত্মহারা গীতিকবি।

গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই ('মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে') রয়েছে তাঁর নিঃসংশয় সাক্ষ্য ঃ

যা-কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা,
কথা বুনে, ছন্দ গেঁথে, শব্দ ছেনে
আমি শুধু ভালোই বেসেছি
সবচেয়ে তীব্র, মত্ত, সত্য ক'রে।

বোঝা যাচ্ছে, যৌবন এবং ভালোবাসা এই কবির চোখে অন্যোন্যনির্ভর এবং প্রেমের একটা সমগ্রতারই দ্যোতক। এবং এই উপলব্ধির প্রকাশে গভীর এক অস্থিরতা তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এই অস্থিরতা নিছক romantic anguish-প্রসূত কিংবা সেই অস্থিরতা নয়, যা যে-কোনো আত্মমগ্ন ও আত্মপরিব্রাজক কবিকে সহজের সমতলে নেমে আসতে প্ররোচিত করে ; বস্তুত, এই অস্থিরতা আরো গভীরের ব্যাপার, তা জীবন-অন্বেষা-সমুদ্ভূত।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রাথমিক পটভূমি শীতঋতু, কিন্তু বিস্তৃত পটভূমিকায় বসন্তেরই বিদ্যমানতা। এখন কবির জীবনে শীতঋতু সমাগত। যৌবনের সীমান্ত পেরিয়ে এসে এখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রশস্ত প্রান্তরে উপনীত। তাঁর জীবনের চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর হিমেল হাওয়া প্রবাহিত, নিষ্পত্রতার নিদারুণ মর্মান্তিকতায় তাঁর অস্তিত্ব অবসন্নপ্রায়। অর্গল-অবরুদ্ধ কক্ষে, নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী ক'রে, শয্যালগ্ন হ'য়ে এখন তাঁর শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের বিভোর হওয়ার পালা, নিজের অতীতকে নিয়ে নিজের আত্মমগ্ন হওয়ার লগ্ন। ঐ একই কবিতায় ঘুমের প্রতীকে কবির এই মানসিক আবহাওয়াই অভিব্যক্ত হয়েছে ঃ

আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় ঘুম যেন মাতার মমতা,
তামসী মাতার নির্জন করুণ যৌবন,
পরিচিত অন্ধকারে, মমতার নরম উষ্ণতা নিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে
অন্তহীন অন্ধকারে কঠিন ঠাণ্ডারে—

এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় আমরা এক ধরনের বাক্‌সংযমের, আত্মোপলব্ধির এবং প্রতীকী প্রচ্ছদে বিন্যস্ত আত্মগুপ্ত ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করি। এ জাতীয় কবিতা-সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটির নাম অবশ্যই 'রাত্রি'—সেই আশ্চর্য গদ্যকবিতাটি, যেটি একই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর এবং আমাদের সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, যেটি এই পর্বের রচনা হ'লেও কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ভিন্ন অন্য কোনো কবিতা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং যেটিতে কবির রাত্রি-সম্ভাষণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রেম-সম্ভাষণেরই রূপক, যেহেতু রাত্রি কবি-প্রেয়সীরই নামান্তর। 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'-শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি এই গ্রন্থের সর্বশেষ রচনা। কবিতাটিতে গ্রন্থটির নামকরণের বিশ্লেষণ রয়েছে। ইতিপূর্বে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'কার্তিকের কবিতা'য় কবি বলেছিলেন 'শীতের সঙ্গে জীবনের শত্রুতা / মৃত্যুর সখা সে যে ;' পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের এই রচনাতেও শীতের

স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর সেই পূর্বধ্বনিরই প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়েছে। শীতের সঙ্গে যদি থেকে থাকে মৃত্যুর সখ্য, তাহ'লে বসন্তের সঙ্গে রয়েছে নবজন্মের মিত্রতা। শীতে যা মৃত, বসন্তে তা-ই নবজাত। অতএব কবির বিশ্বাস, শীতের অভিশাপ কুড়োনো ভিন্ন বসন্তের আশীর্বাদ প্রাপ্তির দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। আর, এই বিশ্বাস থেকেই ক্রমে-ক্রমে তিনি হ'য়ে উঠেছেন অকুতোভয়; নিজের উদ্দেশেই নিজে ঘোষণা করেছেন, তাঁর আর কোনো কিছুই হারাবার ভয় নেই। কেননা পুরাতনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না-ঘটলে নূতনের আবির্ভাব সম্ভবপর নয়। তাই স্বগতোক্তির মতো তিনি সমগ্র কবিতাটিতে ব'লে চলেছেন ঃ

এসো, ভুলে যাও তোমার সব ভাবনা,… …
ফেলে দাও ভবিষ্যতের ভয়, আর অতীতের জন্য মনস্তাপ।…
যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ ;…
যাতে মনে পড়ে, ভুলতে না পারো, তাই অনেক ভুলতে হবে তোমাকে,…
হ'তে হবে রিক্ত, হারাতে হবে যা-কিছু তোমার চেনা, যাতে পথের
বাঁকে-বাঁকে পুরোনোকে চিনতে পারো, নতুন ক'রে।…
তুমি ভ'রে তুলবে, তাই শূন্যতা। তুমি আনবে উষ্ণতা, তাই শীত।…
তুমি কি জানো না, বার-বার মরতে হয় মানুষকে, বার-বার,
চলতে হয় মৃত্যু আর নবজন্মের বিরামহীন দোলায়
যদি সত্যি বাঁচতে হয় তাকে।… …
যে-মৃত্যুকে ভেদ ক'রে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল, …
জ্ব'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর—নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।

'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তরে'র 'রাত্রি' কবিতায় '… … ফিরে এসো, রাত্রি, নেমো এসো এই মৃত্যুর উপর, আনো তোমার বুক ভ'রে আমার যন্ত্রণা—স্বপ্ন দাও, দুঃস্বপ্ন দাও, দাও ঈশ্বরের মতো কবির নিঃসঙ্গতা,…'—কবি-প্রেয়সী রাত্রির প্রতি কবিহৃদয়ের এই আকুল আবেদন ১৯৫৪ থেকে '৫৮-র মধ্যে রচিত ও ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এর রচনাবিশেষেও—যেমন 'যাওয়া-আসা'য়—সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু আবেদনের অভিন্নতা সত্ত্বেও তার প্রকাশের রকমটি কিন্তু একেবারেই আলাদা। বস্তুত, এই কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর কবিচরিত্রের কোনো মৌলিক বাঁক-ফেরার জন্য আমরা, তাঁর পাঠক-পাঠিকারা, অপেক্ষায় ছিলাম। এবং আমাদের সেই অপেক্ষা একেবারে নিষ্ফল হয়নি। কেননা এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ রচনাতেই বিষয় এবং আঙ্গিক—এই উভয়গত বিবেচনায় বুদ্ধদেবের কবিপ্রতিভার দিক্‌পরিবর্তনের লক্ষণ রীতিমতো স্পষ্ট। বলা যেতে পারে, কবিজীবনের অন্ত্যপ্রায়-পর্বে'র এই গ্রন্থটি বুদ্ধদেবের কবিতায় নূতন সম্ভাবনার একটি দুয়ার উন্মুক্ত করেছে, পুরোনো একটি পর্ব সমাপ্ত ক'রে নূতন একটি

পর্বের সূচনা করেছে। এই অর্থে বলা চলে, 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বুদ্ধদেবের কবিজীবনের পর্ব-সন্ধির গ্রন্থ। সেই সুদূর 'দময়ন্তী'র কাল থেকেই শীতার্ত প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের যে-শর্তাবলী তিনি আত্ম-আরোপিত ক'রে আসছিলেন, এই গ্রন্থে উপনীত হ'য়ে সে-শর্তাবলী তিনি সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করলেন, পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। এর কবিতাবলীতে তিনি অঙ্গীকার করলেন নূতন পথ, গ্রহণ করলেন নূতন পথ পরিক্রমার শপথ ; তিনি জ্ব'লে উঠলেন অতৃপ্তির আগুনে, প্রৌঢ় প্রেমিক শেষবারের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন নিজের মুখোমুখি। এবং আমরা পেলাম সেই বুদ্ধদেব বসুকে, যিনি এতদিন পর্যন্ত ছিলেন অনেকাংশ আমাদের অপরিচিত। তখনো ভেতরের-বাইরের কত বাধা, শারীরিক-মানসিক কত বিপত্তি তাঁর জীবনকে অন্ধকারে আবৃত ক'রে রেখেছে ! কিন্তু নবসৃষ্টির প্রেরণা-উদ্দীপ্ত কবির নবজাগ্রত মানসে সার্বিক প্রতিকূলতার এই আঁধারকে আঁধার ব'লে আদৌ প্রতিভাত হ'লো না—বরং তাঁর মনে হ'লো, তা আসলে আলোরও অধিক ; কেননা একমাত্র বিরূপতার এই অন্ধকারের পটভূমিকাতেই নূতন সৃষ্টির আলো প্রজ্জ্বলিত ক'রে তোলা সম্ভব। সেই কারণেই গ্রন্থটির, আঁধারের এই মহিমান্বিত স্বরূপের স্বীকৃতিমূলক নাম,—'যে-আঁধার আলোর অধিক'।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বুদ্ধদেবের কবিমানসের এই রূপান্তরের তথা বিবর্তনের হেতু কী? অন্যান্য কারণের সঙ্গে, এই গ্রন্থের রচনাকালে, ১৯৫৫ সালে, কবির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও য়োরোপ সফরের ঘটনাও নিশ্চয়ই একটি। এই সফরের ফলে দেশান্তরের মানবজীবন ও ভিন্নতর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁর মনের দিগন্ত প্রসারিত হয়। তাছাড়া, এই সফর উপলক্ষ্যেই তিনি গ্যয়টে-হেল্ডার্লিন-রিল্‌কে, বোদলেয়ার-র‍্যাঁবো এবং পাউন্ড-লরেন্স ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য কবির রচনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। এঁদের কাব্যভাবনার ভিন্ন-ভিন্ন দিক্ নানাভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত হেতু-পরম্পরার সামগ্রিক ফলস্বরূপই তাঁর কাব্যমানসিকতায় সূচিত হয়েছিলো এই পরিবর্তন, য়োরোপীয় কবিতার নিবিষ্ট পাঠকরূপে পরিশ্রমী সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয়েছিলো তাঁর এই আত্মিক জাগরণ—যার নিঃসংশয় সাক্ষ্য এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা।

'যে-আঁধার আলোর অধিকে' কবি 'বন্দীর বন্দনা'র মতো জ্বালাময় আবেগ-তাড়িত নন, বরং অনেকাংশে আবেগ-বর্জিত, উচ্ছ্বাসবিহীন, বিবেক-নির্দেশিত এবং চিত্রার্পিত। ভাষার বিচিত্র কারুকার্য ও আঙ্গিকের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিও তিনি যথেষ্ট অভিনিবিষ্ট—এমনকি, বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, কবিতাবিশেষে অনুকৃত হওয়ার যোগ্য। ভাষার অন্দরমহলে অবাধ আনাগোনা, বিষয়বৈচিত্র্যের নিপুণ অনুসন্ধান এবং আবেগের উৎসারণে মাত্রাগত পরিমিতিবোধ তাঁর অতীতের উচ্ছ্বাস-পূর্ণ অতিকথনপ্রবণতাকে সংযত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ফলে, এতদিন পর্যন্ত যাঁর কবিতায় আবেগই প্রধান এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন, বিশুদ্ধ নাগরিকের জীবনের আড়ালে আত্মগোপনকারী একজন উচ্ছ্বসিত স্বভাবকবির

নিরন্তু তাড়নায় এ-যাবৎ যাঁর কবিতা প্রায়শ অকারণ ও অবারণ বাচনিক বাহুল্যপূর্ণ, এই গ্রন্থে তাঁর সেই সমস্ত ত্রুটি অনেকাংশে অন্তর্হিত। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে তিনি বোধ ও বোধির সমন্বয়প্রয়াসী, আত্মআবিষ্কারাকাঙ্ক্ষী এবং বিশ্লেষণপ্রবণ। এখানে তাঁর কাব্যপ্রয়াস প্রধানত নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অনন্যতা অনুসন্ধানী, সচেতন আত্মময়তার শিকড়-সংবদ্ধ। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই, এই গ্রন্থের কবিতাসমূহ অনতিব্যক্ত ও অনুচ্ছ্বসিত, প্রগাঢ় ও পিনদ্ধ। চিন্তা এগুলিতে আবেগের অধীনস্থ নয়, আবেগই চিন্তার বশীভূত। আবেগের তাড়নার পরিবর্তে চিন্তার শাসনবশতই কবিতাগুলির গঠন-গড়ন অনেকটা প্রবন্ধের, বাক্যের অগ্রগতি যতিচিহ্নের ব্যবহারবাহুল্যে মন্থর অথচ অত্বর লক্ষ্যাভিসারী— যে লক্ষ্য, গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠের পর বুঝতে অসুবিধে হয় না, শব্দের সঙ্গে তার অর্থের দ্বন্দ্বরিক্ত একাত্মতায় উপনীত হওয়া। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রয়োজনেই কবি এই কবিতাগুলিতে তাঁর বক্তব্যকে পারতপক্ষে বিস্তারিত হ'তে দেননি। স্বল্পায়তন (বেশির ভাগই সনেটের পরিসরে পরিসীমিত) এই কবিতাগুলির উচ্ছ্বাস-বিরহিত নির্মেদ পিনদ্ধতার (compactness) কতিপয় আংশিক উদাহরণ :

১.

শেষ, না আরম্ভ মাত্র ; কৈবল্য, না কুমারসম্ভব :
কেননা মহাকালের নৃত্যে নেই ভাবী ও সম্প্রতি।

২.

বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয় !
হ'য়ে থাকি বধির, যতক্ষণ চক্ষু প্রীয়মাণ ;
পদ্মরাগ চুম্বনে হারিয়ে যায় ; দৃষ্টিহীন কণ্ঠ করে পান
মদের সোনার কান্তি। অসম্ভব, সম্ভোগে দ্বিতীয়।

৩.

তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিঃসাড়, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
শেখাও সাগর-যাত্রা,.........

৪.

যদিনা স্বর্গের মধু, উর্বশীর ধীর অভিসার,
নিয়ে এসো গন্ধকে লবণে জ্বলা নরকের প্রকট নিঃশ্বাস।

৫.

শুধু, কোনো অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন—
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।

উদ্ধৃত অংশগুলির প্রথম পাঠ থেকেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়—স্পষ্ট হয় যে বুদ্ধদেব বসু এই গ্রন্থে অনেক পরিবর্তিত হয়েছেন। আগেকার উচ্ছ্বাস-উদ্দামতা আর

অবশিষ্ট নেই ; আবেগের অবিরাম তরঙ্গভঙ্গও অনেকাংশে স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। অর্থাৎ, অলঙ্কৃত ভাষায় বলা চলে, বুদ্ধদেব বসুর কবিজীবনপ্রবাহ হ্রদ পেরিয়ে সমুদ্রে নয়, সমুদ্র ডিঙিয়ে হ্রদে এসে উপনীত হয়েছে।

১৯৬৬-র ডিসেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'মরচে-পড়া পেরেকের গানে' বুদ্ধদেব বসু ভারতীয় পুরাণের একটি কাহিনীকে তাঁর বক্তব্যের রূপক হিসেবে গ্রহণ ক'রে নিজের প্রেমভাবনাকে একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একদা রাজা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টিহেতু অজন্মা আরম্ভ হ'লে দৈবজ্ঞগণৎকাররা বিধান দিলেন, আজন্ম অরণ্যবাসী, তরুণ-তাপস ঋষ্যশৃঙ্গকে কোনো উপায়ে রাজ্যের রাজধানীতে পদার্পণ করাতে পারলে রাজ্যের সেই অভিশপ্ত দশার নিরসন ঘটবে। জনৈকা বৃদ্ধা স্বৈরিণী এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ ক'রে নিজের যুবতী কন্যার রূপে মোহাবিষ্ট ক'রে ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে নিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচুর বারিবর্ষণ হ'লো। রাজ্যের অজন্মাও দূর হ'লো। রাজা লোমপাদ পরম সন্তোষে আপন কন্যার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন।

এই আদিরসাত্মক কাহিনীই গ্রন্থটির নাম-কবিতা 'মরচে-পড়া পেরেকের গানে' বুদ্ধদেবের রূপকাশ্রয়। শরতের এক সকালে পচা ও পরিত্যক্ত একখণ্ড কাঠ থেকে মরচে-পড়া একটি পেরেককে বেরিয়ে প'ড়ে থাকতে দেখা গেলো। পেরেকটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই ঘটলো এক অলৌকিক ঘটনা ; যা ছিলো নিতান্ত তুচ্ছ একটি মরচে-পড়া পেরেক, তা-ই মুহূর্তে রূপান্তরিত হ'লো এক শাপভ্রষ্ট তপস্বীতে এবং বলতে আরম্ভ করলো তাঁর আত্মকাহিনী। সঙ্গে-সঙ্গে কবির চোখে উত্তোলিত হ'লো অতীতের যবনিকা, তাঁর মনে পড়লো ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের কথা। পেরেকরূপী ঋষ্যশৃঙ্গ বলতে লাগলেন, রাজপালঙ্কে রাজকন্যার বাহুবন্ধনে তিনি তৃপ্ত হননি। রাজপ্রাসাদের প্রেম-শূন্য কামতিক্ত রজনী তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিলো। তাঁর মনে একক অধিরাণী হিসেবে বিরাজিত ছিলো সেই বারযুবতী, সেই স্বর্গস্বৈরিণী—যে তাঁকে সুকঠোর ব্রহ্মচর্য থেকে চ্যুত করতে সাফল্যলাভ করেছিলো। তাঁর সমগ্র চেতনায় অনুরণিত ছিলো প্রথম রমণী-রমণজাত 'বিশ্বের প্রথম শিহরণে'র স্মৃতি। তাঁর অজ্ঞাত ছিলো নারী কী বস্তু, অজ্ঞাত ছিলো তৃষিত অন্তরের নিভৃত আনন্দের উৎস-কেন্দ্র। তাঁর জীবনে রমণীর আবির্ভাবের সেই প্রথম স্মৃতিই পরম স্মৃতিতে পরিণত হয়েছিলো। সেই প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনায়, সেই পরম স্মৃতির রোমন্থনে এই গদ্যকবিতাটিতে বুদ্ধদেবের যে-সিদ্ধি, তাকে 'পরা' বিশেষণে বিশেষিত করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। সেই অনবদ্য বর্ণনার চারটি স্তবকের মাত্র একটি ঃ

> 'যেখানে ত্রিলোক এক অখণ্ড স্থির বিন্দুর মধ্যে সংহত,
> ত্রিকাল এক সমতল ও নিরঞ্জন বিস্তার,
> লুপ্ত সব দ্বৈত, তুমি আর আমি অনন্য—
> আমি সেই ব্রহ্মলোকে স্থান পেলাম, তার আলিঙ্গনে।'

দেহরতির এই দর্শনঋদ্ধ বর্ণনায় কবিদৃষ্টি ঋষিদৃষ্টিতে উন্নীত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের অন্য একটি কবিতা 'মোহমুদ্গরে'ও 'দেবাদিদেব কামে'র বন্দনাগান আমরা শুনতে পাই। সেই বন্দনাগীতিতে কবি প্রথমে কামের করুণাপ্রার্থী :

দেবাদিদেব কাম ! করুণা করো তুমি আমার গুরু বৈরাগ্যে। এবং পরে, বিচিত্ররূপে বিচিত্ররূপী কামদেবতার ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণান্তে, কবিতাটির উপসংহারে পৌঁছে, তিনি তাঁর উদ্দেশে 'প্রার্থনা' নিবেদনরত :

> অমর, অফুরান, ধন্য তুমি কাম, মর্মমূলে বেঁধা ধ্রুবপদ,
> ধরায় শ্যামলতা, এবং মৃত্যুজিয়মে স্বর্গছায়া যার সম্পদ !
> নিদ্রাহীন নিশা, দৃপ্ত কল্পনা, মায়াবী শিল্প, ও ভগবান—
> যেহেতু জানি, তুমি তৃপ্তিহীনে দাও নিগূঢ় এইসব অবদান,
> যাচনা, অতএব, আমাকে রাখো, দেব, বঞ্চনায় সন্তপ্ত,
> তোমার উৎসের পাতাল ছুঁয়ে যাতে আলোয় হ'তে পারি ব্যক্ত।

'বন্দীর বন্দনা'য় কামের প্রশস্তি রচনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর দুরন্ত যে-কবিজীবনের আরম্ভ, 'মরচে-পড়া পেরেকের গানে' কামের করুণা প্রার্থনায় ঘটলো তার অবসান। মধ্যবর্তী পর্বে রইলো চিরসবুজ চিরঅবুঝ যৌবনের চিরনূতন চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-লীলার বাসনারঞ্জিত বাণীরূপায়ণ, অপরাজিত এক প্রেমিকসত্তার জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের কামনা-তৃষিত কাব্যকাহিনী।

পরিশেষে, অতি সংক্ষেপে দু'টি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই—(এক) আমাদের সাহিত্যে প্রেমের কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর যথার্থ স্থান এবং (দুই) তাঁর কবিতায় সমাজ-বাস্তবতা। প্রথমটির কথাতেই প্রথমে আসি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এই ধারণাই প্রচলিত যে কবি বুদ্ধদেব বসু প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে বক্তব্যে নূতন। অর্থাৎ, প্রেমের কবিতা লিখতে গিয়ে এমন সব বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন, যা ইতিপূর্বে কেউ করেন নি। ধারণাটা সম্পূর্ণভাবে না-হ'লেও আংশিকভাবে সত্য, নয়তো বাংলা কবিতার আসরে তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে এককালে এত সোরগোল উঠতো না। সোরগোল সোরগোলই ; কিন্তু তার মধ্যেও কিছুটা সত্য থাকে। যতটা রটে, ঠিক ততটা না-ঘটলেও অন্তত কিছুটা তো ঘটেই। অতএব প্রেমের কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে সাধারণ পাঠক-প্রচলিত এই ধারণা একেবারে অমূলক বা নির্ভিত্তিক নয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না-থেকে আমাদিগকে প্রসঙ্গটির আরো একটু গভীরে নেমে যেতে হবে ; দেখতে হবে, প্রেমের কবিতায় বক্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা ঠিক কোথায়—তা কি প্রেমিকচিত্তের অপ্রদর্শিতপূর্ব দুঃসাহসিকতায়, না-কি প্রেম-সম্পর্কিত ধারণাগত সম্পূর্ণ অগতানুগতিকতায় অথবা অন্য কোথাও।

আমাদের সাহিত্য আরো অনেক দিকের মতো প্রেমের ক্ষেত্রেও নরনারীর স্বাধীন (ফলে সহজ) সম্বন্ধের প্রথম প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় কেউ নন। তাঁর সুবিপুল গদ্যসাহিত্যে তো ব'টেই, এমন কি কবিতাতেও এতদ্দেশীয় নবজাগ্রত মানুষের জয়গান

তিনিই প্রথম ধ্বনিত করেছেন। তাঁর রচনাতেই সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় সংস্কারের শাসন ও পরিবারের বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিমানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে। এবং এই নব-জাগ্রত মানুষের বন্দনাগানের অঙ্গ হিসেবেই পুরুষের পাশাপাশি নারীর সামাজিক অস্তিত্বের আকৃতিও স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্মিলিত ও যৌথ জীবনচর্যার অংশীদার হ'য়েও নারীও পুরুষের মতোই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন—এই চেতনাও রবীন্দ্রনাথই আমাদের মধ্যে প্রথম সঞ্চারিত করেছেন। অর্থাৎ, এককথায়, নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত সম্পর্ক-বিষয়ে আমাদের তৎকাল-পর্যন্ত-প্রচলিত বিশ্বাসের ভিতে তিনিই প্রথম ফাটল ধরান এবং এ-ব্যাপারে চিন্তার নূতন বিন্যাস আমাদের সামনে তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার কেন্দ্রভূমিতে এই নূতন দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নারী স্বমহিমায় বিরাজিত।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কবিতায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক-বিষয়ে এই সাবালক মনোভাবের অস্তিত্ব কোথায় বা কতটুকু? এ-কথা অনস্বীকার্য, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের বঙ্গদেশেও বিশুদ্ধ রোম্যান্টিকতার উচ্ছ্বসিত যুগ অবসিতপ্রায়—এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'প্রান্তিক'-পর্বের দ্বন্দ্বক্ষত মানুষ, নিঃসঙ্গ অথচ নির্ভীক, শূন্যহস্ত, একাকী, রিক্ত দিগন্তের মুখোমুখি এবং জীবনানন্দ-অমিয়-সুধীন্দ্র-প্রেমেন্দ্র-বিষ্ণু প্রমুখ এই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের প্রধান কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাবমুমুক্ষু ও স্ব-স্ব আবহাওয়ালালিত, তখনই 'শাপভ্রষ্ট' ও 'বন্দী' বুদ্ধদেব প্রেমের রোম্যান্টিকতায় আদ্যোপান্ত আত্মহারা, রুণুঝুনু ভাবে সম্পূর্ণ বিভোর, বিহ্বল। এবং যদিও তিরিশের দশকের এই বাসনাবিদ্ধ, নতজানু বন্দী-বিদ্রোহী প্রেমের বাস্তবতায় কখনোই উচ্চকিত নন, কিন্তু প্রেমিকের সদর্প দাবি ঘোষণায় তিনি তাঁর সমকালীন অনেক কবির চেয়েই অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠ। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কঙ্কাবতী'র অন্তর্গত 'কাল' কবিতাটির কথা, যেটি রোম্যান্টিকতাসম্পৃক্ত মৌহূর্তিক (momentary) প্রেমাবেগের বিশ্বস্ত কাব্যরূপায়ণ হিসেবে ব্রাউনিঙের 'একত্রে অন্তিম অশ্বারোহণ' (The Last Ride Together') কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। বুদ্ধদেবের এই কবিতাটি প্রেমের ঘোষণাপত্র (declaration of love) হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। স্বীকার করতেই হয়, প্রেমের অধিকারের দাবি উচ্চারণে তাঁর সমকালের অন্যান্য কবি যখন যথেষ্ট বিনীত, যথেষ্ট অবনত এবং যথেষ্ট নেপথ্যচারী, তখন প্রেমের ক্লিষ্ট গীতিকার বুদ্ধদেবই প্রেমের একমাত্র দাম্ভিক দাবিদার। প্রেমের অধিকারের এই বলিষ্ঠ দাবি-উত্থাপন কবিমানসের সংস্কারমুক্তির তথা আধুনিকতারই অন্যতম লক্ষণ, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে এই সংস্কারমুক্তি পাত্র-পাত্রীর দৈহিক দিকের বিবেচনাতেই সীমাবদ্ধ, এই আধুনিকতা দেহগত স্বাধীনতাতেই অবলুপ্ত—প্রেমিক-প্রেমিকার মনের দিগন্ত প্রসারণে এর কোনো প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব নেই। অথচ, আমরা জানি, প্রেমের সার্থকতা মাত্র 'নতুন ননীর মতো তনু' আস্বাদনেই নয়, তার সার্থকতা সেই তনুর অন্তরালবর্তী মনের উন্মোচনে। তাছাড়া, সমাজবদ্ধ মানব-

মানবীয় দ্বৈত-সম্পর্কসঞ্জাত প্রেমের পটভূমিতে যে-সমাজ ও সংসারের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, ভূমিকা অতি ব্যাপক, সে-সম্পর্কেও বুদ্ধদেব একান্ত উদাসীন। অর্থাৎ, ফলত, স্বীকার করতেই হয় যে অভিনবত্বের দাবি কমবেশী স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কবিতার বক্তব্য অগভীর ও একপেশে এবং তার চেয়েও শোচনীয়, ভবিষ্য-পরিণতিশূন্য।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি সম্পর্কে, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের কবিতায় সমাজ-বাস্তবতা বিষয়ে জানবার কথা এই যে, বিশেষভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও বিশুদ্ধ সাহিত্যের যে-আদর্শকে সামনে রেখে তিনি কবিতা রচনা করেছেন, তাতে তাঁর পক্ষে সমাজ-সংসারের অনুপুঙ্খ বাস্তবতার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হওয়ার সুযোগ যেমন ছিলো না, তেমনই সম্ভাবনা ছিলো না জনতাজীবনের সঙ্গে যূথবদ্ধ হওয়ার। ফলে, 'কালের পুতুলে'র 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা' প্রবন্ধে যদিও তিনি স্বীকার করেছেন, 'এ-কথা সত্য যে কবিও তাঁর যুগেরই সৃষ্টি ; সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং কবির ব্যক্তিগত জীবন, অচেতনভাবেই তাঁর কাব্যের রক্তমাংসকে গ'ড়ে তোলে।'—তবু, তাঁর নিজের কবিতায় কিন্তু মাত্র তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ভাবনা-কল্পনাই প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন প্রতিফলিত হয়নি। এই কঠোর ও বিরূপ মন্তব্য বুদ্ধদেবের সমগ্র কবিজীবন সম্পর্কেই প্রযোজ্য একটি সাধারণ সত্য—একমাত্র ব্যতিক্রম 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ, যেটির রচনাবলীতে, তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সামাজিক সামগ্রিক অবক্ষয়ের চাপে, প্রথম ও শেষ, মাত্র একবারই সমাজসচেতনতায় ঝল্‌সে উঠেছিলেন। বস্তুত, বিশুদ্ধ কাব্যের স্ব-সৃষ্ট পরিমণ্ডলে তিনি তখন আর স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সেই গণলগ্ন তাঁর কবিজীবনে মাত্র একবারই এসেছিলো, দু'বার নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর মানসিক অবাহাওয়াও পরিবর্তিত হ'য়ে গেলো এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'মায়াবী টেবিলে' 'দীপ' 'উজ্জ্বলতর' ক'রে আবার তিনি 'সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন' হলেন। অর্থাৎ, সমাজ-সংসারের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে আবার তিনি 'আত্মরতির সম্মোহনে' আবিষ্ট হলেন। ফলে, সাম্যবাদের প্রয়োগে মানুষের সার্বিক সমস্যার সমাধানসচেষ্টদের তরফ থেকে তাঁর ভাগ্যে জুটলো কলঙ্কিত বিশেষণ 'এস্কেপিস্ট' বা বাস্তব-পলাতক। কিন্তু এই অপবাদের প্রয়োগে তিনি দমিত হন নি, বরং তাঁদের উদ্দেশে বিনীতভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন এই ভাষায়—"কবি জড়ত্বের সমস্ত সীমাবদ্ধতার অংশীদার, অন্য দিকে তাঁর মধ্যেই জ্বলে চৈতন্যের শিখা। আধুনিক কবিকে তাই 'Repressive Anxiety Structure'-এর মধ্যে বাস করতে হয়। তাই আধুনিক কবি নিঃসঙ্গ, ব্যথিত এবং উপেক্ষিত।" এখানে আধুনিক কবি বলতে তিনি যাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি নিশ্চিতরূপে তাঁদের সর্বোত্তম প্রতিভূ এবং এই কবিদের নিঃসঙ্গতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তিনি বৃহত্তর সমাজবাস্তবতার সঙ্গে অনন্বিত (alienated) নিজের উৎকেন্দ্রিক সাহিত্যাদর্শকেই সমর্থন করেছেন। ফলত, আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে social realism নয়, romantic idealism-ই ছিলো তাঁর কবিসত্তার নিঃশ্বাসবায়ু।

বুদ্ধদেব বসু আত্মনিমগ্ন, এমনকি আত্মকেন্দ্রিক কবি। এখানেই তাঁর যা-কিছু সবলতা এবং এখানেই তাঁর যা-কিছু দুর্বলতা। তাঁর জগৎ বিশুদ্ধভাবে একজন individual বা ব্যক্তির জগৎ, একান্তভাবেই একজন কবির জগৎ। সংকীর্ণ, কিন্তু সম্পূর্ণ তাঁর সেই জগতের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনাও তাই প্রধানত কবি ও কাব্যগত। তাঁর অভিজ্ঞতা অসীম নয়, কিন্তু অকৃত্রিম। অতএব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিশ্বাস 'শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত', স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা 'কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত'। এবং এই ব্রতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে যখন তিনি কবিতার ওপরেই কবিতার-পর-কবিতা লিখতে পেরেছেন, লিখে গিয়েছেন, তখন ধ'রেই নিতে হবে যে কবিতা তাঁর কাছে কেবল ছন্দের রিণিঝিনি অথবা ভাবের বুদ্বুদমাত্র ছিলো না, ছিলো তাঁর জীবনের তীব্রতম অভিজ্ঞতা, সর্বতোব্যাপ্ত একটা গভীর অনুভূতি—

হ্লাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিষ্ঠুর, অসুখী,
সরস্বতী, ভেনাস, ক্ষণিক লক্ষ্মী, অনন্ত বাসুকী ··· ···

এরপরেও বুদ্ধদেবের অভিজ্ঞতার অনতিব্যাপ্তি বিষয়ে অনুযোগের অবকাশ কোথায় ??

কবি হিসেবে বিষ্ণু দে কী ছিলেন—'pure poet' না 'poetical poet'?—এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। রজার ফ্রাই, আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যসমালোচনায় দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতার গুণে যিনি নূতন ধারার প্রবর্তকরূপে স্বীকৃত, বিশ্বসাহিত্যের তাবৎ কবিদের উপরোক্ত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং এই দু'-ধরনের কবিদের মৌলিক পার্থক্য নির্ণয়-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'The poetical poet makes use of words and materials already consecrated by poetry, and with this he ornaments and embroiders his own theme.' অপরপক্ষে, pure poet-দের বৈশিষ্ট্যবাহী দৃষ্টান্তস্বরূপ মালার্মেকে গ্রহণ ক'রে তিনি আমাদিগকে জানিয়েছেন, 'Mallarme's method is the opposite of this. His poetry is the unfolding of something implicit in the theme.' এ-বিষয়ে রোম্যান্টিসিজম ও ক্ল্যাসিসিজমের দুই প্রধান প্রবক্তা, মিডলটন মারী এবং মারিও প্রাৎজ্-এর মতামতও ('The Romantic Agony' গ্রন্থে) অনেকটা অনুরূপ। বিষ্ণু দে অবশ্য মালার্মে নন অথবা মালার্মের কাব্যাদর্শ তাঁর অন্বিষ্টও ছিলো না; কিন্তু ওপরের উদ্ধৃতি দু'টি থেকে pure poet-দের সঙ্গে poetical poet-দের প্রধান পার্থক্য সম্পর্কে আমরা সম্যকরূপে অবহিত হ'তে পারি।

বিষ্ণু দে কোন্‌টি ছিলেন, pure poet অথবা poetical poet—এই বিতর্কে প্রবৃত্ত হবার প্রারম্ভেই স্বীকার ক'রে নেয়া ভালো যে এই দুই শ্রেণীর কবিদের মধ্যবর্তী পার্থক্য মৌলিক হ'লেও একেবারে অসেতুসম্ভব (unbridgable) কিছু নয়। কেননা pure poet-দের অনুধ্যানের বিষয় যদি হ'য়ে থাকে বস্তুর রূপ, poetical poet-দের সাধনার বিষয় তাহ'লে সেই রূপের উন্মোচন। অর্থাৎ, এই প্রভেদ যত না বিষয়ে, তার চেয়ে ঢের বেশি বিষয়ের যাথার্থ্যের অনুভূতিতে; যতটুকু চিন্তায়, তার তুলনায় অনেক বেশি সেই চিন্তা-সংশ্লিষ্ট অনুচিন্তায়। কেননা বিষয়ের রূপধ্যান মাত্র pure poet-দের এবং বিষয়ের প্রকাশসাধনা কেবল poetical poet-দেরই একান্ত এলাকাধীন—এমন সিদ্ধান্ত কষ্টকল্পিত যুক্তিবিস্তারেও শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে না, যেহেতু রূপচিন্তন যেমন pure poet-দের প্রধান লক্ষণ, তেমনই রূপের প্রকাশও সেই লক্ষণেরই মুখ্য অনুষঙ্গ। অপরদিকে, রূপের অনুধ্যান-ব্যতিরেকী প্রকাশ-সাধনাও poetical poet-দের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে বাধ্য। আসলে, কবিমাত্রেই রূপসতৃষ্ণ ও সৌন্দর্যসচেতন, এবং রূপের প্রকাশ ভেদের মতো রূপের প্রকাশরীতিতেও রয়েছে বহুবিধ বৈচিত্র্য। ফলত, রূপের অনুধ্যান এবং তার উন্মোচনের পথসন্ধান—এই উভয় তাড়নার জটিল দ্বন্দ্বাবর্তে pure-poetical-

নির্বিশেষে কবিমাত্রেই মনোচৈতন্যগত বিবেচনায় চিরবেপথু ও চিরঘূর্ণমান। অথচ, তৎসত্ত্বেও, অস্বীকারের উপায় নেই, এই দুই শ্রেণীর কবির মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে ; কিন্তু সে-পার্থক্য, আবার বলি, যত না অন্তর্মুখ, ততোধিক বহির্মুখ। অর্থাৎ, প্রতিমান টেনে বলা যেতে পারে, একজন স্রষ্টার সঙ্গে একজন নির্মাতার কিংবা একজন দার্শনিকের সঙ্গে একজন বৈজ্ঞানিকের যে-প্রভেদ, এই উভয় শ্রেণীর কবির পার্থক্যও অনেকটা অনুরূপ। যিনি প্রকৃত স্রষ্টা এবং যথার্থ দার্শনিক দৃষ্টির অধিকারী, তিনি অনাসক্ত স্বভাবের মানুষ—তিনি সুখে-দুঃখে সমভাবে অবিচলিত ও অচঞ্চল এবং তিনি ভোগজ আনন্দ আস্বাদনের অন্তেও চরিত্রধর্মে বিগতস্পৃহ। সৃজনাত্মক নির্বিশেষ জ্ঞানের আত্মগত উপলব্ধিই তাঁর অভিলষিত। পক্ষান্তরে, একজন নির্মাতা ও বিজ্ঞান-মনস্কের অভিসন্ধি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। শর্তহীন অথবা চূড়ান্ত বিশ্বাস ব'লে তাঁর মানসিকতায় কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই ; বস্তুত, তা সম্ভবপরই নয়। আপেক্ষিকতায় তিনি আস্থাশীল এবং নিত্যনূতন ও বিশেষ জ্ঞানের সন্ধানে তিনি সতত তৎপর। অর্থাৎ, স্রষ্টা ও দার্শনিকের এবং নির্মাতা ও বিজ্ঞানীর মননাত্মক এই প্রভেদ প্রকৃতপক্ষে জগৎ ও জীবনপর্যবেক্ষণের দৃষ্টিকোণের প্রভেদ, যার মূলে নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির, দেখাশোনা ও চিন্তা-ভাবনার বিস্তৃত ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বব্যাপারকে ধ্যানন ও পক্ষবেক্ষণ করার এই যে পার্থক্য, যা এই দুই শ্রেণীর মানুষে বিদ্যমান, তা pure poet এবং poetical poet-দের ক্ষেত্রেও প্রায় সমভাবেই বর্তমান।

এই সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ আলোচনাকে বিষ্ণু দে-র কাব্যপাঠের ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করলে এবং এই আলোচনার আলোকে বিষ্ণু দে-র কবিপ্রতিভার স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রয়াসী হ'লে এ-কথা স্বীকার না-ক'রে গত্যন্তর নেই যে তাঁর কাব্যপ্রতিভার সমূহ মৌলিকতা সত্ত্বেও তাঁর সৃজনক্ষমতার স্ফূর্তি বিশুদ্ধ কবিতা রচনার চেয়ে কবিতার কাব্যকারু-কৃতিত্বেই অধিকতর বলীয়ান। অর্থাৎ, বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সামগ্রিক জটিলতার দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা (dialectical realism) বিষয়ে উদাসীন থেকে বিশুদ্ধ কবির আত্মকেন্দ্রিক ভাবকণ্ডূয়ন কদাচ তাঁকে আকৃষ্ট করে নি ; বরং কবি হিসেবে সর্বদাই তিনি প্রয়াসী থেকেছেন তাঁর কবিতার আঙ্গিক কাঠামোয় বৃহত্তর সমাজবাস্তবতার দ্বান্দ্বিক অমোঘতাকে (dialectical inevitability) সংযত বলিষ্ঠতায় শিল্পরূপায়িত করতে। এই শতকের তিরিশের দশকের প্রধান বাঙালী কবিদের সঙ্গে এখানেই তাঁর মৌলিক পার্থক্য এবং এই পার্থক্যই কবি হিসেবে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর, এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের তিনি অন্যতম প্রধান কাব্যব্যক্তিত্ব।

বিষ্ণু দে-র কাব্যের পটভূমিকাগত যে বিপুল বিস্তার, তা থেকেই তাঁর এই বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমাদের পক্ষে সচেতন হওয়া সম্ভব। তাঁর কাব্যের পটভূমি শুধু বিস্তৃতই নয়, তা একই সঙ্গে যথেষ্ট বৈচিত্র্যমণ্ডিতও। সেই পটভূমিতে দেশ ও কালের ব্যবধান যেমন অবস্থাবিশেষে অবলুপ্তপ্রায়, তেমনই কবিতাবিশেষে মানবিক, সামাজিক এবং

বৈশ্বিক ঘটনাবলীও অচ্ছেদ্য বন্ধনের সংবদ্ধতায় (compactness) সমুপস্থিত। এবং নিজের কবিতার পটভূমিতে জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত এই ত্রৈমাত্রিক বাস্তবতার যুগপৎ উপস্থিতি তাঁর নিজেরও উপলব্ধির অন্তর্গত ছিলো ব'লেই ডব্লিউ. জি, আর্চার সাহেবকে লেখা আরেক সাহেব অ্যালান লুইস্-এর একটি চিঠির অংশ বিশেষ—'There is so much to anger you in the human scene, so much to dismay you in the social scene, so much to humble you in the universal scene.'—নিজের কবিতার পটভূমির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন। একদিকে স্বদেশ ও স্বকাল, অন্যদিকে সর্বদেশ ও সর্বকাল—এ-দু'য়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত তাঁর কবিমানস, এ-দু'য়ের সংঘাতে সংক্ষুব্ধ তাঁর কাব্যের পটভূমি। কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাকে মর্মে-মর্মে অনুভব ক'রেও শেষপর্যন্ত তা থেকে মুক্ত ক'রে এক উদার সামঞ্জস্যে নিজেকে তিনি সুস্থির করতে পেরেছিলেন, পেরেছিলেন তাঁর কাব্যের পটভূমিকে স্থৈর্যের এক ভিন্নতর বাতাবরণে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে। ফলে, প্রথম জীবনের তুঙ্গস্পর্শী রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসের স্থলে মধ্যজীবন থেকেই তাঁর কবিতায় দেখা দিয়েছে এক ধরনের ক্ল্যাসিক্যাল পিনদ্ধতা—যদিও মনে রাখা প্রয়োজন, যথার্থ অর্থে তিনি ক্ল্যাসিসিস্ট নন, তিনি আশিরনখর রোম্যান্টিক। স্বদেশী-বিদেশী প্রাচীন ঐতিহ্যে তাঁর পৌনঃপুনিক প্রত্যাবর্তন প্রকৃতপক্ষে তাঁর রোম্যান্টিক নস্ট্যালজিয়ারই প্রমাণ মাত্র। ক্ল্যাসিসিজম তাঁর কবিতার বহিরঙ্গ-পরিচিতি, অন্তরঙ্গ-পরিচয় নয়। বস্তুত, তাঁর ক্ল্যাসিসিজমের আমেজ-লাগা কবিতাগুলিতে আমরা যার সন্ধান পাই না, তা, এজ্‌রা পাউন্ড-এর ভাষায় 'পার্সন্' এবং যার সজ্জা পাই, তা-ও পাউন্ড-এরই ভাষায় 'পার্সোনা'; অর্থাৎ, এই কবিতাগুলিতে আমরা এগুলির রচনাকার কবিমানুষটিকে পাই না, পাই তার মুখোশটিকে।

যে-কোনো কবিকে সঠিকভাবে বুঝতে হ'লে শুধু তাঁর কবিতার পশ্চাদ্‌ভূমি (hinterland) উন্মোচন কিংবা ইতিহাসবর্ণন অথবা আনুষঙ্গিক তথ্য পরিবেশনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সেই সঙ্গে তাঁর কবিতার অ্যানাটমিরও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ প্রয়োজন এই কারণে যে একমাত্র এই বিশ্লেষণের পথে এগোতে-এগোতেই আমরা একে-একে খুঁজে পেতে পারি তাঁর কাব্যপ্রেরণার সব ক'টি গোপন উৎস-মুখ। আর, এ-কাজ অতি দুরূহ এই হেতু যে এটা তাঁর কবিতার মাত্র ইতিবৃত্তকথনই নয়, এটা আসলে তাঁর কবিতার জরায়ু ও ঔরসের সম্পর্ককে আবিষ্কার করাও—বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে অবিচলিত ধৈর্যে লক্ষ্য করা কালক্রমে কীভাবে তাঁর কবিতার পরিভাষা ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে, বাক্‌ভঙ্গিমা বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হ'য়ে উঠেছে, ভাবনা-কল্পনায় কীভাবে কখনো বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা, আবার কখনো-বা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই প্রাধান্য অর্জন করেছে, পর্ববিশেষে কীভাবে তাঁর কবিতা তীব্র বহির্মুখিতা এবং মগ্ন অন্তর্মুখিতার দোলাচলে আন্দোলিত হয়েছে ইত্যাদি এবং তাঁর কবিতার দৃঢ়তা (firmness) ও চারুতা (tenderness)-ঘটিত আরো অনেক কিছু—অর্থাৎ, এক

কথায়, কীভাবে একটু-একটু ক'রে তাঁর কবিতার সামগ্রিক বিবর্তন ঘটেছে, তা অভিনিবেশপূর্বক অনুধাবন করা।

বিষ্ণু দে-র নিবিষ্ট পাঠক-পাঠিকামাত্রেই অবগত আছেন অথবা ক্রমশই অবগত হন যে এই কবির কবিতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাটা কেবল কবিতার ব্যাপারই নয়, সেই সঙ্গে আরো অনেক আনুষঙ্গিক ব্যাপার ; কবিতার তো অবশ্যই, কিন্তু তার সঙ্গে, কাব্যরসের চরম সিদ্ধি সত্ত্বেও, কাব্যাতিরিক্ত বহু চিন্তা-ভাবনা, অভ্যাস-অভীপ্সা, মনোভঙ্গি-দৃষ্টিকোণ ইত্যাদির বিচিত্র ব্যাপারও বটে। ফলত, এটাও তাঁদের জানতে হয়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা জানতে আগ্রহী হন, এই কবির স্বজনী স্বভাবে (creative nature) স্বদেশ ও স্বকাল যেভাবে বিধৃত ছিলো, কীভাবে তা উন্মোচন করা সম্ভব, কীভাবে সম্ভবপর যে-তত্ত্ব ও তথ্যাবলী তাঁর কাব্যজগতকে তিলে-তিলে গ'ড়ে তুলেছিলো, সে-সমস্তকে পারম্পর্যের সূত্রে গ্রন্থন ও আবিষ্কার করা ? কেননা বিষ্ণু দে-র ভক্তমাত্রেই জানেন, তাঁর কবিতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণাস্বরূপ তাঁর স্বদেশ ও স্বকালভাবনার প্রকৃতি উন্মোচন এবং তাঁর কাব্যজগৎ নির্মাণের উপাদানকল্প তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর আবিষ্কার ভিন্ন এই জটিল মানুষটির কবিস্বভাবকে চেনা সহজ নয়, জানা সম্ভব নয় তাঁর কবিতার জটিলতার যথার্থ স্বরূপ। এবং এই উন্মোচনে ও আবিষ্কারে যদি তাঁরা সফল হন, তাহ'লে তাঁদের প্রয়াসের পুরস্কার হিসেবে এই সিদ্ধান্তেই তাঁরা উপনীত হবেন যে সমকালের, এমন কি সময়ুগেরও, প্রতিনিধিত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে কবি বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি—যেহেতু তাঁর কবিতার আদ্যোপান্ত ইতিবৃত্তেই প্রকাশিত হয়েছে আমাদের দেশের ও কালের যুগসত্য।

কিন্তু কী সেই যুগসত্য, যাতে বিষ্ণু দে দ্বন্দ্বের অনেকগুলি স্তর অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন ? সেই যুগসত্য ধ্যানের সঙ্গে ধারণাকে হরগৌরীমিলিত করার—সংক্ষেপে যার অর্থ, সমকালীন যুগপ্রেক্ষিতে, এই সিদ্ধান্তে অনিবার্যভাবে উপনীত হওয়া যে মানব-সংস্কৃতির বিকাশে-বিবর্তনে কবি ছাড়া যেমন জয় বৃথা, মানব ইতিহাসের গতিনির্ধারণেও জনতার জয়গান ভিন্ন তেমনই কবিতারচনা অসম্পূর্ণ ; কেননা আপাত-সাধারণ-অথচ-অসাধারণ জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যে উপনীত হ'তে না-পারলে কবির কাব্যপ্রয়াস অনর্থক, তাঁর বোধ-বুদ্ধি-বিচার অসার্থক, তাঁর ইতিহাসচেতনা অপ্রয়োজনীয়—এমনকি তাঁর কালজ্ঞানও অপ্রাসঙ্গিক। এই যূথজনতাবন্দনাব্যঞ্জক যুগসিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হয়তো ফ্রান্সের আরাগঁ ও এলুয়ার, রাশিয়ার গর্কী ও মায়াকোভস্কী এবং চিলির নেরুদা বিষ্ণু দে-কে মানসিকভাবে উদ্দীপিত ক'রে থাকবেন ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এটা নিছক বৈদেশিক প্রভাবপুষ্ট একটা ব্যাপারমাত্র, ভিন্নদেশীয় উদাহরণ থেকে নিজের মতের ও পথের শুধু সূত্রসন্ধান। বরং এটা, অন্তত বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে, নিজের দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, নিজের দেশের ইতিহাসের শিক্ষায়, নিজের দেশের শ্রেণীবিন্যাসের সংস্থানে এবং সর্বোপরি নিজের অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ

বিশ্লেষণে একটি সহজ প্রতীতিতে উপনীত হওয়া, একটি সুদৃঢ় প্রত্যয়ে সুস্থির হ'তে পারা। ফলে, তাঁর কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই এটা নিভৃতে গুঞ্জরণের বিষয়ে নয়, প্রকাশ্যে ঘোষণার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, হ'তে পেরেছে যে সমাজের অধিজনরা নয়, কবিতার প্রধান প্রেরণা সমাজের ঊনসম্প্রদায়। এবং যেহেতু তাঁর বিশ্বাস, আপামর জনসাধারণই সামাজিক জীবনের মুখ্য নিয়ামক, অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত সমাজের সাধারণ-জন থেকে বিবিক্ত হ'য়ে কবিতা সম্ভব নয়, এবং তাঁর প্রত্যাশা, কবিতার উৎসারণের মতো কবিতার উদ্বর্তনও ঘটবে সাধারণ মানুষের মঙ্গলকামনায়, অগণিত জনগণের মহিমা-কীর্তনে।

এই প্রতীতি-প্রত্যয়ে সুস্থির হ'য়েই, এই বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত-প্রত্যাশায় অবিচলিত থেকেই লোকপ্রেমে তিনি আপ্লুত করেছিলেন নিজেকে, আচ্ছাদিত করেছিলেন নিজের কবিতাকে —অবশ্য প্রথাসিদ্ধ লৌকিক মোহ-পারবশ্য থেকে নিজেকে কিঞ্চিৎ আড়ালে রেখে, নিজের কবিতার অনাসক্ত ও তদ্‌গত ভাবকে নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণে এনে। কিন্তু কেবল লোক-প্রেমকেই নয়, মধ্য ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বপ্ন-কামনা, বিলাসব্যসন, আর্থিক-সামাজিক অবস্থান ও সাপেক্ষ সম্পর্ক (reciprocal relationship)—ইত্যাদির সমস্ত কিছুকেও তিনি তাঁর সমকালীন যুগের অস্থির ও আবিল পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত ক'রেই, দৃষ্টিকে নিরাসক্ত রেখে, কবিতার পরিভাষায় ও কাব্যের সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগ শিল্পীর নিরাসক্তির অন্তরালে রয়েছে: কিন্তু কবির নিজস্ব চেতনা ও উপলব্ধি শব্দের শরীরে রূপ পেয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মর্মে সোজা পৌঁছে গিয়েছে। কবি হিসেবে এখানেই তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতার সিদ্ধি এবং এভাবেই তাঁর কবিতা নিছক রোম্যান্টিক আবেগ-আপ্লুতি থেকে যাত্রা শুরু ক'রে কৌতুক-আনন্দ-স্পর্ধা-বোধ-বোধি-উপলব্ধি—চিত্তবৃত্তির এতগুলি ক্রমান্বিত স্তর অতিক্রমের অন্তে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বৃত্তে ক্রমে প্রসারিত হ'তে-হ'তে, প্রজ্ঞার সঙ্গে পূর্ণকে সমন্বিত ক'রে, অবশেষে উপনীত হয়েছে এক আশ্চর্য সংশ্লেষণে (synthesis), শেষ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে শতধারা জীবনের বিপুল বৈভবে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও অস্বীকারের উপায় নেই, কাব্যবিশ্বাসে পাউণ্ড ও তাঁর শিষ্য এলিয়টের ছায়াশ্রয়ী এবং মননসামর্থ্যে ক্ষুরধার বুদ্ধি-বৈদগ্ধের পরাকাষ্ঠা বিষ্ণু দে অদীক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে রীতিমতো, ব্রাত্য, শিল্পীস্বভাবে সম্পূর্ণ ব্রাত্যধর্মী, —যে-ব্রাত্যধর্মিতা বাংলার ব্রতকথা-উপকথা-রূপকথা এবং মঙ্গলকাব্যের কাহিনী ও লোকসঙ্গীতকে তাঁর কাব্যের বিষয়ে পরিণতকরণে, অর্থাৎ, লোকসংস্কৃতি (folk culture) এবং লোকনন্দন (folk aesthetics)-এর প্রতি আন্তরিক ও আত্যন্তিক আগ্রহের মাধ্যমে, স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। বিষ্ণু দে ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে এই অনুভূত অভিজ্ঞতা বা felt experience-এর সহজ স্বীকৃতি তাঁর ও তাঁর কবিতার অনুরাগী-অনুরাগিনীদের মনে কতখানি প্রবল, তা সঠিকভাবে বলতে না-পারলেও এটা নির্দ্বিধ-চিত্তেই বলতে পারি যে আমার প্রথম যৌবনে, আধুনিক বাংলা কবিতার নিষিদ্ধ ফল

আস্বাদনের রোমাঞ্চকর পর্বে, বিষ্ণু দে-র কবিতার বিরল যে-বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রতি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করেছিলো, তা হচ্ছে তাঁর কবিতায় লোকায়ত চেতনার গভীরতার সঙ্গে নানন্দিক রূপের সহজ সম্মিলন। এবং আজ, যখন তিনি তাঁর আরাধ্য কাল-পুরুষের সঙ্গে চিরতরে মিশে গেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও তাঁর কবিজীবন সম্পর্কে আরো অনেক কথাই মনে ভিড় ক'রে আসছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা বর্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় অনেকাংশেই অবান্তর। অতএব তাঁর মাত্র কাব্যকৃতির এই বিশেষ দিক্‌টি সম্পর্কে যে-কথাটি বিশেষভাবে আমি বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে আধুনিক বাংলা কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র-মধুসূদন, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র কিংবা বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের মতো কবির কালপ্রবাহকে অতিক্রম ক'রে এসেও যে তার লোকায়ত যোগসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় নি অথবা যুগানুক্রমে অনুসৃত তার লৌকিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান কবিপুরুষ বিষ্ণু দে-র রচনাতেই বোধ হয় সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এবং তাঁর কবিতায় লৌকিক উপাদানের এই যে ব্যবহার আর তাঁর কাব্যরীতিতে লৌকিক ঐতিহ্যের এই যে অনুসৃতি, তা কিন্তু সম্পূর্ণতই সজ্ঞান ও সচেতন ; কেননা গোত্রজ বিচারে ধ্রুপদী রীতির শিল্পী হ'য়েও লোকায়ত ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতিতে তিনি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন। একই সঙ্গে এটাও সমানভাবেই স্মরণীয় যে তাঁর এই আস্থা সময়ের আবর্তনের সহযাত্রী হ'য়ে ক্রমশই গভীর থেকে গভীরতর হ'য়ে উঠেছে।

একদা এই কবি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার ('সেই তো তোমাকেই' ঃ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার') প্রারম্ভেই প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'কোথায় যাবে তুমি? যেখানে যাও সেই / একই মাটি জল একই নীলাকাশ— / জন্মভূমি যেন।' এই মাটি-জল আর মানুষকে নিয়েই মানুষের জন্মভূমি, তথা আত্মভূমি। ফলে, সৎ কবিমাত্রেই, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই থাকুন না কেন, কিছুতেই যেমন পারেন না আলো-বাতাস-জল-মাটির বন্ধনকে অগ্রাহ্য করতে, মানুষের প্রভাবকে অতিক্রম করতে, তেমনই পারেন না লৌকিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে। একজন নিষ্ঠাবান কবি হিসেবে বিষ্ণু দে-ও পারেন নি এই জল-মাটি-আলো-বাতাস আর মানুষের প্রভাব এবং ঐতিহ্যকে অতিক্রম ও অস্বীকার করতে। ফলে, তাঁর কবিতায় আমরা একদিকে যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার প্রভাব এবং ক্ল্যাসিক্যাল (বিশেষত গ্রীক ও রোমান) ইমেজ বা বাক্‌প্রতিমা এবং সিম্বল বা প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করি, অন্যদিকে তেমনই প্রাচ্য (বিশেষত বাঙালী ও সাঁওতালি) লৌকিক কাহিনী, রূপকথা ও ছড়া ইত্যাদির আশ্রয়গ্রহণও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনের কোনো পর্বে তিনি হয়তো গ্রামবাংলার সোনালি পৌষের মধুর স্মৃতিতে কিংবা কার্তিকের নবান্ন উৎসবের বিগত স্বপ্নে একান্ত অতীতচারী, কোনো পর্বে উরাওঁ কিংবা সাঁওতালি অথবা ছত্তিশগড়ী জীবনরীতির আদিম রূপোন্মোচনে তৎপর, কোনো পর্বে বাঙালী লোকশিল্পের মহিমা প্রচারে অথবা পশ্চিমী ধ্রুপদী ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে, দেবব্রত বিশ্বাস-মালতী ঘোষাল-সুচিত্রা

মিত্রের কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীতে কিংবা অবনীন্দ্রনাথ-যামিনী রায় বা পিকাসো-মাতিসের চিত্রে আত্মমগ্ন, আবার কোনো পর্বে হয়তো-বা রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিস্মিত মোহে তিনি অর্পিতবোধি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রপ্রীতির পরাকাষ্ঠাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পংক্তিকে তিনি তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণে পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন এবং সে কাব্যগ্রন্থটি পাঠ ক'রেই সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মীরূপে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর সেই কাব্যগ্রন্থটির নাম আমরা সকলেই জানি, 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। তাছাড়া, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহু অপরিবর্তিত পংক্তি তো তাঁর বহু কবিতার লৌকিক চালচিত্রস্বরূপ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিষ্ণু দে-র কবিসত্তার আপাত-দুরূহতার বাইরে বিস্তৃত আছে সহজ-সরল-স্বাভাবিক আদিম লোকজীবনযাত্রার নানাদিক এক ঘাসীজমি, যার আকাশে-বাতাসে জীবনগীতি নিয়তই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লোকসঙ্গীতের উদাত্ত-গভীর সুরে। সেখানে আছে রূপকথার কাঁড়ির পাহাড়, কাঞ্চনমালা, পারুল বোন ইত্যাদি লৌকিক প্রতীকের অন্তরালে স্বপ্নরঙীন রূপকথার রাজ্যে কবির অস্থির স্মৃতিসঞ্চরণ ('সাত ভাই চম্পা'), গ্রামবাংলার লালকমল-নীলকমলের রূপকথার প্রতীকে কৃষাণ-জীবনের অন্তরঙ্গ কথা ('মৌভোগ' ঃ 'সন্দ্বীপের চর'), আদিবাসী ছত্তিশগড়ীদের প্রেম-প্রণয়ের মধুর কাহিনী ('ছত্তিশগড়ী গান' ঃ 'সন্দ্বীপের চর'), সাঁওতালদের জীবনের আঙ্গিকে আদিবাসী সমাজের লোক-চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ ('সাঁওতাল কবিতা' ঃ 'সন্দ্বীপের চর'), সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ইন্দ্রধনু, তেপান্তরের পাহাড়, চাঁদিনী প্রান্তর ইত্যাদির প্রাকৃত প্রতীকে আধুনিক জীবনযন্ত্রণার কাব্যচিত্র ('অন্বিষ্ট' ঃ 'অন্বিষ্ট'), শ্রমজীবী মানুষের চষা নদীপ্রান্তর ('সন্দ্বীপের চর' ঃ 'সন্দ্বীপের চর') এবং এবম্বিধ আরো অনেক কাঙ্ক্ষিত কাব্যসম্পদ।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় অনুসৃত লৌকিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে অন্য একটি দিক্‌ও গভীর-ভাবে অনুধাবনযোগ্য। সেই দিক্‌টি হচ্ছে তাঁর কবিতায় বহুল ব্যবহৃত 'বাপ', 'ছোথা', 'বটে' ইত্যাদি এবং লোকজীবন থেকে তুলে-আনা এ-ধরনের আরো অনেক লোকমুখের শব্দের সচেতন ও সযত্ন নির্বাচন—যেগুলির সাহায্যে তাঁর কবিতায় তিনি নির্মাণ করেছেন মৃত্তিকাভিসারী এক আদিম আবহ যার পরিমণ্ডলে কোমল দেশজ শব্দের ব্যবহারে গুন-গুন ক'রে ওঠে এক আশ্চর্য সাঙ্গীতিক ধ্বনিমূর্চ্ছনা (Lilt)।

এই সঙ্গেই প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে আরো নিবেদন করি যে পৌরাণিক প্রেরণায় আধুনিক সামাজিক সমস্যার উৎস-নির্ণয়ে এবং তার সমাধানের হাতিয়ার নির্মাণে সিদ্ধ-হস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র সাম্যবাদী চেতনা শুধু ভারতীয় পুরাণের উপমা টেনেই ক্ষান্ত হয়নি, দেশী-বিদেশী লোকসংস্কৃতির যুগল সম্মিলনেই তা মানবমুক্তির অমৃত-কুম্ভের সন্ধান করেছে—যদিও তাঁর কাব্যে সাম্যচেতনার পৌরাণিক প্রতীক বহুলাংশেই প্রচ্ছন্ন, দুর্বোধ্য ও অনুপলব্ধ। এবং এই শেষোক্ত কারণেই সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালী

কবিদের মধ্যে এ-বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় একজন খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

আগেই দেখেছি, বিষ্ণু দে-র কাব্যের পটভূমি অতি বিস্তৃত। কিন্তু তাঁর কেবল কাব্যের পটভূমিই নয়, মনের ক্যান্‌ভাসও বিশাল মাপের। সেই সুবিশাল ক্যান্‌ভাসের পরিধি নাগরিক বুদ্ধিপ্রকর্ষের চূড়ান্ত থেকে গ্রামীন লৌকিক জীবনের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। তাঁর মনের ক্যান্‌ভাসের এই বিশাল ব্যাপ্তির কারণেই অভিজ্ঞ পাঠক ও পাঠিকার কাছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩) থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' (১৯৭৮) পর্যন্ত প্রবাহিত কবিতার পাঠ, সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় (total impact), প্রতিভাত হয় ছোটো-বড়ো-লঘু-গুরু অজস্র নোটেশনপূর্ণ এক মহাসঙ্গীতরূপে। বহতা কবিতার এই মহা-সঙ্গীত রচনার নেপথ্যে অবশ্য রয়েছে কবির সেই নৈর্ব্যক্তিকতা, যা, যে-কোনো জাত-শিল্পীকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুখ-আশা-নিরাশার তরঙ্গিত অস্থিরতা থেকে বিযুক্ত ক'রে স্বতন্ত্র সত্তায় অধিষ্ঠিত করে। মানববিদ্যার অন্যান্য শাখার শিল্পীদের থেকে, এ-বিষয়ে, যাঁরাই কবিতা লেখেন, তাঁরাই অবগত আছেন, কাব্যশিল্পীদের পার্থক্য কত প্রবল। এই নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন, অর্থাৎ, আত্মবিলোপী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, ভাস্কর, চিত্রকর, সঙ্গীতকার—এমনকি বাস্তুকারের পক্ষেও কত অনায়াসসাধ্য, অথচ কবির পক্ষে কত গভীর আয়াসসাপেক্ষ। বিষ্ণু দে পেরেছিলেন—তাঁর কবিতায় প্রমাণ আছে—যথার্থ শিল্পীর মতো এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে, এই দ্বৈতভূমিকায় অবিচলিত ও আত্মপ্রত্যয়ী হ'য়ে থাকতে। বস্তুত, তার সুদীর্ঘ কবিজীবনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আগাগোড়াই এই অভীষ্ট সিদ্ধি অর্জনে অর্জুনের মতো তিনি ছিলেন একলক্ষ্য, স্থির—যদিও এ-সাধনা তাঁর মতো ধীসম্পন্নের পক্ষেও আদৌ সহজ ছিলো না। সাধনার সেই দুরূহতাকে তিনি বার-বার অতিক্রম করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতার সাবলীল লঘু চাপল্যে, তাঁর কবিতায় পরিহাস প্রয়োগের সহজ সাফল্যে।

বিষ্ণু দে সম্পর্কে জানাবার এই এক আশ্চর্য তথ্য যে তাঁর কবিপ্রতিভার বিবর্তনের পর্বসংখ্যা তিন—আত্ম-অন্বেষণ পর্ব, এলিয়ট-আবিষ্কার পর্ব এবং মার্ক্সবাদে দীক্ষা পর্ব; তাঁর কবিমানসের বিকাশে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্বের সংখ্যা প্রধানত তিন—রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট এবং মার্ক্স ;—এমন কি কবি হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যের সংখ্যাও মূলত তিন—বিচিত্র ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রস্থানের অনায়াস-কুশলতা এবং দীর্ঘ কবিতা রচনায় স্পষ্ট পারঙ্গমতা। বলাই বাহুল্য, এই দিক্‌গুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণই তাঁর কাব্য-কৃতিত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন।

বিষ্ণু দে জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার গোলদীঘি অঞ্চলের দে-বিশ্বাসদের নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত বনেদী পরিবারে। পিতার সস্নেহ উৎসাহে অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ ঘটে। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তাঁর গ'ড়ে ওঠার সময় এবং অবশ্যই সেই সঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভার বিবর্তনের প্রথম পর্বেরও শুরু। এই কালসীমা পর্যন্ত তাঁদের

পরিবারের, গ্রন্থপরিবেষ্টিত কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের পরিবেশের এবং তাঁর স্বনামধন্য শিক্ষকদের বিচিত্র প্রভাবকে আত্মস্থ ক'রে কী-ভাবে একটু-একটু ক'রে নিজেকে তিনি গ'ড়ে তুলছিলেন ভবিষ্যতের জন্য, দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন কবিতা রচনার ব্রতসাধনে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে, সেই নেপথ্যকাহিনী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু বসু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সমর সেন ইত্যাদি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁদের নিজ-নিজ রচনায় এবং তিনি নিজেও তাঁর 'কি করে লেখক হলুম'-শীর্ষক আত্মকথনমূলক রচনায় নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই কথিত কাহিনীর পুনর্কথনে, বর্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায়, আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা বরং আমাদের অভিনিবেশকে তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে নিয়োজিত করি।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রেখেই, এই শতকের তিনের দশকের অধিকাংশ বাঙালী কবির মতো, বিষ্ণু দে-রও কাব্যবৃত্তপরিক্রমার শুরু—যদিও সমাপ্তিতে তিনি উপনীত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিণতিতে। কিন্তু কেবল রবীন্দ্রনাথই নন, আরো অন্তত দু'জন বাঙালী কবিও তাঁকে প্রথম দিকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন—মোহিতলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ। অবশ্য প্রথমোক্ত জনের সাহায্যের তুলনায় শেষোক্ত দু'জনের সহায়তার মাত্রা ছিলো নিশ্চিতরূপেই কম। কিন্তু এই তিনজনের কাছেই ঋণস্বীকারে তিনি সমানভাবে অকপট ও মুক্তকণ্ঠ। এ-প্রসঙ্গে, একটি সাক্ষাৎকারে একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁর উক্তি, 'মোহিতলালের চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ আমায় সাহায্য করেন বেশি। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই এবং বরাবর।' দ্বিতীয় পংক্তিটি, অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথ তো বটেই এবং বরাবর'—এই উক্তিটি আমাদের বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে; কেননা এই আত্মস্বীকৃতির গভীরেই নিহিত রয়েছে তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্যানুসন্ধানের মূলসূত্র। তাঁর উক্তি অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহায্য করেছেন 'বরাবর'। কিন্তু কী অর্থে কিংবা কোন্ বিবেচনায়? প্রভাবিতকরণের মাধ্যমে কবিতারচনাকর্মের সারল্যসাধনে, নাকি নিজের কাব্যাদর্শ নির্বাচনে পথ-প্রদর্শনে অথবা ধী ও বোধিঘটিত মানসিক উদ্দীপিতকরণে—কোন্ অর্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহায্য করেছেন? অবশ্যই প্রথম অর্থে এবং প্রধানত প্রথম পর্বেই—পরবর্তী পর্বদ্বয়ে নয়; কেননা শেষ দুই পর্বে তিনি স্পষ্টতই রাবীন্দ্রিক নন, তিনি যথেষ্ট পরিবর্তিত এবং আত্মদীপিত। অবশ্য এ-কথা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে মধ্য ও অন্ত্য পর্বেও, যতই তিনি এলিয়ট-প্রভাবিত এবং মার্ক্স-উদ্দীপিত হোন না কেন, তাঁর কবিতায় শেষ পর্যন্তও একটি রবীন্দ্র-আবহ—তা যতই অস্পষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ হোক না কেন—বিরাজিত ছিলোই ছিলো। নিজের কবিতার অবয়বে মাঝে-মধ্যেই প্যারেনথীসিসের মতো রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো কবিতার পংক্তিবিশেষের যোজনার (যে-প্রবণতা সমর সেনেও কবিতাবিশেষে দেখা গেছে) মধ্য দিয়েই (দ্রষ্টব্য ঃ 'চোরাবালি'র 'বেকারবিহঙ্গ' কবিতার অন্তিম স্তবকের অন্তিম পংক্তিদ্বয় এবং 'ক্রেসিডা' কবিতার একবিংশতম পংক্তিটি, 'পূর্বলেখ'র 'জন্মাষ্টমী' কবিতার সপ্তদশ ও অষ্টাদশতম পংক্তি দু'টি, 'অন্বিষ্টে'র 'রামধনু' কবিতার চতুর্থ

স্তবকের প্রথম পংক্তি ইত্যাদি এবং এ-রকম আরো অনেক, যেগুলি তাঁর অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে) মাত্র নয়, অংশত নিজের কাব্যাদর্শের নির্বাচনে এবং সমগ্রত নিজের মানসিক উজ্জীবনে (mental resurgence) রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর গভীর ঋণকে শিরোধার্য ক'রেই তিনি বার-বার তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছেন, তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর সেই পৌনঃপুনিক প্রত্যাবর্তনে এই সহজ সত্যের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছিলো যে বাংলা কাব্যের দেহমনআত্মা, তাঁর ভাষাবিভঙ্গ (lingui-tic texture) সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, তাঁর দান; রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সকল কালের আধুনিকতা। সে-আধুনিকতা অনেককাল পরেও টিঁকে থাকবে, কেননা সেটাই ধ্রুপদের রীতি। ফলত, স্বাভাবিক-ভাবেই এই ধারণা তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিলো যে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন ক'রে নয়, বরং তাঁকে বিনীত শ্রদ্ধায় গ্রহণ ক'রেই বাংলা কাব্যের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব। পাশ কাটিয়ে তাঁকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, তাঁর মুখোমুখি হ'তে হবে, তাঁকে স্বীকার করতে হবে—স্বীকার ক'রে নিতে হবে আরো অনেকদিন পর্যন্ত সমগ্র মনুষ্যপ্রজাতির অমূল্য সম্পদ হিসেবে, আমাদের নানা চিন্তা-ভাবনার পথ-প্রদর্শকরূপে, আমাদের বহু নির্বাক নিভৃত অনুভূতির উন্মোচক ও রূপকার হিসেবে। এই শুভ ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন ব'লেই, তাঁর সমগ্র কাব্যকৃতির দিকে এক লহমায় তাকিয়ে, বলা যেতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত নিজের কাব্যপথটি অত্যন্ত সঠিকভাবে তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন।

অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচায়করূপে যদি আমরা 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র 'ছেদ' কবিতার 'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' পংক্তিটিকে গ্রহণ করি, তাহ'লে আমাদের নির্বাচন নির্ভুল হবে না। (কারণ এই পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য ক'রে রচিত হ'লেও এটির লক্ষ্য অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে এতটুকু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা নয়। রবিদ্রোহিতার আভাসমাত্র এতে নেই। পংক্তিটির মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, তা আসলে রোমান্টিকতার অতিতারল্য ও অতিশৈথিল্যের প্রতিবাদে যুগের বিদ্রূপ।) বরং এ উদ্দেশ্যে আমরা বারে-বারে ফিরে যাবো 'চোরাবালি'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির ঃ

> সে কথা তো জানি তোমাতে আমার মুক্তি নেই ;
> তবু বারে-বারে তোমারই উঠানে যাওয়া-আসা।

এই প্রথম পংক্তি দু'টিতে, যে-পংক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞ মনো-ভাবটির যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে অথবা স্মরণ করবো তাঁর 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র সুবিখ্যাত '২৫শে বৈশাখ' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটিকে, যেটি বস্তুতপক্ষেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই শতকের তৃতীয় দশকের আপাত-রবীন্দ্রবিরোধী-অথচ-অন্তরে-রবীন্দ্র-সশ্রদ্ধ বাঙালী কবিকুলের প্রকৃত মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রতিফলন ঃ

> রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে-ভেঙে
> চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং

আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে-গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে, হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব-আনন্দের।

অবশ্য স্তবকটিতে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার (ও শিরোধার্য) ক'রেও তাঁকে অতিক্রমণের সুদৃপ্ত ঘোষণাটুকুও একেবারেই অলক্ষ্য অথবা অনুপভোগ্য নয়।

বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩), 'চোরাবালি' (১৯৩৭) এবং 'পূর্বলেখ' (১৯৪১)। এই গ্রন্থত্রয়ের কবিতাগুলির রচনাকাল যথাক্রমে ১৯২৯-৩৩, ১৯২৬-৩৭ এবং ১৯৩৭-৪১। অর্থাৎ, কবির কুড়ি থেকে বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্যাপ্ত একযুগ ধ'রে লিখিত কবিতা এই গ্রন্থ তিনটিতে স্থান পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তদানীন্তন তরুণ বিষ্ণু দে-র এই তিনটি গ্রন্থের কবিতা-গুলিকে ইদানীন্তনের অত্যুগ্র আধুনিকতার নিরিখে যথেষ্ট রকমের চৌকস বলে প্রতিভাত না-ও হ'তে পারে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একটা কথা আমরা যেন ভুলে না যাই ; আমরা যেন মনে রাখি, যে-কোনো কবির কাব্যকৃতির পর্যালোচনায় তাঁর সমকালকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে ; একমাত্র সমকালের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের যথার্থ বিচার-বিবেচনা—অন্যথায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা সমূহ এবং পদে-পদে। অতএব আজ থেকে অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক পূর্বের যুগপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতাগুলির মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হ'লে আমরা দেখবো যে এগুলি কবির কবিত্বশক্তির প্রাথমিক পরিচয়বাহী হওয়া সত্ত্বেও কবিতারচনার প্রাথমিক দুর্বলতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। প্রথম যৌবনের—অর্থাৎ বেশির ভাগ কবির স্রষ্টাজীবনের প্রথম পর্বের—কবিতায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, বাংলার কবি বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। তিনিও তাঁদের মতোই, নবযৌবনের আগমনে নর-নারীর শরীরে-মনে অকারণ ও অবারণ যে-পুলক সঞ্চারিত হয়, তারই বিমুগ্ধ গান রচনা করেছেন তাঁর প্রথম পর্বের কবিতাবলীতে। বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্বের কবিতা সম্পর্কে এই সাধারণ মন্তব্য আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র রচনাসমূহ সম্পর্কে। শ্রেণীগত বিবেচনায় এই কবিতাগুলির সিংহভাগই প্রেমের—আত্মসুখী ও পরিশুদ্ধ প্রেমের। কবিতাগুলি প্রেমের, কিন্তু প্রেমের রুক্ষ ও জ্বালাময় দিক্ এগুলিতে একেবারেই অনুপস্থিত। বরং তার পরিবর্তে প্রেমের পেলব ও কোমল দিক্‌টিই এগুলিতে সমধিক উদ্ঘাটিত। এই কবিতাগুলিতে কবিচিত্ত প্রেমের আবেগে বিকম্পিত, প্রেমের আবেশে বিমোহিত। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসের রোম্যান্টিকতায় অথবা রোম্যান্টিকতার উচ্ছ্বাসে কোনো-কোনো কবিতা অত্যধিক আন্দোলিত। কিন্তু সেই রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসের প্রকাশে তদানীন্তন যুগপ্রচলিত একাধিক রচনাগত ত্রুটি (ভাবপ্রকাশের অস্পষ্টতা, শব্দচয়নের দুর্বলতা কিংবা উপমা-রূপক-প্রতীক প্রয়োগে অতিসাধারণত্ব, যা, তৎকালীন অপেক্ষাকৃত

প্রাচীনপন্থী অনেক কবির রচনাতেই সহজদৃষ্ট) থেকে লক্ষ্যণীয় দূরত্বে তাঁর অবস্থান। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই একদিকে প্রাচীনপন্থীদের এইসব রচনাগত ত্রুটি থেকে যেমন তিনি মুক্ত, অন্যদিকে তেমনই তিনি হৃদয়াবেগের উৎসারণে তাঁর অতিসমকালীন ও অতিনব্যপন্থী বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্রের কবিজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের মতো বল্গাবিহীনও নন। প্রেমের ভাবনা ও অনুভাবনায় প্রথম থেকেই তিনি কিছুটা স্থিতধী ও আত্মস্থ, একটি সূক্ষ্ম শিল্পময়তায় তাঁর প্রেমের কবিতা প্রথম থেকেই সমৃদ্ধ। 'পলায়ন' কবিতায় :

> সফরী চোখের সরল চাহনী, চোখের কোলের
> কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে—চিকন কপোল,
> সিল্‌ক্‌মসৃণ শাদা আর ছোটো পান্ডু ললাট।
> ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।
> ... ...
> —সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার,
> প্রেমের কবিতা করেছো আমাকে।

এই পংক্তি-ষণ্টক (বিশেষত চোখের বিশেষণরূপে 'সফরী' শব্দের ব্যবহার ও 'সুরভি চুলের' মসৃণতার উপমা হিসেবে 'সিল্‌ক্‌' শব্দটির নির্বাচন), 'গ্রীষ্ম' কবিতার সর্বশেষ পংক্তিদ্বয় :

> শুধু লিলি, তোমার শরীর
> মসৃণ কোমল পান্ডু মর্মর শীতল ॥

অথবা 'উর্বশী' কবিতার, 'তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি' পংক্তিটির আশ্চর্য-শিল্পীত আবেদনের প্রতি লক্ষ্যপাত করলেই বিষ্ণু দে-র প্রেমদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমরা অবগত হ'তে পারি। এই তিনটি ছাড়া 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র 'প্রত্যক্ষ', 'অভীপ্সা', 'সন্ধ্যা' এবং 'এপ্রিল'-শীর্ষক কবিতা ক'টিও বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্বের কাব্যিক বিশেষত্বের স্মারক, যে-কারণে কবি নিজে এ-ক'টিকেও তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় অন্তর্ভুক্ত ক'রে গিয়েছেন। একটি অদ্ভূতরকমের আশ্চর্য বা আশ্চর্যরকমের অদ্ভূত নামের কবিতা রয়েছে বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থে,—'সোহবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি'—যেটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৪।২ সংখ্যক শ্লোকের ছন্দাশ্রিত আধুনিক কাব্যরূপ। একমাত্র সাধারণ্যে অচলিত এবং অজ্ঞাতঅর্থ 'বুদোয়ারে' শব্দটির চেষ্টিত প্রয়োগ (laboured application) ছাড়া কবিতাটির অর্থভেদে অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তবু মনে রাখা প্রয়োজন, বিষ্ণু দে-র কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার যে-অভিযোগ পাঠক ও সমালোচকমহল থেকে বারে-বারেই উত্থাপিত হয়েছে, তার সূত্রপাত কিন্তু এই বিশেষ কবিতাটি থেকেই।

প্রথম কাব্যগ্রন্থে কবি হিসেবে বিষ্ণু দে-র প্রাথমিক যে-সাফল্য, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি'তেও তা সমানভাবে অব্যাহত। 'চোরাবালি'র কবিতাগুলিকে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র কবিতাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের

কাছে এটা উপলব্ধ না-হবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে এই দু'টি গ্রন্থই তাঁর কবি-জীবনের একই (প্রথম) পর্বের রচনা। মাত্র অভিন্ন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশেই নয়, বক্তব্য উপস্থাপনার ধরনটিতেও গ্রন্থদ্বয়স্থ রচনাসমূহ যথেষ্ট সমীপবর্তী। কিন্তু এই মৌলিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অবশ্যই অসমীচীন যে এই গ্রন্থ-দ্বয়ের একটি অপরটির সম্ভাব্য সম্প্রসারণ মাত্র, একটির ধ্বনি অপরটিকে প্রতিধ্বনিত ক'রেই অবসিত। বস্তুতপক্ষে, 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র সামগ্রিক কাব্যবৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখেও 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে এমন কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ ঘটেছে, যেগুলির আলোচনাই এই গ্রন্থের কবিতাবলীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশেষভাবে করণীয়।

'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি নূতন যে-দু'টি বৈশিষ্ট্য 'চোরাবালি'র কবিতাগুচ্ছে পরিস্ফুট হয়েছে, তার একটি কবিতার ভাবরূপঘটিত এবং অপরটি কবিতার বিষয়পরিধিসম্প্রসারণসম্পর্কিত। প্রথমটির প্রসঙ্গেই প্রথমে বলি। আমরা আগেই দেখেছি, প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রেমের কবিতায় প্রেমের পেলব ও কোমল রূপের উন্মোচনই বিষ্ণু দে-র বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যটি 'চোরাবালি'তেও যে বিরাজিত, তারই একটি সুন্দর উদাহরণ এই গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট রচনা 'মহাশ্বেতা' কবিতাটির আদ্যোপান্ত, বিশেষত এই বিচ্ছিন্ন পংক্তি-কতিপয় ঃ

> নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
> স্তনচূড়া দিলো ক্ষীণ কটিদেশে ছায়া।
> ...   .
> অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে।
> ..   ..
> শরীরে তোমার অলকানন্দা গান।

এমনকি সেই পেলব-কোমলতা কোনো-কোনো কবিতায়—প্রেমের কবিতাতেই—লঘু চপলতায় পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে, যেমন 'গার্হস্থ্যাশ্রম' কবিতাটির অংশবিশেষ 'পূর্বরঙ্গে'র প্রারম্ভিক এই পংক্তি-চতুষ্ক ঃ

> তোমায় লেগেছে ভালো—সে-কথা তো জানো ?
> তোমার ও কটা চোখ—যদিচ বাঙালি,
> বুধবার থেকে কেন মনে পড়ে খালি !
> লোকে যাকে প্রেম বলে—সে কি তুমি মানো ?

এবং ঐ একই কবিতার আরেকটি ছোটো অংশ, ছয় পংক্তির 'কন্‌ডিশনড্ রিফ্লেক্‌স'-এর সমগ্রটুকুও এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থনে যায়। কিন্তু সন্ধানী পাঠকের লক্ষ্য এড়াবার নয় যে এই পেলব-কোমল লঘু চপলতার পাশাপাশি একটি মিতবাক ও সংহত-গম্ভীর ভাবরূপও সর্বপ্রথম 'চোরাবালি'তেই স্ফুরিত হয়েছে। এবং এই বিশেষ লক্ষণটি, পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হবে, সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে-সঙ্গে, ক্রমেই তাঁর কবিতায় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। 'চোরাবালি'র সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা (এবং সেই সঙ্গে উত্তর-

রৈবিক বাংলা কাব্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা) 'ঘোড়সওয়ারে' তো বটেই, এমনকি এই কাব্যগ্রন্থের একটি সাধারণ রচনা 'উভচর'-এর অন্তিম স্তবকটিতেও এই ভাবগাম্ভীর্য কত স্পষ্ট ঃ

হে মেরুচারিণী, তোমার চোখের নীল
ইস্পাতে আজ ঝলসি' উঠুক
কঠিন দীর্ঘ খড়্গোদ্যত দিন
ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধতগতি চরণ শ্রান্তিহীন ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো কবি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে (স্বয়ং বিষ্ণু দে-র ভাষায়, 'সুধীন্দ্রনাথই লিখতে চান এবং মাসখানেক ধ'রে আলোচনা করে লেখেন।') 'চোরাবালি'র মুখবন্ধ বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছিলেন, তার মূলে যতই বন্ধুত্বের, শ্রদ্ধার কিংবা স্নেহের মনোভাব বিরাজিত থাকুক না কেন, আমার বিশ্বাস, তার চেয়ে ঢের বেশি বিদ্যমান ছিলো 'চোরাবালি'র কিছুসংখ্যক কবিতায় পরিস্ফুট বিষ্ণু দে-র এই গম্ভীর ও সংহত ভাবরূপের প্রতি তাঁর অন্তরের আকর্ষণ। সুধীন্দ্রনাথ-লিখিত মুখবন্ধ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'চোরাবালি'কে অবশ্যই অতিরিক্ত মর্যাদায় ভূষিত করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও সমানভাবেই স্মরণে রাখার যে সুধীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছাড়াও সন্নিবদ্ধ কবিতাসমূহের উৎকর্ষহেতুই বিষ্ণু দে-র এই গ্রন্থটি আমাদের সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা রাখে।

'চোরবালি'র বিষয়পরিধিসম্প্রসারণ-সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গে যে-কথাটি আমাদের বিশেষভাবে জানবার ও জানাবার, সে-কথাটি এই যে 'চোরাবালি'র কবিতাগুচ্ছেই বিষ্ণু দে-র রচনার বিষয়পরিধির বহুধাব্যাপ্তির সূচনা ঘটেছে। এই প্রথম তাঁর কবিতায় বিদেশী শব্দ ও ছন্দের, বিদেশী উপমা-প্রতীক-রূপক ও রূপকল্পের, বিদেশী পৌরাণিক প্রসঙ্গের (allusion) এবং এমন কি, বিদেশী বিষয়বস্তুর পর্যন্ত অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটলো। অথচ স্বদেশী ঐতিহ্যের সযত্ন অনুসরণ আদৌ বর্জিত হ'লো না। অর্থাৎ, বাংলা কবিতার দীর্ঘলালিত দেশজ ঐতিহ্যপ্রবাহের সঙ্গে সমকালীন বৈদেশিক কাব্য-প্রয়াসের অভিনব ধারাটি সংযুক্ত হ'লো। এই সংযোগ বাংলা কাব্যের বিকাশ ও বিবর্তনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ; কেননা প্রধানত এরই ফলে বাংলা কবিতার, যাকে বলা যেতে পারে আধুনিকীকরণ, তা, বহুগুণে তরান্বিত হয়েছে, তার দিগন্ত বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হ'তে পেরেছে। ফলে, অত্যন্ত অগভীরভাবে এবং অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে হ'লেও আমাদের মধ্যে এই বোধটা জাগ্রত হয়েছে যে বাংলা কবিতার আধুনিকতা বিশ্বকবিতার আধুনিকতা-নিঃসম্পর্কিত কোনো ব্যাপার নয় ; বাংলা কবিতাকেও, বিশ্বকবিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, অর্জন করতে হবে তার নিজের আধুনিকতা। বস্তুত, এই বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মধুসূদনে যে-প্রয়াসের সূত্রপাত, সুধীন্দ্রনাথে এবং বিষ্ণু দে-তে পৌঁছে সেই প্রয়াসেরই সাময়িক সমাপ্তি। এবং

বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে সেই সমাপ্তিরও আরম্ভ আবার তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি'তেই।

'চোরাবালি'তে নাম-কবিতাটি ছাড়াও, এমন কবিতা একাধিক আছে, যেগুলি ইতি-মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত। সেই কবিতাগুলির নাম বিষ্ণু-অনুরক্ত কারোরই আজ আর অজানা থাকার কথা নয়—'ঘোড়সওয়ার', 'মহাশ্বেতা'-'ক্রেসিডা' এবং 'ওফেলিয়া'। অবশ্য স্বয়ং কবিকে একবার 'আপনার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কোন্ তিনটি কবিতা আপনার নিজের কাছে আপনার কবিপ্রতিভাকে বুঝতে তাৎপর্য-পূর্ণ ব'লে মনে হয়?' প্রশ্ন করা হ'লে, উত্তরস্বরূপ তিনি 'ঘোড়সওয়ার', 'মহাশ্বেতা', এবং 'ক্রেসিডা'র নামই করেছিলেন; দুর্বোধ্যতার অভিযোগের শঙ্কাবশতই হয়তো 'ওফেলিয়া'র নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কাব্যিক উৎ-কর্ষের বিবেচনায় 'ওফেলিয়া'র দাবি অন্য তিনটি কবিতার চেয়ে কিছুমাত্র কম। অবশ্য সামগ্রিক উৎকর্ষের নিরিখে, এই কবিতা-চতুষ্কের মধ্যে, 'ঘোড়সওয়ারে'র স্থানই নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চে। এর হেতু নির্ণয় করাও কিছুমাত্র কঠিন কোনো কর্ম নয়। তামসিক নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে রাজসিক পুরুষকারের যে-উত্থান ও উত্তরণ 'ঘোড়সওয়ারে'র মূল আলম্বন, তা, এবং দ্বান্দ্বিক যে-প্রক্রিয়ায় এবং নাটকীয় যে-সংঘট্টে সেই আলম্বনকে পরিণতির অভিসারী ক'রে তোলা হয়েছে, তা,—এই উভয়ই কবিতাটির উৎকর্ষের হেতুযুগ্মক।

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?

এবং এবম্বিধ বরাভয়ব্যঞ্জক পংক্তিবন্ধে ভুবনবিজয়ী, দূরদেশী ও দৃপ্ত ঘোড়সওয়ারের দ্রুতধাবমান অশ্বের যে-ক্ষুরধ্বনি বারে-বারেই শ্রুতিগোচর হয়, তা আসলে আধুনিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ক্রমবিস্তার্যমান চোরাবালির প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় হৃদয়ের মহত্তম চেতনার সুগভীর ও সামগ্রিক জাগরণ-প্রয়াসেরই প্রতীক। এই মানবিক প্রতীকের প্রয়োগের সাফল্যেই কবিতাটির নিহিত মহত্ত্বের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকেই কবিতাটির চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই; কেননা যে-কোনো বিভাগের মানবিক শিল্পেরই, বিশেষত কবিতার—এবং আরো বিশেষত আলোচ্য কবিতাটির মতো বহু-স্তরান্বিত কবিতার—চূড়ান্ত ব্যাখ্যা আদপেই সম্ভব কিনা, সেটা সত্যিই সন্দেহের বিষয়। এবং এই সন্দেহ যে আদৌ অমূলক নয়, তারই প্রমাণস্বরূপ আমরা লক্ষ্য করি যে নানা মুনির (ও গুণীর) কাছ থেকে কবিতাটির ওপর নানাবিধ ব্যাখ্যা বর্ষিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কাছে কবিতাটির ভাবসৌরভের চেয়ে ধ্বনিগৌরবই অধিকতর মূল্যবান ব'লে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের তুলনায় আঙ্গিকের —ছন্দ-মিল-অনুপ্রাস, ধ্বনিগত উত্থান-পতন, নাট্য ও গীতিরসের পরিমিত মিশ্রণ ইত্যাদির—নৈপুণ্যের কারণেই এটি 'একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা, বর্তমান যুগের বাংলা

ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সিদ্ধান্তে, কবিতাটি পরোক্ষ অথচ প্রকৃত অর্থে আরাধ্য ও আরাধকের পারস্পরিক সম্বন্ধের উন্মোচন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের অনুভূতিতে, কবিতাটি মূলত প্রেমবসাভিষিঞ্চিত। তার, মার্ক্সবাদীদের আরোপিত ব্যাখ্যায় এটি অবশ্যই একটি শ্রেণীসংগ্রামের কবিতা, এবং ফলে, তাঁদের বিবেচনায়, অবশ্যই সাংস্কৃতিক শ্রেণীসংগ্রামের (cultural class-war;) -একটি শক্তিশালী হাতিয়ারও। কবিতাটিব নবম স্তবকে রঃ

> জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
> মেরুচূড়া জনহীন—
> হাল্‌কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
> লোকনিন্দার দিন।

পংক্তি-চতুষ্টযে শ্রেণীসংগ্রামের সহিংস আহ্বান তাঁরা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেও আমরা কিন্তু কবিতাটির চরমোৎকর্ষ আবিষ্কাব করি :

> কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
> কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার।
> ...   .
> হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
> আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
> কোথায় পুরুষকার ?
> অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

ইত্যাদি যুগপৎ ভাব-অবগাঢ়, বেগার্ত এবং গীতিমুখর আশ্চর্য অংশ কতিপয়ে। কিন্তু যে-ব্যাখ্যাকেই আমরা গ্রহণ বা বর্জন করি না কেন, এ-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই যে আধুনিক বাংলা কবিতার সামগ্রিক উৎকর্ষের চরিত্রলক্ষণযুক্ত অন্যতম অত্যুল্লেখ্য রচনা এটি।

ছ'-পংক্তির এক-একটি স্তবকের চারটি স্তবক-সমন্বিত 'মহাশ্বেতা' কবিতাটির পাঠকপ্রিয়তা অবশ্যই 'ঘোড়সওয়ারে'র পাঠকপ্রিয়তার সমতুল্য নয়; কিন্তু একমাত্র পাঠকপ্রিয়তার নিরিখেই সকল সময় সকল কবিতার সমূহ উৎকর্ষের বিবেচনা করা চলেনা—যেমন চলেনা এই কবিতাটির। আর-দশটি কবিতার তুলনায় বিষ্ণু দে-র এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য কোথায়? বৈশিষ্ট্য এখানটায় যে মহাকবি বানভট্টের মহাকাব্য 'কাদম্বরী'র অন্যতম প্রধান পার্শ্বচরিত্র মহাশ্বেতার দৈহিক রূপোন্মোচনে আশ্রিত শান্ত ও সৌম্য ভাবের অনুষঙ্গের সঙ্গে কবির প্রাত্যহিক ও প্রাতিস্বিক অনুভূতির সমানুপাত ঘটিয়ে শৃঙ্গারানুভূতির অন্তর্গূঢ় এষণা এবং বেদনাকে একীভূত করার মাধ্যমে রোম্যান্টিসিজমের সঙ্গে ক্ল্যাসিসিজমের এক কৌশলী সমন্বয় সাধন করা হয়েছে কবিতাটিতে। এই সমন্বয় আমাদের কাছে সেই পুরাতন শিল্পসত্যকেই আরেকবার নূতন করে প্রমাণিত করে যে রোম্যান্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজমের [illegible] সম্পর্ক তেল ও জলের সম্পর্কের মতো

একেবারে সর্বৈথ বিরুদ্ধ নয়। এই দুই শিল্পাদর্শের মধ্যে যে-বিরোধের সন্ধান অনেকে পান, অনেক ক্ষেত্রেই তা আসলে আপাত ও আপাতিক ; ফলে, অলীক বা অবাস্তব। কবিতাটির সমগ্রটুকুই, বিশেষত শেষ স্তবকটি, রোম্যান্টিকতাসম্পৃক্ত সহজ বিষয়বস্তুকেও ক্ল্যাসিক্যাল কঠিন পিনদ্ধতায় পরিবেশনের দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মৃতিতে ধ'রে রাখার যোগ্য ঃ

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা ?
হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহ-দুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা ॥

কোনো কবিই তাঁর কবিজীবনের সমস্ত পর্বে একমাত্র নিজের দেশের ঐতিহ্য ও উপকরণ থেকেই অনুপ্রেরণার সম্পূর্ণ রসদ সংগ্রহ করতে পারেন না, যে-কারণে অনু-প্রেরণার উজ্জীবনের জন্য কখনো-কখনো তাঁকে স্বদেশের চৌহদ্দীর বাইরেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়—যেমনটি হয়েছিলো পাউণ্ডের ক্ষেত্রে অনুরূপ উদ্দেশ্যে চৈনিক কবিতার নিবিষ্ট পাঠের মাধ্যমে, যার ফল তৎকৃত চৈন কবিতার স্মরণীয় অনুবাদগুচ্ছ ; যে-রকমটি ঘটেছিলো এলিয়টের বেলাতেও কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের এবং নির্বাচিত বিষয়ের প্রকাশভঙ্গিতে অভিনবত্ব আনয়নের উদ্দেশ্যে কখনো দান্তে, কখনো লাফর্গের শরণাপন্ন হওয়ার, যার পরিণামস্বরূপ তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 'ওয়েস্টল্যাণ্ডে'র মতো যুগপৎ জীবন্ত ও জটিল এবং অত্যাশ্চর্য ও অত্যাধুনিক সুদীর্ঘ কবিতা। এমন কি কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত, বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হ'য়েও, বৈদেশিক সাহিত্যের প্রগতির প্রকৃতি সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহল নিরসনার্থে বিদেশী সাহিত্যের অন্দরমহলে একাধিকবার মনোক্ষেপণ করতে হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়াত্মক তাঁর রচনাসমূহে এ-সম্পর্কে অনেক সাক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে কেবল নিজের কৌতূহল নিরসনার্থেই তিনি সচেষ্ট হন নি, তাঁর সমকালীন অথচ তাঁর অনুজ বাঙালী সাহিত্যিকদের এতৎসংক্রান্ত প্রয়াসের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আধুনিক য়োরোপীয় সাহিত্যের স্বরূপ-সম্পর্কিত তাঁর একটি রচনার এই অংশটুকু এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়—'আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে।...আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয়, সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি।' বয়সে তাঁর কনিষ্ঠ হ'লেও, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে যাঁদের সাক্ষ্যকে

তিনি মূল্যবান বিবেচনায় শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে অবশ্যই একজন। সাময়িকভাবে অবসিত কাব্যপ্রেরণার পুনরুজ্জীবনের জন্য বারংবার বিদেশী সাহিত্যের তিনি শুধু দ্বারস্থই হননি, তিরিশের যুগের আরো অনেক কবির মতো, সেই সাহিত্য থেকে নিজের রচনায় গ্রহণও করেছেন প্রচুর। কবিতা রচনায় নিত্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আন্তর-তাড়নায় (inner impulse) বিদেশী মিল ও ছন্দ, উপমা-প্রতীক-রূপকল্প, ইতিহাস ও লোকবৃত্তান্ত—এমনকি 'মীথ্' বা পুরাকাহিনীকে পর্যন্ত নিজের কবিতায় স্থান দিয়ে নানাভাবে তিনি তার সমৃদ্ধি সাধন করেছেন।

বিষ্ণু দে-র কবিতার পৌর্বাপর্য সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে, তার ওপর ভিত্তি ক'রে বলতে পারি, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি'র অন্তর্গত 'ক্রেসিডা' এবং 'ওফেলিয়া' কবিতা দু'টি থেকেই এ-পথে তাঁর যাত্রারম্ভ। পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের আরো অনেক কবিতায়—যেমন প্রকাশের কালানুক্রমে 'পূর্বলেখ'র 'Oisive jeunesse A tout asservie', 'সন্দ্বীপের চরে'র 'কাসান্ড্রা' ও 'আইসায়ার খেদ', 'অন্বিষ্টে'র 'এলসিনোরে', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র 'কাসান্দ্রা' 'টাইরেসিয়স' ও 'ভিলানেল' এবং 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখে'র 'বোহেনিয়া' ইত্যাদিতে—এই পথে আরো অনেক দূর পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু তা এ-আলোচনার অন্যত্র লক্ষ্যণীয়। আপাতত 'ক্রেসিডা' সম্পর্কে জানাই যে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র 'সোহ-বিভেওস্মাদেকাকী বিভেতি' কবিতাটিতে বিষ্ণু দে-র রচনায় যে-দুর্বোধ্যতার সূত্রপাত (যে-কথা আগেই বলা হয়েছে), এই কবিতাটিতে—এবং 'ওফেলিয়া' কবিতাটিতেও—তা চূড়ান্তরূপে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। শুধু বিদেশী সাহিত্যের এল্যুসন (গ্রীক মহাকাব্যের ট্রয় নগরীর এবং হেলেন রূপসীর) উল্লেখেই নয় কিংবা 'ক্রতুকৃতমের', 'স্বসমুখ', 'জেবলী', 'সোৎপ্রাসপাশে', 'জীজিবিষু', 'মাতরিশ্বা' 'কৃকলাস' বা 'অপাপবিদ্ধমন্নাবির'—ইত্যাদির মতো অপ্রচলিত ও অপ্রাঞ্জল শব্দপ্রয়োগেই নয়, সামগ্রিক আবহেই কবিতাটি 'ধূম্রলোচন' ও 'নিদ্রাহীন' 'মাঘরজনীর সবিতা'সদৃশ অস্পষ্ট ও আবৃত। কবিতাটিতে কবির বক্তব্য কী, তা বোঝা যেমন কঠিন, তেমনই এটিতে আদপেই তাঁর কোনো বক্তব্য আছে কিনা, তা বুঝতে পারাও কিছুমাত্র কম কঠিন নয়। আমার ধারণা, পাঠক-পাঠিকাচিত্তে প্রবেশের ব্যাপারে এখানেই কবিতাটি প্রথম বাধা পেয়েছে। কেননা নির্দিষ্ট বক্তব্যের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব-সম্পর্কিত এই অনিশ্চয়তাই কবিতাটিকে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের তো বটেই—এমনকি উচ্চশিক্ষিত বিদগ্ধ পাঠক-সম্প্রদায়েরও কাব্যরসগ্রহণক্ষমতাপরিধির বাইরে নির্বাসিত করেছে।

কবিতাটির পক্ষে আমাদের হৃদয়সংবেদ্য হ'য়ে ওঠার পথে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক এটির স্তবকবন্ধগত পৌর্বাপর্যবিহীনতা। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকটি অবশ্য প্রথম প্রতিবন্ধকটিরই—অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট বিষয়বিহীনতার অথবা ভাবের অসংবদ্ধতার—অনিবার্য ও প্রত্যাশিত পরিণাম। কবিতাটির স্তবক-কতিপয় ভাব-বিষয়ের কোন্ অদৃশ্য ঐক্যসূত্রে অন্তর্গ্রথিত অথবা এক-একটি পরবর্তী স্তবক কী কারণে এক-একটি পূর্ববর্তী স্তবককে অনুসরণ

ক'রে চলেছে—এ-জিজ্ঞাসা, কবিতাটি পড়তে-পড়তে, আমাদের মনে বারে-বারেই জেগে ওঠে। এ-কথা জানাতে গিয়ে আমি অবশ্যই বিস্মৃত হইনি যে কবিতা ও প্রবন্ধ এক বস্তু নয় ; দু'য়ের জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রবন্ধের আঁটোসাঁটো গড়ন এবং গাণিতিক যুক্তিশীলতা কবিতায় প্রত্যাশিত—এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিপ্রেতও নয়। (অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এবং একমাত্র সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই তাঁর বেশ কিছু কবিতায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের এই বৈশিষ্ট্যের দু'টিই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ; অথচ তৎসত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বিষ্ণু দে-র কবিতার মতো দুর্বোধ্য (obscure) নয়, মাত্র দুরূহ (difficult)। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথই—বাংলা কাব্যে একজনই—তাঁর কথা স্বতন্ত্র।) কিন্তু তা-হ'লেও সকল দেশের সকল কালের 'মহৎ' কবিতারই এই এক সাধারণ লক্ষণ যে তাতে ভাবের একটা স্বাভাবিক কেন্দ্রিকতা এবং প্রকাশেরও একটা স্পষ্ট একমুখিনতা থাকে। বিষ্ণু দে-র এই কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ ঘটায় কবিতাটি হ'য়ে উঠেছে নানা ফুলের বিচিত্র একটি তোড়ার মতো। কিন্তু কবিতাটিতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবের মধ্য দিয়ে এমন কোনো একটি সমন্বিত ভাবের অভিব্যক্তি ঘটেনি, যার সুগভীর অভিঘাতে আমাদের চিত্ত আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। কবিতাটির আবেদন এখানেই আংশিক ও খণ্ডিত। ফলে, এবং সেই সঙ্গে, কবিতাটির সীমাবদ্ধতাও এখানেই।

কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার স্বরূপ-সন্ধানীদের পক্ষে কবিতাটির গুরুত্ব অনেক ও অন্যাবিধ। আমাদের কবিতার ভৌগোলিক পরিধিকে, অংশত হ'লেও, নিঃসন্দেহে এই কবিতাটি প্রসারিত করেছে। বাংলা কবিতার সাবালকত্ব (adulthood) অর্জনে নয়,—সাবালকত্ব অনেক আগেই অর্জিত হয়েছে—আধুনিকীকরণে (modernisation) কবিতাটি, তৃতীয় দশকের আমাদের আরো কয়েকজন কবির কিছু সংখ্যক কবিতার মতোই, সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু এই বিশেষ কবিতাটি সমগ্র বাংলা কবিতার আধুনিকতা অর্জনে কোন্ অর্থে সহায়তা প্রদান করেছে ? এই অর্থে যে পাশ্চাত্য (গ্রীক) সাহিত্যের নায়িকা, প্রেমে একনিষ্ঠতাশূন্য ও হৃদয়হীনা ক্রূর ক্রেসিডার বিশ্বাসভঙ্গ বীরনায়ক ট্রয়লাসের জীবনে গভীর যে-ট্র্যাজেডির সূচনা করেছিলো, তার বিষাদময়তাকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের শত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা-অসূয়া-মাৎসর্য-প্রলোভন-পরিকীর্ণ, সংকট-সংঘাত-সংগ্রাম-সমাকীর্ণ পটভূমিকার সঙ্গে সহসম্পর্কিত (corelated) ক'রে এটি পাশ্চাত্যের কাব্যবিষয়কে আমাদের কবিতার উপাদানে রূপান্তরিত করেছে। এই রূপান্তর (transformation)—অর্থাৎ পরকীয় বিষয়কে স্বকীয়করণ—আধুনিকত্বঅর্জনপ্রয়াসের একটি স্বীকৃত লক্ষণ। সেই লক্ষণে কবিতাটি আক্রান্ত। এর সঙ্গে লক্ষণীয় কবিতাটির নাট্যরসাশ্রয়িতা, সঙ্গীতধর্মিতা এবং গতিময়তা—বিশেষত শেষোক্ত লক্ষণটি। প্রকৃতপক্ষে গতিময়তাই এই কবিতাটির প্রাণ। গভীর যে-প্রাণাবেগে ট্রয়লাসরূপী কবি :

ক্রেসিডা ! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয় ।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুক্রতমের শেষ ।
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয় ।

অথবা

জানি, জানি, এই অলাতচক্রে চংক্রমণ ।
সোৎপ্রাসপাশে বলি নাকো তাই কথা ।
ক্রেসিডা ! আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
জীর্জিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ ।

কিংবা

স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি ।

ইত্যাদি পংক্তি আত্মহারার মতো উচ্চারণ করতে পারেন, টান-টান ছন্দের দুর্বার গতিময়তাই তার প্রকৃষ্ট বাহন ।

'ক্রেসিডা'র বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যে-ক'টি কথা এখানে সাধারণভাবে বলা হ'লো, তার সব ক'টিই 'ওফেলিয়া'র, এমনকি 'এটাক্সিয়া' এবং 'এলসিনোরে'রও, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রযোজ্য । সেই কারণেই জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে বিষ্ণু দে-র এই তিনটি কবিতাই, বিশেষত 'ওফেলিয়া' ও 'এলসিনোরে' একত্রে পঠিতব্য । দু'টি কবিতাতেই, গীতিকাব্যের শরীরে এলিয়ট-নির্দেশিত নাট্যবেদ্যতা সঞ্চারের সহায়তায় প্রেমের রোম্যান্টিক আদর্শ এবং সেই আদর্শগত স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে বিধৃত হয়েছে । অধিকন্তু উভয় কবিতাতেই মহাকবি শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের নৈর্ব্যক্তিক সহসম্পর্কসংস্থাপক (objective corelatives)-এর নিপুণ ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় । তবে এই একই কৌশলের প্রয়োগ দু'টি কবিতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে । নেতিবাচক মূল্যবোধ ও সর্বব্যাপ্ত বিপ্রকর্ষের অমোঘতাকে ব্যঞ্জিত করার অভিপ্রায়ে 'ওফেলিয়া' কবিতায় বিশ্বাসহন্ত্রী ওফেলিয়ার নিষ্ঠাহীনতাই গুরুত্ব পেয়েছে ; অপরপক্ষে ইতিবাচক মূল্যচেতনা ও সামগ্রিক মানবপ্রগতির অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আমাদিগকে সচেতন ক'রে তোলার অভিলাষে 'এলসিনোরে' কবিতাটিতে ওফেলিয়ার নিষ্ঠাপরায়ণতার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।

'ওফেলিয়া' কবিতার :

তুমি যেন এক পরদায়-ঢাকা-বাড়ি,
আমি অঘ্রাণ-শিশিরে-সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ফিরে

অথবা

এলসিনোরে বটে হাসি ।
মেঘের রেশমী আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া-আসা ।

এই পংক্তিগুলির সঙ্গে 'এলসিনোরে' কবিতাটির ঃ

এসো দুইজনে মৃত্যুর পুঁতি দূর করি খরস্রোতে
জুঁই-চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি
এলসিনোরের নরকে দিওনা বলি
তোমার এ দিনেমারে।

পংক্তি-পঞ্চকের তুলনামূলক পাঠ থেকে প্রেম ও প্রগতি সম্পর্কে কবির বিবর্তিত দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া সম্ভব। যদিও সুধীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে 'বিষ্ণু দে-র ওফেলিয়া কোনো প্রকৃতিকৃপণা পার্থিবা নয়, সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক' এবং তাঁর বিবেচনায় 'ওফেলিয়া' কবিতাটি 'সংক্ষিপ্ত সামান্যকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ', এবং যদিও আমরা এ-কথাও জানি যে 'ক্রেসিডা' ও 'এলসিনোরে'র মতো 'ওফেলিয়া' কবিতাটিও এটির রচয়িতার কাব্যকলাকৌশলগত গভীর অনুসন্ধিৎসা ও ধ্রুপদী পরীক্ষামনস্কতার বিরল দৃষ্টান্ত, তবু বিচ্ছিন্নভাবে কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে উচ্ছ্বসিত হবার মতো উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সম্মোহিত হবার মতো সামগ্রিক গভীরতার সন্ধান কবিতাটিতে লাভ করা যায় কিনা কিংবা লাভ করা গেলেও কবিতাটির ভাববিস্তার স্তবক-পরম্পরায় পারম্পর্যপূর্ণ অথবা ভাবানুষঙ্গ সমগ্রতায় অন্তর্গ্রথিত কিনা—ইত্যাদি প্রশ্নপ্রসূত সংশয় থেকে অদ্যাবধি আমার কিন্তু চিত্তমুক্তি ঘটেনি।

বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের প্রথম পর্বের তৃতীয় ও শেষ কাব্যগ্রন্থ 'পূর্বলেখ'। এই গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন তাঁর ত্রি-পার্বিক কবিজীবনের প্রথমটির সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই দ্বিতীয়টির আরম্ভেরও আভাস সূচীত হয়েছে। অতএব 'পূর্বলেখ'কে বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের সন্ধিপর্বের কাব্য হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। ফলত, 'পূর্বলেখ'র কবিতাগুচ্ছে এই দুই পর্বেরই বৈশিষ্ট্যাবলীর সম্যক প্রতিফলন আমাদের প্রত্যাশিত এবং সুখের বিষয়, এই কবিতাগুচ্ছের কয়েকটি আমাদের এই প্রত্যাশাকে, অন্তত আংশিকভাবে হ'লেও, পূরণ করে। অর্থাৎ, সেই কবিতা ক'টি পড়তে-পড়তে এটাই আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে যে একটি পথের পরিক্রমা সমাপ্ত ক'রে এগুলির রচয়িতা যেন অন্য একটি পথের বাঁকে উপনীত হয়েছেন। বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্যত্র ইতিপূর্বেই সংক্ষেপে করা হয়েছে। এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। তবু এখানে এইটুকু কেবল জানিয়ে রাখি, এই গ্রন্থের 'চতুর্দশপদী'-সিরিজের কলকাতা-কেন্দ্রিক চারটি কবিতা ('রেড রোডে', 'চৌরিঙ্গি', 'খিদিরপুর' ও 'মানিকতলা খাল') এবং 'গুমোট', 'বৈকালী' ও 'সোনালি ঈগল' ইত্যাদি কবিতা কবির প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্যবাহী কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা। অবশ্য এই তালিকায় এই সঙ্গেই 'সপ্তপদী'র নামটিকেও আমি অন্তর্ভুক্ত করতে চাই এবং একটু বিশেষভাবেই, যেহেতু 'সপ্তপদী'র দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাটিরই আরম্ভে আমরা পাই ঃ

পান্থ প্রেমের গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোলো বঁধু তাই দেখে।

এই চারটি প্রেমভারাতুর অপূর্ব লিরিকপংক্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ব'লে রাখি, 'সপ্তপদী'র সপ্তম কবিতাটির চতুর্থ পংক্তিটি ('হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানস-মরাল!') আসলে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তিবিশেষেরই সরাসরি ও অনর্থক অনুসরণ।

'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের অল্প কয়েকটি রচনায় বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্বের যে বৈশিষ্ট্যাবলীর পূর্বাভাস সংকেতিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্যটি হচ্ছে কবিচিত্তের সামাজিক সচেতনতার প্রতিফলন। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'র কবিতায় এই দিক্‌টির প্রতিফলন আমরা কদাচিৎ লক্ষ্য করেছি। বিষ্ণু দে-র কবিতায় সামাজিক সচেতনতার পরিচয় প্রশ্নাতীত ; কিন্তু সেটা তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বের শেষদিকের ব্যাপার, তার আগের নয়। এবং তার সূত্রপাত 'পূর্বলেখ'তেই। বস্তুত, জটিল ও দ্বান্দ্বিক যে-প্রক্রিয়ায় মানসিকভাবে বিবর্তিত হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন পরিকল্পিত স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম সারির প্রতিপক্ষ, সুদীর্ঘ সে-প্রক্রিয়ার অলক্ষ্য আরম্ভ কিন্তু 'পূর্বলেখ'র কয়েকটি কবিতাতেই, যেগুলির মধ্যে 'বিভীষণের গান', '১৯৩৭', 'পদধ্বনি' এবং 'জন্মাষ্টমী'—অন্তত এই চারটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এই কবিতা ক'টিতে কবিমানসে নূতন লক্ষণ স্ফুরণের অনুকূলে জাতিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে অবশ্য বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিলো, যে-সকল কারণের বিদ্যমানতার মিশ্র অভিঘাতেই কবিচিত্তের এই জাগরণ ও বিবর্তন। একদিকে ভারতীয় গণমানসে মার্কসীয় চিন্তাধারার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমান্তরালে সাম্যবাদী আন্দোলনের সুবিপুল উন্মাদনা, অন্যদিকে য়োরোপখণ্ডে স্পেনের বার্সিলোনায় গণতন্ত্রের পূজারীদের সমূহ পতন এবং জর্মানীতে চেম্বারলেনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে হিটলারী নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান—তখন ঘরে-বাইরে এ-রকম বিস্ফোরক পরিস্থিতি। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ঘটনার চাপ বিষ্ণু দে-র তৎকালীন কোনো-কোনো কবিতায় গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে। 'বিভীষণের গান' কবিতার :

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে,
লুকাবো না কেউ প্রাকারছায়ায় গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে আজ সন্দিহান।

এই প্রথম পংক্তি পাঁচটিতে অথবা '১৯৩৭'-শীর্ষক কবিতাটির :

চাচা-র আপন প্রাণ-বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র॥

এই শেষ পংক্তি দুটিতে যেমন যুদ্ধের অত্যাসন্নতা ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় আভাসিত, কালের সেই করাল-পর্বের রচনা ঃ

এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা !
উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে ম'রে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে ।

অংশটুকুতেও তেমনই সেইসব দিনরাত্রির কলকাতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবি রীতিমতো দুশ্চিন্তিত। অবশ্য বাঙালী কবি বিষ্ণু দে-র এই উদ্বেগ সেদিনের সভ্য জগতের শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনীতিক-নির্বিশেষে বিবেকী বুদ্ধিজীবীমাত্রেরই বৃহত্তর উদ্বেগের অংশ-বিশেষ। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের তদানীন্তন কেন্দ্রভূমি খাস ইংল্যান্ডের কবি এইচ. ডব্লু অডেনের যুদ্ধকালীন কবিতাতেও আমরা সেই একই উদ্বেগের প্রকাশকে আবিষ্কার করি ঃ

The slight despair
At what we are,
The marginal grief
Is source of life ··· ··

এবং আরেক ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেন্ডারের তৎকালীন কণ্ঠেও, স্পেনে গণতন্ত্রের পতনে, অনুরূপ উদ্বেগবিজড়িত প্রশ্নোচ্চারণ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় ঃ

In this time when grief pours freezing us,
when the hard light of pain gleams at every street corner,
when those who were pillars of that day's goldroof
Shrink in their clathes ; surely from hunger
we may strike fire, like fire from flint ?

অনুমান করি, অনুরূপ উদ্বেগই তাড়িত করেছিলো বাংলার কবি বিষ্ণু দে-কেও স্পেন্ডারের ধ্বনির প্রতিধ্বনিবহ পূর্বোল্লিখিত '১৯৩৭' কবিতাটির এই প্রথম স্তবকটি রচনা করতে ঃ

প্রণয় পালালো প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে ।
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা ।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা ।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী ।

'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী' ও 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের অত্যুল্লেখ্য দু'টি রচনা। শুধু দীর্ঘ কবিতা রচনাপরীক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবেই নয়, ব্যাপক অর্থে যাকে আমরা বলি the human situation বা মানবিক পরিস্থিতি, সে-সম্পর্কে ধ্রুপদী অনুসন্ধিৎসার এবং সেই সঙ্গে কাব্যপ্রকরণগত কলাকৌশলের নিদর্শনরূপেও কবিতা দু'টি স্মরণীয়। 'পদধ্বনি' কবিতাটির পটভূমিকায় রয়েছে ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত। মহাভারতের

অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুনকে কবি নির্বাচন করেছেন এই কবিতায় তাঁর বক্তব্যের প্রতীক হিসেবে। কিন্তু কোন্ বিশেষ বক্তব্যের দ্যোতকরূপে এই প্রতীকের প্রয়োগ, সে-বিষয়ে মতদ্বৈতের অবকাশ আছে ; কেননা এই পদধ্বনি কি যুদ্ধাবসানের অনিবার্য সঙ্গীস্বরূপ অত্যাসন্ন করাল কালের, না কি সাম্যবাদী কবি বিষ্ণু দে-র কল্পনাদৃষ্ট আসন্ন সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের,—এ-সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব সহজ নয়। যাঁরা মার্ক্সীয় মতবাদের সমর্থক এবং একমাত্র মার্ক্স সাহেবের তত্ত্বানুসারেই মানুষের সমূহ সমস্যার সমাধানে অবিচলিতরূপে আস্থাশীল, তাঁরা যে অবশ্যই বিষ্ণু দে-র এই কবিতাটিতে অর্জুনের প্রতীকের প্রয়োগের হেতু হিসেবে শেষোক্ত সিদ্ধান্তেই সুস্থির হবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই ; কিন্তু বিস্ময় জাগে যখন দেখি, প্রমাণিতভাবে মার্ক্স-উদ্দীপিত না-হওয়া সত্ত্বেও মহামান্যা দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতো মহাপ্রাজ্ঞা সমালোচকও তাঁর সুবিক্রীত গ্রন্থটিতে 'পদধ্বনি' কবিতায় অর্জুনকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণের কারণ-স্বরূপ মার্ক্সীয়সুলভ এই একই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ ক'রে ব'সে আছেন। অথচ তাঁর মতো প্রবীণার অজ্ঞাত থাকার কথা নয় যে, কোনো কবিতার কালগত পটভূমিকা এবং তার বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা 'একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে'। এ-দেশে, যেখানে সাহিত্যের সমালোচনা আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের পদবাচ্যই হয়নি, সেখানে সমালোচনা-সাহিত্যের নামে সবই বোধহয় সম্ভব। তা না-হ'লে, মার্ক্সীয় ফর্মুলায় কবিতা-বিশ্লেষকদের মতো তিনিও হয়তো ভাবতেন, অন্তত একবার ভেবে দেখতেন, কবিতাটি রচনার কালসীমার (১৯৩৭ থেকে ১৯৪১—যে বৎসর দু'টির মধ্যবর্তী সময়ে সমগ্র 'পূর্বলেখ'র সব ক'টি কবিতাই রচিত হয়েছিলো) বিবেচনায় 'পদধ্বনি'তে অর্জুনের প্রতীকের প্রয়োগের হেতু সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যা আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নয়, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব তখনো বহু দূর-অস্ত অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তিক ভয়াবহ সঙ্কটকাল অনিবার্য গতিতে অত্যাসন্ন ; মনের কানে বেজে উঠেছে তার দুর্বার পদ-ধ্বনি। সেই পদধ্বনিতে ছত্রধরহীন আরো অসংখ্য মানুষের মতো কবিও শঙ্কায় শিহরিত ঃ

> পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ! কারা আসে সঙ্কুল আঁধারে
> তিমিরপঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে
> উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
> বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে ধমনী।
> কার পদধ্বনি আসে ? কার ?

সর্ব অস্তিত্বমথিত এই আতঙ্কবিজড়িত প্রশ্ন উচ্চারণ ক'রেই আকণ্ঠ জীবনতৃষ্ণার তীব্রতা-বশে তাঁর মনে হ'লো—'এ কি এলো যুগান্তর। নব-অবতার!' কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর সেই বিভ্রমের অবসান ঘটলো, তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করলেন, অদূর ভবিষ্যতের এই অশনি-সংকেত সমাজতান্ত্রিক 'যুগান্তরে'র দ্যোতক নয়, বিশ্ব-বিপ্লবের 'নব-অবতারে'র আগমনের সূচকও তা নয়,—তা আসলে সমরোত্তর করালকালগর্ভসম্ভূত সার্বিক নৈরাজ্যের পূর্বাভাস, দুঃসহ দুর্বিপাকের পদপাত-ধ্বনি। এবং আসন্ন সেই দুর্যোগপিঙ্গল দিনগুলিতে যাদের পদভারে পৃথিবী কম্পিত হ'য়ে উঠবে, (এবং আরো আশ্চর্য) যাদের স্তবে মেদিনী মুখর হ'তে থাকবে, কবির চোখে তাদের পরিচিতি ও প্রকৃতি এই রকম ঃ

এ যে দস্যুদল !
... ...
লুব্ধ যাযাবর ! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
... ...
চায় তারা ফসলের খেত, দীঘি ও খামার,
চায় সোনা-জ্বলা খনি ।

পৌনঃপুনিক পাঠে এবং সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনায় এই হচ্ছে আমার কাছে বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি' কবিতাটির সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। কিন্তু এটির মধ্যে সমাজ-বিপ্লবের আসন্নতা কোথায় যে আত্মগোপন ক'রে আছে, তা আজো আমি বুঝে উঠতে পারিনি—যেমন পারিনি বঙ্গসাহিত্যের তথাকথিত বিপ্লব-অন্বেষী সমালোচককুল কর্তৃক কবিতাটি (যেটি একটি বিশুদ্ধ সামাজিক কবিতা এবং আদপেই বিপ্লবের বার্তাবাহী নয়) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, সামাজিক বিপ্লব এবং সামগ্রিক মাৎসন্যায়কে একাকার ক'রে ফেলাব কারণ উপলব্ধি করতে ।

'পদধ্বনি'র মতো 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটিরও পটভূমিকায় রয়েছে মানবীয় পরিস্থিতি এবং এই সপ্রাণ গ্রহে মানবিক দশার নিপুণ উন্মোচনই এটিতেও কবির প্রধান অভীষ্ট। কিন্তু পটভূমিকা ও অভীষ্টগত এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও সেই অভিন্ন পটভূমিকার ব্যাপ্তির বিবেচনায় কবিতা দু'টির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 'জন্মাষ্টমী'র পটভূমিকা 'পদধ্বনি'র পটভূমিকার তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপ্ত। দ্বিতীয়ত, যে-সঙ্গীতরস 'জন্মাষ্টমী'র মৌল আশ্রয়, তা 'পদধ্বনি'তে, সঙ্গত কারণেই অনুপস্থিত। ফলে, সাঙ্গীতিক যে-প্রতিন্যাসে (musical pattern) 'জন্মাষ্টমী'র পংক্তিবিন্যাস, তা-ও 'পদধ্বনি'তে অলক্ষ্য। তাছাড়া, দীর্ঘ কবিতার আঙ্গিক বিষয়ে 'জন্মাষ্টমী'তে কবি অধিকতর পরীক্ষামনস্ক এবং আঙ্গিকের বিচারে এটিতে তাঁর সাফল্যের মাত্রাও অধিক।

'জন্মাষ্টমী'র রচনার আরম্ভ ১৯৩৬ সালে আর সমাপ্তি ১৯৩৭-এ। এটির রচনায় হাত দেবার ঠিক এক বছর আগেই, ১৯৩৫ সালে, কবি সমাপ্ত করেছিলেন তাঁর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বিখ্যাত 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি। 'জন্মাষ্টমী'র মূল আলম্বন সঙ্গীতরস, এ-কথা পূর্ব স্তবকে বলেছি ; কিন্তু সেই মুখ্য রসের সঙ্গে অন্য যে-রসটির ভিয়েন কবিতাটিকে পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে পরম উপভোগ্য ক'রে তুলেছে, যেটি হ'লো নাট্য-রস। বস্তুত, এই উভয় রসের আনুপাতিক মিশ্রণের সাহায্যেই কবিতাটিকে ঘিরে কবি রচনা করতে চেয়েছেন মহাকাব্যিক একটি আবহ, সাঙ্গীতিক ও নাটকীয় সংঘট্টের সহায়তাতেই কবিতাটিতে তিনি প্রস্তুত করতে চেয়েছেন মহাকাব্যের এক ভূমিকা। কিন্তু তাঁর এই শুভ প্রয়াস প্রয়াসের স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে, সাফল্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেনি ; কেননা মানবচিত্তে এক বা একাধিক যে-স্থায়ীরসের সঞ্চারকৌশলে মহাকবিরা তাঁদের মহাকাব্যে কাহিনীর কলাপ বিস্তার করেন, তার অভাবহেতু—সঞ্চারী রসের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও—কবিতাটিতে তিনি তাঁর লক্ষ্যপূরণে আশানুরূপ সফল হন নি।

কিন্তু যথেষ্ট সফলকাম হয়েছেন অর্কেস্ট্রায় বিভিন্ন (এমন কি বিপরীত) সুর, তাল ও লয়ের মধ্যে ঐকতান সৃষ্টির কৌশলের অনুকরণে বৃহত্তর সমাজজীবনের বিস্তৃত পরিধি-প্রসূত বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার আপাতবিচ্ছিন্নতার মধ্যে সমন্বয়ের সেতুবন্ধন রচনা করতে। অর্কেস্ট্রার দ্রুত ও বিলম্বিত লয়ের ওঠানামার মতো 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটিতেও কবি-চিত্তের বিচিত্র ভাবের উত্থান ও পতন লক্ষ্য করা যায়, লক্ষ্য করা যায় অর্কেস্ট্রার বাদী-বিসংবাদী সুরের অসমমাত্রিক অনুরণনের মতো কবিহৃদয়ের বিভিন্নমুখী আবেগের প্রহৃত স্পন্দন। এবং যেহেতু 'জন্মাষ্টমী'র আঙ্গিক মূলত অর্কেস্ট্রারই আঙ্গিক, অতএব পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রায় সমন্বিত Allegro (দ্রুত লয়) Adagio (বিলম্বিত লয়) এবং note (বাদী সুর) ও counternote (বিসংবাদী সুর)—ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানেরও অভাব কবিতাটির রসাস্বাদনের এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পক্ষে গুরুতর অন্তরায়। কাব্য যে অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের সহযাত্রী এবং কাব্যরস আস্বাদনের পক্ষে সঙ্গীতরসের রসিক হওয়াও যে অন্তত ক্ষেত্রবিশেষে অত্যাবশ্যক, বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি এই মৌলিক শিল্পসত্যকেই উদ্ঘাটিত করেছে। কবিতাটিতে সমন্বয়ে সংহৃত বিচ্ছিন্ন ভাবের যে-জোড়াতাড়াগুলি রয়েছে, সেগুলি থেকে মাত্র তিনটি নমুনা-দৃষ্টান্ত ঃ

১. মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় ক্লান্তি যায় কৈ ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।
ক্লোস্ অপ্ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈ চৈ !

২. ফিটনের নেই দরকার।
সূর্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বইনাকো,
বাজার সরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানী,
জজকোর্টে উকিলই হয়তো-বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।

৩. অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাট পাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ ;
বারকার [illegible] ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।

দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।

এই পর্যন্ত পৌঁছে বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের প্রথম পর্বের—যাকে বলা চলে আত্ম-অন্বেষণের—সমাপ্তি। কিন্তু এই প্রথম পর্বও, স্বাভাবিক বিনয়বশত যাকে তিনি বলেছেন 'ছন্দমিলের পালাকীর্তন', তাঁর ক্ষেত্রে যে নিছক শখের রচনার বা লেখা-লেখা খেলার দুর্বলতাদুষ্ট অধ্যায়মাত্র ছিলো না, তা যে তাঁর পক্ষে ছিলো যথার্থই identity crisis বা আত্মপরিচিতি অন্বেষণের সংকটে সঙ্কুল, এই আলোচনায় এর আগেই তা লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুত, সত্তায় যে-সঙ্কটের সৃষ্টিতে হৃদয়ে কবিত্বের উন্মেষ ঘটে, তাঁরই ভাষায় 'ব্যক্তিত্বের বাইরে নিজের তাড়না' শুরু হয়, সেই সঙ্কটেরও সূত্রপাত কিন্তু তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্বেরই একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। এবং একই সঙ্গে এটাও মোটেই লক্ষ্য এড়াবার নয় যে সত্তার সেই সংকট থেকে উত্তরণের সূচনার—অর্থাৎ বিষয়-বস্তু নির্বাচনে ও তদনুসারী প্রকরণের উদ্ভাবনে এবং ভাবনা-চিন্তায় ও তার প্রকাশে কর্তৃত্ব অর্জনের আরম্ভেই—বিষয়টিও ঐ প্রথম পর্বেরই অন্তর্গত। আর, শুধু আরম্ভেরই বা বলি কেন, সেই পর্বের 'ঘোড়সওয়ার', 'ক্রেসিডা', 'ওফেলিয়া', 'পদধ্বনি' কিংবা 'জন্মাষ্টমী'র মতো পরিণত রচনায় সেই কর্তৃত্ব অর্জনের সম্পূর্ণতাও সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, রচনায় আত্মকর্তৃত্ব অর্জনের নজীরস্বরূপ 'জন্মাষ্টমী' কবিতা থেকে উদ্ধৃত ওপরের তৃতীয় অংশটুকুর কথা তাঁর একাধিক রচনায় তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন।

Identity Crisis থেকে মুক্তি পাবার অত্যল্পকালের ব্যবধানেই নূতন যে-ঘটনার অভিঘাতে তিনি প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছেন, তা এলিয়ট-আবিষ্কার। এই আবিষ্কার কবি হিসেবে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের—যার ব্যাপ্তি 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৫) থেকে 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৮) পর্যন্ত—সর্বপ্রধান ঘটনা। তাঁর এই পর্বের অন্য কাব্যগ্রন্থগুলি 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩) এবং 'আলেখ্য' (১৯৫৬)। ইংরেজ কবি এলিয়টকে, (জন্মস্থানের বিবেচনায় তিনি অবশ্য মার্কিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইস শহরে ১৮৮৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। ১৯২৭ সালে, উনচল্লিশ বৎসর বয়সে, তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ প্রধানত ইংল্যাণ্ডেই অতি-বাহিত করেন।) পুরোনো বইয়ের ব্যবসায়ী ইউসুফ মিঞার কল্যাণে, আকস্মিকভাবে আবিষ্কার কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্বে তাঁকে কীভাবে এবং কতটুকু সাহায্য করেছিলো, সে-সম্পর্কে 'Speech of Shri Bishnu Dey'-র চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠায় অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে তিনি যথাক্রমে জানিয়েছেন, "টি. এস. এলিয়টের 'কবিতাবলী

১৯২৫' এবং 'সেকরেড উড', আমার ঐ নব-আবিষ্কারই কি বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব ছিল না?" এবং "আবার স্মরণ করি এখানে টি. এস. এলিয়টকে। তাঁর 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক গুণপনা, আমাকে আমার বিকাশে সাহায্য করেছিল প্রচুর।"

বিষ্ণু দে-কে তাঁর কবিজীবনের মধ্য-পর্বে টমাস্ স্টার্নস্ এলিয়ট কি কবি হিসেবে মাত্র বিকাশেই সহায়তা করেছিলেন, না কি গভীরভাবে প্রভাবিতও—এই পুরোনো বিতর্কে প্রবেশের তেমন সার্থকতা আজ আর না-থাকলেও তা একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও চলে না, যেহেতু এই বিতর্কের দু-দিকেই বিষ্ণু দে-র কবিতার সমালোচকদের কেউ-না-কেউ বিরাজিত আছেন। তাঁদের অনেকে বিষ্ণু দে-র কবিতায় এলিয়টের প্রভাবকে স্বতঃসিদ্ধের মতো যেমন মেনে নিয়েছেন, সংখ্যায় স্বল্প হ'লেও কয়েকজন তেমন মেনে নেন নি। এবং কোনো পক্ষের সমালোচকদের বক্তব্যেই যুক্তির কোনো অভাব নেই। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবি হিসেবে বিষ্ণু দে-র নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক যে-দৃষ্টিভঙ্গি, তা যে আসলে শিল্পীর অগ্রগতি সম্পর্কে এলিয়টের স্মরণীয় উক্তি 'The progress of an artist is...a continual extinction of personality'-র তাৎপর্যকে যথার্থ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করারই প্রত্যক্ষ ফল, নিজের কবিসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর আত্মসচেতনতা যে বস্তুত সৎ কবিদের পক্ষে আত্মসচেতন হ'য়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে এলিয়ট সাহেবের ওকালতিরই পরোক্ষ পরিণাম, এমন কি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন-বাস্তবতার দুঃসহ দুরবস্থার বর্ণনে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিড়ম্বিত জীবননাট্যের মর্মান্তিক অন্তঃসার-শূন্যতার উন্মোচনে তাঁর কাব্যকৌশলও যে মূলত এলিয়ট-নির্দেশিত কাব্যপ্রকরণেরই সযত্ন অনুসরণ—ইত্যাদি একপক্ষীয়দের বক্তব্যের যৌক্তিকতা একদিকে যেমন স্বীকার্য, অন্যদিকে তেমনই অনস্বীকার্য অন্য পক্ষের সমালোচকদের এবম্বিধ বক্তব্যের সারবত্তা যে, যদিও এলিয়টের কাব্যে বিষ্ণু দে আবিষ্কার করেছিলেন পশ্চিম য়োরোপের 'contemporary history'-র 'the immense panorama of futility and anarchy'কে, যদিও এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড বা পোড়ো জমির প্রতীকের আদলেই তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর 'চোরাবালি'র প্রতীক এবং যদিও তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত ও আবিল অস্তিত্ববাহী সুরেশ ('কথকতা' : 'চোরাবালি') প্রথম পরিচয়ে অনেকটা এলিয়টের শুচিবায়ুপরায়ণ প্রৌঢ় প্রেমিক প্রুফ্রকের মতো, তবু ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের এই দুই যুগন্ধরের মধ্যে এই সাদৃশ্য সমূহের প্রতিটিই যত না প্রকৃত, তার তুলনায় ঢের বেশি আপাত। কেননা তাঁদের মতে, প্রথমত, বিষ্ণু দে এলিয়টের মতো এত প্রখররূপে ইতিহাস-সচেতন ছিলেন না। সত্য বটে, তিনি তাঁর রচনায় ইতিহাসের 'ট্র্যাজিক উল্লাসে'র কথা বলেছেন; কিন্তু তাতে ইতিহাসের মাত্র উল্লেখই আছে, উন্মোচন নেই। এলিয়টের কাব্যে তাঁর সমকালীন পশ্চিম য়োরোপীয় বন্ধ্যা ও কীটদষ্ট সমাজ যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে, শূন্যগর্ভ ও গূঢ়ৈষাজীর্ণ নরনারী যতবেশি ভিড় ক'রে এসেছে, বিষ্ণু দে-র কবিতায় তা দুর্লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, এলিয়টের এক 'The wasteland' মহাকবিতাতেই প্রত্যক্ষ (Concrete) ও প্রাণারোপিত (life-imposed) প্রতীকের যেমন ছড়াছড়ি—শূন্য মাকুর সারি হাওয়ার জালে

বুনছে কিংবা রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে এসে হলুদ ধোঁয়া জানালার সার্সীতে পিঠ ঘষছে অথবা আকাশে ছড়ানো বিবর্ণ সন্ধ্যা যেন-বা টেবল্-শায়িত আরক-অসাড় রোগী ইত্যাদি—বিষ্ণু দে-র সমগ্র কবিতা মন্থন ক'রেও এমন প্রতীকের তেমন প্রয়োগ-প্রাচুর্যের উদাহরণ উদ্ধার করা কঠিন। 'চোরাবালি'র প্রতীক, ভালোভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, 'The wasteland'-এর প্রতীকের তুলনায় অনেক বেশি অস্পষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ ; তদুপরি সমগ্রতা (totality)-র অভাবে ভাঙা-ভাঙা, ছেঁড়া-ছেঁড়া। তৃতীয়ত, এলিয়টের নির্বিঘ্ন ও সন্ত্রস্ত Prufrock-এর সঙ্গে বিষ্ণু দে-র অপবৃত্ত ও দীনসত্ত্ব সুরেশ তুলনীয়ই নয়। জীবন সম্পর্কে সুরেশের অভিজ্ঞতার চেয়ে Prufrock-এর অভিজ্ঞতা বহুগুণে মর্মান্তিক।

অতএব, এমতাবস্থায়, এই বিতর্ক প্রসঙ্গে আমাদের নিরুপায় বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে বিষ্ণু দে-র ওপর এলিয়টের প্রভাব সম্পর্কে উভয় পক্ষের বক্তব্যই কিঞ্চিৎ একপেশে এবং অতিশয়তাপূর্ণ—ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অর্থেই। অর্থাৎ, বিষ্ণু দে-র ওপর এলিয়টের প্রভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যাঁরা নিঃসন্দিগ্ধ, তাঁরা যেমন এ-সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেছেন, যাঁরা সন্দিহান, তাঁরাও তেমনই অল্পোক্তি করেছেন,। আসল কথা, কেবল কবিতার নয়, মানববিদ্যার যে-কোনো শাখারই—তা যে-কোনো দেশের বা যে-কোনো কালেরই হোক না কেন—ধারাবাহিকতায় যদি আমরা বিশ্বাসী হই, ইতিহাসে যদি আমাদের আস্থা থাকে, অর্থাৎ এই সত্যে স্থৈর্য অর্জনে যদি আমরা ক্রমেই অভ্যস্ত হ'তে পারি যে মানবিক শিল্পশাখার কোনোটিই ভুঁইফোঁড় বা উট্‌কো কিছু নয়, তার মূল দেশ ও কালের মৃত্তিকার অনেক গভীর পর্যন্ত প্রসারিত, তাহ'লে উত্তরসূরীদের চিন্তা-ভাবনায় পূর্বসূরীদের প্রভাবের প্রতিফলনের অনিবার্যতার বিষয়টিও অনস্বীকার্য হ'য়ে ওঠে। তবে সেই প্রভাব কারো ক্ষেত্রে হয়তো প্রবল, কারো ক্ষেত্রে মৃদু ; কোনো কবিতে প্রত্যক্ষ, কোনো কবিতে হয়তো-বা পরোক্ষ। যিনি যথার্থই শক্তিশালী, তিনি সেই প্রভাবকে অতিক্রম করতে না-পারলেও তাকে নিজের মতো ক'রে নেন, ধীরে-ধীরে আত্মস্থ ক'রে ফেলেন। শক্তিহীনরা তা পারেন না। বিষ্ণু দে পেরেছেন, এলিয়টের প্রভাবকে—বিশেষত তাঁর কাব্যের প্রকরণ বা কলাকৌশলকে—নিজের কবিতায় স্বাঙ্গীকৃত ক'রে নিতে এবং যথেষ্ট সচেতনভাবেই। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের মধ্যপর্বের সমাপ্তির পূর্বেই এলিয়ট সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তনের আভাসও সূচীত হয় এবং কাল-ক্রমে কবি হিসেবে তাঁর পথ এলিয়টের পথ থেকে যথেষ্ট পৃথক হ'য়ে যায়। বস্তুত, মধ্য-পর্বে তাঁর মানসে এলিয়টের যে-প্রেরণা ছিলো প্রধানত ভাবগত, পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (dialectical attitude) গ'ড়ে ওঠার ফলে সে-প্রেরণা স্তিমিত হ'য়ে আসে। এবং বিষ্ণু দে-র ওপর এলিয়টের প্রভাবের এই বাহ্যতার কারণেই, জীবনের কোনো এক পর্বে এলিয়ট প্রভাবে অডেন যেমন তাঁর জনৈক শিক্ষককে একদা বলেছিলেন যে ওয়র্ডস্বার্থের প্রভাবপুষ্ট সমুদয় কবিতা ছিঁড়ে ও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন ক'রে কবিতা লিখতে তিনি আগ্রহী, কেননা এলিয়ট প'ড়েই

তাঁর চৈতন্য জেগেছে 'কবিতা কীভাবে লিখিত হবে', বিষ্ণু দে-কে তেমন কখনো বলতে শোনা যায়নি, যেহেতু কবিতারচনপন্থা সম্পর্কে এলিয়ট পাঠেই তাঁর প্রথম ও প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মেছে ; অতএব রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো পূর্বজ প্রধান কবিকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে অভিনবভাবে কবিতা লিখতে তিনি নিরুৎসুক। পথান্বেষণের সঙ্কটকালে এলিয়ট-আবিষ্কার কবি হিসেবে তাঁকে উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত করেছিলো, তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগকে উৎসারিত করতে পেরেছিলো—এলিয়ট সাহেবের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংশ্রবের ফলাফল মাত্র এই-ই এবং এই পর্যন্তই। এ-ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য এ-সম্পর্কে তাঁর প্রাসঙ্গিক স্বীকৃতি—'Mr. Elliot's influence as a poet and critic has thus been......a releasing force.' ('Homage to T. S. Elliot' in 'In the Sun and the Rain'.)।

তবে এলিয়টের কবিতা পড়ার ফলেই কাব্যরচনার কৌশল সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র আত্মজ্ঞান জন্মানোর সঙ্গে-সঙ্গে এ-চৈতন্যও নিশ্চিতরূপেই জাগ্রত হয়েছিলো যে, কোনো কবিই কাব্যভাবনা কিংবা কবিতাপ্রকরণে অন্য কোনো কবির 'মতো' হ'তে পারেন না অথবা হ'তে পারলেও তাঁর পরিণাম কখনোই শুভ হয় না। এই চৈতন্যের জাগরণহেতুই তিনি কবি হিসেবে এলিয়টের অনুরূপ হবার প্রয়াস থেকে বিরত হ'য়ে নিজের মতো হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, paradox ব'লে মনে হ'লেও এ-কথা সত্য যে এলিয়টই তাঁকে জুগিয়েছেন এলিয়ট-মুক্তির অনুপ্রেরণা। এলিয়টের মানসপ্রাণিত হিসেবে কাব্যচর্চায় নিরত হ'য়েও এবং এলিয়টের সঙ্গে কোনো-কোনো বিষয়ে তাঁর আপাতসাদৃশ্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এলিয়টের প্রভাব থেকে নিজেকে তিনি যে যথার্থই মুক্ত ক'রে নূতন ও নিজস্ব এক জীবনদৃষ্টির অধিকারী হ'য়ে উঠেছিলেন, তাঁর নিদর্শনস্বরূপ এই দুই কবির দু'টি কবিতার এই দু'টি আপাতসদৃশ অংশকে গ্রহণ করা যেতে পারে :

Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceived with whispering ambitions,
Guides us by Vanities.

('Gerontion' : T. S. Eliot)

......মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
নীলকণ্ঠ ক্ষমাহীন। ইতিহাসে বিরাট প্রাসাদে
মহলে মহলে ঘোরে সময়ের ক্ষিপ্র গুপ্তচর
অবারিত গতি...

('বৈকালী' : বিষ্ণু দে)

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় অংশ দু'টি শুধু গভীরভাবে সাদৃশ্যসম্পন্নই নয়, বলা চলে, প্রায় এক এবং অভিন্ন ; কেননা দু'টি অংশেরই অবলম্বন ইতিহাস। অবলম্বিত বিষয়ের অভিন্নতা ছাড়াও, অন্যবিধ সাদৃশ্যের দরুণও অসতর্ক পাঠে অংশ দু'টির দ্বিতীয়টিকে

প্রথমটির আংশিক অনুসরণ, এমনকি পরোক্ষ অনুকরণরূপেও প্রতিভাত হ'তে পারে। অধিকন্তু ইতিহাসের মতো অতীত-কবলিত ও অস্পষ্টতা-ধূসরিত বিষয়কে নৈরাত্ম্য-মর্যাদাদানের আগ্রহের জাগরণেও প্রথম অংশটির কবি-ই দ্বিতীয় অংশটুকুর কবির পথ-প্রদর্শক—উদ্ধৃত অংশদ্বয়ের সতর্ক পাঠে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও আদৌ অসঙ্গত নয়। কিন্তু অসম্ভব একই ইতিহাস বিষয়ে এই দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাকে অস্বীকার করা কিংবা এড়িয়ে যাওয়া। বস্তুত, তা স্পষ্ট। ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে এলিয়টের দৃষ্টি এ-ক্ষেত্রে সংশয়াচ্ছন্ন, সেজন্য তার প্রকাশ সন্দিগ্ধ ও বর্তুল। কিন্তু বিষ্ণু দে-র ইতিহাসদৃষ্টি সংশয়ের আচ্ছন্নতামুক্ত ; ফলে, সেই দৃষ্টির প্রকাশও নির্দ্বিধ ও ঋজু।

কিন্তু এলিয়টের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র প্রধানতম পার্থক্য কাব্যগত নয়, তা দর্শনগত। জীবনদর্শনে বিষ্ণু দে এলিয়ট থেকে মাত্র পৃথকই নন, বিষয়বিশেষে সম্পূর্ণভাবে বিপরীতও। এই পার্থক্যের দিক্ তিনটি—এক : এলিয়ট বিজ্ঞানের শুভতায় আস্থাহীন, কিন্তু বিষ্ণু দে আস্থাশীল। দুই : সমাজনিয়ন্ত্রণে গণতন্ত্রে তথা জনতাতন্ত্রে এলিয়ট অবিশ্বাসী, তাঁর সমর্থন রাজতন্ত্রের প্রতি ; কিন্তু বিষ্ণু দে 'অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণে'র, বিশেষত 'মৃত্তিকাসন্তান'দের সমাজনিয়ন্ত্রণক্ষমতায় স্পষ্টত বিশ্বাসী। তিন : গোঁড়া অ্যাংলো-ক্যাথলিক এলিয়ট ঈশ্বরের মঙ্গলময় অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ; অপরপক্ষে মূলত মার্ক্স-বিমোহিত বিষ্ণু দে ঈশ্বরের অস্তিত্বেই ঘোর অবিশ্বাসী।

এলিয়টের জীবনদর্শনের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র জীবনদর্শনের এই বৈপরীত্যের মূল অবশ্য উভয়ের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক পরিস্থিতি (social situation) পর্যবেক্ষণের তন্নিষ্ঠতার গভীরে নিহিত। দাম্পত্যজীবনে দুঃসহ রকমের ব্যর্থতার দরুণ ব্যক্তিগত জীবনে এলিয়ট ছিলেন চূড়ান্তরকমের অসুখী। ১৯১৫ সালে, তাঁর সাতাশ বৎসর বয়সে, ভিভিয়েন হে উড-নাম্নী ইংরেজ যে-রমণীটি সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, শারীরিক বা মানসিক কোনো অর্থেই সে-রমণীটি সুস্থ বা স্বাভাবিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্নায়বিক-মানসিক (neuro-mental) ব্যাধির শিকার। প্রেমের দেবতা এলিয়টের প্রতি তাঁর সমগ্র জীবনে পুরোপুরি বিমুখ না-হ'লেও (১৯৭৭ ও ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত লিনড্যাল গর্ডন-রচিত 'Eliot's Early Years' এবং 'Eliot's New life'—এলিয়টের জীবন-বিষয়ক এই দু'টি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, জীবনের মধ্য-পরবর্তী পর্বে এমিলি হেল, মেরী ট্রেভেলিয়ান, ভ্যালেরী ফ্লেচার ইত্যাদি নারীর সঙ্গে এলিয়টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো এবং, এমনকি, উনসত্তর বৎসর বয়সে পৌঁছে, ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভ্যালেরি ফ্লেচারকে তিনি বিবাহ পর্যন্ত করেছিলেন।) এলিয়ট ও ভিভিয়েনের দাম্পত্যসম্পর্কে প্রেমের আশীর্বাদ ছিলো না, ছিলো অপ্রেমের অভিশাপ। বিবাহিত জীবনের প্রথম থেকেই সে-সম্পর্ক প্রেমের বন্যায় প্লাবিত না-হ'য়ে অপ্রেমের খরায় আক্রান্ত হয়েছিলো। অন্তরের উষ্ণতার স্থলে শীতল মর্মকাম, হৃদয়সংরাগের পরিবর্তে ব্যথিত নির্বেদ—এই-ই ছিলো সে-সম্পর্কের কেন্দ্রীয় বাস্তবতা। তদুপরি জন্ম থেকেই এলিয়টের ছিলো ক্লেশকর এক যাপ্য ব্যাধি—

ডাব্‌ল্‌ হার্নিয়া। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি সঙ্গমে সন্ত্রস্ত ছিলেন, হয়তো-বা অসমর্থও। মনে হয়, এই অসহ্য বিড়ম্বনা থেকে পরিত্রাণ লাভের পন্থা হিসেবেই ১৯২৭ সালে (যে-বৎসর তিনি ব্রিটিশ নাগরিক হন এবং তাঁর 'Ash wednesday' ও 'Journey of the Magi'-এর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়) তিনি Church of England-এ যোগ দেন এবং ব্রহ্মচর্য পালনের শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর সর্বোত্তম কাব্যকীর্তি 'The wasteland'-এর প্রথম খসড়া রচনাকালে (১৯২০-২১), ভিভিয়েনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবনতির শেষ ধাপে উপনীত হ'লে, ভূতপূর্ব ছাত্রের দাম্পত্য-সঙ্কটে তাঁর ভূতপূর্ব শিক্ষক বার্ট্রান্ড রাসেল হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তাতে ভিভিয়েনকে নিয়ে এলিয়টের অন্তহীন সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি, বরং জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিভিয়েনের স্নায়বিক ব্যাধি শেষ পর্যন্ত উন্মত্ততায় (psychoticism) পর্যবসিত হয় এবং অবশেষে, দীর্ঘকাল পীড়িত থেকে, ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে এক উন্মাদাগারে মহাকবি এলিয়টের জীবনের মূর্তিমতী অভিশাপ, রাসেলের ভাষার অনুবাদে 'ডস্টয়েভস্কি ধরনের নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি' ভিভিয়েনের মৃত্যু হয়।

প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত (দাম্পত্য) জীবনে এ-রকম প্রেমশূন্য ও অভিশপ্ত দশার অধীনতা যাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে, এ-ধরনের দুর্বিষহ পরিস্থিতির প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে পাঞ্জা কষে যাঁকে পার্থিব অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছে, তাঁর পক্ষে বিজ্ঞান-বিদ্বেষী, গণতন্ত্রবিমুখ এবং নাস্তিক্য-বিরোধী জীবনদর্শনে আশ্রিত হওয়া আদৌ আশ্চর্যের কিছু নয়; কিন্তু যে-সুচারুনৈপুণ্যে তাঁর রচিত সাহিত্যের কুশীলবদের—অ্যাপোলিন্যাকস্‌, গেরোনশ্যান, প্রুফ্রক, সুইনি ইত্যাদির—চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে সেই জীবনদর্শনকে তিনি ব্যঞ্জিত ক'রে তুলেছেন, তা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। আর, মাত্র জীবন-দর্শনকেই নয়, নিজের দাম্পত্যজীবনের বিপুল বিফলতাকেও তাঁর কাব্যের বিভিন্ন নর-নারীর চরিত্র-উন্মোচনে অপ্রেমের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত করেছেন তিনি। ফলত, তাঁর কাব্যের নর-নারীদের অধিকাংশই নৈষ্ফল্য-পীড়িত, ব্যর্থতা-তাড়িত; তারা প্রায়শই ক্লিশিতঅন্তর, জীবন-অনীহ, জরা-কবলিত ও ক্রমক্ষীয়মান। এবং আরো আক্ষেপের, এইসব স্বপ্নহীন, সঙ্গীহীন, শূন্যগর্ভ, গূঢ়ৈষাক্লিষ্ট চরিত্রাবলীর জন্য এদের স্রষ্টার মনে এতটুকু মায়া বা মমতা নেই, বিন্দুমাত্র দয়া কি করুণাও অবশিষ্ট নেই। এমনকি পাঠকচিত্তেও এদের প্রতি কোনো স্নেহ, কোনো মমতা সঞ্চারিত করতেও তিনি অনিচ্ছুক। সম্ভবত সেই কারণেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর কাব্যের খুব বড়ো একটা কৌশল। এই কৌশলের সাহায্যেই তাঁর সৃষ্ট স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে অতি সতর্কতায় তিনি নিজে ব্যবধান রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের দ্বারাও রক্ষা করিয়েছেন।

এই অরুন্তুদ সংসারে ভোগবৃত্ত ও সংক্লিষ্ট দশা থেকে মানুষের উত্তরণ কোন্‌ পথে সম্ভব, কোন্‌ পন্থায় নিহিত রয়েছে তার পরিত্রাণ—এই মৌল প্রশ্নের উত্তরই এলিয়টের দর্শনের প্রধান অন্বেষণ। তাঁর সমগ্র স্রষ্টাজীবন তিনি এই অন্বেষণেই অতিবাহিত করেছেন—'The wasteland' থেকে যাত্রা শুরু ক'রে ক্রমে-ক্রমে পৌঁছেছেন 'Ash

wednesday'-তে এবং সেখান থেকে অবশেষে উপনীত হয়েছেন 'Four Quartets'-এ —অন্তবিহীন তাঁর জিজ্ঞাসার বৃত্তপরিক্রমা। কিন্তু নিখিল সংসারের কোনোখানেই তাঁর জিজ্ঞাসার সদুত্তর না পাওয়ায়, বিশ্বব্যাপারের কোনো অবস্থাতেই তাঁর চিত্তের প্রশ্নপরায়ণতার নিবৃত্তি না ঘটায় শেষ পর্যন্ত তিনি ডুবে গিয়েছেন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের আদিম পাপতত্ত্বের গভীর তমসায়। এবং সেই অন্ধকারের গর্ভ বিদীর্ণ ক'রেই তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে আলোর অমৃতপথ। জন্ম সূত্রেই মানুষ অনিবার্যভাবে অসম্পূর্ণ, অপ্রতিরোধ্যভাবে খণ্ডিত—এই বোধ যেমন তাঁর মনে ধীরে-ধীরে বাসা বেঁধেছে, এ-ধারণাও তেমনই তাঁর মধ্যে ক্রমশই দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে যে মানুষের এই অনতিক্রম্য অসম্পূর্ণতা ও খণ্ডতা থেকে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় ঈশ্বরের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করা, ঈশ্বরপুত্রের পায়ে নির্দ্বিধায় নতজানু হওয়া; কেননা ক্রিশ্চিয়ানিটির পাপতত্ত্বে অন্ধ বিশ্বাসী অ্যাংলো-ক্যাথলিক এলিয়টের মতে একমাত্র এই পথেই সম্ভব মানুষের পক্ষে তার জন্মপাপের সম্পূর্ণ কলঙ্কমোচন, তার পতিত আত্মার উজ্জ্বল উদ্ধারসাধন।

মানুষের আত্মিক ব্যাধির উৎস, স্বরূপ ও নিরাময়পন্থার এলিয়টি ব্যাখ্যার কোনোটিই বিষ্ণু দে-র নিকট গ্রাহ্য ব'লে বিবেচিত হয়নি, যেহেতু তাঁর জীবনদৃষ্টির নেপথ্য নিয়ামকই ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এলিয়টের মতো দুর্বহ দাম্পত্য-জীবনের দুঃসহ অভিশাপ কখনোই তাঁকে ভোগ করতে হয় নি। বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন তৃপ্ত, সম্পূর্ণরূপে সুখী। বিবাহোত্তর প্রথম দিনটি থেকেই তাঁর সহৃদয়া স্ত্রী তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর অন্ত্য-জীবনে, সাময়িকভাবে রিখিয়া বাসকালে, মস্তিষ্কের পীড়াবশত যখন তিনি স্মৃতির সক্রিয়তা এবং পরিচিতজনের আলাপ-বিনিময়ের বাইরে, অভিব্যক্তিরহিত, মননশক্তিহীন ও সৃষ্টিকর্মশূন্য, তখন তাঁর নিরন্তর সেবা-শুশ্রূষায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। পুত্রকন্যাদের তরফেও তাঁর প্রত্যাশার কোনো অবপূর্তি ঘটেনি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনদৃষ্টিতে অধ্যাত্মবাদী ইহবিমুখতা অথবা অন্যবিধ নৈতিবাদ প্রশ্রয় পায়নি। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সাধারণভাবে ইহবাদীই নয়, তা বিশেষভাবে গণমুখীও। ধর্মের আরকে আবিষ্ট নয়, রাজনীতির মোড়কে তা আবৃত। বৈশ্বিক অবস্থানে (universal Position) মানুষের সমস্যাকে এলিয়ট বিবেচনা করেছেন ব্যক্তিগত (individual) দৃষ্টিকোণ থেকে আর বিষ্ণু দে সেই সমস্যাকে পর্যালোচনা করেছেন সমষ্টিগত (collective) প্রেক্ষিত থেকে। ক্যাথলিক এলিয়টের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিষ্ণু দে-র জীবনদৃষ্টিগত প্রধান পার্থক্য এখানেই।

জীবনদৃষ্টির এই প্রখর পার্থক্য সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র কবিতায় এলিয়ট প্রতিবিম্বিত, যেমন প্রতিবিম্বিত অমিয় চক্রবর্তীর পর্ববিশেষের কাব্যকর্মে। অথচ আশ্চর্য, উত্তর-রৈবিক এই দুই প্রধান বাঙালী কবির সমসাময়িকদের—বয়ঃক্রমানুসারে জীবনানন্দের, সুধীন্দ্রনাথের, প্রেমেন্দ্রের অথবা বুদ্ধদেবের—মনের শরীরে, এলিয়টের ছায়া, বলা চলে,

প্রায় পড়েনি। তবু সুধীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো পর্বে এলিয়টের উপস্থিতি একেবারেই অস্পষ্ট নয়, কিন্তু অন্য তিনজনের ক্ষেত্রে এলিয়ট একেবারেই অনুপস্থিত। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দের মহাজাগতিক চেতনা (cosmic consciousness) এবং সুধীন্দ্রনাথের সংশয়ী নাস্তিক্যবাদ (agnostic atheism) এলিয়টের দর্শন থেকে মাত্র পৃথকই নয়, সেই দর্শনের প্রায় বিপরীত। আর, প্রেমেন্দ্রের ইহদর্শন (earth philosophy) তাঁর কবিজীবনের আদ্যোপান্তই যেমন মেরেডিথ ও হুইটম্যানের দর্শনের সমীপবর্তী, বুদ্ধদেবের দেহ-দর্শন (corporeal philosophy)-ও তাঁর সমগ্র সৃষ্টি-পর্বেই, বিশেষত অন্তিম কবিজীবনে, তেমনই লরেন্স ও বদলেয়্যারের কামভাবনার অনুসারী। এই আলোচনায় ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি, বিষ্ণু দে-র ত্রি-পার্বিক কবিজীবনে এলিয়টের প্রভাব প্রকৃতপক্ষে মাত্র মধ্য-পর্বের ঘটনা ; কেননা কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে তিনি যেমন মূলত রবীন্দ্র-সমর্পিত, তৃতীয় পর্বে তিনি তেমনই মুখ্যত মার্ক্সীয় চিন্তা-ভাবনা-উদ্দীপিত। মধ্য-পর্বেই এলিয়ট তাঁর চোখে কাব্যিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। শুধু তা-ই নয় ; এলিয়ট-প্রবর্তিত কাব্যরীতিকেই তিনি এই পর্বে নিজের কবিতায় অনুসরণ পর্যন্ত করেছেন। বস্তুত, কবিজীবনের মধ্য-পর্বে বিষ্ণু দে-রচিত কবিতাবলীর আঙ্গিক-প্রকরণে এবং ভাবনা-কল্পনাতেই যে এলিয়টের ছায়া স্পষ্ট, কেবল তা-ই নয় ; তাঁর অনুবাদ-কাব্যগ্রন্থ 'এলিয়টের কবিতা'—যাতে টি. এস. এলিয়টের 'হলো ম্যান', 'সঙ্ অব্ সিমেয়ন', 'মারিনা', 'কোরিওলান' (১ ও ২), 'বরন্ট্ নরটন্' ইত্যাদি এবং আরো অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা বাংলায় ভাষান্তরিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে গ্রন্থটির ভূমিকাস্বরূপ 'টমাস স্ট্যার্নস্ এলিয়ট'-শীর্ষক একটি তথ্য-বহুল ও মূল্যবান প্রবন্ধ—তাঁর এলিয়ট-প্রীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনেকের কাছে এ-জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকভাবেই জাগতে পারে, এলিয়টের মতো বিরল-প্রতিভা কবির কোন্ বৈশিষ্ট্য বিষ্ণু দে-র মতো উগ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবিকে আকৃষ্ট, এমন কি বিশেষ একটি পর্বে আবিষ্ট পর্যন্ত করেছিলো ? এ-জিজ্ঞাসার উত্তর হিসেবে আমার মনে যা উদিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে এই দুই কবির কাব্যপ্রতিভার নিহিত সাদৃশ্যই একজনকে আরেক জনের নিকটে টেনেছে। বিবর্ণ, পাণ্ডুর, অস্তায়মান গোধূলিকে 'an etherised patient'-এর সঙ্গে তুলনায় এক অত্যাশ্চর্য চিত্রকল্পের উন্মোচনে এলিয়টের কবিমানসের যে-শিল্পনিমগ্নতার পরিচয় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাবেরও অনুরূপ শিল্পনিমজ্জতা তাঁর বহু কবিতার বহু কারুকর্মের ভিতর দিয়ে আমরা আবিষ্কার করি। কবি হিসেবে এই স্বভাবী সাদৃশ্যই বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-অনুরক্তির মূল—এবম্বিধ সিদ্ধান্ত নেহাৎই অমূলক নয়, যদিও বুদ্ধদেব বসুর মতো কোনো-কোনো বিষ্ণু দে-অনুরাগীর কাছে বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-অনুরাগ রীতিমতো বিস্ময়কর। এবং হয়তো সেই কারণেই 'কালের পুতুল' সমালোচনাগ্রন্থে 'বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি' পত্র-নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে-কে 'আপনার কবিপ্রতিভায় আমি আস্থাবান', এ-কথা জানিয়েও তাঁর কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, "সুধীন্দ্রনাথের মারফৎ জানলুম যে আপনার মতো

'এলিয়ট-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না।' তবে কিসের তাড়নায় লেখেন ?"

মধ্য-পর্বে বিষ্ণু দে-র কবিপ্রতিভা বিচিত্র বিবর্তনের অভিসারী ; সেই বিবর্তনের সাক্ষ্য 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর', 'অন্বিষ্ট', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' 'আলেখ্য' এবং 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখে'র কবিতাসমূহ নিজেদের শরীরে-মনে ধারণ ক'রে আছে। 'সাত ভাই চম্পা'র কবিতাগুলিতে একজন সহৃদয় সামাজিকের জীবন-জিজ্ঞাসা যেমন পাঠকের শ্রুতিগোচর হয়, তেমনই এ-সত্যও তাঁদের উপলব্ধির বাইরে থাকে না যে 'সন্দ্বীপের চরে'র কবিতাবলীতে দিঘিড়িয়া ও ত্রিকূট পর্বতের মধ্যবর্তী আদিম আরণ্য-অঞ্চলে (রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পদ্মা-সাজাদপুর-পাতিসর-বোয়ালিয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের মতো) কবি খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাকৃত জীবনের প্রকৃত ঠিকানা। কিন্তু 'সন্দ্বীপের চরে'র কবিতাবলীতেই নয়, পরবর্তী 'অন্বিষ্ট' থেকে আরম্ভ ক'রে 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেরই বেশির ভাগ রচনায় তাঁর সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা ছিলো সেই বন্ধুর প্রাকৃতিক পরিবেশপুষ্ট। নদী-রেখাঙ্কিত ও পাহাড়-বেষ্টিত সেই প্রাকৃত পরিবেশে অবস্থান ক'রেই তিনি ব'লে উঠেছেন,'খর চন্দনা কবে ধেয়ে যাবে পারের মায়ায় / আশ্লেষে বাহু খুলবে বিরাট সুনীল আকাশ ? / আভাস ! পেয়েছি হে অনামিকা।' তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'ছিরনার টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে, / সবুজ ও লালে লাল। / বাবুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে লাল' এবং 'রক্তিমপটে পিকাশোর পেশীস্বচ্ছল সাঁওতাল ।।' সেই সঙ্গে এটাও তিনি উপলব্ধি করেছেন, 'পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎসে / তবুও সবুজ সরস পল্লবে'। এই পারিবেশিক প্রভাব ছাড়া 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র চিত্র-আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় সংযোগের সম্পন্ন স্মৃতি এবং যামিনী রায়ের মতো সমাহিত শিল্পীর উদার বন্ধুত্বের বিরল ঐশ্বর্যও এই পর্বে তাঁর কবিতায় নূতন প্রাণাবেগ সঞ্চারিত করেছে। 'সন্দ্বীপের চর', 'কঙ্কালীতলা', 'সমুদ্র স্বাধীন' অথবা 'অন্বিষ্ট', 'প্রতীক্ষা', 'জল দাও' ইত্যাদি দীর্ঘ কবিতায় সে-প্রাণাবেগ যেমন প্রবল, তেমনই স্পষ্ট 'নীরদ মজুমদারের জন্য', 'হেমন্ত' কিংবা বিখ্যাত 'আলেখ্যে'র মতো মধ্যদৈর্ঘ্যের কবিতায়—এমন কি 'স্কেচ', 'অন্ধকারে আর' বা 'ক্লান্তি নেই' ইত্যাদির মতো হ্রস্বদৈর্ঘ্যের নিটোল কবিতাগুলিরও বুকে কান পাতলে সেই প্রাণাবেগের স্পন্দন আমরা অনুভব করতে পারি।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনুপস্থিতি বিষ্ণু দে-র এই পর্বের কবিতার আরেক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। ব্যঙ্গের শায়কে বিদ্ধ করা নয়, সামাজিক চৈতন্যে পাঠক-পাঠিকাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই এই পর্বে তাঁর প্রধান অভীষ্ট। এই সময়কার কবিতাসমূহের পটভূমি প্রশস্ততর এবং জীবন-পর্যবেক্ষণে কবির দৃষ্টিভঙ্গিটিও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তাঁর লক্ষ্য জীবনদৃষ্টির সম্পূর্ণতা অর্জন, সমাজচেতনার পূর্ণতাপ্রাপ্তি। তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার সর্বমালিন্যমুক্ত আদিম পট-পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মানুষের প্রতি মমত্ব ও কল্যাণবোধের জাগরণহেতু কেবল কবিতা থেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জোয়ার তিনি মুছে

ফেলেন নি, সঙ্গে-সঙ্গে একজন লক্ষ্যভেদী 'wit'-এর ভূমিকা থেকেও নিজেকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। ফলত, এই সময় থেকেই তাঁর কবিতায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ঘটনা ও কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ ক'রে জীবনের নানা নদী-খাল-খাঁড়িকে একটা প্রশস্ত মোহনায় মিলিয়ে দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, তাঁর কবিতার পাঠককেও যেন তিনি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার অংশভাক্ ক'রে নিতে চান—'চলো যাই জীবনের তরঙ্গ-মুখর সমুদ্র-সৈকতে···জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ স্বচ্ছল ভেলায়' ('চৈতে-বৈশাখে' : 'সন্দ্বীপের চর'), জ্ঞাপন করেন তাঁর অন্তরের এষণা—'এক হোক এককের বহু বহু বহুধায় এক ··সেই একতায় নিঃশেষ হোক এক ও বহুর নেতি ॥' ('বহুবড়বা' : 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')।

প্রথম পর্বে (বিশেষত 'চোরাবালি'তে) যে-কবি নিজের নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত, মধ্য-পর্বে 'অন্বিষ্ট' গ্রন্থে সে-কবিই জীবনের জঙ্গমতায় অস্থির, মানবতাবোধের অঙ্গীকারে আবদ্ধ এবং কবিকল্পনার ব্যাপ্তিতে সমগ্রতাসন্ধানী। 'অন্বিষ্ট'-শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতাটির এই পংক্তি ক'টি কবিচিত্তের সেই সন্ধানপরায়ণতারই ইঙ্গিতবাহী :

> আমারও অন্বিষ্ট তাই
> অণুর সংহতি
> আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
> সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই···।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র প্রথম কবিতা '২২শে শ্রাবণে'র যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকের :

> মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয়
> চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে,

এবং

> আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ
> আমার প্রেমের গানে দিকে-দিকে দুঃস্থের মিছিল
> আমার মুক্তির স্বাদ জানেনাকো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
> তাদেরই অন্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।

অংশ দু'টিও, নিবিষ্ট পাঠে ধরা পড়ে, বস্তুত জীবনের সমগ্রতা সন্ধানেরই দ্যোতক। এছাড়া, দু'টি গ্রন্থেরই আরো কিছুসংখ্যক কবিতাতেও সেই সন্ধানে কবিমানসের তৎপরতা প্রতীয়মান।

'আলেখ্য' এবং 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের মধ্য-পর্বের শেষ দু'টি গ্রন্থ। দু'টি গ্রন্থেরই একাধিক কবিতা পূর্ব-প্রযুক্ত প্রতীক ও চিত্রকল্পের পুনর্প্রয়োগে দুষ্ট। গ্রন্থ দু'টির প্রকাশসালের ব্যবধান মাত্র দু'-বছরের ; কিন্তু প্রায় সমকালীন রচনা হওয়া সত্ত্বেও দুই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে প্রধান যে-পার্থক্যটি লক্ষ্যে

পড়ে, সেটি হচ্ছে জীবনচর্যায় সমগ্রতা অর্জনের সম্ভাবনা-সম্পর্কিত আশা-নিরাশায় কবিচিত্তের দোদুল্যমানতার মাত্রাগত তারতম্য। 'অন্বিষ্ট' পর্যন্ত দুরন্ত যে-আশাবাদ (formidablo optimism) কবিকেই ক্রমাগতই উদ্দীপিত রেখেছে, সে-আশাবাদের জোয়ার 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখে'র কবিতাগুচ্ছে স্পষ্টতই বিদ্যমান ; কিন্তু 'আলেখ্য'র অধিকাংশ রচনাতেই তা লক্ষ্যণীয়ভাবে ভাঁটার দিকে। জৈবনিক সমগ্রতা-বিষয়ক ভাবনা-চিন্তায় কবিচিত্তের কোন্ প্রত্যন্ত আকাশে সংশয়ের একখণ্ড মেঘ যেন উদিত হয়েছে, সন্দেহের একটি কণ্টক কোথায় যেন কবির বিশ্বাসকে বিদ্ধ করেছে। জীবনের যে-সমগ্রতা অর্জন তাঁর চোখে 'আলেখ্য' কবিতায়, '…যেন কঠিন মানস-যাত্রা, / কিংবা যেন-বা মরুভূমি ঘুরে জরিপ', তারই সাফল্য-সম্ভাবনা সম্পর্কে 'তবু কেন' কবিতায় তাঁর সংশয়-বিজড়িত উচ্চারণ—'কিন্তু কেন বকুলের বনে ফণী-মনসা প্রান্তর ? …মনে হয় কী নির্বোধ ! বৃথা গেছি আজীবন বকে !'

কিন্তু 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থে কবিকন্ঠের উচ্চারণ সংশয়মুক্ত, আশাবাদী। বিষ্ণু দে-র আরো অনেক বিচ্ছিন্ন রচনা ও দু'-একটি গ্রন্থের মতো এই কাব্যগ্রন্থটিও তাঁর স্বদেশানুরাগের স্মরণীয় নিদর্শন। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে মাত্র অর্থহীনই নয়, কুফলপ্রসূও—আর্থ-রাজনৈতিক এই মৌলিক সত্যের উচ্চারণ এই গ্রন্থের একাধিক কবিতায় সুস্পষ্ট। কবির চোখে তাঁর স্বদেশ স্বাধীন, কিন্তু সুস্থ নয় ; কেননা তাঁর স্বাধীন স্বদেশে আর্থিক বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত সংখ্যাল্প ধনী সম্প্রদায় জীবন সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের শেয়ানা শিকারী এবং প্রবল। কিন্তু সংখ্যাধিক দরিদ্র মানুষদের অবস্থা ? কবির ভাষায়, 'গৃহহীন দল প্রতিবেশী এমনকি স্বদেশীয়, তবুও ভিখারী'। সুতরাং এই 'স্বদেশীয় ভিখারী'দের জন্য নূতন জীবন-শপথে কবিচিত্ত অধীর, এদের অমানবিক জীবনযাত্রার সার্বিক অন্ধকারের বিরুদ্ধে কবিগুরুর 'সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো'র জন্য কবি প্রার্থী ; এবং সেই সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি ঃ 'মনুষ্যত্ব বড়োই কঠিন ব্রত'। এই মহৎ উপলব্ধির ঐশ্বর্যেই 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখে'র কবিতাগুলি সম্পন্ন।

দ্বিতীয় বা মধ্য-পর্ব অতিক্রম ক'রে বিষ্ণু দে তাঁর কবিজীবনের তৃতীয় বা শেষ পর্বে, অর্থাৎ মর্ক্সীয় অধ্যায়ে উপনীত হলেন। মার্ক্সবাদ গ্রহণ তাঁর জীবনের ঠিক কোন্ সময়ের ঘটনা, তা নিশ্চিতরূপে জানা না-গেলেও এ-কথা সম্ভবত সত্য যে যাঁর সধৈর্য ও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তরুণ শিক্ষার্থী বিষ্ণু দে-র মনের মাটিতে এই মতবাদের প্রতি আকর্ষণের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়, তাঁর নাম ক্রিস্টোফার এক্রয়েড্—বিষ্ণু দে-র ছাত্র-জীবনে সেইণ্ট পল্স্ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক—যিনি তাঁর এই ছাত্রটিকে প্রত্যক্ষত পরিচিত করিয়েছিলেন আধুনিক ইতিহাসের জগৎ এবং 'মার্ক্সবাদের গুপ্তরহস্যে'র সঙ্গে। যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত মানুষই পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম, 'সকলেই ঈশ্বরের সন্তান', অতএব 'সকল বস্তুতেই সকলের অধিকার সমান'—সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় নাস্তিক্য-প্রভাবিত মার্ক্সবাদের আস্থার হেতুনির্ণয়ে তাঁর মাননীয় অধ্যাপকের এবম্বিধ আস্তিক্য-উদ্দীপিত

ব্যাখ্যায় নিজের প্রতিক্রিয়ার কথা বিষ্ণু দে অবশ্য কোথাও লিপিবন্ধ ক'রে যান নি। পরবর্তীকালে সমকালীন কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে আগ্রহী আলাপ-আলোচনা এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন বিদগ্ধ কমিউনিস্ট নেতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে মার্ক্সবাদের প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে-ক্রমে এই বিশেষ মতাদর্শের পঠন-পাঠন ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ছাড়াও মার্ক্সবাদী বিচিত্র কর্ম-কাণ্ডেরও তিনি অনুরক্ত, এমনকি ইস্যুবিশেষে অংশভাক্ পর্যন্ত হ'য়ে পড়েন। অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার বিবর্তনের ভূমিকাও এ-ক্ষেত্রে সমানভাবে স্মরণীয়। এই আলোচনারই অন্যত্র দেখেছি, পূর্ববর্তী এলিয়ট-প্রভাবিত পর্বেও, 'The wasteland'-এর নরক-বর্ণনায় তিনি শিহরিত হয়েছেন, বিমোহিত নন ; কেননা মানুষের 'নিরাশাকরোজ্জ্বল' অবস্থার অবসানের কোনো ইঙ্গিত তাতে নেই, রাহু-গ্রস্ত দশা থেকে মানুষের মুক্তির পথ-নির্দেশ তাতে অনুপস্থিত। ফলে, এলিয়ট-পারবশ্য স্বীকার ক'রে নিয়েও তাঁর মনে ভাবনা জেগেছে,—এলিয়ট-ভক্ত হেনরি ফ্ল্যচেরি-র মতো এবং ফ্ল্যচেরি-র ভাষায—'what else can we do, but affront such misery, and, courageously, try to establish new assets over the ruins of an absurd world.'। এই 'what else can we do'-র উত্তর বিষ্ণু দে খুঁজে পেয়েছেন মার্ক্সবাদে। বস্তুত, তাঁর জীবনধর্মী প্রতিভা ও প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পরিপূরক ব'লে প্রতিভাত হওয়াতেই জীবনের এই পর্বে মার্ক্সবাদের আবেদন তাঁর কাছে এত তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

বিষ্ণু দে-র জীবনচর্যায় মার্ক্সবাদের চর্চা কোন্ অর্থে ফলপ্রসূ হয়েছিলো ? একজন পেশাদার বামপন্থী রাজনীতিকের পক্ষে যে-অর্থে, বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সে-অর্থে এই মতবাদ ফলপ্রসূ হয়নি। নিছক রাজনৈতিক সংকীর্ণ অর্থে নয়, মানবিক ব্যাপক অর্থেই মার্ক্সবাদ তাঁর দৃষ্টির পরিধিকে বহুগুণে প্রসারিত করেছিলো। মানবিক পরিস্থিতি বা the human situation-এর এলিয়ট-প্রদত্ত ব্যাখ্যায় অসম্পূর্ণতার ফলে তাঁর মনে যে-অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিলো, তার নিরসন ঘটেছিলো মার্ক্সবাদে ; জীবন-স্বরূপের যে-সমগ্রতার তৃষ্ণায় এলিয়ট-প্রভাবিত অধ্যায়ের অবসানের আগে থেকেই তিনি অধীর হ'য়ে উঠছিলেন ক্রমশ, তাঁকে সে-সমগ্রতার সন্ধান দিয়েছিলো মার্ক্সবাদ। অর্থাৎ, জগৎব্যাপারের সার্বিক ব্যাখ্যার একটা যুক্তিসংগত উপায় হিসেবেই এই বিশেষ রাজ-নৈতিক মতবাদকে তিনি স্বীকার ও গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, মার্ক্সবাদ, অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে, (অন্যের প্রসঙ্গ তুলে লাভ নেই), মাত্র সাহিত্যিক রূপান্তরের মাধ্যমরূপে সীমাবন্ধ না-থেকে চিন্তা-চেতনার বিপুল পরিবর্তনসাধনেও শক্তিশালী অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলো। এই মতাদর্শ তাঁর চিন্তনে-মননে চারিয়ে ও জারিয়ে যাবার অন্য একটি ফলও এই পর্বে তাঁর মধ্যে ফলেছিলো ; তা হচ্ছে জ্ঞানার্জন বিষয়ে সেই গভীর পিপাসা বা 'hydroptiqne thirst'-এর জাগরণ, যার তীব্রতায় মানববিদ্যার বিভিন্ন দিকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁর কবিজীবনের অন্যান্য পর্বের তুলনায়, অধিকতর ও গভীর-তর মনোযোগ। আধুনিক কাব্যের জনৈক সমালোচক বাঙালী কবি বিষ্ণু দে-র এই

নবপ্রাণিত (newly inspired) জ্ঞানার্জনস্পৃহাকে তুলনা করেছেন ইংরেজ কবি John Donne-এর জ্ঞানতৃষ্ণার সঙ্গে। কিন্তু সমালোচকের তুলনার চেয়ে, এলিয়টের প্রভাব অতিক্রম ক'রে মার্ক্সবাদী পর্বে তাঁর উত্তরণ-প্রসঙ্গে, তাঁর নিজের উক্তিই আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান। পরোক্ষভাবে হ'লেও, তাঁর সাহিত্যিক-আত্মজৈবনিক রচনা 'কি করে লেখক হলুম'-এর এক জায়গায় (নিজের সম্বন্ধেই) তিনি লিখেছেন, 'একজন তাই থেকে উত্তরোত্তর বুঝতে লাগলো যে পথ চওড়া হচ্ছে—সঙ্কীর্ণ অর্থে, প্রদেশিক অর্থে সাহিত্যসৃষ্টি ও চর্চা থেকে সাহিত্যের উৎসে ও বস্তুতায়, ইতিহাসে, জীবনের দর্শনে, জ্ঞানের কর্মিষ্ঠতায়। কাল্পনিক ধর্মীয়তায় নয়, মৃত বা ভুঁইফোঁড় বর্বর রক্ষণশীলতায় নয়। দেখলেন যে অ্যাংলো-ক্যাথলিক রাজন্যবাদী এলিয়টের ঐ ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধের অসম্পূর্ণ নির্ণয়ই নিয়ে যায় সাহিত্যের পাদপীঠে, সমাজজীবনে, রাজনীতির ইতিহাসে, অতীতে ও ভবিষ্যতের চিন্তায়, অর্থাৎ বর্তমানেই। সাহিত্যিক রূপান্তর হয়ে ওঠে সার্বিক রূপান্তরের চৈতন্য।'

বিষ্ণু দে-র পক্ষে তাঁর 'সাহিত্যিক রূপান্তর' যদি হ'য়ে থাকে এলিয়টি প্রভাবের দান, তাঁর 'সার্বিক রূপান্তরের চৈতন্য'-জাগরণ তাহ'লে অবশ্যই মার্ক্সবাদী দীক্ষার অবদান। বস্তুত, তাঁর ত্রি-পার্বিক স্রষ্টাজীবনের তৃতীয় বা শেষ পর্বের কাব্যগ্রন্থসমূহের—'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' (১৯৬৩), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৬), 'সংবাদ মূলক কাব্য' (১৯৬৯), 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৭০), 'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে' (১৯৭৩), 'ঈশাবাস্য দিবানিশি' (১৯৭৪), 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৫), 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭) এবং 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' (১৯৭৮)—প্রায় প্রতিটিই (একমাত্র ব্যতিক্রম 'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে', যেটি তাঁর নিজস্ব কাব্যভাবনায় রবীন্দ্রনাথ অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে থাকার শেষ নিদর্শন এবং যেটিতে তাঁর দ্বিতীয়বার রবীন্দ্র-প্রদক্ষিণের প্রয়াস ঈষৎ অস্পষ্টতায় আভাসিত) বিচিত্র আবহে এই 'সার্বিক রূপান্তরের চৈতন্য' প্রত্যক্ষে-পরোক্ষ জাগ্রত। এবং মূলত এরই প্রভাবে তাঁর এই পর্বের কবিতায় দেখা দিয়েছে জীবনের বহু বিচিত্রের প্রতি এক অলক্ষ্যিতপূর্ব সমন্বয়মুখী অভিসার, দেশকালের সীমাতিক্রমী এক সুদূরের অভিযাত্রা। পূর্ববর্তী পর্বে যে-'বিনিদ্র নির্মাণে' স্থির হ'তে অন্যকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, এই পর্বের কবিতায় তাতে অবিচলিত থাকতে তিনি নিজেই আত্ম-উপদিষ্ট। শুধু সমগ্রতার সংহতিই নয়, সংহতির সমগ্রতাও এই পর্বে তাঁর কাম্য। তাই এক আশ্চর্য যূথবন্ধতার অঙ্গীকারে তাঁর এই পর্বের কবিতাগুলি উজ্জ্বল, এক একাগ্র গণ-মুখিনতার গতিভারে কবিতাগুলি উচ্ছল। এবং সেই সঙ্গে সেগুলি স্পষ্টতই মাটির টানেও উদ্বেল।

কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিমানসের এই মৃত্তিকাভিসার এবং এই গণমুখী অভিযাত্রা—এর কোনোটিই এমন কোনো ব্যাপার নয়, যা তাঁর কবিজীবনের একমাত্র এই পর্বেই হঠাৎ-সৃষ্ট-হওয়া বা মাত্র এই পর্বেরই বিশেষত্ব। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনের এই উভয় প্রবণতারই আদি উৎস নিহিত ছিলো আরো আগে, দ্বিতীয় পর্বে, 'সন্দীপের চরে'র কোনো-কোনো

কবিতায়। তবে, সন্দেহ নেই, মার্ক্সবাদী দীক্ষায় ও শিক্ষায় তা আরো স্পষ্ট হয়েছে, প্রবল হয়েছে। সেই পর্বে স্বদেশের মৃত্তিকার প্রতি গভীর যে-মমতায় সেই মৃত্তিকা-মধুর আবহাওয়ায় তাঁর কবিতাগুলিকে তিনি লালন-পালন করেছিলেন, সে-মমতা এ-পর্বেও শুধু অব্যাহতই নয়, তা প্রবর্দ্ধিতও। তাই তাঁর স্বীকৃতি, 'তবু ভারতের রোগা মাটি দৃঢ়, হারায়নি তার স্থায়িত্ব।' ('মানুষের দেশ! স্বয়ং প্রকৃতি' : 'উত্তরে থাকো মৌন'), তাই তাঁর প্রার্থনা :

হে আকাশ! জল ঢালো স্থিতধী মাটিকে,
নিয়ন্ত্রিত দেশে দেশে দশদিকে বাঁচুক সবাই ॥
('সাময়িকী' : 'উত্তরে থাকো মৌন')

কিন্তু গণপ্রবণতা বা mass proneness-এর বিবর্তনে তাঁর কবিমানসে একটা স্ববিরুদ্ধতা বিদ্যমান। কবি হিসেবে প্রথম জীবনে 'জনতা' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব শুধু যে অপ্রসন্ন ছিলো, তা-ই নয়; এ-সম্পর্কে তিনি ছিলেন রীতিমতো উন্নাসিকও। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র 'প্রত্যক্ষ' কবিতার 'কোলাহল-কুৎসিত এ-নগরের ভিড়ে / দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে' কিংবা 'মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ' ইত্যাদি পংক্তিতে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় বর্তমান। আরো পরবর্তীকালে রচিত 'পূর্বলেখ'র অন্তর্গত 'সপ্তপদী' কবিতার 'এ-নিরালম্ব জনতা-সাগরে ঢুকেছে ভাসা / রুদ্ধশ্বাস' অংশেও এ-বিষয়ে তাঁর মনোভাবের বিশেষ কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ে না। কিন্তু 'পূর্বলেখ'-পরবর্তী 'সাত ভাই চম্পা' থেকেই জনতা সম্পর্কিত তাঁর চিন্তা-ভাবনায় পার্থক্যের সূচনা যে কত স্পষ্ট, সংখ্যায় মাত্র দু'টি উদ্ধৃতি থেকেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব—

১.

ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে, হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছো হাল।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল ॥
('I am Cinna the poet, Cinna the poet')

২.

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নব-সমাজ গড়ার কলরোলে,
শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে,
হারিয়ে যাবো সেখানে জনতায়।
('শেষ রোমান্টিক')

বলার অপেক্ষা রাখেনা, গণজীবন-সম্পর্কে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর মার্ক্সীয় পর্বের বহুসংখ্যক কবিতায় উত্তরোত্তর স্পষ্ট, প্রবল ও প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে।

এবং তা এতই স্বপ্রমাণিত যে বাহুল্য বিবেচনায় এ-ক্ষেত্রে আর দৃষ্টান্তের সাহায্যে গ্রহণ করা হ'লো না। কিন্তু মার্ক্সবাদে গভীর প্রত্যয় তাঁর কবিতার ভাবে ও ভাষায় যতই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচীত করুক না কেন, একক জীবনের স্বার্থপরতায় নিমজ্জনের পরিবর্তে যৌথ জীবনের মিলিত আনন্দে যতই তাঁকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলুক না কেন অথবা অনুভূতির সংবেদনশীলতার জাগরণে এবং মানবিক বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করুক না কেন, এই পর্বেরই শেষ দিকে কিন্তু তাঁর কবিতায় ভিন্নতর একটি সুর অনুস্যূত হ'য়ে উঠেছে। গণজীবনের সংহতি-সমুদ্ভূত শক্তির শুভময়তা ও কল্যাণ-প্রসূতায় তাঁর যে-আস্থা এই পর্বের প্রথম দিকেও ছিলো অনড়, এই পর্বের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁর সে-আস্থার ভিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলে, 'নব সমাজ গড়ার রলরোলে' তাঁর কণ্ঠ আর উদ্দীপিত থাকে নি কিংবা 'জনতায়' হারিয়ে যাবার অবোধ আনন্দেও তিনি আর আত্মহারা হ'য়ে ওঠেন নি। পরিবর্তে এক তিক্ত দ্বিধায় তিনি আন্দোলিত হয়েছেন, সংশয়ের কুয়াশায় তাঁর কবিচিত্ত ধীরে-ধীরে আবৃত হ'য়ে এসেছে। স্বদেশের স্বকালের অপ্রত্যাশিত অথচ অনিবার্য অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একদিকে যেমন তাঁর কবিতার শরীরে বার্ধক্যের ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই যৌথ জীবনের সমৃদ্ধি-সম্ভাবনাসমূহও তাঁর মনে ক্রমেই অনুজ্জ্বল হ'য়ে এসেছে। সমষ্টিগত ও সামগ্রিক উন্নতির পথে প্রাপ্ত সুযোগের ব্যাপক অপব্যবহার, জীবনযাত্রায় নির্লজ্জ নীতিহীনতা, বিপুল ধন-বৈষম্য, সামাজিক জীবনে আপজাত্য ও অযৌক্তিক অধ্যাদেশের আধিপত্য ইত্যাদির মিশ্র অভিঘাতে এবং সেই সঙ্গে গ্রামীন জীবনের লোকায়ত শিকড়গুলি উৎপাটিত ক'রে যে-যন্ত্রযুগ আমাদের জীবনে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে এসেছে, তা যে নাগরিক অস্তিত্বকেও সমৃদ্ধ বা শান্তিপূর্ণ করে নি—এই অনুভূতির তীব্রতা তাঁকে ক্রমেই ব্যথিত ক'রে তুলেছে। সেই ব্যথার প্রাবল্যে তাঁর এই সময়কার কবিতায় নিচু গলার একটা নরম সুর সারাক্ষণ ধ'রে বেজেছে। অতীত ও ভবিষ্যতের সময়সন্ধি, বর্তমানের অন্তঃসার-শূন্যতা বড়ো মর্মান্তিকভাবে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে ; 'অবান্তর উন্মাদ-বিলাসী খেলায় মত্ত স্বাধীন ভারতবর্ষকে তাঁর মনে হয়েছে নরক। সেই নরকে তাঁর প্রাত্যহিক অস্তিত্ব ত্রিশঙ্কুর মতো অসহায়, কেননা ঃ

> এ নরকে
> মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,
> যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
> প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল ··· ···।
>
> ('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' ঃ 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ')

স্বাধীন স্বদেশকেও তাঁর মনে হয়েছে, 'নিজ বাস একান্ত অজানা, / আজন্ম প্রবাসী', 'খুঁজে মরি নিজ বাসভূমি, আছি আপন দেশেই।' তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'মনে প্রাণে মেরে দিয়ে ভাতে / উধাও ইংরেজ ঘোড়া রেখে গেছে' যে 'হাঙ্গার সহিস', সেই সহিস-রূপী 'লুব্ধ পদলেহীর জয়ে' 'নৃশংসতা হ'য়ে ওঠে স্বভাবেরই রীতি' এবং 'লোভে শক্তি

সর্বদা ভীষণ, ঘৃণ্য কল্মষে একাকে।' ফলে, তাঁর আন্তরিক প্রশ্ন, 'একি ক্ষয়িষ্ণুতা ? না কি চৈতন্যেই অতিসার রোগী ?' কিন্তু শুধু বর্তমানের এই উতরোল প্রশ্নে আর্ত না-হ'য়ে তিনি বলেছেন, 'প্রশ্ন হোক বর্তমানোত্তর ॥' এবং বর্তমানোত্তর প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান তিনি আর যূথজনতার জীবন-সংগ্রামে পান নি, পেয়েছেন নিসর্গপ্রকৃতিতে— 'থেকে থেকে নিসর্গই ডাক দেয়,—'যেহেতু তাঁর মনে হয়েছে 'মানবজীবনে তা-ই এক-মাত্র স্বাভাবিক' ; খর বাস্তবতার পরিবর্তে পেলব স্বপ্নকেই তাঁর অনুভূত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত ব'লে, কেননা তাঁর তদানীন্তন বিরূপ অভিজ্ঞতাবিক্ষত জীবনপ্রেক্ষিতে 'স্বপ্নেই দেহের শান্তি, প্রাণের আরাম, মনের পূর্ণতা' এবং তাঁর চেয়েও বড়ো, তাঁর পরিণত প্রত্যয়, 'স্বপ্নেই তো মুক্তি, সয়ম্বর নবজন্ম, / বাস্তবের জ্যোৎস্না-স্নাত তীব্র রূপান্তর।'

অথচ দুঃখের বিষয়, সেই নিসর্গাভিসার এবং স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁর কাছে তাঁর তখনকার বর্তমানের দৃষ্টিতে যতই অনিবার্য কিংবা অপরিহার্য ব'লে প্রতিভাত হোক না কেন, এতদ্দেশীয় তদানীন্তন উগ্র মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীদের কাছে তা কিন্তু বিপ্লব-বিরোধিতার এবং বুর্জোয়া অবক্ষয়ের (bourgeois decadance) সূচক ও দ্যোতক হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। ফলে, বঙ্গজননীর কতিপয় সুসন্তান (?), মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক এবং স্বঘোষিত সাহিত্যসমালোচক, বিষ্ণু দে-র বিরূপ সমালোচনায় ভব্যতার সর্বসীমা লঙ্ঘন ক'রে নিজেদের ষোল আনা খাঁটি আগ-মার্কা প্রগতিশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান স্থপতি বিষ্ণু দে-র মার্ক্সীয় সততা-সম্পর্কিত সেই কূট বিতর্কের কলঙ্কিত অধ্যায় একালীন তরুণ পাঠককুলের অনেকের কাছেই অদ্যাবধি অনুদ্ঘাটিত। যথার্থই প্রশংসার, একদার বন্ধু-বান্ধব এবং সহ-পথিক (co-traveller)-দের সেই প্রবল বিরূপতা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, এতটুকু ভেঙে পড়েন নি। এর কারণ পরীক্ষিত মার্ক্সবাদী বিষ্ণু দে-কে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে কখনোই অডেন অথবা স্পেণ্ডারের মতো স্বপ্নভঙ্গের সম্মুখীন হ'তে হয় নি কিংবা আরাগঁ-এলুয়ারের মতো যান্ত্রিক সাম্যবাদ (mechanistic communism)-এর শিকারও কখনো তিনি হন নি। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী সাম্যবাদী বা idealist communist এবং সেই সঙ্গে, স্বকণ্ঠে উচ্চারণ না-করলেও প্রকৃতপক্ষে ভাবুক সরোজ আচার্যের মতো, তাঁরই ভাষায়, একজন 'অনুতাপহীন মার্ক্সবাদী'।

আসলে উঁচুদরের মৌলিকতা যেমন জনপ্রিয়তার সস্তা হাটে সহজে বিকোয় না, উচ্চ স্তরের মৌলিক প্রতিভাও তেমনই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মতবাদের প্রভাবের চৌহদ্দীতে কখনো সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষ্ণু দে-র কাব্যপ্রতিভাও জনৈক রবীন্দ্র-নাথের বা এলিয়টের অথবা একমাত্র মার্ক্সবাদের প্রভাব-ছায়ায় আচ্ছাদিত থাকে নি। সমস্ত প্রভাবকে স্বীকার ও শিরোধার্য ক'রেও বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক ও বিচিত্র পথ-পরিক্রমার অন্তে, কবি হিসেবে তিনি শুধু স্বতন্ত্রই নন, তিনি সার্থকও। জাগতিক ও জৈবনিক বীক্ষার ক্ষেত্রে আত্মবাতন্ত্র্যে ও আত্মস্বভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকার দরুণই বারে-বারে তাঁর

মাত্র কবিতারই রূপান্তর ঘটেনি, ঘটেছে তাঁর কবিমানসেরও গ্রহান্তর। কবিমানসের এই সজীবতা ও জঙ্গমতার কারণেই রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার ভাবজগৎ ও শিল্প-রূপকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তিনি মন্ডিত ক'রে যেতে পেরেছেন। যে-সমাজের ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন, নানা স্তরভেদ ও পর্ব-পর্বান্তর ছিলো তাঁর কাব্য-ভাবনার মুখ্য আলম্বন, তাঁর কবিতায় সে-সমাজ সর্বদা কোনো দেশকালের গণ্ডী-সীমিত নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তা সর্বদেশিক ও সর্বকালীকও বটে। চিন্তায় যে-অখণ্ডতার বিদ্যমানতাহেতু তিনি মানব-সমাজের বিভিন্ন প্রকারকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন না-ভেবে সকল মানুষকেই এক সুবৃহৎ সমাজের অন্তর্গত ব'লে ভাবতে পেরেছিলেন, চিন্তার সেই অখণ্ডতার প্রভাবেই তিনি বাঙালীসমাজকেও তার সমূহ স্থানবর্ণিমা (local colour)-সহ মেলে ধরেছিলেন—অন্তত ধরতে চেয়েছিলেন—বিশ্বসমাজের আন্তর্জাতিক পটভূমিকায়। স্বদেশ ও স্বকালকে সর্ব-দেশ ও সর্বকালের সঙ্গে সাযুজ্যসূত্রে গ্রথিত করার প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবেই তিনি তাঁর কবিতায় বিদেশের বিচিত্র আবহে স্বদেশের এবং স্বদেশের স্বকীয় আবহে বিদেশের লোক-বৃত্ত-ইতিহাস-পুরাণের ও ঋতু-অঞ্চল-স্থানবিশেষের নামকীর্তন করেছেন নানাভাবে; উদ্দেশ্য—যাতে স্বদেশী-বিদেশী সমগ্র সমাজে স্বদেশী-বিদেশী-নির্বিশেষ সমাজের সমগ্রের ছায়া পড়ে, যাতে নির্দিষ্ট স্থান ও কালের সমূহ তাৎপর্য ধরা দেয় সমগ্র স্থান ও কালের বিরাট সারণীতে। সেই কারণেই তাঁর কবিতা অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে প্রকৃত অর্থেই কল্লোলিত সমুদ্রের মতো, ভাবের ঢেউয়ের ওঠানামায় উত্তাল; উন্মুক্ত প্রান্তরের মতো, শুভ-আস্তিক্যবোধের আলো-বাতাসে পরিশুদ্ধ। তাঁর শীলিত কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের সমস্যাসঙ্কুল জীবনকে ভাবের সৌকুমার্যে ও ভাষার গতিবেগে প্রাত্যহিক দিনানুদৈনিকতা থেকে প্রথমে মুক্তি দেয়, পরে পথে নামায়। কিন্তু যেহেতু তাঁর কবিসত্তার প্রধান পীঠভূমি সমাজ, অতএব সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গীত রেখে তাঁর কবিতার রূপান্তর পাঠকের পক্ষ থেকে যেমন তাঁর কাছে প্রত্যাশিত, পাঠকচৈতন্যের সামাজিক ব্যাপ্তিও তাঁর তরফে তেমনই পাঠকের নিকট আকাঙ্ক্ষিত। অথচ তিনি জানতেন আমাদের দেশের অধিকাংশ অনগ্রসর পাঠক-পাঠিকার পক্ষে তাঁর কাব্যপথের অভিযাত্রী হ'তে প্রতিবন্ধকতা কী বা কোথায়। এবং তা জানতেন ব'লেই যথার্থ আধুনিকের মতো সমসাময়িক জীবনের অসঙ্গতির উদ্ঘাটনকে কবিতার অভীষ্টে পরিণত ক'রেও এবং এ-বিষয়ে যথেষ্ট সপ্রতিভ ও সুতীক্ষ্ম শ্লেষাত্মক হ'য়েও নিজের কবিতাকে পারতপক্ষে তিনি নেহাৎই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উৎসারণমাত্রে পর্যবসিত করেন নি। অথবা যেহেতু কবিতার আঙ্গিক কবিতার ভাবসম্পর্কবিরহিত নৈপুণ্যমাত্র নয়, অতএব কবিতার ইতিহাস যে কেবল আঙ্গিকের পরিবর্জন ও পরিগ্রহণেরই ইতিহাস—এমন ভ্রান্ত ধারণারও তিনি বশবর্তী হননি, যদিও তিনি স্থিরবিশ্বাসী ছিলেন যে 'টেকনিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেকনিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে।' (চতুর্থ স্তবকের প্রথম পংক্তি, 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি': 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'।)

আসলে তিনি চেয়েছিলেন কবিতার ভাবে ও ভাষায় এমন এক গূঢ়-দৃঢ় সমন্বয়, যার

ফলে কাব্যশিল্প হ'য়ে উঠবে মানবিক শিল্পের অন্যান্য শাখার সার্থক সংবাহ, কবিতা পরিণত হবে মানবচৈতন্যের বিবর্তন ও বিবর্ধনের অমোঘ উপাদানে। একেবারে শেষের দিকের কবিতায় কবিতার এই রূপান্তরসাধনে তিনি সর্বাধিক সফল। বস্তুত, তাঁর সেই সময়কার কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি ও সমাজের বিষয়গত ব্যবধান যেমন তিরোহিত, ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গিমার আঙ্গিক-প্রকরণগত পার্থক্যও তেমনই প্রায় অবলুপ্ত। অর্থাৎ, কবিতার দেহ ও আত্মা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে যেমন একীভূত হ'য়ে গিয়েছে, বিষয় ও বিষয়ীর সমস্ত স্বাতন্ত্র্যও তেমনই দূরীভূত হ'তে পেরেছে। বেশ বোঝা যায়, রাজনীতি ও সমাজনীতির যাবতীয় গূঢ় তত্ত্ব একপাশে ঠেলে রেখে তিনি নিমগ্ন হ'তে চেষ্টা করেছেন নিজেরই সত্তার গভীরে, ফিরে আসতে চেয়েছেন একান্তভাবেই নিজের জগতে—যে-জগতে নিছক আবেগ অনেকাংশে অন্তর্হিত, কিন্তু মর্মের দহন আদৌ অবসিত নয়; যে-জগতে ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সমষ্টিগত চেতনায় প্রতিফলিত করা নয়, বরং সমষ্টিগত চেতনাকে ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে প্রতিফলিত করাই কবির ঈপ্সিত ॥

প্রকৃত কবির বিশ্ববীক্ষা তাঁর আত্মবীক্ষারই নামান্তর। 'আত্ম'-র দর্পণেই তিনি বিশ্বকে প্রতিফলিত দেখেন এবং সেই প্রতিফলিত বিশ্বের বেদনাকে আপন অন্তরে অনুভব করেন। আবার নিজের রচনায় নিজের অন্তরে অনুভূত বিশ্বগত সেই বেদনাকে বিশ্বের কাছেই তিনি ফিরিয়ে দেন। বৈশ্বিক বিশৃঙ্খলা বা universal chaos-কে ব্যক্তিক শৃঙ্খলা বা personal cosmos-এ রূপান্তর এবং সেই রূপান্তরিত ব্যক্তিগতকে বিশ্বগত ক'রে তোলা, অর্থাৎ অস্তিত্বের অন্তহীন ও অন্তর্লীন অ্যাবসারডিটির গভীর থেকে অস্তিত্বেরই মূল সত্যকে উপলব্ধি করা, নির্যাসটুকুকে ছেঁকে তোলা—এটাই হচ্ছে একজন যথার্থ কবির প্রধান অভীষ্ট, তাঁর জীবনের মৌল অন্বেষণ। যদি-না তিনি বিশ্বকে আত্মে প্রতি-ফলিত করতে পারেন, তাহ'লে আত্মকেও বিশ্বে সম্প্রসারিত করতে পারেন না তিনি। বস্তুত, আত্মগত-বিশ্বগতের এই গ্রহণ-প্রত্যর্পণ মাত্র কবিতার নয়, যে-কোনো সৃষ্টিরই গোপন রহস্য, যাকে আমরা বলি সৃজনী প্রক্রিয়া (creative process), তার নেপথ্য নিয়ামক। বিশ্বজীবনের বিচিত্র, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল ঘটনাবলীর দ্বান্দ্বিক সংঘটন (dialectical occurance)-জনিত মানবিক ও মনোজাগতিক নানা অভিঘাত স্রষ্টার পর্যবেক্ষণের অন্তর্গত হ'য়ে তাঁর সৃষ্টিতে একটি সমগ্রতা পায়, একটি অবিমিশ্র রূপ পরিগ্রহ করে।

এ-কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে সামাজিক জীবনের পটভূমিকাতেই বিভিন্ন যুগের কবিকুল তাঁদের স্ব-স্ব কবিতার স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং ভাব ও ভাষার বিবেচনায়, আঙ্গিক ও প্রকরণের পর্যালোচনায় সমালোচকরা বিশেষ কালের প্রতীক হিসেবেই তাঁদের কবিতার বিচার ক'রে থাকেন। কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও প্রায় সমানভাবেই স্বীকার্য, সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে মানবচরিত্রের উন্মোচন এবং মানবিক অভিজ্ঞতায় শিল্পীত রূপায়ণই ব্যাপক অর্থে সকল কালের সকল কবিতার সাধারণ বিষয়বস্তু। ফলত, কবির দায় বিচিত্র ও বিপুল, তাঁর দায়িত্ব যুগপৎ যৌথ ও একক, সামাজিক ও মানবিক।

এই দায়-দায়িত্বের স্বীকারে ও পালনে বিভিন্ন দেশের ও কালের কবিদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—কারো-কারো চোখে সমাজই মুখ্য, কারো-কারো ঝোঁকে ব্যক্তি। অর্থাৎ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা—এই শক্তিদ্বৈতের কোনো-না-কোনোটির প্রতি আন্তরিক পক্ষপাতে পৃথিবীর তাবৎ কবিই কমবেশি চিহ্নিত। অবশ্য এমন কবির সাক্ষাৎও আমরা পাই (এবং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্ব-কালে এঁরাই সংখ্যায় গুরু), যাঁরা তাঁদের রচনায় এই দুই আপাতবিরুদ্ধ প্রবণতার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে পেরেছেন, পেরেছেন নিজেদের কবিতায় ধীরে-ধীরে অর্জন করতে এমন এক পরিণতি এবং সমগ্রতা, যাতে এই দুই প্রবণতার আপাতবিরুদ্ধতার

অবসান নিশ্চিতরূপে সূচীত। উত্তররবীন্দ্রিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি অরুণ মিত্র এমনই একজন কবি।

অরুণ মিত্রের জন্মস্থান যশোর শহর, জন্মদিন ১৯০৯ সালের ২রা নভেম্বর। শৈশব কেটেছে যশোরে, বাল্য কলকাতায়। কলকাতায় থাকতে-থাকতেই স্কুল-কলেজের গণ্ডী অতিক্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন অসমাপ্ত রেখেই, পরিস্থিতির চাপে পেশাজীবনে প্রবেশ করতে হয় তাঁকে। তেমন না-হ'লেও কিছুটা বৈচিত্র্যমণ্ডিত তাঁর পেশাজীবন। পেশাগত সূত্রে দীর্ঘদিন দৈনিক 'আনন্দবাজার' ও সাপ্তাহিক 'অরণি'-র সঙ্গে সাংবাদিকরূপে নানা দায়িত্বে এবং 'আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ'-এর গ্রন্থাগারে সহকারী হিসেবে যুক্ত থাকার পর ১৯৪৮ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি ফ্রান্সে চ'লে যান। যেখানে, রাজধানী প্যারীতে, সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিন বৎসর ধ'রে 'ল্য গ্রুপ দ্য লা রভু ব্লাঁশ' (বাংলায় এর অর্থ : 'শ্বেত পত্রিকার গোষ্ঠী')-বিষয়ে গবেষণা ক'রে তিনি 'ডক্টরেট' ডিগ্রি অর্জন করেন। প্যারীতে থাকাকালে তাঁর আস্তানা ছিলো প্রথমে রু দ্য লা তর্ব ইসোয়ার-এ এবং পরে সিতে ইউনিভার্সিতের-এ—বাসস্থান হিসেব দু'টিই রীতিমতো বিখ্যাত। তিন বৎসর ফ্রান্সে কাটিয়ে ১৯৫১ সালে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যাবর্তনের পরের বৎসরই, অর্থাৎ ১৯৫২ সালে, এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি বিভাগের তদানীন্তন প্রধান ডক্টর বানোয়া-র সাদর আমন্ত্রণে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান, আর সেই সঙ্গে প্রবাসীর জীবন-বরণ। অবশেষে, ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ব্যাপ্ত কুড়ি বছরের প্রবাস-পর্বের উপান্তে পৌঁছে অধ্যাপকবৃত্তি থেকে অবসরগ্রহণ ও কলকাতার ছেলের কলকাতায় ফিরে আসা এবং লেখালেখির কাজে অখণ্ড একাগ্রতায় আত্মনিয়োগ।

অরুণ মিত্রের কবিতা-সম্পর্কিত আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর বৃত্তিবিষয়ক এই তথ্যাবলীর উল্লেখ একান্ত অপরিহার্য না-হ'লেও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও নয়; কেননা তাঁর বৃত্তি-জীবনের ঘটনাবলী তাঁর কবিজীবনের রচনাবলীকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ, তাঁর কবিজীবনের পর্যালোচনায় তাঁর বৃত্তিজীবনের অবতারণা প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। আর, এটা মাত্র আমাদেরই সিদ্ধান্ত নয়, অরুণ মিত্র নিজেও তাঁর পেশা-জীবনের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে একাধিক লিখিত বক্তব্যে তাঁর পেশাজীবনের সঙ্গে কবি-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বিষয়ক আমাদের এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত প্রায় এগারো বৎসর 'আনন্দবাজারে'র সঙ্গে যুক্ত থাকাটা তাঁর পক্ষে শুধু সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায়স্বরূপই ছিলো না, ছিলো মানসিক প্রশস্ততা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগও। শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদনায় সহযোগী হিসেবে এই পর্বেই তিনি একে-একে শৈলজানন্দ-তারাশঙ্কর-মানিক প্রমুখ ও তদানীন্তন অন্যান্য সাহিত্য-দিক্‌পালের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক নানা প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ-আলোচনায় মানসিক পুষ্টিঅর্জন ও স্বাস্থ্য-

বর্ধনের ব্যাপারটা তো ছিলোই, তদুপরি ছিলো তাঁর একেবারে প্রথম দিকের কবিতায় সুফল প্রসব। খোলা চোখে খোলা মনে ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া,—এই-ই হচ্ছে প্রকৃত সাংবাদিকের প্রধান কাজ। কিন্তু স্বদেশের ও স্বকালের হৃদয়োত্থিত প্রতিটি স্পন্দনের খর ও গাঢ় অনুভব-সামর্থ্য ব্যতিরেকে সফল সাংবাদিক হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সফল সাংবাদিকতার এই মূল শর্তটি সম্পর্কে অরুণ মিত্র সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে নিজের ভাবনা-চিন্তাকে নিজের দেশের ও কালের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত করার সফল সাংবাদিকসুলভ যে-প্রবণতা সুপ্ত ছিলো, প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জনের প্রারম্ভিক কালেই সাংবাদিকরূপে জীবন-পর্যবেক্ষণ শুরু করার সুযোগ পাওয়ায় তা ক্রমেই মূর্ত ও স্ফূর্ত হ'য়ে উঠেছিলো। এ-সম্পর্কে সর্বোত্তম প্রমাণ তাঁর নিজেরই উদার স্বীকৃতি—'আনন্দ-বাজারের কাজকে চাকরি বললে ঠিক বলা হয় না। তা ছিল আমার এক নতুন উদ্দীপনার ক্ষেত্র।' সেই 'নতুন উদ্দীপনা'র স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'র 'কয়েকটি পুরনো কবিতা' শিরোনামের 'আচ্ছন্ন', 'প্রতিধ্বনি', 'অরণ্য', 'দিবস-রজনী', 'শোভাযাত্রা', 'জীবন-দক্ষিণা' এবং 'আমরা চেয়েছি শান্তি'—এই কবিতা-সপ্তকে। সাতটি কবিতাই 'আনন্দবাজারে' তাঁর চাকরি-পর্বের প্রথম দিকে (১৯৩৪-৩৫ সালে) রচিত এবং সাতটি কবিতারই সাধারণ শিরোনাম তাঁর 'কাব্যসমগ্রে' 'কয়েকটি পুরনো কবিতা'র পরিবর্তে 'পূর্বখণ্ড'।

'সম্পাদকের স্বাধীনতা'র প্রশ্নে 'আনন্দবাজার'-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গুরুতর মতভেদ ঘটায় স্বাধীনচেতা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৪০ সালে ঐ পত্রিকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং পরের বৎসর থেকে প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'অরণি' সম্পাদনা শুরু করেন। 'অরণি'র যাত্রারম্ভের এক বৎসর পরেই সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রতুল্য ও ভাগনী-জামাতা অরুণ মিত্রও 'আনন্দবাজারে'র নিশ্চিন্ত তরণীর আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিত 'অরণি'র অস্থির তরঙ্গাবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, টালমাটাল ঝড়ে সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কর্ণধাররূপে 'অরণি'র হাল ধরলেন। পরবর্তী অর্ধযুগ এই সাপ্তাহিকটিই পরিণত হয়েছিলো তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্রে। সেই কর্মক্ষেত্রে থাকাকালেই একজন কবি হিসেবে প্রগতিশীলতায় তাঁর দীক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে। স্মরণীয়, সময়টা পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের করাল-পর্ব। সেই ভয়ঙ্কর সময়ের অনিবার্য চাপে বাংলার প্রগতি-সাহিত্যিক আন্দোলনের রূপান্তর ঘটে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, ১৯৪২-এর মার্চ মাসে পূর্বতন 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' রূপান্তরিত হয় 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলনে নবগঠিত কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন যুবক-কবি অরুণ মিত্র। অবশ্য, এখানে জানানো উচিত, আরো আগে থেকেই 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ', 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' এবং এ-ধরনের আরো কয়েকটি তখনকার উত্তরোল

সময়ের বিবেচনায় প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি নানাসূত্রে কমবেশি জড়িত ছিলেন। আর, সাধারণভাবে রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে মার্ক্সবাদের প্রতি আকর্ষণ তো অন্তত সেই সময় তাঁর পক্ষে ছিলো প্যাশনতুল্য। তদানীন্তন 'বাংলার প্রগতি-সাহিত্যের আন্দোলন, গণনাট্য আন্দোলন এবং ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর আন্দোলন.⋯ ⋯চল্লিশের দশকে বাংলা সংস্কৃতির যুগান্তকারী এই পদক্ষেপগুলির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর' যে-সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় 'নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও' পাওয়া যাচ্ছিলো, সেই 'সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত' 'অরণি'র কর্মোন্মাদনায় আত্মনিয়োগ ক'রেই তিনি সঞ্চয় করেছিলেন সেই 'উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা', যার গভীর ছাপ পড়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ভাষণ' অংশের 'লাল ইস্তাহার', 'মাটির কবর', 'কসাকের ডাক ঃ ১৯৪২', 'অগ্রবর্তী' এবং 'আন্তর্জাতিকে'র মতো বহুপঠিত ও বহুআলোচিত কবিতা-সমূহে। 'আনন্দবাজারে' কাজ করতে গিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'উদ্দীপনার ক্ষেত্র' আর 'অরণি'র কর্মসূত্রে তিনি অর্জন করেছিলেন 'উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা'।

কিন্তু সেই 'উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা' অর্জনের পর্বেই তাঁর মধ্যে ধীরে-ধীরে প্রবাহিত হ'তে শুরু করেছে গোষ্ঠীপরায়ণতার বিপরীত একটি স্রোত, তাঁর চেতনায় ক্রমে-ক্রমে আলোড়ন তুলেছে যূথবদ্ধতার বিপ্রতীপ একটি ভাবনা ঃ সাহিত্যে বা শিল্পে কার ভূমিকা প্রধান—ব্যক্তির, না গোষ্ঠীর? সৃজনকর্মে কোন্‌টির অবদান অধিক—ব্যষ্টির অথবা সমষ্টির? সেই রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ও ক্রিয়া-কলাপের উতোর-চাপানের সময়েই এই নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন এবং আমাদিগকে জানিয়েছেন, 'শিল্পসাহিত্য সৃজন যে যৌথ উদ্যমের বিষয় নয়, একক সাধনার বস্তু, সে-ধারণা অধিকাংশের মতো আমারও ছিল।' পরবর্তীকালেও এ-সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তিনি একাধিকবার জানিয়েছেন, বলেছেন যে, সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্র-অভিনয় ইত্যাদির কোনটির সাধনাই সমাজ বা তাঁর অন্তর্গত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, 'কিন্তু এ-সবই নিজের-নিজের আলাদা কাজ।' এই আত্মিক উপলব্ধির একান্ত দিক্‌টি ছাড়াও অন্য একটি ব্যাপারেও তিনি সেই সময় গভীর অস্বস্তির শিকারে পরিণত হয়েছিলেন; সেটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা এবং তৎসম্পর্কিত বিতর্ক। সেই বিতর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে দোটানার যে-খাদে তিনি প'ড়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে উঠে আসা তাঁর পক্ষে সেদিন আদৌ সহজসাধ্য বা সুখকর হয়নি; কিন্তু সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ ক'রে যে-শিক্ষাটুকু তিনি লাভ করেছিলেন, তা ছিলো তাঁর পক্ষে যথার্থই মূল্যবান। একই সঙ্গে 'শৌখিন' সাম্যবাদীদের প্রতি আন্তরিক অনীহাবশত 'পার্টিজান' 'লড়াকু' সাম্যবাদীদের 'ঘনিষ্ঠ' হ'য়ে ওঠা ও স্বপক্ষতা এবং ১৯৪৭-৪৮-এর বিখ্যাত 'আরাগঁগারোদি বিতর্কে' সাহিত্য-সম্পর্কিত যান্ত্রিক ছক-বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেই 'ঘনিষ্ঠ'দেরই বিপক্ষতা—এই আত্মিক দ্বৈততা (spiritual duality)-ই ছিলো তাঁর সেদিনের আত্মিক সংকট (spiritual crisis)-এর মূল হেতু। শিল্প-সাহিত্য বিচারে কট্টর কমিউনিস্টদের mechanistic and formula attitude-এর প্রতি

তাঁর অন্তরের সমর্থন ছিলো না ব'লেই তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন গারোদির মতের সমর্থক। বাংলা ভাবানুবাদে সেই মত 'কমিউনিস্ট শিল্পতত্ত্ব ব'লে স্বতন্ত্র কোনো শিল্পতত্ত্বের অস্তিত্ব নেই'। অতএব, দেখা যাচ্ছে, সেই অস্থির সময়ের প্রবল উত্তালতায় তাঁর মানসিক অবস্থান সর্বদা এবং সর্বথা এক ছিলো না। এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, সেই সময়কার দলীয় রাজনীতির তাবে ব'সে এবং তাপে থেকেও, তার প্রত্যক্ষতার আলোড়নে তিনি যথেষ্ট উত্তাপ অনুভব করছিলেন না, তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারছিলেন না। বস্তুত, দলীয় রাজনীতির বা রাজনৈতিক দলীয়তার প্রতি উত্তাপের নয়, শৈত্যের অনভূতি—সমর্থনের পরিবর্তে বিরুদ্ধতার মনোভাবই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিলো সেদিন। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অনুশাসনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং আত্মিক উপলব্ধির ওপর যুক্তিশাসিত নির্ভরতা—এ-দু'য়ের মধ্যে সেদিন তাঁর প্রাণের সাড়া ছিলো দ্বিতীয়টির প্রতিই। কমিউনিস্টপন্থী 'অরণি'-কেন্দ্রিক পেশাগত কর্মকাণ্ডের তথা প্রগতিশীলতা চর্চার তথা সাম্যবাদী স্বপ্নদর্শনের পরিণতিস্বরূপ অরুণ মিত্রের এবম্বিধ পরিবর্তিত মানসিকতায় উপনীত হওয়ার পরিণাম তাঁর পরবর্তী কবিজীবনকে কত আমূলভাবে প্রভাবিত করেছে, এই আলোচনায়, পরে, তাঁর কবিতার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে, তা পর্যালোচিত হবে।

'অরণি'-পর্বের উপান্তে পোঁছেই অরুণ মিত্রের বিদেশে পাড়িঃ লক্ষ্য ফ্রান্স, ফ্রান্সের প্যারী, প্যারীর সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়, সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' ডিগ্রী অর্জন। ফ্রান্সে তিনি কোনো পেশাসূত্রে যাননি (সেখানে তাঁর ভরণপোষণ চলতো ফরাসী সরকারের আর্থিক অনুদানে), গিয়েছিলেন ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নেশাসূত্রে। স্বাভাবিকভাবেই প্যারীপ্রবাসের তিন বৎসরের বেশির ভাগ সময়টাই তিনি কাটিয়েছেন অধ্যবসায়ী ছাত্রের মতো, অনলসভাবে, পড়াশোনায়। ফলে, ফরাসী কবিমহলে ঘনিষ্ঠ-মেলামেশা করার মতো সময় কিংবা সুযোগ—কোনোটাই তিনি ক'রে উঠতে পারেন নি। এ নিয়ে তাঁর গভীর ক্ষোভ আজও ঘোচেনি, হয়তো ঘুচবেও না কোনোদিন; কেন না ফরাসী কবিদের সঙ্গসুধা তিনি পান করতে চেয়েছিলেন আকণ্ঠ। তবু, সেই সময়াভাবের মধ্যেও তিনি লাঁসলো এবং আরো কয়েকজন চিত্রশিল্পীর সান্নিধ্যে এসেছেন, শহর-গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, দ্রষ্টব্য স্থানও কিছু-কিছু দেখেছেন। সেই সব কিছু নিয়ে অজস্র গল্পের বুদ্বুদ এখনো তাঁর মনে মাঝে-মাঝে ফেনিয়ে ওঠে। ফ্রান্সে থাকাকালে কবিতা বা গদ্য প্রায় কিছুই লেখেননি তিনি—সম্ভবত সময়াভাবেই লিখতে পারেননি। তাঁর স্মৃতি অনুযায়ী, 'উৎসের দিকে'র মাত্র তিনটি কবিতা, যার একটি, তাঁর নিশ্চিত ধারণা, অবশ্যই 'প্রবাসী', তাঁর ফ্রান্স-প্রবাসকালীন রচনা। ফ্রান্সে ব'সে কবিতা তিনি প্রায় লেখেন নি বটে, কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কালের হ'লেও ফ্রান্স-প্রবাস তাঁর কবিতা-বিষয়ক পরবর্তী ভাবনা-চিন্তার দিক্ থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ব'লে প্রমাণিত। সেই প্রমাণ তাঁর প্যারী-প্রবাসোত্তর কবিজীবনের সমগ্র আবহে—তাঁর কবিতার আঙ্গিক-

প্রকরণে, কবিতা-সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা-চিন্তায়, তার কাব্যগত কথাবার্তায় অর্থাৎ, প্যারী-প্রবাস তাঁর কবিসত্তার সামগ্রিক বিবর্তনে বস্তুতই সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করেছিলো।

ফ্রান্সে সংক্ষিপ্ত প্রবাস সমাপ্ত ক'রে '৫১-তে ভারতে ফিরে '৫২ থেকেই এলাহাবাদে শুরু হ'লো তাঁর কুড়ি বছরের সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবন। মাঝে-মধ্যে কলকাতায় এসেছেন, দিন-কয়েকের সাময়িক বসবাসের সুযোগে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন, সাহিত্য-সম্পর্কিত সভা-সমিতি-আড্ডায় যোগ দিয়েছেন (এ-ভাবেই একবার ১৯৬৬-তে ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসে 'উল্টোরথ'-পুরস্কার নিয়েছেন), আবার ফিরে গিয়েছেন এলাহাবাদে তাঁর কুড়ি বছরের স্থায়ী ঠিকানায়, কলকাতায় দিন কয়েকের সাময়িক আগন্তুক, যদিও কলকাতারই মানুষ, কবি অরুণ মিত্র। ছিলেন বটে একনাগাড়ে কুড়ি বছর এলাহাবাদে, কিন্তু দিনেকের জন্যও এলাহাবাদ তাঁর রক্তে প্রবেশ করেনি কিংবা, একমাত্র 'এলাহাবাদ ইস্টিশনের' ('মঞ্চের বাইরে মাটিতে') কবিতাটির কথা বাদ দিলে, তাঁর কবিতায় ছায়া বিস্তার করেনি ; বরং সেই সুদীর্ঘ প্রবাস তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে সাধারণভাবে বাংলাদেশের (এখনকার পশ্চিমবঙ্গের) এবং বিশেষভাবে তাঁর প্রিয় শহর কলকাতার প্রতি ইতিপূর্বে অননুভূত এক সুতীব্র আকর্ষণ। অর্থাৎ, স্বদেশের মাটি থেকে দূরে গিয়েই তিনি যেন তাকে নূতন ক'রে চিনতে পেরেছেন, তার মহত্ত্বকে বহুগুণে উপলব্ধি করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তিও অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'ছিলাম বটে এলাহাবাদে, কিন্তু সতিকারের বাসিন্দা ছিলাম কলকাতার।·· প্রত্যেক ছুটিতে আমি এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছি এবং ফেরার সময় মনে করেছি ছুটিতে বাইরে যাচ্ছি।' আরো গুরুত্বপূর্ণ উক্তি, যা কবি হিসেবে তাঁর স্বভূমির সন্ধান-নির্দেশক—'বারবার অনুভব করেছি আমার সমস্ত শিকড় এই কলকাতায়, এই বাংলাদেশের মাটিতে গাড়া আছে।' এবং সেই সঙ্গে তাঁর সরল স্বীকৃতি, 'এই অনুভূতির কথা আমার একাধিক কবিতায় প্রকাশও করেছি।' ঠিক, অতি সত্যি তাঁর এই স্বীকৃতি। এলাহাবাদে ব'সে লেখা তাঁর সমস্ত কবিতাই—'উৎসের দিকে'র বেশির ভাগ, বিশেষত 'স্মরণকাল'-শিরোনামাঙ্কিত অংশের রচনাকালের পরবর্তী সময়ে রচিত সব ক'টি, 'ঘনিষ্ঠ তাপ' এবং 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত প্রতিটি, এমন কি আরো পরের 'শুধু রাতের শব্দ নয়' গ্রন্থেরও একাধিক—তাঁর এই স্বীকৃতির যাথার্থ্যের নিদর্শন। তাঁর সেই সময়ের সমস্ত রচনায় তাঁর সেই অনুভূতিকে আমরা যেন ছুঁতে পারি, তাঁর সেই পর্বের আপাতশীতল প্রতিটি কবিতার শরীরে আমাদের মনের হাত ছুঁয়ে তাঁর প্রবাসের বেদনার জ্বর আমরাও যেন অনুভব করতে পারি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এলাহাবাদে তিনি এত দিন ধরে বাস করলেন, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর, অথচ এলাহাবাদ তাঁর কবিসত্তায় প্রবেশ করলো না ; সেই শহরে ব'সে এত কবিতা তিনি রচনা করলেন, সোয়া শ'-রও বেশি, তবু সেই শহর তাঁর কবিতাকে প্রভাবিত করলো না। তাঁর এলাহাবাদ-পর্বের সমস্ত কবিতারই দেহমনে শুধুই বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ, কেবলই অবিভক্ত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা আর কলকাতা।

যে কলকাতায় ফিরে আসার জন্য তাঁর এত আকুলতা, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই কলকাতায় ফিরে এলেন বাষট্টি-পেরোনো-তরুণ অরুণ মিত্র তারুণ্যের উন্মাদনা নিয়ে, স্থায়ীভাবে। তখন তাঁর মাথা-ভর্তি লেখার পরিকল্পনা, কিন্তু এত বিশাল কলকাতায় কোথাও তাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। অবশেষে, অনেক চেষ্টার পর, রাজনৈতিক নেতা আর সরকারী আমলাদের স্তোক ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির স্তর অতিক্রম ক'রে কলকাতায় যখন তিনি একটি স্থায়ী আস্থানা পেলেন, কিংবা বলা চলে, তাঁর ভাগ্যে হঠাৎ শিকে ছিঁড়লো, তখন তিনি আরেক মানুষে রূপান্তরিত, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের—সৃষ্টির আবেগে অধীর, উন্মাদনায় অস্থির। এই সময়টায় তাঁর মধ্যে সৃষ্টির যেন জোয়ার এসেছিলো। মাথা গোঁজার সামান্য একটু ঠাঁই (তাঁর স্ত্রী, আমাদের অনেকেরই শান্তি বৌদির ভাষায়, 'মরবার একটা জায়গা') পেয়েই নিজেকে তিনি পুরো-পুরি নিয়োজিত করেছেন লেখালেখির কাজে। লিখেছেন অনেক, দু'হাতে, ছোটো-বড়ো-ডান-বাম সব পত্র-পত্রিকায়—কখনো প্রাণের প্রেরণায়, কখনো জীবিকার প্রয়োজনে। কত বিভিন্ন রকমের সে-সব রচনা—কবিতা (মৌলিক ও অনুবাদ), উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ফীচার। কত বিচিত্র বিষয় সে-সমস্ত রচনার—ফরাসী সাহিত্য ও কবিদের কথা, মায়কোভস্কি-এলুয়ার-সার্ত্র-প্রসঙ্গ, 'ভারতীয় থিয়েটার' (আদ্য রঙ্গাচার্য-লিখিত ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ), 'গাছের কথা' (রাস্কিন বণ্ড-রচিত মূল ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ) ইত্যাদি। প্রাণের শহর কলকাতায় ফিরে আসার পর থেকে তাঁর সেই সৃজন-জোয়ারে, বয়সের গুরুভার সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত ভাটার কোনো লক্ষণ নেই, অদ্যাবধি তা সমানভাবেই অব্যাহত। অবশ্য এ-কথাও সানন্দে স্মরণীয় যে স্রষ্টা হিসেবে তাঁর এই সক্রিয়তা এবং তারই ফলে তাঁর সৃষ্টির বহুলতার কারণে দেশবাসীর সমাদর তো বটেই, এমনকি সরকারী স্বীকৃতিও তিনি লাভ করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের তরফে, বহু সভা-সমিতিতে নানা উপলক্ষ্যে তাঁকে সম্মান-সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৭৯ ও ১৯৮৭ সালে তাঁর 'শুধু রাতের শব্দ নয়' এবং 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' কাব্যগ্রন্থের জন্য যথাক্রমে রবীন্দ্র পুরস্কার ও অ্যাক্যাডেমী পুরস্কার প্রদানের ভেতর দিয়েই তা প্রমাণিত।

অরুণ মিত্র বহুপ্রসূ ও বহুবিষয়ক লেখক, তাঁর লেখক-জীবনও দীর্ঘদিনের—সেই ১৯৩৪ থেকে তাঁর শুরু এবং আজ পর্যন্ত তা প্রলম্বিত। কিন্তু এই দৈর্ঘ্যের অনুপাতে তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ সংখ্যায় মোট সাতটি। প্রকাশের কালানুক্রমে সেগুলি ঃ 'প্রান্তরেখা', 'উৎসের দিকে', 'ঘনিষ্ঠ তাপ', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে', 'শুধু রাতের শব্দ নয়', 'প্রথম পলি শেষ পাথর', এবং 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'। এগুলির মধ্যে 'প্রান্তরেখা', 'উৎসের দিকে' এবং 'প্রথম পলি শেষ পাথর'—এই তিনটি গ্রন্থে রচনাকালের (যথাক্রমে ১৯৩৪/৩৫-৪৩, ১৯৪৩-৪৮ ও ১৯৫১-৫৫ এবং ১৯৭৫-৭৯) উল্লেখ আছে, অন্য চারটিতে নেই। মাত্র 'উৎসের দিকে' এবং 'শুধু রাতের শব্দ নয়' গ্রন্থ দু'টি ছাড়া অন্য কোনোটিরই প্রথম প্রকাশের পর আর কোনো প্রকাশ বা

সংস্করণ হয়নি। কিন্তু অরুণ মিত্রের মতো কবির পক্ষে তাঁর কাব্যগ্রন্থের এই সংখ্যাস্বল্পতা কিংবা প্রথম প্রকাশের পর সংস্করণবিহীনতা তেমন গুরুতর কোনো ব্যাপার নয় ; বরং তাঁর ক্ষেত্রে প্রকৃত গুরুত্বের বিষয়টি হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথের পরের কালের বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন মৌলিক কবি। তাঁর কবিতার পর্যালোচনায় কবি হিসেবে তাঁর এই মৌলিকতাই বিশেষভাবে বিবেচ্য, তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা কিংবা সেগুলির সংস্করণের পৌনঃপুনিকতা নয়।

'প্রান্তরেখা' অরুণ মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটির প্রকাশসন ১৯৪৩ (আশ্বিন, ১৩৫০) এবং এটিতে সন্নিবেশিত কবিতার সংখ্যা, তাঁর কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড) অনুযায়ী, চৌত্রিশ। ১৯৩৪/৩৫ থেকে শুরু ক'রে ১৯৪৩ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়-সীমার মধ্যবর্তীকালীন কবিমানসের পরিচয় ধরা আছে এই কবিতাগুলিতে। প্রথম দিকে উনিশটি কবিতা সাধারণভাবে সাজানোর পর, গ্রন্থটির শেষাংশ প্রথমে 'ভাষণ' শিরোনামে আটটি এবং পরে 'কয়েকটি পুরনো কবিতা' শিরোনামে সাতটি কবিতা বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে 'কয়েকটি পুরনো কবিতা' অংশটুকুই সবচেয়ে আগের রচনা। তাঁর কাব্যসমগ্রের প্রথম খন্ডের 'নিবেদনে' এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এ-অংশের কিছু রচনা বর্জন করবার খুব ইচ্ছে আমার হয়েছিল, কিন্তু···বর্জনের অভিপ্রায় আমি ত্যাগ করি এই ভেবে যে, পুরোনো এ-সব লেখা তো আমার চলারই এক সাক্ষ্য, তাদের কাছ থেকেই খানিকটা জানা যাবে আমার আরম্ভটা কেমন ছিল এবং তারপর আমি কোন্ দিকে চলেছিলাম।' সেই সঙ্গেই এই অংশের পরবর্তীকালীন 'প্রান্তরেখা'র অন্য কবিতাগুলি সম্পর্কেও তিনি জানিয়েছেন " 'প্রান্তরেখার'র যে-সব কবিতা পরে লেখা, তাদের ক্ষেত্রেও আমার বর্জনের ঝোঁক এসেছিল। মনে হয়েছিল, যেন অন্ধের মতো চলা, মাথা-ঠোকা এখানে-ওখানে। কিন্তু খেয়াল হয়, আমার এই পথ-হাতড়ানোও তো সবার সামনে ধরা দরকার। নইলে কী ক'রে বোঝা যাবে আমার উত্তরণ, যদি আমি আমার একান্ত পথ পেয়ে গিয়ে থাকি ?···'প্রান্তরেখা'র এই পরবর্তী অংশ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে ওঠে। এর কোথাও কি আমার ভাবনা ও বাক্‌রীতির কোনো স্বাতন্ত্র্য ফোটেনি ?···আমার শুধু মনে হয়, এর অব্যবহিত পরের পর্ব থেকে অর্থাৎ 'উৎসের দিকে' থেকে একটা স্বতন্ত্র ধাঁচ আসে আমার কবিতায়, যার কিছু লক্ষণ প্রথম গ্রন্থে ছিল।"

এ হচ্ছে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণার কথা। এই ধারণার প্রকাশে ওপরের উদ্ধৃতির শেষ অংশটুকু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অংশটুকু থেকে বোঝা যায়, এ-কবি আত্মবিশ্বাসী, নিজের কবিতা সম্পর্কে প্রথম থেকেই তিনি আত্ম-প্রত্যয়ী। যে-কবি প্রস্তুতি-পর্বেই প্রত্যয়ী, আত্মপ্রকাশের প্রথম স্তরেই আত্মবিশ্বাসী, তাঁর কাব্যসামর্থ্য সন্দেহাতীত। এই সামর্থ্যের প্রকাশ 'প্রান্তরেখা'য়, কবিতা-বিশেষে ঈষৎ অস্পষ্ট হ'লেও, সাধারণভাবে স্পষ্ট। এই প্রকাশের আবার দু'টি দিক্ ঃ ব্যক্তিক ও সামাজিক। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ও সমাজগত—এই দ্বিবিধ বিষয়কেন্দ্রিক ভাবনা-বেদনায়

তাঁর কাব্যযাত্রার সূত্রপাতটি সুচিহ্নিত এবং কবিজীবনের একেবারে প্রথম দিকে তিনি কিঞ্চিৎ দোলায়িতও। অবশ্য অরুণ মিত্রের কবিপ্রতিভার বিবর্তন-বিশ্লেষণাত্মক এই আলোচনাতেই আমরা দেখবো যে, সেই প্রাথমিক দোলাচলের পর, সমস্ত টালমাটাল অতিক্রম ক'রে, পরবর্তীকালে, কাব্যগ্রন্থ-পরম্পরায়, সামাজিক কোলাহলে ভেসে না-বেড়িয়ে, ক্রমেই তিনি একাগ্রচিত্তে নেমে গিয়েছেন নিজের অস্তিত্বের গভীরে, চোখ বুজে-ছেন নিজের 'বিপুল হৃদয়ের ধ্বনির ভিতরে'। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর কবিতায় সামাজিক যূথবদ্ধতার দাবি ক্রমশ অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির ছবি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। অরুণ মিত্রের কবিতার পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রথমেই কথাটা ওঠালাম এই কারণে যে কবি হিসেবে তাঁর সম্পর্কে এটি একটি মূল সত্য এবং এই মূল সত্যটির উপলব্ধি ব্যতীত তাঁর কবিতাকে বোঝা ও বোঝানো—দু'য়েই বিভ্রান্তির সমূহ সম্ভাবনা।

'ভাষণ' অংশ বাদে, 'প্রান্তরেখা'র 'কয়েকটি পুরনো কবিতা' অংশে এবং অন্য কবিতাগুলিতে অরুণ মিত্রের আত্মগত অনুভূতি প্রায়ই অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত ; কিন্তু 'ভাষণ' অংশের কবিতাগুচ্ছে তাঁর সমাজগত সচেতনতা অবশ্যই স্পষ্টভাবে অনুভূত। 'কয়েকটি পুরনো কবিতা' তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভিক-পর্বের অভিজ্ঞান। নিজেকে তখনো তিনি খুঁজে পান নি—পাবার কথাও অবশ্য নয়। বস্তুত, আত্মান্বেষণ অভীপ্সাই তখনো তাঁর মধ্যে তেমনভাবে জাগ্রত হয়নি। অতএব পথ হাতড়াতে-হাতড়াতে এবং হাত মক্‌শো করতে-করতে এই অংশের যে-ক'টি কবিতা তিনি লিখেছিলেন, সে-গুলির প্রায় সব ক'টিরই ওপর তাঁর নিজের, অর্থাৎ তিরিশের, যুগেরই কোনো-না-কোনো কবির ছায়াসম্পাত ঘটেছে। এই ছায়া যেমন ভাবে, তেমনই ভাষায় ; অর্থাৎ, কবিতা-গুলির দেহে এবং মনে, উভয়ত। 'শোভাযাত্রা' কবিতার 'পথের দু'ধার দিয়ে মানুষের ভিড়, / ছত্রভঙ্গ ছন্নছাড়া দল' পংক্তিদ্বয় যেমন প্রেমেন্দ্রের কবিতাবিশেষের অনুকারী, 'দিবস-রজনী' কবিতার 'অধৈর্য হয়েছে মোর শরীরের স্নায়ু। / নিশ্চিন্ত নীলিমা হ'তে প'ড়ে যাব স্খলি', / জীবন জ্বলিয়া যাবে তোমার আমার' পংক্তিত্রয়ও তেমনই বুদ্ধদেবের কাব্যভাবনার অনুসারী। এমনকি 'তুমিও ভাবিয়াছিলে হবে অপলাপ' ('আচ্ছন্ন') কিংবা 'আমরা চেয়েছি শান্তি আজ তার অবসাদ ভারি' ('আমরা চেয়েছি শান্তি') ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে যথাক্রমে তাঁর কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের চকিত উঁকিঝুঁকিও একেবারেই অলক্ষ্য নয়। অর্থাৎ, তাঁর সমসাময়িক ও সামান্য পূর্ববর্তী কোন্ কবিকে অনুসরণ ক'রে কার পথে তিনি অগ্রসর হবেন, সে সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে তখনো তিনি উপনীত হ'তে পারেন নি। এর কারণ তাঁর কবিজীবনের আরম্ভের আগেই আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিলো রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত বাংলা কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সেই আন্দোলন ধীরে-ধীরে পরিণতি পেয়েছিলো একটি তৎ-কালীন নূতন ধারায়, যা, যুগপৎ স্বাদেশিক ও বৈদেশিক আবহলালিত। তাঁর আবির্ভবকালীন বাংলা কবিতার সেই নূতন ধারাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই এবং তাতে

অবগাহিত হ'য়েই তাঁর কাব্যযাত্রার শুরু। তখন তাঁর মধ্যে ছিলো না সেই ধারার উজানে যাবার কোনো প্রয়াস কিংবা সেই ধারাকে উল্লংঘনের কোনো প্রচেষ্টা। তাকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন সর্বতোভাবে এবং তাকে অনুসরণ ক'রে রচিত বলেই তাঁর প্রাথমিক কবিতায়, সমর ও সুভাষের প্রাথমিক কবিতার মতো, ভাবের চমক বা ভাষার চটক—কোনোটাই ছিলো না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর প্রারম্ভ-পর্বের রচনা 'অরণ্য' কবিতার :

বিশ্বাস করো, কাতরা কণ্ঠলীনা—
মুকুরের মতো নয়নে তোমার আমার মনেরে ধরি।

পংক্তিদ্বয়ে প্রেমের আন্তরিকতায় এবং 'জীবন-দক্ষিণা' কবিতার :

খনির গহ্বর-পথে গভীর পাতালতলে যারা গেল নেমে
তাহাদের অনায়াসে ভুলে যেতে বলো ;
তোমরা ভুলাতে চাও ঐশ্বর্যের পিছনে যে রহিয়াছে থেমে
যুগান্তের ইতিহাস অশ্রু-ছলোছলো।

পংক্তি-চতুষ্কে গণজীবন-মমত্বের যে-প্রকাশ, তাতে তাঁর নিজস্বতার স্পর্শ, প্রখরভাবে না-হ'লেও, অনুভব করা যায়।

'প্রান্তরেখা'য়, প্রথম দিকে, অরুণ মিত্রের কবিজীবনের প্রথম পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'উত্তরমেঘ' সহ যে-উনিশটি কবিতা সাধারণভাবে সাজানো আছে, সেই কবিতা-গুলিও তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির, আত্মগত উপলব্ধির—কখনো প্রেমের, কখনো-বা পরিবেশ-প্রকৃতির। কিন্তু প্রেমের অনুভূতির প্রকাশে কিংবা পরিবেশ-প্রকৃতির বর্ণনায় সেগুলিতেও তিনি একান্তভাবে নিজের পথের পথিক হ'য়ে উঠতে পারেন নি—কি ভাবে, কি ভাষায়। ভাবে তখনো অন্যের প্রভাব, ভাষায় তখনো তৎসম শব্দের ছড়াছড়ি, প্রাচীন রীতি ও ঐতিহ্যের ব্যাপক অনুসরণ। এবং তাঁর কবিতায় তখনো পর্যন্ত চলেছে তাঁর অগ্রজ-অনুজ নানা কবির অলক্ষ্য আনাগোনা—কখনো সুধীন্দ্রনাথের :

কলরোলে তালভঙ্গ, বহমান নৃত্যের পরব
সাঙ্গ হ'ল ভ্রান্ত লয়ে। প্রসারিত রূঢ় প্রহরণে
ক্ষিপ্র গতি ছন্দহীন। উপকূলে নূতন উৎসব।
('সৈকত' : পঞ্চম স্তবক)

কখনো বিষ্ণু দে-র :

দু-বাহু ঘেরাও করে বারবার অভ্যস্ত আহ্লাদে
সোনার হরিণ আর স্মরণের বিপর্যস্ত সোনা,
দু-হাতে পাথর-কাটা কঠিন কাঠামো বুঝি বাধে।
('দোটানা' : তৃতীয় স্তবক)

আবার কখনো-বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের :

গভীর তোমার ফল্গু-প্রেমের ধারা উছল,
ধন্য আমার দীর্ঘ বেকার দশা-মোচন।

পাগলা বাঁশিতে চমকাও কেন ? করা কী আর ?
এলো যে বোমারু, নিচের তলায় চলো পালাই।
('বিড়ম্বনা' ঃ চতুর্থ / অন্তিম স্তবক)

অরুণ মিত্রের কবিতার সদ্যোদ্ধৃত অংশগুলি (বিশেষত শেষেরটি) থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় ; স্পষ্ট হয় যে সময়ের তাপ এবং পারিপার্শ্বিকের চাপ—দুই-ই এই সময় থেকে তিনি অনুভব করতে শুরু করেছেন, কিন্তু কোনোটিরই বিরুদ্ধতা করার মতো শক্তি বা সাহস কোনোটাই তিনি তখন পর্যন্ত সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারেন নি। ফলে, সময় ও পারিপার্শ্বিকের নিরন্তর বিরুদ্ধতায় এবং তজ্জনিত সংঘাতের অনিবার্য পরিণতিতে কবিব্যক্তিত্বের যে-বুনিয়াদ গ'ড়ে ওঠে এবং যার ওপর ঋজু মেরুদণ্ডে দাঁড়িয়ে কবি জগৎ জীবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, কালক্রমে গ'ড়ে তোলেন কবিতার নিজস্ব ইমারত, তখন পর্যন্ত তা গ'ড়ে না-ওঠায় এই কবিতাগুলিতে তিনি সময়ের স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটেন নি, কাটতে পারেন নি, অনুকূলে গা ভাসিয়েছেন। এবং যেহেতু তখন পর্যন্ত তিনি সময়শাসিত ও সময়সীমিত, অতএব এগুলিতে বিশেষ কোনো সংঘাত নেই, বরং আছে সমর্পণ ; উচ্চকিত কোনো ঘোষণা নেই, পরিবর্তে আছে মৃদু কিছু উচ্চারণ। অবশ্য সেই উচ্চারণও, প্রথমে যত সরল মনে হয়, ভালো-ভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, আসলে তা নয়। তা কিছুটা জটিল এই কারণে যে তাতে এক ধরনের অস্থিরতা মিশে আছে ; আর, এই অস্থিরতার উৎস খুঁজতে যাওয়াও নিতান্ত নিরর্থক নয়। কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নয়, আবেগের টানই এই অস্থিরতার উৎস—আবেগের সেই চোরাটান আবার ঘূর্ণিত হ'য়ে ওঠে বিশ্বাসের ঘনবদ্ধ চাপ থেকে, যদিও তার স্বরূপ তখন পর্যন্ত তাঁর কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। তবু, বিশ্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে অস্পষ্টতা সত্ত্বেও,—কিংবা হয়তো সেই কারণেই—তাঁর প্রথম পর্বের এই কবিতাগুলিতেও কিন্তু প্রকাশের রীতিটি কিঞ্চিৎ তির্যক। অর্থাৎ, তাঁর কবিসত্তায় প্রথমাবধিই ছিলো আবেগ ও অনুভূতিপুঞ্জের সেই দ্বান্দ্বিকতা (dialecties of emotions and feelings), যা, পরবর্তীকালে তাঁর কবিপ্রতিভার বিবর্তনের বিচিত্র ধারায়, তাঁর কবিতায় ক্রমশই স্পষ্ট ও প্রবল হ'য়ে উঠেছে। বস্তুত, এই পর্বের 'হে হৃদয়' কবিতার উপসংহার-পংক্তিতে যখন তিনি বিহ্বল কণ্ঠে ব'লে ওঠেন, 'হে হৃদয়, মূল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে' কিংবা 'জঠর' কবিতায় ষষ্ঠ পংক্তিতে মন্ত্রের প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন, 'এখন সূচাগ্র লক্ষ্যে আমরা সকলে হব স্থির', তখন স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় যে সেই দ্বান্দ্বিক-তার অভিঘাতেই সকল অস্থিরতা অতিক্রম ক'রে তিনি উপনীত হ'তে চাইছেন উপলব্ধির গভীরতায়, পৌঁছোতে চাইছেন স্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে।

এই কবিতাগুলির মধ্যে এমন কবিতা অন্তত একটিও রয়েছে, যেটিতে 'প্রান্তরেখা'র 'ভাষণ'-পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে ঝোঁকসাদৃশ্য (similarity of inclination) স্পষ্টতই বিদ্যমান। অন্য কারণে না-হ'লেও, এই ঝোঁকসাদৃশ্যের বিবেচনাতেই, এই

কবিতাটিকে কবি অনায়াসে 'ভাষণ' অংশে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন। কবিতাটির নাম 'প্রবাস'। এই দীর্ঘ কবিতাটির অন্ত্যপ্রায় অংশের :

… … আর কারা রাস্তায় ?
রেঙ্গুনে চায় ছ'মাহিনা ভর কাজ—
খনি-খামারের দেশ কি দেয় বিদায় ?

এই পংক্তি-কতিপয়ে উচ্চারিত আর্ত প্রশ্নে যে-জনজীবন (mass life)-এর একেবারে মাঝখানে নেমে এসেছেন তিনি, সেই জনজীবনের (কমিউনিস্ট সুভাষের মতো 'জন-যুদ্ধে'র নয়) জয়গান রচনাই তো তাঁর 'ভাষণ'-পর্বের কবিতাগুলির মূলকথা। অবশ্য সেই মূল কথার উচ্চারণে, কমিউনিস্ট সুভাষের মতই, তিনিও পরাধীন—মানসিকভাবে এবং মর্মান্তিক মাত্রায়। কেননা সেই উচ্চারণে দলীয় রাজনীতির সহায়তা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে, রাজনৈতিক একটি বিশেষ দর্শনের এবং সেই দর্শনের বাস্তব প্রয়োগাভিলাষী বিশেষ একটি দলের নিকট তিনি নতজানু হয়েছেন। কবিতার মর্যাদা রক্ষার পরিবর্তে দলীয় রাজনীতির দ্বারা তার বলাৎকার ঘটানো হয়েছে। 'ভাষণ' অংশের 'সামরিক', 'লাল ইস্তাহার' কিংবা 'কসাকের ডাক :১৯৪২' কবিতায় যখন তিনি যথাক্রমে বলেন :

১.

শস্যক্ষেতের গান ছিল শুনি, বধির মাটি
শোনে নি সে-সুর স্মরণকালে,
আষাঢ়ে গল্প চাষারা শুনেছে সম্প্রতিও,
সেনানীর পদপাতে আজ নব প্রতিশ্রুতি।

২.

প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?
লাল অক্ষরে আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো !
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ,
ভোঁতা হয়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)
যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো
নতুন ইস্তাহার।

৩.

জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া
সোভিয়েট রুশিয়া
জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া
রাখবই
ভাই হো
তোমাদের দুনিয়াকে রাখব

রুখবই দুশমন রুখব
দোসরের মুখ চাই ভাই হো···
হাতিয়ার।

তখন, এই অংশগুলির অর্থ আমাদের কাছে অতি-সরলীকৃত (over-simplified) হ'য়েই ধরা দেয়। প্রথম পাঠেই আমরা বুঝে ফেলি যে উদ্ধৃত অংশত্রয়ের 'চাষা', (ভবিষৎ) 'কাল' এবং 'রুশিয়া'—এর কোনোটিই আমাদের ধূলিমালিন্যের প্রাত্যহিক পরিচিত পৃথিবীর অন্তঃস্থ নয়, প্রতিটিই কোনো তত্ত্বলোকের অন্তর্গত—'চাষা'টি কমিউনিস্টদের তত্ত্বে-মোড়া চাষী, 'কাল'টি কমিউনিস্টদের স্বপ্নে-দেখা ভবিষ্যৎ এবং 'রুশিয়া' কমিউনিস্টদের ধ্যানে-গড়া কল্পলোক ; তদানীন্তন ভারতীয় বাস্তবতায় কোনোটিরই কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। অবশ্য এই কবিতাগুলি যখন একটির-পর-একটি রচিত হচ্ছিলো, সেই সময়টাই ছিলো আসলে এমন টাল-মাটাল, উত্তাল এবং ঘোর-লাগা যে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আবিশ্বপরিধিব্যাপী প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সামিল হওয়ার উন্মাদনায় কমিউনিজমের বিশ্বপ্রেমেই ভারতের কমিউনিস্টরা উদয়াস্ত হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তৎকালীন ভারতীয় পরিস্থিতির বাস্তবতা বা স্বদেশীয় অভিজ্ঞতা—ইত্যাদি 'তুচ্ছ' (প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করার মতো সময় তখন তাঁদের আদৌ ছিলো না, এবং সেই সঙ্গে হয়তো ইচ্ছাও। সেই অনিচ্ছার মূলে ছিলো একদিকে ভারতীয় কমিউ-নিস্টদের মধ্যশ্রেণীগত রোম্যান্টিক মনোভাব এবং অন্যদিকে, যা আরো ঢের বেশি গুরুতর, ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই গোড়ায় গলদ। এই আন্দোলনের পরি-কল্পনাকারীরা মৃত্যুকাম (suicidal) ভ্রান্তিবশে সুদূর সোভিয়েতের সম্মেলিত (federated) রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতাকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা ব'লে নির্বিচারে গ্রহণ করলেন, স্বদেশের পরিস্থিতির দ্বন্দ্বজটিলতা ও সমস্যাসঙ্কুলতার কথা অনেকাংশে ভুলে রইলেন ; একবারও ভেবে দেখলেন না ভালোভাবে, যে-মাটির ওপর তাঁরা দাঁড়াতে চাইছিলেন, সে-মাটি কতখানি শক্ত।

অরুণ মিত্রও একদা মেতে উঠেছিলেন তাঁর কমিউনিস্ট সতীর্থদের মতো কবিতায় কমিউনিস্ট-উন্মাদনায় এবং তাঁর সতীর্থদের মতোই তিনিও যথারীতি ভুলে গিয়েছিলেন, সেই উন্মাদনার ঘোরে যে-সত্যের শক্তিতে নিজেকে তিনি বলবান ভেবেছিলেন, যে-সত্য তাঁর পক্ষে অভিজ্ঞতার সত্য ছিলো না, ছিলো মাত্র বিশ্বাসের সত্য। আর, সে-বিশ্বাসেরও উৎস ছিলো আবার প্রত্যক্ষ বা স্বদেশ নয়, পরোক্ষ ও বিদেশ। এখান-টাতেই, তাঁর কবিতায় কমিউনিজম প্রচার প্রসঙ্গে, বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং সুভাষ-মুখোপাধ্যায়—অন্তত এই তিনজনের কথা সঙ্গত কারণেই মনে প'ড়ে যায়। মনে প'ড়ে যায় যে, কাব্যসাধনায় প্রগতিচর্চার নামে কমিউনিস্ট দলীয়তার অন্ধ আরাধনায় বহুকাল অতিবাহিত করার পর শেষ পর্যন্ত তাঁদেরও মোহমুক্তি ঘটেছিলো, সেই রাহুগ্রস্ত দশা থেকে তাঁরাও অবশেষে মুক্তিলাভ করেছিলেন—যদিও এতই বেশি বিলম্বে যে আমাদের ক্রমক্ষীয়মাণ স্মৃতিতেও তাঁদের একদার কমিউনিস্ট পরিচিতি কিছুতেই অপনীত বা

অস্পষ্ট হবার নয়। অবশ্য, শুভ বিষয়, অরুণ মিত্রের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট-মোহভঙ্গ তথা রাহুমুক্তি তত বিলম্বিত নয়, বরং তা খুবই ত্বরান্বিত। সেই সুদূর চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাড়না-উন্মাদনায় সাম্যবাদী ও সমবিশ্বাসী দলবন্ধতায় কিছু-কালের জন্য মেতে উঠে অচিরেই নিজেকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন নিজের নিভৃতে। সেই প্রাথমিক দিগ্‌ভ্রান্তির পর তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর তিনি দিগ্‌ভ্রষ্ট হননি, সাম্যবাদের অলীক মায়ায় বা 'আশার ছলনে' নিজে ভোলেন নি, তাঁর পাঠক-পাঠিকাদিগকেও ভোলাতে চেষ্টা করেন নি। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলবন্ধতার পরিবর্তে সাধারণভাবে সামাজিক দায়বন্ধতায় বিশ্বাস রেখে (অথচ তাতে ব্যাহত না-থেকে) ক্রমশ তিনি 'উৎসের দিকে' ফিরে গিয়েছেন, নিজেকে তিনি ক্রমাগত আবিষ্কার করেছেন, 'আর এক আরম্ভের জন্যে' প্রস্তুত করেছেন।

'প্রান্তরেখা' প্রকাশের পর থেকে, অরুণ মিত্রের স্বীকৃতিতেই, তাঁর কবিজীবনে দীর্ঘ-দিনের জন্য একটা প্রায়-বিরতি-পর্ব নেমে এসেছিলো। হয়তো-বা কিঞ্চিত অবসাদেরও পর্ব (lull period) ছিলো সেটা—যার ব্যাপ্তি আট বছরের, ১৯৪৩-এর পর থেকে ১৯৫১-র পূর্ব পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়-সীমায় রচিত তাঁর কবিতা সংখ্যায় মাত্র বাইশটি, যেগুলির সব ক'টিই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎসের দিকে'র 'স্মরণকাল' অংশে অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যার স্বল্পতা ছাড়াও, লক্ষ্যণীয়, সেই কবিতাগুলিতে তখনকার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার ছাপও তেমন স্পষ্ট নয়। ব্যতিক্রমস্বরূপ উল্লেখ করা চলে একমাত্র 'বিদারণ' কবিতাটির কথা, যেটির শেষ পংক্তি দু'টিতে উত্থাপিত ঃ

> কিন্তু অন্ধকার ঘনাতেই আলোগুলি সব নিবিয়ে দিলে তুমি,
> তাহলে বুকের ভেতরটা কী ক'রে দেখা যাবে ?

প্রশ্নে দাঙ্গাকবলিত কলকাতার অনিশ্চিত দিনযাত্রার আতঙ্কের আঁচ কিছুটা যেন আমরা অনুভব করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই অবসাদ, কবিতার স্রোতে কেন এই ভাঁটার সূচনা অথবা কেনই-বা কবিতায় প্রত্যক্ষের এই পরোক্ষ প্রতিফলন—বিশেষত সেই তুমুল সময়ে, যখন রাজনৈতিক বাত্যাবাহে দিগ্বিদিক্ কুজ্ঝটিক, চতুর্দিক আলুথালু ? অন্য সমালোচকরা এ-সম্পর্কে কী বলবেন জানি না, কিন্তু আমার নিজের ধারণা, আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত হ'লেও, তাঁর মতো বিবেকী কবির পক্ষে এটা ছিলো অনিবার্য। আসলে 'প্রান্তরেখা'র 'ভাষণ'-পর্বের কবিতায় দলীয় রাজনৈতিক অত্যুচ্ছ্বাসের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম ছিলো এই সৃজনগত অবসন্নতা। আর, সেই সঙ্গে সাহিত্য ও রাজনীতির সম্পর্কের পারস্পরিকতার মাত্রা, কবিতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় দলবন্ধ উন্মাদনা এবং ব্যক্তিগত সাধনার আপেক্ষিক গুরুত্ব—ইত্যাদি সাহিত্য-তাত্ত্বিক মৌল প্রশ্নে তাঁর বিবেকের তাড়না তো অবশ্যই ছিলো। প্রস্তুতি চলছিলো তাঁর ভেতরে-ভেতরে এই সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার, প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি ধীরে-ধীরে এই সব প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে নিজেই নিজের মুখোমুখি হবার জন্য, নিজেরই সঙ্গে নিজে বোঝাপড়া করার উদ্দেশ্যে। আশার কথা, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার অন্তে,

আত্মসমীক্ষার অবসানে, নিজের বিবেকোত্থিত সেই সমূহ প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং অবশেষে, উপনীত হয়েছিলেন এ-সম্পর্কে এক সুস্থির সিদ্ধান্তে। সেই সিদ্ধান্তে তাঁর অবিচলিত আস্থার কথা জানাতে চেয়েই সেই সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে, ১৯৮০ সালে, 'আজ কাল পরশু' পত্রিকার তরফে গৃহীত একটি প্রশ্নোত্তর-সাক্ষাৎকারে একেবারেই না-রেখে-ঢেকে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়েছেন তাঁর সেই সিদ্ধান্ত—'কবিতা বা যে কোনো শিল্পরচনার কাজ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে দল বা আন্দোলনের কোনো ভূমিকা নেই।' এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে, যা, তাঁর পক্ষে ছিলো একটা মূল্যবান শিক্ষার মতো। সেই অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ তাঁর পক্ষে মূল্যবান হ'য়ে উঠেছিলো এই অর্থে যে, তারই ফলে তাঁর দৃষ্টি ক্রমেই খুঁজে পেয়েছিলো এমন এক সমগ্রতা, যা পরবর্তীকালে স্ববিরুদ্ধতার সকল সম্ভাবনা থেকে তাঁকে নিশ্চিত রূপে রক্ষা করেছে।

'প্রান্তরেখা'র 'ভাষণ'-পর্বের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অন্য সময়েও তাঁর বিভিন্ন রচনায় নানা প্রসঙ্গে আরো অনেকবার নির্দ্বিধভাবে তিনি জানিয়েছেন—যেমন ১৯৭৯-র 'প্রমা' পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্যে সৃজনক্রিয়া ঃ উৎস এবং অববাহিকা' রচনায় তাঁর উক্তি, 'কোন্ লেখক কী লিখবেন, তা তাঁর সৃজনমুখী প্রবণতা ভেতর থেকেই ঠিক ক'রে নেয়।' কিংবা ১-১৫ মে, ১৯৮৩ সংখ্যা, 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় মুদ্রিত 'বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য, 'সৃষ্টির সাফল্য বা মহত্ত্ব তো ভাবনা থেকে তৈরী হয় না, তার উৎস এক অনির্দেশ্য ক্ষমতা, যা প্রাণবায়ুর সহোদর।' অথবা এর অল্প ক'দিন পরেই, ঐ একই 'শিলাদিত্য' পত্রিকার ১৯৮৩-র ১৬-৩০ জুন সংখ্যায় এ-সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত, 'কবিতা রাজনীতি নয়,···রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের জন্যে তো কবিতা লেখা হয় না, কবিতা লেখা হয় জীবনের অভিঘাতে কবিহৃদয়ে যে-স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, তা-ই প্রকাশ করার জন্যে।···মার্কসবাদের চিহ্ন-দেওয়া এলাকায় যান্ত্রিকতার যথেষ্ট নমুনা দেখা যায়। যান্ত্রিকতা কবিতার সবচেয়ে নৃশংস ঘাতক।' এ-রকম উক্তি আরো আছে অনেক, তাঁর বিভিন্ন রচনায় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা, যেগুলি তুলে ধরা যেতে পারে পর-পর সাজিয়ে। কিন্তু কী দরকার সে-সব টেনে বের করার? তার চেয়ে বরং লক্ষ্য করা যাক, সেই অভিজ্ঞতাঅর্জন, সেই শিক্ষাগ্রহণ এবং সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কীভাবে তাঁর চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত ক'রে ধীরে-ধীরে তাঁর কবিতায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

অভিনিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, 'ভাষণ'-পর্বের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির গভীর প্রতিক্রিয়াই একই সঙ্গে তাঁর কবিতার প্রথম (অর্থাৎ ভূমিকা) পর্বের অবসান এবং দ্বিতীয় (অর্থাৎ প্রকৃত) পর্বের সূচনার কারণ। মনোজাগতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে এই সময় থেকেই তিনি ক্রমশ অনুভূতি ও ভাবনার বিশাল সমুদ্রের দিকে তাঁর কবিতাকে প্রবাহিত করাতে আরম্ভ করলেন, বাইরের কোলাহল যত কমতে

শুরু করলো, ভেতরের কলধ্বনি ততই প্রবল হ'তে আরম্ভ করলো তাঁর কবিতায়। মানুষ ও তার সমাজ, নিসর্গ ও তার সৌন্দর্য—ইত্যাদি সমস্ত কিছুই বিষয়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রইলো তাঁর কবিতায় এবং ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিটিও অপরিবর্তিতই থেকে গেলো তাঁর মধ্যে ; কিন্তু তৎসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রকাশের ধরনটি স্পষ্টতই পরিবর্তিত হ'য়ে এলো ক্রমশ। তথাকথিত দায়বন্ধ বামপন্থী বাংলা কবিতার শ্রেণীসংগ্রাম-সমর্থক, উচ্চনাদী ঘোষণা-ধ্বনিত প্রকাশরীতিটি ধীরে-ধীরে পরিত্যাগ ক'রে তার স্থানে তিনি গ্রহণ করলেন ভিন্ন এক প্রকাশপদ্ধতি। আর উঁচুসুরে নয়, নিচুসুরে বাঁধলেন তাঁর কণ্ঠকে। নিচু, কিন্তু গভীর সেই সুর। সেই সুরকে সম্বল ক'রে তিনি মুখ ফেরালেন শ্রেণী-সংঘর্ষের জগৎ থেকে সমাজনিবদ্ধ মানুষের আত্মিক সংঘাতের জগতে—দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করলেন সেই মানুষের আস্তিত্বিক বাস্তবতার (existential realities) সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার নিরন্তর দ্বন্দ্বের উৎস-বিন্দুতে। রাজনৈতিক মিছিলের মানুষ দূরে স'রে গিয়ে তাঁর কবিতায় ক্রমশ এগিয়ে এলো সেই সব মানুষের মিছিল, যারা মিছিলে-মিছিলে মেদিনী বিকম্পিত করছে না কিংবা শ্লোগানে-শ্লোগানে গগন মুখরিতও করছে না, কিন্তু প্রতিদিনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে লিপ্ত রয়েছে একটা কঠিন যুদ্ধে ; আক্রান্ত এবং আক্রমণকারীর যুগ্ম-ভূমিকায় ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে একটা অজ্ঞাত অভিমুখের দিকে।

জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার এই দিক্-পরিবর্তনের লক্ষণ প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎসের দিকে'র রচনাগুচ্ছে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে তিনি একে-একে যাচাই ক'রে নিতে চেয়েছেন তাঁর পরিবর্তিত বিশ্বাসের নূতন আয়ুধগুলির নির্ভরযোগ্যতা। মনে রাখা প্রয়োজন, আজকের বাংলা কবিতায় অরুণ মিত্রের কণ্ঠের যে অনন্যতা, সে-অনন্যতার সূত্রপাত কিন্তু 'উৎসের দিকে'র কবিতাসমূহেই। 'প্রান্তরেখা'-র পরবর্তী দীর্ঘ বিরতির পর, বারো বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি থেকেই আমরা যেমন তাঁকে নূতনভাবে পেতে শুরু করেছি, তিনিও তেমনই আমাদিগকে এবং সেই সঙ্গে বাংলা কবিতাকেও নূতনভাবে জিতিয়ে দিতে আরম্ভ করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই কাব্যসত্যগত একটা মৌল উপলব্ধিতে তিনি ক্রমশ সুস্থির হয়েছেন, এই বোধ তাঁর মধ্যে উত্তরোত্তর সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে যে তত্ত্বের মৌখিক উচ্চারণ এবং অভিজ্ঞতার বাস্তব রূপায়ণ—এ-দু'য়ের মধ্যে বিরোধ যদি অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে বিবেকী কবির সর্বপ্রধান কর্তব্য যুক্তিকে জাগ্রত করা, বিচারকে নিরপেক্ষ রাখা আর সেই সঙ্গে বিশ্বাসের উত্তাপ এবং অবিশ্বাসের শৈত্য, উভয় থেকেই নিজেকে সমান দূরত্বে সরিয়ে নেয়া, সমানভাবে নিজেকে অনাবিষ্ট রাখা।

কিন্তু যিনি প্রকৃতই কবি, নিজের অভিজ্ঞতা-অনুভূতির কথা কাব্যজারিত ক'রে প্রকাশ করাই যাঁর প্রধান কাজ, সত্যিই কি সম্ভব তাঁর পক্ষে বিশ্বাসের বাইরে এসে দাঁড়ানো, আবেগের উত্তাপকে একেবারেই এড়িয়ে চলা? তাহ'লে তো তাঁর পক্ষে

কবিতা রচনাই হ'য়ে পড়ে অসম্ভব। 'উৎসের দিকে'র কবিতাগুচ্ছে অরুণ মিত্রও তা পারেন নি। স'রে আসেন নি তিনি বিশ্বাসের পরিধি থেকে, সরিয়ে নেন নি নিজেকে আবেগের উত্তাপের বাইরে। বিশ্বাসের স্পষ্টোচ্চারণ এখানেও তাঁর কবিতার সর্বত্র এবং সেই সঙ্গে আবেগের উত্তাপের বিকীরণও। কিন্তু বিশ্বাসের বজ্র-ঘোষণ নয়, মৃদু উচ্চারণ; আবেগের অস্থিরতা নয়, সুনিশ্চিত সুস্থিরতা। এই-ই এই গ্রন্থে তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্য। আবেগকে তিনি বেঁধেছেন, অহৈতুক কোলাহলে নয়, অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলে; উত্তাপকে তিনি বিকীর্ণ করেছেন একমুখিনতায় নয়, বহুমুখিনতায়। 'চিতা' কবিতায় যখন তিনি প্রশ্ন তোলেন:

> ঘানি ঘোরার টালে
> লাঙলের ফালে
> লোহাগলানো আঁচে
> কে বাঁচে কে বাঁচে ? কে ?

অথবা 'মন্ত্রলোপ' কবিতার শেষ দুটি পংক্তিতে গাঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন:

> একাগ্র উত্তাপে দগ্ধ পাষাণ-প্রচ্ছদ,
> দশ আঙুলের ডগা অগ্নিবিন্দু।

তখন আমাদের লক্ষ্যের গোচরে আসে, অভিজ্ঞতা-অনুভূতির এই পরিবর্তন তাঁর কবিতার প্রকৃতিকেও কীভাবে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করেছে। কবিতার শরীরে আগের কালের ছন্দময় দ্রুততাল আর নেই, সাজসজ্জিত বাগ্‌বিন্যাসও প্রায় অনুপস্থিত। অথচ বিশ্বাস-আবেগ-উত্তাপ ইত্যাদি—অর্থাৎ তাঁর কবিত্বের যা মূল পুঁজি, সমস্তই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অনুচ্চকণ্ঠ, কিন্তু মর্মস্পর্শীভাবে গাঢ় ও গভীর; ধীর, অথচ দ্বিধাহীনভাবে অটল ও কঠিন। তাঁর কবিতার নিজস্ব এই ধরনটির সঙ্গেও আমরা প্রায় মুখোমুখি হ'য়ে পড়ি।

কাব্যযাত্রার একটা পথ অতিক্রম ক'রে এবং আরেকটা পথের বাঁকের মুখে উপনীত হ'য়ে কবির মনে যে ক্রমাগত বহু ও বিচিত্র চেতনার উন্মেষ ঘটছে, এবং তারই ফলে তাঁর কবিতাও যে একমুখিনতা পরিত্যাগ ক'রে বহুমুখিনতায় প্রসারিত হচ্ছে, তার অনেক নিদর্শন 'উৎসের দিকে'র অনেক রচনা থেকেই তুলে ধরা যেতে পারে। নব-নব চেতনার উন্মেষ তাঁকে পরিণত করেছে অজ্ঞাতপূর্ব মানসিক জগতের অভিযাত্রীতে এবং সেই অভিযাত্রা তাঁর কবিচরিত্রে সংযোজিত করেছে অভিনব একটি মাত্রা—তিনি হ'য়ে উঠেছেন আশ্চর্যরকমের কথনপ্রিয় এবং কথনপটু। কবিতায় কথা বোনার সঙ্গে-সঙ্গে কথা বলতেও আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন তিনি অনর্গলভাবে। কত কথা যে তিনি বলতে থাকেন, কত কথা যে তাঁর মধ্যে ফেনিয়ে ওঠে, কত যে, কত যে! কবিতার কোষাগারে 'ছয় ঋতু সঞ্চয়' করতে-করতে 'অন্ধ জীবনের কাছে' যৌতুকের জন্য তিনি ক্রমশ প্রস্তুত হন, বিভোর হন 'এক একটা শান্ত দিন নিয়ে', বলতে থাকেন তাকে ঘিরে জমে-থাকা 'আদ্যিকালের গল্প / যার দিকে ফিরে মনের আগ্রহ আস্তে আস্তে গ'লে গ'লে ঘুম হয়ে

যায়।' যেন-বা ঘোরের বশেই তিনি নেমে যান স্মৃতির গভীরে এবং সেখান থেকে স্বগতোক্তির সুরে ব'লে ওঠেন 'স্মৃতির ভোমরা ফেরে/গুনগুন, গহীন গাঙের ভাষা শুনি' ('ছুটি'), শুনতে পান 'ঘনঘটার আকাশে বিদায়ের ঘণ্টা' ('অপরিমাণে')। 'পৃথিবীর দেউলিয়া মাঠে/একটি বিপন্ন ঘর গড়া হয় বুকে বুক রেখে' ('শিশুর কান্নার ঘর')—এই অনুভূতিতে এবং 'পোড়ো জমি জুড়ে সোনালি খুশির শীষ ভরপুর ঝড়ের দমকে' ('মুখর')—এই দৃশ্যে তিনি যেমন উৎফুল্ল বোধ করেছেন, 'নোনাজলে ক্ষয়লাগা পাড়ের যন্ত্রণা'য় ('ম্যাজিক') তেমনই তিনি কুঁকরেও উঠেছেন। আর, সেই বিমর্ষতার অবগাঢ়তাই তাঁর মধ্যে ফেনিয়ে তুলেছে প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন, একটার-পর-আরেকটা —'এই অনুর্বর অধিত্যকার উপর দাঁড়িয়ে আমি/ ফাঁকা আলিঙ্গনে কাকে জড়াতে চাই ?' ('সীমান্ত'), 'ভবিষ্যতের পটে কি একটা তিলপরিমাণ বিন্দু হয়ে আমি / লেগে থাকব এইখানে ?' (ঐ), 'আমি কি অবাধ্য নৌকা / আলেয়ার তীর ঘেঁষে ডুবে যাব উচ্ছ্বাসের ফুঁয়ে ?' ('আহ্বান') 'ডান বাঁয়ে ঘোর পতনের মুখে / নিরেট পাথরে কোন্ ধিক্কার / তোমরা রাখলে ?' ('রাস্তা বোঝাই তোমরা'), 'আদি গঙ্গায় পাড়ি দিয়ে কোন্ / স্তূপ গড়ি ? তার শিখরে কেতন উড়বে কখন ?' ('মরযাত্রা') ইত্যাদি-ইত্যাদি এবং সর্বোপরি, এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রশ্নের সারাৎসার সেই সূচ্যগ্র মহাপ্রশ্নটি, 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে ? / কখন ?' ('এ জ্বালা কখন জুড়োবে')—যেটি তাঁর কবিসত্তার ধ্রুবপদস্বরূপ এবং যেটি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় রূপান্তরিতভাবে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত।

কিন্তু এই সমূহ প্রশ্ন যদি নিছক প্রশ্নের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকতো, ঊর্ধ্বতর কোনো মাত্রায় কবিকে উত্তীর্ণ না-করাতো, তাহ'লে এগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলাদাভাবে বলার মতো তেমন কিছু থাকতো না। সুখের বিষয়, এগুলি মাত্র প্রশ্নের গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ না-থেকে অন্য পথে পরিণতি পেয়েছে ; এগুলি কবিকে এগুলির উত্তর সন্ধানেও প্রাণিত করেছে। কিন্তু কবির সংক্ষুব্ধ চিত্তমথিত প্রশ্নপরম্পরার উত্তর কোথায় বা কোন্‌দিকে সেই উত্তরের সংকেত ? স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত উত্তরপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তায় তিনি বিভ্রান্ত বোধ করেছেন। সেই বিভ্রান্তিরই প্রকাশ ঘটেছে বিখ্যাত 'উৎসর্গ' কবিতাটির এই পংক্তি-চতুষ্কে তাঁর স্বগত উচ্চারণে ঃ

> কে শুনবে সম্ভাষণ
> আপনার জন কে চিনবে
> কে কড়ি গুনবে ভালোবাসার
> বুকের মধ্যে মুমূর্ষু কত অহঙ্কার··· ···।

কিন্তু বিমূঢ়তার কাছে আত্মসমর্পণ, তাতেই স্থিত হ'য়ে থাকা, তাঁর কবিস্বভাবের অন্তর্গতই নয়। অতএব অলব্ধ উত্তরের প্রত্যাশায় প্রশ্নের বিধাতার কাছেই তিনি প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন, সেই কল্পিত পুরুষের উদ্দেশে তাঁর কন্ঠে উদ্গীত হয়েছে প্রার্থনার সুর—'আমাকে পাথর আর পোড়ামাটিতে গড়ো / আমাকে কাঁটাবন আর রাত্তিরের মধ্যে ধরো' ('যেখানে উত্তাপ নেই') ; 'আমাকে সম্পূর্ণ ক'রে প্রতিবিম্বিত করো' ('হৈমন্তী')।

তাঁর সেই প্রার্থনায় প্রকৃতিকেও তিনি সঙ্গী ক'রে নিয়েছেন। 'অপরিমাণে' কবিতার 'হে বেগবতী নদী / সমস্ত পৃথিবীর ভস্মস্তূপ নিঃশেষে ধুয়ে নিয়ে যাও' এবং 'হে বিশাল মোহনা / সমস্ত পৃথিবীর ভস্মস্তূপ নিশ্চিহ্নে তলিয়ে দাও' পংক্তিতে রয়েছে তারই সাক্ষ্য। কিন্তু রোগের উপান্তে যেমন থাকে স্নিগ্ধ নিরাময়, তাঁর প্রার্থনার অন্তেও তেমনই রয়েছে গভীর প্রত্যয়, যার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি—'নতুন মহাদেশের জঠর / এ যেন এক রক্তাক্ত সত্যের জন্ম' ('প্রবাসী') এবং সেই প্রত্যয়ে উপনীত হবার অভিঘাতে তাঁর সত্তার আলোড়ন—'…এক প্রবল স্বস্তির শূন্য আমাকে টানছে আর এক অভিজ্ঞতার শিখরে' ('সীমান্ত')।

'আর এক অভিজ্ঞতার শিখরে'র প্রতি এই টান অনুভব করা তাঁর পক্ষে যে শুধু অভীপ্সিতই ছিলো, তা-ই নয় ; ছিলো অনিবার্যও। কেননা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, 'ভাষণ'-পর্বের অন্তিমে পৌঁছেই তাঁর মধ্যে শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো পথান্তরের অন্বেষণ, তিনি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলেন দিক্‌বদলের এক গভীর তাড়না। সেই তাড়নায় তাড়িত হ'তে-হ'তেই নিজেকে তিনি ধীরে-ধীরে ভাঙছিলেন এবং একই সঙ্গে গড়ছিলেনও নূতনভাবে। সেই ভাঙা-গড়ার পরিণতিতেই তাঁর মধ্যে 'আর এক অভিজ্ঞতার' শিখরনিঃসৃত এই প্রত্যয়ের জন্ম। এই প্রত্যয়ে ক্রমে দীপ্ত হয়েছেন তিনি, তাঁর মানসে অঙ্কুরিত হয়েছে সর্বানুভূতির চেতনা। নবাঙ্কুরিত সেই চেতনার ঘোরে তিনি কেবলই ব'লে চলেছেন তাঁর মধ্যে মধ্যে-মধ্যে উথ্‌লে-ওঠা কথা—'বসন্তের বিভোর গান আমাকে ছড়িয়ে দেয় দূর মাটির ধুলোয় / আমার বুক দিয়ে আমি অনুভব করি দূরব-গাছ স্পন্দন' ('প্রবাসী'), 'অন্ধকূপ ঘরের ভিতর থেকে / শ্রাবণের ধারা শুনেছি / তার অনুরণন আমার এই অস্তিত্ব জুড়ে' ('তবু বৃষ্টির ঝঙ্কারে বাজি'), 'আমার আশার অন্ত নেই / আমি জ্বলব পৃথিবীর রঙে / আমি জ্বলব সকলের চোখে' ('কয়েকটি কথা'), 'আমি অরণ্যের কাছে গিয়ে ঘাসের ফুলের উপর নত হয়েছি…আমি সূর্যের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি / প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে শুষে নিয়েছি রোদের বিন্দু' ('আর এক আরম্ভের জন্যে'), 'রক্তজবার মতো মুঠো-মুঠো অন্ধকার আমি জড়ো করেছি / শেষ নিঃশ্বাস থেকে / আমার রক্তের উপর তা চেপে নিয়েছি' ('বিচ্ছেদের পথে') এবং আরো কত! কিন্তু কেবল সর্বানুভূতির অঙ্কুরোদ্গমই নয়, একই সময়ে তাঁর মধ্যে আরম্ভ হয়েছিলো তাঁর কবিসত্তার আত্মভূমির অনুসন্ধানও। অনুভূতির নানা অধিত্যকা-উপত্যকা অতিক্রম ক'রে 'ফসলের সুরে' কবিতায় অবশেষে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তার যথার্থ স্বভূমি ঃ

> বসন্তের পাতা আর বৈশাখের ঝড়
> আমাকে উৎকর্ণ করে,
> বর্ষার ঝমঝম বা আশ্বিনের ভোরের সানাই
> আমাকে আচ্ছন্ন করে,
> শীতশেষের গ্রাম
> আমার কানে এক অপূর্ব নাম জপে।

আমি পলিমাটি ছুঁলেই বুঝি
নিজেদের জগতে এলাম।

এই স্বভূমির সন্ধানপ্রাপ্তির সমকালেই তাঁর মধ্যে অন্যবিধ সন্ধানেরও সূত্রপাত ঃ আস্তিত্বিক রহস্যের, স্বদেশের স্বরূপের, গ্রামবাংলার মাধুর্যের। সেই রহস্যকে 'অজস্র হাতে' তিনি খুঁজতে থাকেন, সেই রহস্যের খোঁজে 'জগৎ-সংসারের কেন্দ্রে···যাবজ্জীবন উৎসর্গের শেষ নিষ্ফল পরমায়ুতে' তিনি কাঁপতে থাকেন ('খোঁজা'); তাঁর সন্ধানে স্বদেশের স্বরূপ 'করাল প্রাচীরে সম্মুখরেখা / ছিন্ন এখনো, ভারতবর্ষ' ('মরযাত্রা'); ঐশ্বর্য-নগরী কলকাতায় অধিষ্ঠিত থেকেও তাঁর অস্তিত্বের শাখা-প্রশাখায় আতুর গ্রাম-বাংলার নিসর্গ-লালিত জীবনযাত্রার শিকড়ের টান. নাগরিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তারই অস্পষ্ট অনুরণন—'আমার গাঁয়ের বাংলা ফিরে ফিরে আসে / কলকাতায়।···তা যেন কলকাতার কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপায়,···আমি তাকে ধমনীতে পাই, / তরাই থেকে সাগরদ্বীপ তার কণ্ঠে বাজে / আমাকে তা হৃদস্পন্দনে শোনায়।' ('কলকাতায়')।

'উৎসের দিকে'র কয়েকটি কবিতায় প্রেমের কবি হিসেবে অরুণ মিত্রের গতিরেখার প্রলম্বন লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতা ক'টির বৈশিষ্ট্য আবেগের গভীরতার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার উত্তাপের 'সুমিত' সংমিশ্রণ। অবশ্য প্রেমের কবিতা মাত্রেই আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণের ফল; কিন্তু এই সংমিশ্রণের অনুপাত সকল প্রেমের কবিতায় সমান নয়—সকল কবিতেও নয়। কারো-কারো ক্ষেত্রে প্রথমটির প্রাধান্য, কারো-কারো ক্ষেত্রে-বা দ্বিতীয়টির। এক অরুণ মিত্রের সমসাময়িক বাঙালী কবিদের মধ্য থেকেই উভয় দিকের উদাহরণ একাধিক ক'রে তুলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের বলার কথা শুধু এই যে অরুণ মিত্র তাঁর এই প্রেমের কবিতা ক'টিতে এই উভয় প্রবণতার মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছেন। কবিতা ক'টির বৈশিষ্ট্যগত এই বিশেষ দিক্‌টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই 'সুমিত' শব্দটিকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করা এবং উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানেই জানিয়ে রাখি, এই বৈশিষ্ট্যটি কেবল 'উৎসের দিকে'র এ-ক'টি কবিতারই একান্ত নিজস্ব কোনো ব্যাপার নয়; বস্তুত, অরুণ মিত্রের সমস্ত প্রেমের কবিতারই, অন্যবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও, এটি একটি সাধারণ ও স্মরণীয় বিশেষত্ব। 'উৎসের দিকে'র 'জাগর' কবিতায়···'নির্জন ভালোবাসা' কবিকে 'উত্তাল ক'রে রাখে / শিখরে শিখরে রক্তে রক্তোচ্ছ্বাস গানে'; 'আহ্বান' কবিতায় আকাঙ্ক্ষার উত্তালতা আরো প্রবল, প্রেমিকার প্রতি তাঁর নিঃশঙ্ক আহ্বান—'নেমে এসো পিপাসার গহ্বরে আমার।' কিন্তু 'হৈমন্তী' কবিতায় প্রেমের আবেশে যখন তিনি বলেন, 'তৃষ্ণার প্রান্তরে চলতে চলতে / তোমার দূরে গুঞ্জরণ শুনেছিলাম, তা / মনে হয়েছিল কান্না, / সুরের আমেজ তাতে বুঝি এইবার লাগল' কিংবা পূর্বোল্লিখিত 'ফসলের সুরে' কবিতায় 'মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে / তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়' অথবা তাঁর বহুপঠিত 'উৎসর্গ' কবিতায় প্রেমের প্রগাঢ় অনুভূতিতে 'ধ্বংসের প্রান্তরে'ও তাঁর

ভাবনার 'হিরণ্ময়' হ'য়ে ওঠার কথা ব্যক্ত করেন এবং নিসর্গচরাচরের সর্বত্র তাঁর প্রেমাস্পদার অলক্ষ্য উপস্থিতিকে আশিরনখর অনুভব ক'রে নিজেকে তারই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করেন, ছড়িয়ে দেন বিশ্বনিখিলের সর্বত্র, তখন কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতায় অন্য এক সুর জেগে ওঠে, অন্য এক আমেজ এসে যায়। আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ ছড়ানো নয়, আবেগের গভীর পাকে নিজেকে জড়ানোই প্রধান হ'য়ে ওঠে তখন। এবং অবশেষে, প্রেমাবেগের শৃঙ্খল পাকে নিজেকে জড়াতে-জড়াতে, তিনি তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে প্রায় আত্ম-অভেদীত (self-identified) হ'য়ে উঠেছেন। 'উৎসের দিকে'র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা 'তোমার নাম মিলিয়ে দিলাম'-এর এই পংক্তি-কতিপয়ের হার্দ্য উচ্চারণে রয়েছে সেই আত্ম-অভেদেরই নিদর্শন ঃ

সমতলে আর দূর টিলায় অনেক কণ্ঠ
অনেক কণ্ঠ এক উৎস থেকে ব'য়ে আসে
সেই উৎসে তুমি আমাকে উজিয়ে নিয়ে চলো,
স্থানকাল পার হ'য়ে যত ঘনিষ্ঠ ঘর
তাদের ছায়া রোদ রংবদল নানা আকাঙ্ক্ষার মতো
আমি তা তোমার চোখে দেখব।
... ...
প্রতীক্ষার দীপে দীপে তুমি জেগে থাকো।

অরুণ মিত্রের কবিতায় 'তুমি' এবং 'আমি'—এই শব্দ দু'টি আগাগোড়াই সাধারণ অর্থাতিরিক্ত তাৎপর্যে মণ্ডিত—'উৎসের দিকে'তেও। তাঁর 'তুমি' সর্বদাই এবং নিছকই রক্ত-মাংসের শরীরসর্বস্বা কোনো নারী নয়। কেবলই ব্যক্তিগত গণ্ডীর সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ না-থেকে এই 'তুমি' ব্যাপ্তি পেয়েছে নির্বিশেষে। নিঃসন্দেহেই সে নারী, কিন্তু মাত্র নারীই সে নয়, যুগপৎ জীবন এবং স্বদেশেরও প্রতীক সে। তাঁর 'তুমি' কীভাবে তাঁর স্বদেশ-ভাবনায় ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে, তা বোঝার পক্ষে তাঁর চার পংক্তির একটি মাত্র ছোট্টো কবিতা 'দুপুরের সূর্যে'র বিশ্লেষণই যথেষ্ট। কবিতাটির ঃ

দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
তোমার স্পন্দন থমেথমে রাতের মতো
তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
অনুভব করলাম।

সাধারণ নারী না-ভেবে 'তুমি'কে স্বদেশরূপিণী ব'লে গ্রহণ করলে সহজ ব্যাখ্যায় কবিতাটির অর্থ দাঁড়ায় ঃ নারী যেমন দুর্দিনে-দুর্যোগেও জ্বালিয়ে রাখে আশার প্রদীপ, কবির স্বদেশও তেমনই তাঁর বিপর্যয়ের দিনে জাগিয়ে তোলে আশার ভবিষ্যৎ। 'থমথমে রাতের মতো' সময়-বলয়ে দাঁড়িয়েও তাই তিনি অনুভব করেন শস্যের সমূহ সম্ভাবনা। কবিতাটিতে 'শস্য' এবং 'শিকড়' শব্দ দু'টির ব্যবহারে প্রাণদ শক্তির আরাধনা ও ভূমিস্পর্শের প্রতি যে-ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, তা থেকেই বুঝে নেয়া

চলে, এই 'তুমি' গগনবিহারী কোনো নিরালম্ব কল্পনামাত্র নয়, তা আসলে কবির স্বদেশেরই ভাবচ্ছবি, তাঁর স্বদেশেরই জল-মাটি-হাওয়ার বন্ধনে সে দৃঢ়মূল। স্বদেশ-ভাবনায় অরুণ মিত্র তাঁর সমকালীন রাজনীতি-উদ্বুদ্ধ তথাকথিত 'সাম্যবাদী' কবিদের থেকে অনেকাংশে পৃথক। স্বদেশ-সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তার প্রকাশে সেই দলবদ্ধ কবিদের মতো তিনি উচ্চকিত বা উচ্ছ্বসিত নন ; তিনি আত্মগত ও গুঞ্জরিত। তাঁর স্বদেশ-ভাবনার প্রকাশের অনেকটাই তাই এই বিশিষ্টার্থক 'তুমি'-কে নিয়ে তাঁর আত্ম-গুঞ্জরণের ধারাবিবরণী। তাঁর 'তুমি'র মতো তাঁর 'আমি'ও বিশিষ্ট অর্থের দ্যোতক। তাঁর 'আমি' চল্লিশের যূথবদ্ধ কবিদের যূথজনতার নির্বিশেষ একজনমাত্র নয় ; জনতার অন্তর্গত হ'য়েও জনতার আবিলতায় তাঁর 'আমি'র আত্মবিলুপ্তি ঘটেনি, সে আত্মসচেতন। মিছিলের শ্লোগান থেকে তাকে উত্তাপ সংগ্রহ করতে হয়নি, নিজের ভেতরেই সে অনুভব করেছে 'ঘনিষ্ঠ তাপ'।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে অরুণ মিত্রের কাব্যযাত্রার আভিমুখ্য ছিলো 'উৎসের দিকে'। এই উৎস অবশ্যই জীবনের, সর্ব-জাগতিক অস্তিত্বের। উৎসে উপনীত হ'য়ে কবি-চেতনায় যে-উত্তাপ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তারই বিকীর্ণ স্পর্শে তাঁর তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থের রচনাগুলি আমাদের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। সেগুলি পড়তে-পড়তে কবিহৃদয়ের উত্তাপে আমরাও ক্ষণে-ক্ষণে যেন উত্তপ্ত হ'য়ে উঠি। কিন্তু সেই উত্তাপে আমরা মাত্র আলোকিতই হই, ঝলসিত হই না।

'ঘনিষ্ঠ তাপে' অরুণ মিত্র তাঁর কাব্যাঙ্গিকে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। হ্যাঁ, একে আমি বিপ্লবই বলবো ; কেননা মাত্র একটি গ্রন্থের ('উৎসের দিকে') ব্যবধানে 'প্রান্তরেখা' থেকে 'ঘনিষ্ঠ তাপে' তাঁর কবিতার আঙ্গিকগত বিবর্তনের বিস্ময়করতাকে বিপ্লব ব্যতীত অন্য কোন্ অভিধায় অভিহিত করবো ? অথবা যদি করি, তাহ'লে তো তাঁর কবিতার অঙ্গপ্রকরণের আমূল রূপান্তরের বিবেচনায়, 'বিপ্লব' কথাটারই অর্থচ্যুতি ঘটে। 'ঘনিষ্ঠ তাপে' তিনি 'প্রান্তরেখা'র পুরোনো, প্রথাবদ্ধ পদ্যরীতিটি একেবারেই পরিত্যাগ করলেন, পরিহার করলেন কবিতার পংক্তিগত অন্ত্যমিল। অথচ তাঁর মতো ছন্দকুশলী কবি, পদ্যছন্দে একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট থাকলে, সে-পথেও যে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারতেন, সেই ছন্দের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণতার পথে আরো অনেকখানি এগিয়ে দিতে পারতেন, তার বহু নিদর্শন তো 'প্রান্তরেখা'র আদ্যোপান্তই এবং 'উৎসের দিকে'র দু'-একটি ('জয়গান', 'বিষ' ইত্যাদি) কবিতাতেও উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সেই পুরোনো পথে তিনি আর ফিরে গেলেন না, পা বাড়ালেন আনকোরা অভিনব অন্য এক ছন্দের জগতে। কবিতাকে তিনি মুক্তি দিলেন পদ্যছন্দের সুড়ঙ্গ থেকে, সবেগে ধাবিত করালেন গদ্যছন্দের উন্মুক্ত প্রান্তরে। তাঁর কবিতার চেহারায় আমূল পরিবর্তন এলো, রাতারাতি, অবিশ্বাস্যভাবে। কবিতায় ভাবের বাহন হিসেবে তিনি অবলম্বন করলেন কথ্যগদ্য, স্তবককে বিন্যস্ত করলেন অবিকল গদ্যের ধরনে। ফলত, দৃশ্যত গদ্যের ও পদ্যের আকৃতিগত প্রচলিত ব্যবধান তাঁর কবিতা থেকে অবলুপ্ত হ'লো, সীমারেখা মুছে

গেলো পদ্যের ও গদ্যের। কিন্তু মূলগতভাবে কবিত্ব থেকে বিচ্যুত হয়নি তাঁর কবিতা ; বরং গদ্যের সেই সংযত অবয়বে, সংযমশাসিত বাক্যবন্ধে ভাবের স্ফুরণ আরো উজ্জ্বল ও শাণিত হয়েছে। কথকতার (এবং কথোপকথনেরও) ঘরোয়া ভঙ্গিতে তাঁর কবিতা হ'য়ে উঠেছে আরো গাঢ়, গভীর, অন্তরস্পর্শী। কথকতার এই অন্তরঙ্গ নব্যরীতিটির প্রবর্তনার পর থেকেই তাঁর কবিতায় কথকতায় আবিষ্ট একজন নেপথ্য শ্রোতার অলক্ষ্য উপস্থিতি আমরা যেন প্রায় সর্বদাই টের পাই, অনুভব করতে থাকি।

কিন্তু পদ্যছন্দকে তিনি পরিত্যাগ করলেন কেন ? কেন তিনি তার খোলশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন অঙ্গাবরণে তাঁর কবিতাকে আবৃত করলেন, সজ্জিত করলেন নিপাট গদ্যের অঙ্গাভরণে ? আর, স্ফুরিত বাক্যবন্ধের নিরেট গদ্যের এই যে অভিনব কাব্যাঙ্গিক, যা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন তাঁর ভাব-ভাবনার প্রকাশকরূপে, তাঁর আবেগ-অনুভূতির উন্মোচক হিসেবে, যা তাঁর কবিতায় সত্যিই নূতন শক্তি ও গতি সঞ্চারিত—হয়তো একটা নূতন মাত্রাও সংযোজিত—করেছে এবং যা তাঁর গ্রন্থ-পরম্পরায় ক্রমেই হ'য়ে উঠেছে তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্যের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি দিক্, কবি হিসেবে তাঁর চারিত্রিক মৌলিকত্বের (originality) অন্যতম প্রধান পরিচায়ক, তাতে আত্মস্থ হওয়াই বা তাঁর পক্ষে অনিবার্য হ'য়ে উঠেছিলো কেন ? কার বা কোন্ প্রভাবে, কখন থেকে ?

সৌভাগ্যত, উত্থাপিত প্রশ্নগুলির কোনোটিরই উত্তরসন্ধানে অনুমানের ওপর আমাদিগকে নির্ভর করতে হয় না ; কেননা তাঁর নিজের জবানীতেই এগুলির প্রতিটির উত্তর আমরা খুঁজে পাই। উত্তরগুলি শুধু সুচিন্তিতই নয়, কবি হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষত জড়িত, সেই অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি উঠে-আসা। 'ছন্দের কবিতা লেখেন না কেন আপনি ?'—এ-প্রশ্নের উত্তরে 'কবিতা, আমি এবং আমরা' (শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪ সংকলন, 'পরমা') রচনায় স্পষ্টতই তিনি আমাদিগকে জানিয়েছেন 'কবিতা লিখতে গিয়ে আমি বারেবারে তাদের (ছন্দ ও মিল) কাছ থেকে বাধা পেয়েছি ব'লেই অন্য পথ ধরেছি। এখন তো আমার ছন্দমিলকে একটা সংস্কার মনে হয়।… মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনিবিন্যাসে করতে পারে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে-শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই, সেই শব্দ সে ঘাড় ধ'রে প্রায়ই ব্যবহার করায়। এবং মিলের জন্যে কবিতার বক্তব্য বিপথে চলে যেতে পারে।' আরো পরে, 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা-সম্পর্কিত তাঁর আত্মকথনেও, এ-সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন, তাঁর পূর্বোক্ত মতকেই সমর্থন করেছেন তিনি—'আসলে ছন্দের বদলে গদ্যকে বাহন করতে বাধ্য হলুম তখনি, যখন আমি টের পেলুম আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে ছন্দ প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।' আর, বিশুদ্ধ গদ্য-স্তবকবন্ধের তাঁর যে-কাব্যাঙ্গিক, তাতে স্থিত হওয়ার হেতুব্যাখ্যায় তাঁর অভিমত, 'কবিতার রূপায়ণ সম্বন্ধে আমার কোনো নান্দনিক ধারণা নেই। শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্ত আছে যে, আমার মনোভাব বা অনুভব যেভাবে সবচেয়ে ভালো প্রকাশ করতে পারব, সেটাই আমার কবিতার রূপ হবে।…ফরাসী

সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমার এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে।' ('আজ কাল পরশু', অরুণ মিত্র সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮০)।

ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে-পরিচয়ের কথা তিনি বলেছেন, সে-পরিচয়টাই এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বের : কেননা এই কাব্যরীতি অবলম্বনের মূল নিশ্চিতরূপেই ছিলো ফরাসী কবিতার সঙ্গে (কবিদের সঙ্গে নয়, কারণ আগেই দেখেছি, ফ্রান্সে থাকা-কালেও ফরাসী কবিসমাজে তেমন মেলামেলা তাঁর ঘটেনি) তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই পরিচয়ের ফলে সেই কবিতার কাছ থেকে তাঁর গ্রহীষ্ণু মানস যেমন গ্রহণ করেছে অনেক, তেমনই তাঁর কবিতাতেও মাত্র এই গদ্যান্বয়িক উপস্থাপনারীতিটিই নয়, অন্যবিধ পরিবর্তনও ঘটেছে বিস্তর। ধীরে-ধীরে তাঁর কবিতার বাক্যবন্ধ, স্তবকবিন্যাস, উপমা-রূপক-প্রতীক প্রয়োগ ইত্যাদি এবং সর্বোপরি ভাষাব্যবহাররীতি ও শব্দনির্বাচনরুচিতে বিপুল পালা-বদল ঘটেছে। এই পালা-বদল যদিও এক মন্থর প্রক্রিয়ার পরিণতি, তবু তা অলক্ষিতভাবে ঘটেনি। সন্ধানী পাঠকের অবশ্যই নজরে পড়ে, কী-ভাবে তাঁর প্রথম দিকের সংস্কৃতবশ প্রাকৃতপিঙ্গল ভাষা ক্রমে-ক্রমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, 'প্রহরী পাখার ব্যর্থ বিধূনন', 'অবরোহী ক্ষেতের বিহার', 'আকাশের শোনদৃষ্টি', 'অসিধারা-সীমা' কিংবা 'ললাটিকা উল্কামুখী' (এ-রকম আরো অনেক আছে 'প্রান্তরেখা' এবং 'উৎসের দিকে' গ্রন্থ দু'টিতে) ইত্যাদি প্রাচীনপন্থী শব্দ-সমাবেশ আধুনিকতায় মণ্ডিত হয়েছে অথবা 'নিশান্ত', 'হৈম', 'কম্বুরেখা', 'অভ্রলিহ', 'ললাটিকা', 'নভ', 'অধোতরঙ্গে' 'নিরাভ' ('প্রান্তরেখা') এবং 'ভঙ্গুর', 'মঞ্জরী', 'নীবার', 'নীহার', 'বিধূনিত', 'নিমীলিত' ('উৎসের দিকে') ইত্যাদি তৎসমগন্ধী শব্দের সংকীর্ণ কারাগার ভেঙে তাঁর কবিতা 'ভেলা', 'ন্যাজ', 'গোঙানি', 'খাপি', 'চেটো', 'মোলাম', 'আদল', ন্যাতা', 'ফতুয়া' 'জানকবুল', 'আথান্তর', 'জগঝম্প', 'হাঁড়ি-কুড়ি', 'ছাই', 'উনুন', 'মন্তর' 'পিদ্দিম', 'রোদ্দুর', 'সমদ্দুর', 'ঠাহর', 'ভেল্কি', 'ঘোমটা', 'জোয়ান', 'মরদ' ইত্যাদি-ইত্যাদি অজস্র দেশজ ও লৌকিক শব্দের উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে এসে নিঃশব্দে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অভ্যর্থনার আসন যেমন ধীরে-ধীরে বিছোনো হয়েছে, সর্বপ্রকারের শব্দের জন্যও দুয়ার তেমনই ক্রমশঃ উন্মুক্ত হ'য়ে এসেছে। 'ঘুমের দরজা ঠেলে' তাঁর কবিতায় নিত্য নূতন শব্দ এসেছে, এসে ভিড় করেছে। কত রকমের যে সেই শব্দ—কথ্য, গ্রাম্য, মেয়েলি, হাঁটুরে, চলতি, আকাড়া, এমনকি উপভাষারও! এতসব বর্ধমান বৈচিত্র্যকে নিয়ে তাঁর শব্দের ভান্ডার যে সমৃদ্ধ, একজন জাত কবির মতো, সে-বিষয়ে তিনি নিজেও পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তাঁর একাধিক কবিতায় এই সচেতনতার সাক্ষ্য রয়েছে—'শব্দগুলোকে আমি দারুণভাবে সাজিয়েছিলাম।…নতুন শব্দকে ছুঁয়ে আমি আবার পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছি।…কথায় চড়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছি' ('দিগ্বিজয়'), 'আমি শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম।' ('শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম'), 'আমি কথা-গুলোকে সাপ্‌টে ধরতে যাই' ('কথাগুলোকে')। সেইসঙ্গে আরো রয়েছে এই বিবিধ শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মনের উন্মোচন—'তোমার হাতটাকে

লাঙল করো মাটি যেমন উল্‌টে দেয় তেমনি করে উল্‌টোও কথাগুলোকে, তবেই তাদের উপর থরে থরে চারা জন্মাবে, চোখ-ছাপানো ফসল।' ('কথাগুলোকে')। এইসব বিচিত্র শব্দের ব্যবহারে তাঁর কবিতায় ভাবনার চারা সত্যিই থরে-থরে জন্মেছে, ভাবের চোখ-ছাপানো ফসলও ফলেছে নিঃসন্দেহেই।

অথচ, বিস্ময়ের বিষয়, যে-ফরাসী কবিদের কবিতার সংস্পর্শে এসে তাঁর নিজের কবিতার 'ফর্ম'-এ এই নিঃশব্দ বিপ্লব ঘ'টে গেলো, সিনট্যাক্টিক্যাল রিজিডিটিকে বিপর্যস্ত ক'রে, লোক্সিক্যাল রেগুলেশানসকে উল্লঙ্ঘন ক'রে গদ্য ও পদ্যের প্রথাসিদ্ধ আবয়বিক সকল পার্থক্যই অবলুপ্ত হ'লো, সে-কবিরা কিন্তু তাঁর কাব্যগত চিন্তা-ভাবনার নিজস্বতাকে প্রতিহত করতে পারেন নি। তাঁদের চিন্তার দ্বারা অরুণ মিত্রের কাব্যমানসিকতা আচ্ছন্ন হয়নি, আবৃত তো নয়ই। অবশ্য সেটাই ছিলো স্বাভাবিক—হয়তো-বা একজন আত্মসজাগ কবি হিসেবে তাঁর নিজেরও অভিপ্রেত। কেননা ফরাসী কবিদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি শূন্যতার বিরুদ্ধে (অর্থাৎ পূরণে) যোগ্য ফর্মের সন্ধানে, কাব্যের বিষয়গত ভাবনা-চিন্তার অনুসন্ধানে নয়। এবং 'ফর্ম' বা কাব্যরূপ সন্ধানও তাঁর পক্ষে আদৌ পরানুকরণের ব্যাপার ছিলো না, ছিলো গভীর আত্মানুসন্ধানেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুত, ফরাসী কবিতার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে থেকেই তিনি ক্রমশ অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠছিলেন তৎকালপ্রচলিত ও পাঠককুল-সমাদৃত কাব্যরূপের অসম্পূর্ণতায়, তাগিদ জেগে উঠেছিলো তাঁর নিজেরই ভেতরে তৎকালীন ফর্মের শূন্যতার বিরুদ্ধে নিজের নিঃশব্দ প্রতিবাদ ধ্বনিত ক'রে তোলার যোগ্যতম মাধ্যমটি খুঁজে নেবার জন্য। এই রকম সন্ধিৎসু মানসিক অবস্থায় ফরাসী সাহিত্যের আঙিনায় পা বাড়িয়ে জীব-নরসিক ফরাসী কবিদের কাব্যরূপগত পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি এবং তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে পাইয়ে দিলো তাঁর কবিতার ঈপ্সিত ও যোগ্যতম ফর্মটির সন্ধান। ফলে, ঘটলো তাঁর কবিতার রূপ-বদল, ঘটলো তার বন্ধন মুক্তি। কিন্তু তবু তাঁর কবিতার মুক্তিপথের অগ্রদূতের সম্মান যাঁদের প্রাপ্য—সেই উনিশ-শতকী আ্যারত্যুর র‍্যাঁবো এবং বিশ শতকের ঝ্যাল্ স্যুপেরভিয়েল, স্যাঁ-ঝন্ পের্স, পল এল্যুয়ার, ঝাক্ প্রেভের কিংবা র‍্যনে শার—ইত্যাদি শক্তিশালী কবিদের কারোরই 'মতো' তিনি হ'য়ে উঠলেন না পুরোপুরি, তাঁর কবিতাও সর্বাংশে হ'য়ে উঠলো না এঁদের কারোরই কবিতার 'মতো'। ব্যাপারটা তাহ'লে কী দাঁড়ালো? মাত্র দু'টি তুলনার সাহায্যেই তা বোঝানো যেতে পারে—যেমন, উল্লিখিত কবিদের প্রথম জনের, অর্থাৎ র‍্যাঁবোর, কবিতার গদ্য সুতীব্র আবেগে আপ্লুত, কখনো রুদ্ধশ্বাস আর্তনাদের মতো আবার কখনো-বা সমুদ্রের সুগম্ভীর কল্লোলের মতো। কিন্তু সেই আবেগের উচ্ছ্বাস, অবরুদ্ধ আর্তনাদের তীব্রতা অথবা সমুদ্রের নির্ঘোষ অরুণ মিত্রের অন্তর্চেতনাময় কবিতার লীরিক্যাল গদ্যে অনুপস্থিত। আবার, তালিকার শেষ কবি, র‍্যনে শার-এর কবিতায় শব্দের সম্ভাব্য শক্তি-সম্পর্কিত চূড়ান্ত পরীক্ষার শেষ পরিণতি দাঁড়িয়েছে শব্দের বিস্ফোরণ। অরুণ মিত্রও শব্দের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বড়ো কম

করেন নি, কিন্তু তাঁর কবিতায় শব্দগত বিস্ফোরণ অবিদ্যমান। কবিস্বভাবে তিনি স্বতন্ত্র ঘরানার ; তাঁর কবিতা, আগেও ছিলো, পরেও আছে,—পৃথক প্রকৃতির। অনুচিকীর্ষু মনোবৃত্তির বশে নয়, আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই তিনি ফরাসী কবিদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁদের গদ্যকবিতার ও গদ্যের কবিতার অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে নিজের ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, ব্যাপারটার সবটাই মাত্র অনুকরণের নয়, বরং অনেকটাই সজ্ঞান আত্তীকরণের। অতএব এই দিক্‌টিকে সমগ্রত বিবেচনা না-ক'রেই তাঁর কবিতার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'য়ে আমরা যে তাঁর কবিতায় 'ফরাসী প্রভাব'-প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে বসি, আমার মনে হয়, এক হিসেবে এটা তাঁর ও তাঁর কবিতার প্রতি রীতিমতো অবিচার। আর, সেই অবিচারের প্রতিবিধানকল্পেই অরুণ-অনুরক্ত সমালোচকদের উদ্দেশে এই সুযোগে আমার নিবেদন : আপনারা এখন থেকে একে 'ফরাসী প্রভাব' না-ব'লে বলতে আরম্ভ করুন 'ফরাসী আত্তীকরণ'।

'ঘনিষ্ঠ তাপে'র মোট একচল্লিশটি কবিতার প্রথম আঠারোটিই গদ্যের ঠাসবুনোটের। একটানা গদ্যের এই কবিতাগুলির গোত্রনির্ণয় বা সংজ্ঞা নির্ধারণ—কোনোটাই খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পদ্য ও গদ্যের স্বাভাবিক ও স্বীকৃত পার্থক্যবিলোপের এমন একাগ্র প্রয়াস এবং তাতে সাফল্য অর্জনের এ-রকম উজ্জ্বল নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে এর আগে আর দেখা যায়নি। তেল-জলের সংমিশ্রণের মতো কঠিন, দু'-নৌকোয় পা দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার মতো দুরূহ এই সাহিত্যরীতি—একই সঙ্গে গদ্যধর্মও বজায় রাখতে হবে, আবার কাব্যধর্মিতা থেকেও বিচ্যুত হওয়া চলবে না। এই দুরূহতার কারণেই, এই মিশ্র সাহিত্যশৈলী, আকর্ষণীয় অভিনবত্ব সত্ত্বেও, অরুণ-পরবর্তী কবি-প্রজন্মকে আদৌ আকর্ষণ করতে পারেনি। এই কবিদের দু'-একজন, এই চেহারার কবিতা, হয়তো নেহাৎ শখ মিটাবার ছলেই, দু'-একটি লিখেছেন ; কিন্তু ওই পর্যন্তই, তার বেশি আর কিছু নয়। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে অন্তত একজনের নাম, আরো অনেকের সঙ্গে, আমারও মনে পড়ছে—লোকনাথ ভট্টাচার্যের। চল্লিশের এই দুর্ধর্ষ কবিও, কিছুটা অরুণ মিত্রের এই কাব্যরীতির ধরনেই, গরহিসেবী গদ্যবন্ধে আজ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত কবিতা লিখে চলেছেন। কিন্তু তবু তাঁকে আমি অরুণ মিত্রের যথার্থ উত্তরসূরীর শিরোপা দেবো না এই কারণে যে, এই দুই কবি, কাব্যাদর্শের বিচারে, হুবহু একই পথের পথিক নন ; তাঁদের পথ নিঃসন্দেহেই সমান্তরাল, কিন্তু স্পষ্টতই পৃথক। লোকনাথের প্যারোল অরুণ মিত্রের কথ্যভাষার অসতর্ক ছকভাঙা ধরনের নয় ; অধিকাংশ কবিতাতেই তা বড্ডো বেশি অ্যাট্রোশাস্। তাছাড়া, যাদের সম্মিলিত কলকোলাহলে অরুণ মিত্রের কাব্যাঙ্গন অদ্যাবধি মুখরিত, সেই 'নাইভ' মানুষদের আনাগোনাও লোকনাথের কবিতায় নিতান্তই বিরল। পরিবর্তে তাঁর কবিতায় ক্রমেই প্রধান হ'য়ে উঠেছে স্ল্যাঙ্—স্ল্যাঙের সুনিপুণ প্রয়োগ। কবিতার যত্রতত্র স্ল্যাঙ্ প্রয়োগের প্রবণতা এবং এ-বিষয়ে তাঁর স্বীকৃত সিদ্ধি সম্ভবত প্যারীতে তাঁর ফরাসী-জীবন এবং সেই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপা তাঁর ফরাসী স্ত্রীর নিরন্তর সাহচর্যেরই ফল। কিন্তু এটাও

অস্বীকারের উপায় নেই যে তাঁর এই সিদ্ধি একই সঙ্গে তাঁর কবিমানসের একটা অংশের তীব্র মর্বিডিটির প্রতি অভ্রান্ত অঙ্গুলী-নির্দেশকও বটে। আজ খেদের সঙ্গে ভাবি, মনের এই অসুস্থতা যদি তিনি কাটিয়ে উঠতে পারতেন এবং কাব্যভাবনায় নিজের পথের পথিক থেকেও অরুণ মিত্রের কাব্যরূপরীতিটিকেই মডেল হিসেবে সর্বাংশে গ্রহণ করতেন, তাহ'লে বাংলা কাব্যে অরুণ মিত্র-প্রবর্তিত এই অভিনব গদ্যকল্প ফর্মটি এতদিনে না-জানি কতই স্বীকৃতিলাভ ও সম্পূর্ণতাঅর্জন করতো! কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, লোকনাথ বহু দূরে, তাঁর কাছে আমাদের এই খেদভাবনা কে পৌঁছে দেবে !

'ঘনিষ্ঠ তাপ' গ্রন্থটির প্রথমদিকে বিন্যস্ত এই আঠারোটি রচনা এবং 'উৎসের দিকে'র 'স্মরণকাল' অংশের অন্তর্গত 'সুকান্ত'—যেটি গদ্য-আঙ্গিকে রচিত অরুণ মিত্রের প্রথম কবিতা এবং হতভাগ্য কিশোর কবির জীবন-লীলার অকাল-অবসানে, মাত্র একটি আর্ত প্রশ্নে ও তার প্রচ্ছন্ন নেতিবাচক উত্তরের উপজীব্যতায়, আমাদের সকলের সম্মিলিত অশ্রুপাতের বিকল্প এবং যেটির সমকক্ষ উন্মথিত, জীবন্ত ও রক্তমাংসের কবিতা সেদিন বাঙালী কবিদের অন্য কেউই লিখতে পারেন নি—স্বরূপত কী? এগুলি কি গদ্যের কবিতা, না কবিতার গদ্য? এগুলিতে কি রয়েছে গদ্যের ছন্দ, নাকি এগুলি নিজেরাই আসলে ছন্দের গদ্য? সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্যিই কঠিন। তাছাড়া, গদ্য ও পদ্যের লাক্ষণিক এই তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কী অথবা কোনো রচনার রসাস্বাদনের পক্ষে তার স্বরূপগত বিশ্লেষণের সার্থকতাই বা কোথায়? তার চেয়ে আমরা বরং রচনাগুলির নিবিড় সান্নিধ্যে ফিরে যাই।

'ঘনিষ্ঠ তাপে'র প্রারম্ভিক আঠারোটি কবিতার প্রতিটিরই পৃথক পর্যালোচনা সম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় তা নিষ্প্রয়োজন ; কেননা বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি বিশেষ অনুভূতির অভিন্নতার সূত্রে সব ক'টি কবিতাই অন্তর্গ্রথিত। এই অনুভূতির প্রকৃতি অতি প্রাথমিক। মাটি-ঘেঁষা, জল-আলো-হাওয়া-ব্যাপ্ত, কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতা-স্পর্শী এই অনুভূতি। এই ধরনের অনুভূতির প্রাথমিকতা ও আদিমতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়েই এলিয়ট একদা বলেছিলেন যে, বস্তুত এই ধরনের অনুভূতির দিকে আড়চোখে ভিন্ন তাকানো অসম্ভব। কিন্তু অরুণ মিত্রের কাছে এই অনুভূতিকে, প্রাথমিক ও আদিম (primary and primordial) হওয়া সত্ত্বেও, বাঁকাচোখে তাকাবার মতো ব'লে মনে হয় নি। তির্যক দৃষ্টিতে নয়, সোজা এবং সরল চোখেই তিনি ফিরে তাকিয়েছেন এই অনুভূতির উৎস পর্যন্ত। তাকিয়ে তিনি দেখেছেন, অনুভব করেছেন, বিশ্বজাগতিক ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুনিচয়ের কোনোটির সঙ্গেই তাঁর এমন কোনো বঙ্কিম সম্পর্ক নেই, যার ফলে দুর্জয় কোনো বিরোধের জন্ম হ'তে পারে। বরং, বিপরীতক্রমে, তাঁর বোধ জন্মেছে, প্রতিটি বস্তু, প্রাণী ও ঘটনার সঙ্গেই তিনি নিবিড় বন্ধনে মিলিত হ'য়ে আছেন। একদিন তাঁর স্বপ্নের 'তুমি'-কে তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন 'ফসল নদী উৎসবের সঙ্গে' ('তোমার নাম

মিলিয়ে দিলাম' ঃ 'উৎসের দিকে'), আর আজ তাঁর 'আমি'-কেই তিনি মিলিত দেখলেন ইহজাগতিক সকল কিছুর সঙ্গে।

এই যে অনুভূতি, বিকল্পবিহীনতায় যার নিরুপায় নামকরণ সর্বানুভূতি, তারই আভায় এই কবিতাগুলি দ্যুতিময়। তাঁর মধ্যে এই অনুভূতির স্ফুরণ অবশ্য প্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিলো 'উৎসের দিকে'র কয়েকটি কবিতাতেই ; কিন্তু তা যে আরো প্রসারিত হ'য়ে পড়ার জন্য তাঁর কবিচৈতন্যে সেদিন অপেক্ষমান ছিলো, সেটা বোঝা গেলো 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র এই কবিতাগুলিতে উপনীত হ'য়ে। ব্যাপ্তির আধিক্যের দরুণ সেই অনুভূতির স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য এখানে আরো স্পষ্ট। তা যে মূলগতভাবেই বিশ্ব-নিখিলের সমস্ত কিছুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় সম্পর্কিত, যেন তারই নিদর্শনস্বরূপ প্রথম কবিতাটির অনিবার্য নামকরণ 'অন্তরঙ্গ' এবং তার প্রথম বাক্যটিতেই উচ্চারিত হয়েছে গভীর অন্তরঙ্গতার সুর—'ঠাহর ক'রে দেখে বুঝলাম এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ।' কবিতাটির অবশিষ্ট অংশের সমস্তটুকুই ব্যয়িত হয়েছে। 'এই ভিড়ের' অন্তর্গত মানুষজনের সঙ্গে কবির সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনে ও উপলব্ধিতে, যা চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে একটি একাগ্র ইচ্ছায়, কবিতাটির অন্তিম অংশে—'আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি।' কিন্তু কেন কবির এই 'ভয়ানক ইচ্ছে'? এই প্রশ্নটির উত্তরের গভীরেই নিহিত রয়েছে অরুণ মিত্রের অন্যতম চাবি-কবিতা (key-poem) 'অন্তরঙ্গের' মূল রহস্য ও তাৎপর্য। শ্বাসরোধী ভিড়ের মুখে অপরিচয়ের যে-কুয়াশা জমে ওঠে, অনাত্মীয়তার যে-পাথর বসানো থাকে, তা তিনি সরিয়ে দিতে চেয়েছেন এই কবিতায় ; অতিক্রম করতে চেয়েছেন ভিড়াক্রান্ত মানুষের অনিবার্য নিঃসঙ্গতাকে, তার সম্মিলিত একাকিত্বকে। অথচ জীবনানন্দের মতো, 'ভিড়ের হৃদয়' পরিবর্তনের কথা কোথাও বলেন নি তিনি। এর কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে ভিড়ের স্বরূপই যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আবিল জনকোলাহলে মুখরিত নয়, গভীর নৈঃশব্দ্যে তা ঘনবদ্ধ, নিমজ্জিত। ফলে, তাঁর ভীড়ের নিঃসঙ্গতা যেন শরীরী বা corporeal, তাকে যেন personify করা চলে—'আমার মনে হল নিঃসঙ্গতাকে যদি কোনো নাম ধ'রে ডাকা যায় তাহ'লে তারা সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে।' কবিতাটিতে ভিড়ের অসহায় ও অনাত্মীয় মানুষের জন্য নূতন এক অন্তরঙ্গ রূপাভাস রচনাও কবির অন্বিষ্ট এবং সেই অন্বেষাতেই সকলের সঙ্গে তাঁকেও 'নেমে আসতে হয়েছিল···আকাঙ্ক্ষার ···পোড়ামাটিতে।' আর, সেই 'পোড়ামাটিতে' দাঁড়িয়েই, কবিতাটির উপসংহারে পৌঁছে, একটিমাত্র পংক্তি ও বাক্যের স্তবকে (হ্যাঁ, এক পংক্তির এই বাক্যটিই একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্তবক) সমগ্র কবিতাটির অনুভূতির সারাৎসারের উন্মোচন—উত্তেজনার স্পর্শলেশহীন, বাহুল্যবর্জিত কিন্তু নিবিড় অন্তরঙ্গতার প্রত্যয়ী উচ্চারণ ঃ 'তারা সব আমার রক্তের দোসর।'

কবি তাঁর এই 'রক্তের দোসর'দের সঙ্গে নিয়েই এই কবিতাগুলিতে এগোতে চেয়েছেন। তাদের বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার চোরাটানে এগোতে-এগোতেই বিচ্ছেদের 'কাঁটা-

তারের সামনে এসে থেমে পড়তে' হয়েছে তাঁকে, সেই 'কাঁটাতারের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে' ধরে তিনি অনুভব করেছেন 'কেবল শূন্যের চাপ' এবং ফলে, তাঁর মনে হৃদয়-বিদীর্ণ-করা প্রশ্ন জেগেছে, বিচ্ছেদের অবসানের 'ভূমিকম্পের আর দেরি কত ?' ('কাঁটাতার') : 'ঘুমের দরজা ঠেলে' বেরিয়ে এসে গভীর অন্তরঙ্গতায় কারা যেন তাঁকে বলেছে 'কেবল জল আর নরম মাটির কথা।' ('ঘুমের দরজা ঠেলে') ; নিজের ঘরে ব'সে থেকেও তিনি অনুভব করেছেন 'আশেপাশে গাছের পাতাগুলো এক সময় অসংখ্য প্রদীপ হ'য়ে যায়, তাদের রোশনাইয়ের একটা রেশ আমার চোখ দু'টোকে ছুঁই-ছুঁই করে'…'বেশ বুঝতে পারি মাটি হেসে উঠেছে প্রাণ খুলে' এবং একদিন 'আমি ওইসব আলো-হাওয়ার শরিক হ'য়ে যাব।' ('ঘরের মধ্যে')। এই আশ্চর্য অন্তরঙ্গতার আবেশেই সামান্য 'একটি দোকান', তুচ্ছ 'একটি গলি', চুন-বালি-খসা নগণ্য একটি 'বাড়ি'ও তাঁর চোখে বহুমূল্য হ'য়ে উঠেছে, তিনি সেগুলিকেও তাঁর কবিতার বিষয়ে পরিণত করেছেন। এবং এই আবেশের ঘোরেই তাঁর কবিতায় আবার ফিরে এসেছে তাঁর 'তুমি' আর 'আমি' ; তাদের নিয়ে আবার আরম্ভ হয়েছে আচ্ছন্নের মতো তাঁর উচ্চারণ—'আমার স্পর্শ নিয়ে তুমি পাথর মাটির সঙ্গে একাকার হ'য়ে যেতে চাও। যেখানে চির-কালের মতো আমি তোমায় ঢেকে থাকব।' ('এই প্রান্তে')। এইসব অজ্ঞাত-অথচ-আপন লোকজন ও নিসর্গপ্রকৃতিকে সঙ্গী ক'রেই এই কবিতাসমূহে তাঁর অগ্রগামিতা। এই অগ্রগামিতায় দু'-একটি কবিতায় লেগেছে গল্পের আমেজ—বিশুদ্ধ গল্পের, যেমন 'যাত্রী' কবিতায়, যেটিতে আছে 'একগলা ঘোমটা-টানা বউ, জোয়ান মরদ, ছেলে বুড়ো সকলে', যেমন 'মেলা' কবিতাটিতে, যেটিতে এক দৌড়ে একেবারে ছেলেবেলায় গিয়ে' থেমেছেন তিনি। আর আছে কোনো-কোনো কবিতায় তাঁর এই অন্তরঙ্গদের অন্তরের নিঃসঙ্গতার বেদনাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পরখ করার আকুতি। তিনি দেখেছেন, এদেরই দুজন 'গাঁয়ের আবছা কোণে দু'খানা পোড়া রুটি সামনে নিয়ে ব'সে আছে।' ('দু'-জনকে দেখে-ছিলাম') ; অনুভব করেছেন, যে-রিক্‌শাওয়ালা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-নির্বিশেষে বারোমাস 'সন্ধের পর ছেলেবউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে…বেরিয়ে পড়ে', 'খুব সম্ভব কোনো একদিন…ভেতরের আগুনটা নিবে গিয়ে সে ঠাণ্ডায় জ'মে পাথর হ'য়ে কোথাও প'ড়ে থাকবে।' ('রিকশাওয়ালা')। 'শরতের ভোরের সীমানায়' তিনি 'অন্ধ' যে-ইতিহাস ব'য়ে এনেছেন, তা তো বস্তুত তাঁর এই অন্তরঙ্গদেরই অশ্রুসিক্ত ইতিহাস।

কিন্তু যে-ইতিহাস অন্ধ, তার উত্তরণ কী-ক'রে সম্ভব? অন্ধের তো কোনো উত্তরণ নেই, উত্তরণ থাকে না। তাহ'লে কি আমরা এটাই বিশ্বাস করবো যে, কবি ক্রমেই ইতিহাসের, তথা জীবনের উত্তরণবিহীনতায় বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন? তা কিন্তু সত্য নয়। আসলে, এটাও এক ধরনের আবেগেরই প্রকাশ, এক ধরনের অনুষঙ্গী মানসিকতার (associated mentality)—যার প্রকৃতি আশাবাদের বিপরীত। বুঝতে অসুবিধে হয় না, আশা এবং আশা থেকে বিচ্যুতি, এমন কি কখনো-সখনো ঈষৎ নৈরাশ্যস্পর্শিতা—এই দুই বিপ্রতীপের মধ্যে তিনি আন্দোলিত হচ্ছেন, পা রাখার

মতো কোনো ভারসাম্য খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশ্য এই দোদুল্যমানতা কোনো অর্থেই কবি হিসেবে তাঁর ত্রুটির পরিচায়ক নয়, কেননা জীবনের সমগ্রতাকে যিনি খোলাচোখে-খোলামনে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাঁর পক্ষে এবম্বিধ মানসিক অবস্থায় উপনীত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ-ক্ষেত্রে আসল কথাটি হ'লো ভারসাম্যের অন্বেষণ তাঁর মধ্যে অব্যাহত আছে কিনা, সেটাই লক্ষ্য করা। কবির মধ্যে সেই অন্বেষণ যে সত্যিই জাগ্রত, কবিচিত্তের দোলাচলের মতো, তারও প্রকাশ ঘটেছে 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র শেষদিকে (বলা যেতে পারে দ্বিতীয় অংশে) টানা-গদ্যে-না-লেখা, পংক্তি ভাগ ক'রে বিনাস্ত কবিতা-গুলিতে। 'একান্তে' কবিতার ঃ

আমায় যে সন্তর্পণে এসে জাগায়
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু তার মুখে ভোরবেলাকার মুগ্ধতার সৌরভ,
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু আমার করতলে
দিনের দূর উৎসের অনুভব।

এই পংক্তি-কতিপয়ে দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যবর্তী বাস্তবতা-অবাস্তবতার মৃদু তরঙ্গান্দোলনে কবির অস্থৈর্য যেমন আভাসিত, 'তার ছায়াবটের ঝুরি/আমার মাটিতে নামিয়েছি' ('জ্বরে') স্বীকৃতিতে এবং 'যেখানে বীজ প'ড়ে অঙ্কুর তৈরী হয় সেখানে আমি কেমন ক'রে নামব?' ('অন্ধের মতো') গম্ভীর জিজ্ঞাসায় সেই অস্থৈর্য থেকে উত্তরণ-অভিলাষও তেমনই স্পষ্টত প্রকাশিত। আবার কয়েকটি কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে অপেক্ষমানতার সুর ঃ

কখন নিঃশ্বাস শুনতে পাবার মতো রাত্রি আসবে
তার জন্য অপেক্ষা করছি
সেই প্রশান্তির দিকে ফিরে আছি। ('কোলাহল')

অর্থাৎ, 'ঘনিষ্ঠ তাপ'কে শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত করতে হয় উত্তরণের না-হোক, অন্তত উত্তরণাভিলাষের কাব্য হিসেবে। এর কবিতাগুলি পড়তে-পড়তে আমরা ঠিক টের পাই, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার একটা পর্ব তিনি পার হ'য়ে চলেছেন, ক্রমেই পৌঁছোতে চাইছেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের একটা ভারসাম্যে, উপলব্ধিগত কোনো কেন্দ্র-বিন্দুতে। অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য যে এই কবিতাগুলিতে তাঁর সেই আভিমুখ্যের অনেকটাই অভিলাষের অন্তর্গত, বাস্তবের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কিন্তু 'সময়ের আরম্ভে' থেকেও ঈপ্সিত যে-লক্ষ্যে 'ঘনিষ্ঠ তাপে' উপনীত হ'তে পারেন নি তিনি, 'সমস্ত ঋতুর জানলা দিয়ে···ভয়ঙ্কর সুন্দর মাটি'র বুকে শতঝুরি বটের মতো শেকড় নামাতে সফল হন নি, পরবর্তী 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' কাব্যগ্রন্থে তিনি সেই লক্ষ্যের অনেক সমীপবর্তী, ভূমিস্পর্শিতাতে অনেক বেশি সাফল্য তাঁর করায়ত্ত। সেই যে কবে 'ঘুমের দরজা ঠেলে' কারা এসে তাঁকে 'জল আর নরম মাটির কথা'

শুনিয়ে গিয়েছিলো, সেই থেকেই তিনি অধীর হ'য়ে ছিলেন জলের প্রাণের স্পর্শে নিজেকে উজ্জীবিত ক'রে তোলার জন্য, উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা করছিলেন মাটির মনের গানকে নিজের মনের কানে স্পষ্টভাবে শোনার ইচ্ছায়। 'উৎসের দিকে'ই এগোতে থাকুন অথবা 'ঘনিষ্ঠ তাপে'ই নিজেকে তিনি উত্তপ্ত করুন, এতদিন পর্যন্ত তাঁর অধিষ্ঠান ছিলো একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর চৌহদ্দীতে, মঞ্চের সীমিত একটা পরিসরে। এইবার তিনি নেমে এলেন সেই মঞ্চ থেকে, পা ফেললেন তার বাইরের মাটিতে। আর, সেই সঙ্গে অবসান ঘটলো তাঁর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার, পরিপূর্তি ঘটলো তাঁর ভূমিস্পর্শের গভীর পিপাসার। যে-মানুষরা একদা তাকে শুনিয়েছিলো 'নরম মাটির কথা', তাদের জীবনকে তো তিনি এতদিন ধ'রেই জেনে আসছিলেন, তাদের সঙ্গে নিয়েই তো কবিতায় তাঁর এতদিনের অগ্রগামিতা ; কিন্তু সে-কথার আগুন তাঁর প্রাণে যে-মশাল জেলে দিয়েছিলো, তারই আলোয় এবার তিনি উদ্‌ভাসিত দেখতে চাইলেন সেই মাটিকে, স্বকর্ণে শুনতে চাইলেন তার বুকের গুমরে-ওঠা কান্নাকে। বস্তুত, 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' পা ফেলার শিহরণের অনুভূতি তাঁর কবিচেতনার রূপান্তর ঘটালো—হয়তো-বা নবজন্মও।

এই যে মৃত্তিকাভিসার, মাটিমুখী অভিযাত্রা, যা এই কাব্যগ্রন্থটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য করবার, তাতে কিন্তু 'চল্ ফিরে ভাই মাটির টানে'র মতো প্রত্যক্ষ কোনো আহ্বান নেই। আর, তা থাকবেই বা কেন, এতদিন পরেও? যূথজনতার সঙ্গে উদ্দীপক-উদ্দীপিতের সম্পর্ক সেই কবেই তো তিনি 'প্রান্তরেখা'র বিশেষ কয়েকটি কবিতার পরেই ছিন্ন ক'রে ফেলেছেন। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে তিনি আত্মগত, এমনকি আত্মগুপ্তও। নিজের মধ্যেই নিজেকে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন, রাখতে চেয়েছেন। নিজের সঙ্গেই নিজের চলেছে অনর্গল কথা বলা—বড়ো জোর তাঁর 'তুমি'-র সঙ্গে। 'আমরা' ও 'তোমরা' খুবই নগণ্যভাবে উপস্থিত। আসলে, 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' পা ফেলে তিনি অভিভূত বোধ করেছেন, যেন এক আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হ'য়ে পড়েছেন। সেই আচ্ছন্নতার ঘোরেই তাঁর যত স্বগত-উচ্চারণ, উপলব্ধির গভীরোত্থিত তাঁর সব আত্ম-উন্মোচন—'মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে আছি।' ('প্রাজ্ঞের মতো নয়'); 'আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে।' ('বৃষ্টির দেশ থেকে এলে')। এক-একবার তাঁর মনে হয়েছে, তিনি যেন অনুভূতির একেবারে সঠিক জায়গাটিতেই পৌঁছে গিয়েছেন—'...তার সঙ্গে সংলগ্ন হবার জন্যে আমি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম,... আমি সেই দিনটার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি' ('এবং সবাই শুনল'); 'অবশেষে পথ ফুরোল আর আমি বিপুল হৃদয়ের ধ্বনির ভিতরে চোখ বুজলাম। / এই আমার চেনা জায়গা চেনা সময়, / শান্তির আদিগন্ত রাত নিয়ে আকাশ' ('নিশুত'); 'আমার দৃষ্টিতে এমন স্থিরতা এসেছে, / আমি মনে মনে / ওঠাপড়ার ভারসাম্যে পৌঁছেছি।' ('ভারসাম্যে') ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীতে কবিতা যেমন শেষশূন্য, কবিমনের রহস্যও বুঝি তেমনই অন্তহীন ; তা না-হ'লে ভারসাম্যে পৌঁছোনোর পর আবার কেন

তা থেকে বিচলনের সংকেত, প্রত্যয়ের পরেও কেন আবার সংশয়ের অঙ্কুরোদ্গম? পরিপার্শ্ব-সচেতন যে-কবির কণ্ঠে একদা আমরা উচ্চারিত হ'তে শুনেছি, 'আমার মনকে আমি পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না এবং করতে চাই না', সেই প্রত্যয়ী কণ্ঠেই যখন ঃ

মিলিত স্বরের জন্যে এক গান বাঁধা ছিল
কিন্তু কারা তা গাইবে ?
নতুন বছরের সুরে
সন্ধ্যা আর সকালকে যারা উজিয়ে নিত
তারা কই ?
চারদিকে স্থবির ঘর অন্ধ জানলা,
নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। ('উন্মুখ')

এই বিষাদের আর্তি ঝ'রে পড়ে, 'পোল পার হওয়ার সময়' যখন তাঁর 'ভাবনা হয় আমি কীভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব' অথবা হতাশার শৈত্যস্পর্শে যখন তিনি স্বীকার করেন, 'যেখানে তাপ খুঁজছি সেখানে তাপ নেই' ('শীতের সকালে'), তখন তাঁর অভিজ্ঞতার এই আরেক পিঠ আমাদের পক্ষে যতই অপ্রত্যাশিত হোক না কেন, তার হেতু আমরাও যেন কিছুটা আঁচ করতে পারি। ভারসাম্যে উপনীত হ'য়েও তিনি যে সহজ-স্বাভাবিকতায় তাতে সুস্থিত থাকতে পারছেন না, মাঝে-মাঝেই তা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ছেন, তার মূলে আসলে রয়েছে এই গ্রন্থ রচনাকালীন (১৯৬৩-৬৯) ঘূর্ণিত সময়েরই সূক্ষ্ম অভিঘাত। সময়ের সঙ্গী হ'তে তাঁর কোনো অনীহা ছিলো না ব'লেই সময়ও এই কবিতাগুলিতে তাঁর সঙ্গী হ'য়ে উঠেছে।

বস্তুত, সময়ের প্রতিকূলে না নিয়ে গিয়ে তার অনুকূলেই এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে তিনি প্রবাহিত করিয়েছেন। সময়কেই তিনি নানাভাবে ধ'রে রেখেছেন তাঁর এই কবিতাগুলির চালচিত্রে। 'সময়ের গম্বুজের নিচে' দাঁড়িয়ে থেকে তিনি দেখতে পেয়েছেন ঃ

ভাঙন একেবারে সামনে এসে গেছে,
ক্রোশের পর ক্রোশ উল্টেপাল্টে অন্যরকম
উৎকীর্ণ নির্দেশগুলো একটাও আর নেই
অথচ তাদের অবিনশ্বরই মনে হত ('ভাঙন')

সময়ের বাত্যাবাহে ধ্বস্ত হ'তে-হ'তেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর 'একান্ত কাছের মুখ-গুলো বরফের মতো গলে যাচ্ছে'; অন্ধ নিয়তি-তাড়িত সময়-প্রবাহের আভিমুখ্য সম্পর্কেও তাঁর গভীর সংশয় জেগেছে—'ঘড়ি তো আমাদের জানায় আমরা চলছি। কিন্তু কোন্ দিকে চলছি ?' ('ইদানীং'); এমন কি অজ্ঞাতগতি সেই সময়ের দোসর-রূপে নিজেকেই তাঁর মনে হয়েছে 'ঘূর্ণির বাসিন্দা' ব'লে, বেদনায় বিহ্বলতাবশত তাঁর প্রার্থনা জেগেছে ঃ

দাও আমার কপালে যন্ত্রণার রাজটীকা দাও,
আমার জন্যে এই সময়ই তো নির্ধারিত হয়েছে। ('দূর দূরান্তের পর')

সময়ের অভিঘাতজনিত এই অভিজ্ঞতা সত্যিই মর্মান্তিক ; কিন্তু সেই মর্মান্তিকতায় ব্যথিত বোধ করলেও তিনি ব্যাহত হননি। বরং বেদনার অগ্নিময় উপলব্ধিতে তিনি আবার উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছেন, তাঁর কণ্ঠে প্রত্যয়ী উচ্চারণ আমরা আবার নূতন করে শুনতে পেয়েছি—'আমি যেন এক দিগ্‌দর্শী নাবিক, যে জানে কী ক'রে চোরাপাহাড় থেকে বাঁচতে হয়, কী ক'রে ঝড়ের বৃত্ত এড়িয়ে বন্দরে ভিড়তে হয়।' ('তখন থেকে আমি')। এই নবলব্ধ আত্মপ্রত্যয়ের উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে আবার তিনি সামনের দিকে চোখ মেলেছেন, তাঁর আশা জেগেছে, 'এই প্রতিশ্রুত সময়ে আমরা ফিরে আসব' ('উচ্চকিত মাঠ ছাড়াতেই'), 'আমরা মুক্তির আভায় আবার আপ্লুত হব' ('আরো কত প্রস্ফুটন') ; সকলকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, 'চলো এবার ভারহীনতার চূড়ান্তে উঠে যাই।' ('নিয়ন আলোর ভিতরে')। অর্থাৎ, এই গ্রন্থে তাঁর যা মূল লক্ষ্য, সেই 'আসল কথা হল শান্ত হওয়া' ('ভারসাম্যে') থেকে তিনি এতটুকু স'রে আসেন নি, হয়তো কিঞ্চিৎ বেপথু হয়েছেন, এই মাত্র। বস্তুত, তাঁর আজুর্নী লক্ষ্যে একাগ্রতাবশতই 'প্রাজ্ঞের মতো নয়' কবিতায় তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়ে যাই অনুভূতি প্রকাশের ব্যঞ্জনাগভীর আরেক রূপ। আমাদিগকে তিনি বলেন, 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রে বলো।' এবং পরিবর্তে তাঁর নিজের কথা এইভাবে জানিয়ে দেন— '...আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি দ্যাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমরা অবাধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।' এই শস্য আর পুষ্পের প্রাণদায়িনী যে-মৃত্তিকাসত্তা, তার মঙ্গলমূর্তির আবরণ উন্মোচনই 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' কাব্যগ্রন্থে কবি অরুণ মিত্রের প্রধান অভীষ্ট।

'বেনামা সময়' এবং 'ঘরের পৃথিবী' এই গ্রন্থেরই দু'টি অংশ, শেষ দিকে স্বতন্ত্র-ভাবে বিন্যস্ত। 'বেনামা সময়ে'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'ভারসাম্যে', 'ঝাঁপ দেব', 'উপরে ওঠা' ইত্যাদির মতো সহজ ভঙ্গির রচনা যেমন আছে, তেমনই রয়েছে ঈষৎ হালকা চালে ও তির্যক ভঙ্গিতে রচিত 'পুতুল নাচ', 'মুখোশ খুলে রেখেছি' এবং 'কাপ্তান আরো'-র মতো কবিতাও। ছড়ার ধরনে এবং ব্যঙ্গের আশ্রয়ে রচিত একটি সুন্দর কবিতা 'যোগফল'। এছাড়া, আরো কয়েকটি কবিতার বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পংক্তিও মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে ওঠে। 'ঘরের পৃথিবী' অংশে আছে ন'টি কবিতা। এগুলির মধ্যে 'এবার দূরের জন্যে', 'দুই বছর', 'এলাহাবাদ ইস্টিশনের' এবং 'ন্যাতাপরা ছেলেমেয়ে'—এই চারটি কবিতায় একটি নির্দিষ্ট চরিত্র বারে-বারে দেখা দিয়েছে : 'বুলা', যে আসলে রক্তমাংসের পরিচয়ে কবির দৌহিত্রী। এই 'আলো-আঁধারির' এবং 'ঘুঙুরের মতো' বুলার শৈশবের 'দু'টো বছর'ই এই কবিতা চারটির মূল আলম্বন।

চারটি কবিতারই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম অপত্যরস। অন্য কবিতা পাঁচটিতে তাঁর কবিমনের বিচিত্র গড়ন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে প্রকাশিত।

পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮)-এ পুরস্কার তাঁকে স্পর্শ করলো, তাঁর 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' (১৯৭৯) প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তাঁকে সম্মানিত করার সুযোগ আমরা পেলাম। এই গ্রন্থটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে কবির নিজেরই একটি উক্তি। 'কবিতা কী বলে কীভাবে বলে' প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 'পাঠকের সঙ্গে বিস্তৃত সংযোগ তখনই ঘটে যখন কবির নিজের কথা শুধু তাঁর নিজের আর থাকে না।' 'প্রান্তরেখা'-পর্বের 'ভাষণ' অংশের কবিতা-কতিপয়ের কথা বাদ দিলে, অরুণ মিত্রের কাব্যরচনারীতি, আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, কিছুটা স্যুররিয়্যালিস্ট ধরনের—স্বয়ংচলতা (automotion)-এর বৈশিষ্ট্য। এই নিচু সুরের অথচ অবাধ ও অনর্গল রচনারীতিতে এমন একটা নিহিত বিশেষত্ব আছে, যার ফলে রচয়িতার আত্মগত ভাবও তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই সর্বগত ভাবের প্রতিভূ হ'য়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এই রীতির মধ্যবর্তিতায় পাঠকের সঙ্গে লেখকের সংযোগের ক্ষেত্র (contact area) টি ক্রমশ বিস্তৃত হ'তে থাকে। অরুণ মিত্রের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটিই ঘটেছে। এই কাব্যগ্রন্থের দরুণ 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোটেই জনপ্রিয় কবি ছিলেন না, পরেও যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তা-ও আমি মনে করি না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, সীমিতসংখ্যক যে-সমস্ত পাঠক ও পাঠিকার নিকট তাঁর কবিতা সমাদৃত, তিনি তাঁদের একেবারে কাছের মানুষ—অন্তরের বাসিন্দা। তাঁর ও তাঁর কবিতার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যবর্তী ব্যবধানের এই যে অবলুপ্তি, এর কারণ তাঁর নিজের উপলব্ধ কথা শুধু তাঁর নিজেরই হ'য়ে থাকেনি, তাঁদেরও অন্তরের কথায় পরিণত হয়েছে। আবার এরও নেপথ্যে সক্রিয় রয়েছে তাঁর এই স্বতন্ত্র ধরনের অন্তরঙ্গ কাব্যরীতি।

লক্ষ্য করা যাক, 'শুধু রাতের শব্দ নয়'-এর কবিতাগুচ্ছে, কোলাহলে গলা না-মিলিয়েও, কীভাবে তিনি তাঁর নিজের কথাকেই সবার কথায় পরিণত করেছেন। সন্দেহ নেই, এ-ও এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ারই পরিণতি এবং এই প্রক্রিয়ার স্বরূপ সন্ধানেও শেষ পর্যন্ত ঘাড়ে-গর্দানে চেপে ধরতে হয় এই কবিতাগুলি রচনার করাল-কালকেই। কবির আপাত-সর্বশেষপূর্ব দু'টি কাব্যগ্রন্থেরই ('শুধু রাতের শব্দ নয়' এবং 'প্রথম পলি শেষ পাথর') রচনাকাল এই শতকের সত্তরের দশক—যে-দশকে আমাদের সমস্ত কিছুই শ্মশানশয্যায় শায়িত ; আমাদের রাজনীতি-চর্চা, আমাদের আদর্শানুসরণ, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ ইত্যাদির সমস্ত কিছুই শ্মশানধূলিতে সমাচ্ছন্ন। এই দশকের সামগ্রিক অবক্ষয় এবং বীভৎস মুখব্যাদানকে এড়িয়ে গিয়ে 'শুধু রাতের শব্দ নয়'-এর কবিতাগুলিকে যথার্থ প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা বা করানো যাবে না কিছুতেই।

'শুধু রাতের শব্দ নয়' গ্রন্থটির কিছুসংখ্যক কবিতা কবির এলাহাবাদ-প্রবাসপর্বে রচিত, বাকিগুলি কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফিরে এসে লেখা। এলাহাবাদ ছেড়ে স্থায়ী-

ভাবে কলকাতায় ফিরে আসার সময় আশা ও আনন্দ তাঁর মনে উত্তেজনার যে-জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলো, সেই জোয়ারে এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা উদ্বেল—যেমন 'ফিরে আসা' কবিতাটি, যেটিতে তাঁর অনুভূতি, 'দরজাটা শুধুই ভেজানো / আমি হাত দিতেই পাল্লা স'রে যায়…', যেমন 'দ্যাখো আমি ফিরে এলাম', 'বদলটা অন্ধকারে হয়' ইত্যাদি কবিতা, যেগুলি পড়তে গিয়ে, 'আমি পোঁছলাম / আমার কেন্দ্রে, বাংলায়, আমার বাংলাদেশে' এবং এ-রকম আরো কিছু-কিছু বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে আমাদের চোখ আটকে যায়, আমাদের মন থেমে পড়ে। কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছর বাদে স্থায়ীভাবে বাস করতে এসে কলকাতার পথে পা ঠেকিয়েই তিনি যেন ধাক্কা খেলেন, যেন অনুভব করলেন একটা বিপুল ভূকম্পন। আসলে, এটা স্বপ্নভঙ্গজনিত অভিজ্ঞতারই রকমফের। যে-স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে তিনি এলাহাবাদ থেকে যাত্রা করেছিলেন, তাঁর 'কেন্দ্র' বাংলায় পোঁছে সে-স্বপ্নকে তিনি কোথাও সমগ্রত খুঁজে পেলেন না, যেটুকুর হদিশ পেলেন অংশত, তার স্বরূপও তখন একেবারেই অন্য রকমের। আর, তা হবেই বা না কেন? সর্বাত্মক অবক্ষয়ের ঘুণপোকা ততদিনে যে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের গোটা কাঠামো-টাকেই কুরে-কুরে ঝাঁঝরা ক'রে ফেলেছে।

কলকাতা-আগমনের প্রাথমিক ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত স্থির হ'য়ে বসলেও, সেই ছিন্নমস্তা সময়কে শিয়রে রেখে এই গ্রন্থের বাকি কবিতাগুলি যখন তিনি লিখতে আরম্ভ করেন, তখন কিন্তু মনের স্থৈর্য পুরোপুরি বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য তা সম্ভবও ছিলো না—বিশেষত তাঁর মতো সময়-স্পর্শকাতর (time-sensitive) কবির পক্ষে। ফলে, এই কবিতাগুলিতে কবির অনুভূতি বহু ক্ষেত্রেই একটি দ্বি-স্তর গতি পেয়েছে। স্বপ্নের মায়াঘোরে অতীতের আহ্বান শুনতে পেয়ে কখনো তিনি হয়তো অতীতের স্নিগ্ধতায় প্রবেশ করেছেন :

> পেছন থেকে আমি যে-ডাক শুনি
> তা আরো অনেক দূরের।
> যেখানে আমার জন্মের উৎস …
> … … …
> পেছন থেকে ডাক শুনি,
> আমি বঁইচির ছায়া ছেড়ে
> আরো স্নিগ্ধতায় প্রবেশ করি …
>
> ('পেছন থেকে যে-ডাক শুনি')

কিন্তু সেই দেউলিয়া দশকে, আরো অনেকের মতো, যেহেতু কবির মনের সক্রিয়তার আগেই তাঁর চোখ দু'টো তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে, অতএব অতীতের সেই স্নিগ্ধতার ছায়ায় তিনি স্থায়ীভাবে আশ্রিত হ'তে পারেন নি। অতীতের স্বপ্নগহ্বর থেকে টেনে এনে তাঁর চোখ দু'টোই তাঁকে নিক্ষেপ করেছে বর্তমানের অগ্নিকুণ্ডে; তিনি দেখতে পেয়েছেন তখনকার সেই জ্বলন্ত বর্তমানের মর্মান্তিক সব ভাঙনের দৃশ্য, একের-পর-এক-

—মানবিক মূল্যবোধের অদ্ভুত পরিবর্তন, রাজনৈতিক হঠকারিতার শোচনীয় পরিণাম, সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রকাণ্ড ফাটল। তাঁর নজরে পড়েছে চারপাশের বণিকশাসিত বৈশ্য সমাজ, যার সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণীতে প্রতিটি পণ্যই বিষদুষ্ট, পারমাণবিক ছোঁয়াচ-লাগা ঃ

থরে থরে ফলে সব্জিতে মারাত্মক রঙ। আমি
নাড়াচাড়া ক'রে দেখি আমার হাত বিষিয়ে ওঠে।
তাদের গায়ে যেন পারমাণবিক ছোঁয়াচ। ('দিনলিপি')

স্বাভাবিকভাবেই সেই মারাত্মক পরিস্থিতিতে তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে, 'এই বিষ কি ক'রে ছাড়ানো যায়?' ('দিনলিপি') এবং তাঁর মধ্যে ইচ্ছা জেগেছে, 'আমি বাগান থেকে ঘরে, / ঘর থেকে বাগানে নিঃশত্রু বীজের ডানামেলা দেখতে চাই' (ঐ)। কিন্তু 'নিঃশত্রু বীজ'-সম্বন্ধে মানব-সমাজের জন্য ইচ্ছার তীব্রতায় যতই তিনি তাড়িত হোন, তাঁর কানে তখন কেবলই সময়ের পাড়-ভাঙা শব্দ, তাঁর পায়ের নিচে শুধুই আঁকাবাঁকা ঘূর্ণিস্রোত ঃ

১.

… … আমি রাত-ভর
ঘর-দোর ভাঙার শব্দ পাই,
এবং আমার চব্বিশ ঘণ্টায়
রক্তের তাজা গন্ধ,
আমার যা কিছু স্বপ্নের ভিতরে
তা-ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। ('এই ইস্পাত')

২.

কাদার পরতে একটাও অঙ্কুর নেই
কোনো হাতের মায়া কোথাও লেগে নেই ;
… … … … …
আমার মাথার উপরে চারপাশে
আকাশ গর্জায়
তার পায়ের দিকে অবিরাম পাল্টা স্রোত। ('অন্য স্রোত')

এই গ্রন্থের 'চক্কর', 'ঠাসবুনোন শহরটা', 'অথচ জলের জন্যেই' ইত্যাদি কবিতাতেও কবির ভগ্নহৃদয়ের প্রতিফলন অতিশয় স্পষ্ট। খুবই স্বাভাবিক, সমাজের আর-দশজন সাধারণ সদস্যের মতোই, তাঁর জীবনের চৌহদ্দীতেও তখন স্বস্তির কোনো অবকাশ ছিলো না। ফলে, অতি সহজেই তিনি বলতে পেরেছেন, 'আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে?' ('স্বস্তির কথা কে বলে'), এমনকি কবিতাবিশেষে কখনো-বা আত্ম-নির্যাতন (self-torture)-এও একরোখার মতো মেতে উঠেছেন—'আমি আঙুল মুঠো করে

ইঁটের উপর মারছি আর আমার বুকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে' ('দেয়ালের বাইরে')।

সন্দেহ নেই, সময়ের সেই বর্তুল গতি তাঁকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভারগ্রস্ত ক'রে তুলেছিলো, তাঁর মনের মাটিতে ক্রমাগত বুনে চলেছিলো বহুবিধ বিপ্রতীপ ভাবনা-চিন্তার শিকড়-বাকড়। এবং এ-সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে সেই স্বস্তির বিপক্ষতা আর আত্মপীড়নের স্বপক্ষতা—দুই-ই আসলে তাঁর পক্ষে সেদিন ছিলো তাঁর মনের ক্রমসঞ্চিত ও অবদমিত বিক্ষোভেরই অনিবার্য প্রকাশ। কিন্তু যা এখানে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্যণীয় এবং যা বিশেষভাবে জানাবার জন্যই এই আলোচনাকে এতদূরে পর্যন্ত টেনে আনা, তা হচ্ছে এই যে তাঁর সেই বিক্ষোভের প্রকাশে কোথাও গর্জন নেই, কোনো চিৎকার নেই—পরিবর্তে আছে সংযম-শাসিত প্রত্যয়ী উচ্চারণ। তাঁর একটি কবিতার ('জন্মভূমিতে' : 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে') একটি পংক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ক'রে এ-প্রসঙ্গে চমৎকার প্রয়োগ করা যায়। তাঁর কবিতার সেই পংক্তিটি, 'না, আমার বাঁচবার চৌহদ্দীতে কোনো জলের গর্জন নেই।' আর, আমরা সেটিকে এইভাবে পরিবর্তিত ক'রে এ-ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চাই—না, অরুণ মিত্রের বিক্ষোভের চৌহদ্দীতে কোনো গর্জনের শব্দ নেই। চল্লিশের দশকের অতিবাম কবিদের সত্তরের দশকে রচিত কবিতার পাশে রেখে তাঁর এই কবিতাগুলিকে পাঠ করলেই তথাকথিত সেই 'বিপ্লবী' কবিদের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠোচ্চারণগত মৌলিক পার্থক্য আরেকবার স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

তবু তৎকালীন সমাজের সঙ্গে অন্বয়ের আবেগ প্রকাশে তাঁর আশ্চর্য সংযম ও ঋজুতার কথা স্মরণ রেখেও এ-কথা অবশ্যই বলবো, যদি তিনি সেখানেই থেমে যেতেন, সেই সাময়িক অবসাদেই অবসিত হবার কারণ খুঁজে পেতেন, তাহ'লে তাঁর ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে এতসব লেখার হয়তো তেমন কোনো সার্থকতা থাকতো না। কিন্তু তিনি তা করেন নি; সেখানেই থেমে যাননি বা থেমে থাকেনও নি। সময়ের ষড়যন্ত্রজনিত বহু ব্যর্থতার বেদনাকে প্রচ্ছন্নে বহন ক'রেও তিনি হার মানেন নি, অফুরন্ত উৎসাহে অনাদ্যন্ত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছেন আর সেই সঙ্গে আহ্বান জানিয়েছেন আমাদিগকেও তাঁর যাত্রার সঙ্গী হ'তে :

> ... ... এগোও।
> ... ...
> উতরোল ঘণ্টাগুলো দিগন্তে দিগন্তে পুরো দোলে,
> এক পথ পার হ'য়ে আর এক পথ : এগোও। ('গভীর শহরে')

বস্তুত, তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'শুধু রাতের শব্দ নয়'-এ তিনি কেবল রাতের শব্দেই থেকে-থেকে উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠেন নি, এই চরৈবেতির অভীমন্ত্রেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত করেছেন। এবং তাঁর এই অগ্রগামিতায় তাঁর পাঠক ও পাঠিকারাও তাঁর নিত্যসঙ্গী।

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম পলি শেষ পাথর'ও সত্তরের দশকেরই সৃষ্টি। ছাপান্নটি কবিতা-সম্বলিত এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৭৫-৭৯ এবং প্রকাশসাল ১৯৮১। রচনাকালের দশকগত অভিন্নতার বিবেচনায়, স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, তাঁর পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই উভয় কাব্যগ্রন্থের রচনাসমূহেই তাঁর মানসিকতার একই বিশেষ দিকের এবং একই অভিন্ন ধরনের প্রকাশ ঘটেবে। আর, আসলে ঘটেছেও তা-ই। 'শুধু রাতের শব্দ নয়'-এর কবিতাগুলির মতো এই গ্রন্থস্থ কবিতাগুলিতেও সেই ক্ষয়-গ্রস্ত দশকের জীবনবাস্তবতার সব ক'টি দিক্ই—আশা ও নৈরাশ্য, আনন্দ ও বিষাদ, বিশ্বাস ও বিশ্বাসচ্যুতি, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি সুনিপুণভাবে উন্মোচিত হয়েছে; কিন্তু তবু, তাঁরই একটি চকিত উক্তি—কবিতার বিবর্তন-বিষয়ক—আমাদিগকে যেমন জানায়, 'এই ছোট্টো গাছটি যেমন, তার ছায়ার মধ্য দিয়ে যাবার আগের ও পরের একই মানুষ কি একটু বদলে যায় না?'—তেমনই তাঁর এই দু'টি গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যেও, একই দশকে রচিত হওয়া সত্ত্বেও, পার্থক্যের স্পর্শ কি আদৌ লাগেনি, বিভিন্ন-তার মেজাজ কি একেবারেই ফোটেনি? পুরোপুরি অস্বীকার করিনা, করা যায় না, কেননা তা হ'লে সত্যের অপলাপ ঘটে।

কিন্তু কোন্ দিকে ছড়িয়েছে সেই বিভিন্নতার শিকড় আর কোন্ দিক থেকেই-বা বয়েছে সেই পার্থক্যের বাতাস? সত্য বটে, কাব্যগ্রন্থ দু'টির নিবিষ্ট পাঠ থেকে কোনো-কোনো পাঠক-পাঠিকার এমন মনে হ'তে পারে যে গ্রন্থ দু'টিতে কবির কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন আদপেই তফাৎযোগ্য নয়। আগেরটির মতো পরেরটিতেও তিনি ঠিক একইভাবে অনবদ্য গদ্য-লীরিসিজমের আশ্রয়ে, মৃদু স্বগতোক্তিতে, জীবনানন্দের ভাষায়, 'জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা' নিজের সঙ্গে নিজেই কথা ব'লে চলেছেন, কখনো-বা আপনজনের সঙ্গে কথা বলার অন্তরঙ্গতায় ভুলে যাচ্ছেন নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা—একেবারেই উদাসীনের মতো, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না, এবং এই আত্মবিলোপী প্রক্রিয়াতেই আত্মগত সুখ-দুঃখকে ক'রে তুলেছেন দেশ-কালগত সুখ-দুঃখ। তাঁদের এই মনে হওয়াটা যে সত্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু গ্রন্থ দু'টির মিল এই পর্যন্তই এবং এই মিলও সাধারণ বিবেচনার, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের নয়। পার্থক্য সূচীত হয়েছে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে এবং তার মর্মান্তিকতার মাত্রা বৃদ্ধিতে। অভিজ্ঞতারও তো রকমফের আছে, আছে তারও স্তরভেদ। 'শুধু রাতের শব্দ নয়'-এ যে-অভিজ্ঞতায় তিনি ক্লিষ্ট ছিলেন, তার মর্মান্তিকতা সংশয়াতীত, কিন্তু তবু মাঝে-মাঝে মনে হয়, কোথায় যেন একটু ওপরটান থেকে গিয়েছিলো, যে-কারণে সেই অভিজ্ঞতার উন্মোচনের অন্তরঙ্গ রীতিতে এক ধরনের চাপা আবেগের তাপ স্পষ্টত অনুভূত হ'লেও সেই গ্রন্থের কবিতাগুলির কিছুসংখ্যক কখনো-কখনো নিছক স্কেচের স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে, পূর্ণাঙ্গ পেইন্টিং-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, হ'তে পারেনি। হৃদয়ের রম্যকল্পনা সেগুলিতে যত স্পষ্ট, মস্তিষ্কের সংকল্পনা তত নয়। সেই সীমাবদ্ধতার সীমা তিনি অতিক্রম করলেন 'প্রথম পলি শেষ পাথর'-এর

কবিতাসমূহে। এই কবিতাগুলিরও উপজীব্য একই দশকের অভিজ্ঞতা, তারই বিচিত্র টানা-পোড়েন। কিন্তু যেহেতু সেই অভিজ্ঞতা আর ওপরটানের ব্যাপার নয়, তার মূল কবির অস্তিত্বের গভীর পর্যন্ত চারিয়ে গিয়েছে, ঢুকে পড়েছে তাঁর ভাবনার আনাচে-কানাচে, অতএব তার ভারও তাঁর অনুভূতিতে আগের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। অভিজ্ঞতার সেই বোঝা বইতে তাঁর কি খুবই অসুবিধে হয়েছে, তার গুরুভারে তিনি কি অত্যন্তই ন্যুব্জ বোধ করেছেন? সম্ভবত তা-ই। কেননা, গ্রন্থটির একেবারে প্রথম কবিতাটিতেই উচ্চারিত রয়েছে এতদ্সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন এবং সেটির কবিকল্পিত উত্তর—'কিন্তু কে আমার ভর নেবে? গদ্য? তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়। দেখেছি ডাকাডাকিতে সে বেশ সাড়া দেয়। তার প্রশ্রয়ে এক-এক সময়, কী যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চল্কে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ের ভেতরে প্রক্ষালিত হ'তে থাকে।' ('পুরোনো নতুনের টানে গদ্যপদ্য')। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, পদ্যের মতো নিখাদ শব্দশিল্পে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভারকে আর বহন (অর্থাৎ প্রকাশ) করতে পারছেন না; তাই গদ্যকে ডাকার কথা ভাবছেন। আশ্চর্যরকমের সময়গত যোগাযোগের ব্যাপার, প্রায় কাকতালীয়ের মতোই, যখন তিনি অভিজ্ঞতার প্রকাশ-মাধ্যম সম্পর্কে উপলব্ধির এমন শিখরে উপনীত, তখনই, সেই দশকেই রচিত (১৯৭৪-৭৫) ও প্রকাশিত (১৯৭৯) হয়েছে তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'শিকড় যদি চেনা যায়', যেটিতে তিনি গদ্যকে 'স্বচ্ছন্দে' ডেকে এনে তাঁর কাঁধে নিজের অভিজ্ঞতার গুরুভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে কবির পরিক্রমা-পথটি দীর্ঘ—'প্রথম পলি' থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে 'শেষ পাথর' পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রন্থটির পেলবতাপূর্ণ কাব্যিক কোনো নামকরণ স্বচ্ছন্দে ও স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গিয়ে গদ্যের দিকে একটু সরিয়ে-নেয়া নামকরণটি থেকেই অনুমান করি (কেননা, যে-কোনো গ্রন্থের নামকরণকেও আমি সেই গ্রন্থের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবেই বিবেচনা করি), অভিজ্ঞতার নরম পলি ক্রমে-ক্রমে সঞ্চিত হ'তে-হ'তে কী-ক'রে শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার শক্ত পাথরে পরিণত হ'য়ে যায়, সেই জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ-সন্ধানই এই গ্রন্থে কবির মূল লক্ষ্য। কিন্তু এটা মাত্র আমারই ব্যক্তিগত অনুমানের বিষয় থাকে না, হ'য়ে ওঠে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদেরও অভিনিবেশের ব্যাপার, যখন কবির সহযাত্রী হ'য়ে তাঁর লক্ষ্যপথে এগোতে-এগোতে দেখা যায়, সেই পথ কেবল দীর্ঘই নয়, তা একই সঙ্গে যেমন জটিল তেমন বিচিত্রও। সেই পথে বহু বাঁক, বাঁকে-বাঁকে বহু ঝরনা, ঝরনার মুখে-মুখে পাথর, পাথরের গায়ে স্মৃতির পুরোনো ছোপ। এমন পথেই তাঁর মতো দুরন্ত পথিকের যাত্রা, আর এমন পথে যেতে-যেতেই পথের দু'পাশ থেকে তিনি তুলে নিয়েছেন অভিজ্ঞতার যত নুড়ি ও পাথর। পথরেখার দৈর্ঘ্যও যেমন বেড়েছে, তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটিও পথের সঞ্চয়ে-সঞ্চয়ে তেমনই উপচীয়মান হ'য়ে পড়েছে। সেই অভিজ্ঞতার কত রূপ, কত মর্মান্তিক তার অনুভূতি! আঁধার রাতের একলা পথিকের মতো তিনি ক্রমাগত

ব'লে চলেছেন তাঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। যে-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনু-ভূতিতে তিনি বলেন—'মাটি কাঠ জলের গণ্ডি মানুষের গণ্ডি বেঁকে জড়িয়ে ছড়িয়ে মুচড়ে আমাকে নিয়ে খুব নক্সা বানায়' ('গণ্ডি') বা 'মাটি বড়ো স্নেহময়ী চাদ্দিকে দুধের ফুল ফুটিয়ে দুধের ফল ফলিয়ে তাকে সাজিয়েছে মধ্যিখানে সে আহামরি কী শিল্পময় হয়ে আছে' ('দৃশ্য') অথবা 'আমি গাছ ফল ফুল ঘাসের ভিজে গন্ধ পেছনে রেখে এগোব। সময় আর বেশি নেই' ('নিরুদ্দেশের মাঝখানে'), সময়ের শত্রুতায় সেই প্রকৃতির সঙ্গেই তাঁর ঘ'টে যায় চূড়ান্ত বিচ্ছেদ—'আবার এক অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসল।' ('আবার এক অস্থিরতা'), 'আমি স্থির হতে পারছি না আমার পায়ের তলায় মাটি কেবলই কাঁপছে।' ('মাটি কেবলই কাঁপছে'), 'সমস্ত হেমন্ত শীত ক্রমে-ক্রমে হিমাঙ্ক নামিয়ে / কঠিন তুষারে মুড়ে ভালবাসা রেখে দেয় ঠান্ডার ভাঁড়ারে' ('সাত সমুদ্র পার হয়ে')। এমনকি সেই বিরস বিবর্ণ সময়ের গর্ভোৎসারিত পাথর ও নির্ঝরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্তিকাজননীর শস্যপ্রসবিনী শক্তিতেও তিনি যেন আর তেমন আস্থা রাখতে পারছেন না ঃ

> তবে কি তার পায়ের কাছে
> ফাঁদের মাটি ছিল ?
> সে ছেলেমানুষের মতো
> সেখানে ভর দিতে গিয়েছিল ?
> তাহলে ফসল এবার লোপাট হবে,
> আমাদের সামনে নিশ্চয় আকাল।
> ('ফসল ঘন হয়ে উঠলে')

অথচ এই ফসলের সম্ভাবনাই একসময় তাঁর কাছে ছিলো জীবনের প্রত্যাশার পরি-পূর্ণতার প্রতীক।

কিন্তু সময় কবির সামনে শুধু ফসলের আকালকেই তুলে ধরেনি, তাঁর কাছে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদকেও সূচীত করেছে। তিনি যতই বলুন, 'এখন সহজে বুঝি / আমি, এই আমি এক সীমায় পৌঁছেছি' ('অপেক্ষায়'), আমরা ঠিকই বুঝি, বুঝে ফেলি, এটা নিছকই তাঁর আত্মসান্ত্বনা (self-consolation)। আসলে সেই সময়ের কোনো প্রান্তের সঙ্গেই নিজেকে তিনি পুরোপুরি মেলাতে পারছিলেন না। আর, পারছিলেন না ব'লেই গভীর এক নৈঃসঙ্গ্য ও একাকিত্ব তাঁকে ঘিরে রেখেছে, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকেও বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে। ফলে, যে-সময়ের বৈরিতায় তিনি বিপন্ন, সেই সময়ের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে এককভাবে, যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ লাভের পথটিও তাঁকে খুঁজতে হয়েছে একা একাই। কারো-কারো কাছে এটা হয়তো তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানেরই পরিণাম। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের মূলে তাঁর অনুভূতির সততা এবং উপলব্ধির স্বচ্ছতারও একটা অনস্বীকার্য ভূমিকা ছিলো বৈকি। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের বোধই ধীরে-ধীরে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে

নৈরাশ্যের অন্ধকারে, যেখানে তাঁর পরিচিতি জনকেও তিনি ঠিকমতো চিনতে পারছেন না—'যে এসেছে সে খুব আপনার লোক / অথচ সে আপাদমস্তক অস্পষ্ট রয়েছে' ('যে এসেছে')। 'এই কয়েকটা ছত্র' কবিতায় সেই অনুভূতি আরো মর্মান্তিক। 'এই কয়েকটা ছত্র বন্ধুদের মনে করে' তিনি লিখেছেন ; তিনি 'তাদের আবার দেখা পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল।' কিন্তু তাদের হদিশ কোথায় ? কবির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সেতুটি সময় দানবীয় হাতুড়ীর আঘাতে একেবারেই বিচূর্ণ ক'রে ফেলেছে। তাই কবির বিমূঢ় অনুভূতি—'কোন্ দিক্ দিয়ে তারা এসেছিল, কোন্ দিকে আমি গিয়েছি।' স্পষ্টতই বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘ'টে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কবির এই বন্ধুরা কারা ? কাদের বিচ্ছেদে তিনি কাতরতা প্রকাশ করেছেন ? এরাই কি তারা, কবির কাছে একদিন যাদের পরিচিতি ছিলো 'রক্তের দোসর'রূপে ? তা-ই যদি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তো স্বীকার করতেই হয় যে এটা সেই সময়কার ছিন্নমস্তা রাজনীতি ও তার গভীর সঙ্কট থেকেই সৃষ্ট। কিন্তু আমরা মাত্র অনুমানই করতে পারি, সুনিশ্চিতরূপে এ-সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি না, কেননা কবিতাটিতে তেমন কোনো সূত্রের (Clue) উল্লেখ নেই।

এই বিমূঢ়তাই আবার তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে কতকগুলি প্রশ্ন, গভীর, সময়ের নাড়ীস্পর্শী—'শুরু আর শেষ কোথায় ?' ('পুরোনো নতুনের টানে গদ্যপদ্য'), 'তাহলে কি প্রশ্ন আর দিক্ ঠিক করার নয় ? এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে যাওয়ার ?' ('এই কয়েকটা ছত্র'), 'মা তোমার মুখ কোথায় ধরেছো / সে কি খরার রাত ?' ('আলো থেকে বেরিয়ে'), 'আমি নেমে চলি নিশুত পাতালে। / আমার নাগাল কোনো শিকড় কি পাবে না ?' ('যদিও কোথায়'), 'সময়ের হাতে কিছু ডালপালা ধুলো / নড়াচড়া করে, তাকে অস্থিরতা বলে না কি ?' ('শেষ গাড়ি ছেড়ে গেলে') ইত্যাদি আবার কোনো উপলব্ধি রহস্যের ছোঁয়া-লাগা—'কোথায় ভিতর আর কোথায় দাঁড়ালে বলি বাইরে আছি / এ রহস্য আমাকে প্রবল নাড়িয়েছে' ('চওড়া চওড়া রাস্তায়'), কোনো-কোনোটি প্রেমের প্রগাঢ়তায় অবলীন ঃ

১.

ফিরতিপথে দেখছি তুমি দাঁড়িয়ে আছো। তোমার আঁচল জলো হাওয়ায় ভিজে উঠেছে তোমার শরীর দুলছে তোমার মুখ ঢেউয়ের বরণ। আমার দিনগুলো সব তুমি উছ্‌লে তুলছো। তোমার দিকে তাকিয়ে শুনছি কলকল নৌকোর ছলাচ্ছলাৎ।

('আমার একটা মজা গাঙ')

২.

... ... আকাশের আয়নায় তোমার মুখ। যেদিকে তাকাই তোমারই মুখ।...আমার সম্বলের মধ্যে তো এই একটা হৃৎপিণ্ড। তাকে জল নক্ষত্র পাতার সঙ্গী ক'রে রাখি, তোমার প্রতিধ্বনি তুলবার জন্যে তাকে প্রস্তুত

করি।...আমি হয়তো তোমার কাছেই এসে গিয়েছি। কাছে, কিন্তু অগ্নিবলয়ের এপারে।

('অগ্নিবলয়ের এপারে')

এতদিন কবির মনের জগতে ছিলো স্মৃতির রাজত্ব—'তখন চোখ উঠিয়ে দেখিনি, ওঠানো সম্ভব হয়নি স্মৃতির এমন রাজত্ব ছিল।' ('এখন ভাবনা')। এবার তিনি বেরিয়ে এলেন স্মৃতির গহনতা এড়িয়ে দৃশ্যের উন্মুক্ত রাজ্যে—যদিও এ-ক্ষেত্রেও নিজের সংশয় থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তিনি দ্বিধান্বিত প্রশ্ন রেখেছেন, 'মানবিক চোখের মুগ্ধতা / সহজে কি আনতে পারা যায় ?' ('অন্য এক হাত') ; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও তো বলতে পেরেছেন, 'আমার এ চোখ দুটো টলটল সরোবর হয়ে যায়, তাতে কত ছবি !' ('পরম আশ্রয়ে'), 'দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে যাই' ('শেষ গাড়ি ছেড়ে গেলে')। কিন্তু কোন্ সেই ছবি, যা দেখতে-দেখতে তিনি অন্ধ হ'য়ে যান ? তা কি শুধুই সেই শকুন-সময়ের পক্ষবিধুননকম্পিত অন্ধকারে ভরা, না কি তাতে নব-জীবনের আলোরও সংকেত রয়েছে ? একজন আন্তরিক কবি, যিনি খুলে রেখেছেন তাঁর মনের ও চোখের সব ক'টি দরজা-জানালা, তাঁর পক্ষে দু'টোই সত্য হ'তে পারে এবং সমান-ভাবে। সেইজন্যই এই গ্রন্থে তাঁর চোখে দু'ধরনের দৃশ্যই উন্মোচিত—তিনি 'দৌড়তে দৌড়তে মজা গাঙের ধারে' পৌঁছোন, 'কাঠের সাঁকোটার ওপর উঠে' যান ('পারাপার') আর দ্যাখেন 'গোরুর গাড়িতে একটা লম্ফ দুলতে দুলতে / রাতের ভিতরে ঢুকল', ('পুরোনো নতুনের টানে গদ্যপদ্য'), লক্ষ্য করেন, 'মেয়েরা স্তনের ডৌলে গরীব মমতা নিয়ে ব'সে পড়ে' ('নিশ্চল রয়েছো') এবং তাঁর নজরে পড়ে :

> উঠোনটা ছাপাছাপি, সামনে দেদার
> সাদা নীল হলদে তারা,
> দীর্ঘ বীথি ডাক দেয়, সীমান্তের জল
> নাচে পানিতরাসের কাঠে। ('অন্তরাল একটু সরলে')।

অন্যবিধ ছবিও তাঁর নজরে পড়েছে এবং অনিবার্যভাবেই, যেহেতু তা-ও ছিলো সেই অনীশ সময়েরই গর্ভ-সম্ভূত। সেই দেখাটা অবশ্য অনুভূতির দেখা, উপলব্ধির, চর্ম-চক্ষুর নয়, মর্মচক্ষুর। সেই অনুভূতির দেখায়, 'সোজা বাঁকা সব রেখাই ঝল্সে যায় / সব রেখাই রক্তে ডোবে' ('কি ক'রে আগ্‌লাব আমি'), সেই উপলব্ধির দৃষ্টিতে :

...আমি যে জিনিষেই হাত দিতে যাই, আমার আঙুল বেয়ে টপটপ রক্ত। আমি হন্যে হয়ে খুঁজছি কোথায় এই গাদার নিচে বাসি পাতার একটু রস রয়েছে যদি পাহারাদারের অজান্তে নিঙড়ে নেওয়া যায় হায় বিশল্যকরণী, যদি আমার নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের কাছে ওই সব নিশ্বাস বইয়ে রাখা যায় হায় বিশল্যকরণী। আমি খুঁজছি খুঁজছি।

('রাস্তায় দুই সার দোকানের...')

এই খোঁজা, জীবনের মূল উৎসের, এই গ্রন্থেও তাঁর সমাপ্ত হয়নি—যেজন্য পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে খুঁজতে খুঁজতে আরো অনেক দূর পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয়েছে।

'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' অরুণ মিত্রের সপ্তম, আপাত-সর্বশেষ এবং অ্যাকাডেমী পুরস্কার (১৯৮৭) প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির ৮৬টি কবিতা তিনটি অংশে—'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর'-এ ৫৯টি, 'কামিলার দিনরাত'-এ ১০টি এবং 'প্রদর্শনী'-তে ১৭টি—বিন্যস্ত। এই বিন্যাস কালানুক্রমিক কিনা, জানা যায় না; কেননা, গ্রন্থটির কোথাও এই কবিতাগুলির রচনাকালের কোনো উল্লেখ নেই।

এই কাব্যগ্রন্থটিতে অরুণ মিত্র তাঁর দীর্ঘ যাত্রাপথের অন্তে উপনীত হয়েছেন। যাত্রা-পথই তো বলবো, কবিতার যাত্রাপথ—বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে যার মাইলস্টোনগুলি পর-পর চিহ্নিত। সেই পাথরে 'ঝর্ণার ছোপ' আমাদের চোখে পড়ে, সেই পাথর থেকে ঝর্ণার 'গুঞ্জন' আমাদের কানে ভেসে আসে। আমরা সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকি। কবি নিজেও আত্মমুগ্ধতার বশে বারে-বারে ফিরে-ফিরে দেখেছেন, উৎসের দিকে এগোতে-এগোতে, তাঁর কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো স্মৃতিময় নানা ফলক—সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণরঞ্জিত আদিগন্ত প্রান্তর, লাঙলে-বিদীর্ণ-করা মাটির চাঙর, শিকড়-বাকড়সহ উন্মূলিত একটা গাছ, ঝরনার উৎসরোধী বিশাল একটা পাথর এবং সেই পাথরেরই অনুষঙ্গে অনিবার্য হ'য়ে-ওঠা একটা কলগুঞ্জরিত ঝরনা। আর, সেই সঙ্গে জনজীবনের নানা নক্সা, লোকজৈবনিক বহু আঁকিবুঁকি তাঁর কবিতার শরীরে তো আগাগোড়াই বিদ্যমান। তবু এই নৈসর্গিক দিক্‌গুলিই, মানুষজনকেও ছাপিয়ে, একটি বিশেষ দিকের বিবেচনায়, তাঁর কবিতায় সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বের। কেননা, এগুলিরই সমাহৃতিতে, কখনো বৈরিতায় কখনো সখ্যতায়, নির্মিত হয়েছে তাঁর কবিতার চালচিত্র—যে-চালচিত্রে সংস্থাপিত ক'রেই গ্রন্থ-পরম্পরায় তিনি সমগ্র মানবিক পরিস্থিতি বা the human situation-এর সাধারণ পর্যালোচনা করেছেন। ফলে, নিসর্গ প্রেক্ষিতটিকে বাদ দিয়ে তাঁর মানব-বীক্ষণের মূল সূত্রগুলিকে বোঝার প্রয়াস প্রায় ক্ষেত্রেই বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হ'তে বাধ্য। অথচ যদি আমরা তাঁর কবিতার এই নিসর্গ-আশ্রয়ের কথা পূর্ণত স্মরণে রেখে সেই কবিতার ভিতরে প্রবেশ করতে যাই, তা'হলে দেখবো সেগুলির রসোপলব্ধির পথের সমস্ত বাধাই একে-একে অপসৃত হ'য়ে যায়, উপলব্ধির হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে আমাদের মন উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

আবার নিসর্গের এই বহুধাবিস্তৃত, যেনবা-সজীব-যেনবা-সপ্রাণ উপাদানগুলিকে নিয়েই তিনি তিলে-তিলে গ'ড়ে তুলেছেন তাঁর প্রতীকের ঘনবদ্ধ (compact) জগৎ। তাঁর প্রতীকের বৈশিষ্ট্য এখানটায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি নিবিড় অনুষঙ্গ-বাহী। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অনুষঙ্গে আলো এবং অন্ধকার, মৃত্তিকার অনুষঙ্গে প্রাণদ শক্তি, উন্মূলিত বৃক্ষের অনুষঙ্গে সার্বিক ধ্বস্তদশা, পাথরের অনুষঙ্গে ঝরনা এবং ঝরনার অনুষঙ্গে পাথর—এই ব্যাপারগুলি তাঁর কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই যে ঘটে যায়, একের-

পর-এক যে ঘটতে থাকে, আমার ধারণা, সেটা কোনো সচেতন নান্দনিক পরীক্ষামনস্কতা থেকে নয়, তা জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত সহজাত আবেগ ও ঔৎসুক্যকে বস্তুনিষ্ঠ-রূপে প্রকাশ করার আন্তর-তাড়না বা inner impulse-এরই ফল। তাঁর আটপৌরে প্রতীকগুলি জলজ্যান্ত জীবনের হাত থেকে তুলে-নেয়া ব'লেই ব্যঞ্জনায় সেগুলি দূর-প্রসারী। 'পোল পার হওয়ার সময়' ('মঞ্চের বাইরে মাটিতে') কবিতায় যখন আমরা পড়ি, 'তোমার মুখ পদ্মের মতো ফুটছে' কিংবা 'এই যে গ্রীষ্মের' ('প্রথম পলি শেষ পাথর') কবিতায় তিনি যখন শান্তকন্ঠে উচ্চারণ করেন, 'ঘর ভাঙা হল, চালচুলো গেরোস্তালি / সূর্যের বল্লমে গাঁথা হয়ে যায়' অথবা তাঁর এই সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এ পৌঁছেও সময়ের সংকটের কথা জানাতে গিয়ে একটি কবিতায় যখন তিনি এই ব'লে আমাদিগকে সচেতন করতে চান, 'ওই দ্যাখো সঙ্কেত কখন থেকেই উঠে আছে', তখন আমরা সহজেই বুঝি, বুঝতে পারি যে প্রতীকাশ্রিত এই বাক্যবন্ধ-গুলিরও নিহিতার্থ এগুলির বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে আরো বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়ে পড়েছে—'পদ্ম' হ'য়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় পুষ্পের প্রতীক, 'সূর্যের বল্লম' পরিণত হয়েছে মৃত্যুর প্রতীকে আর 'সঙ্কেতে'র উঠে থাকার ব্যাপ্তি ঘটেছে ভবিতব্য-ভারাতুরতার গম্ভীর প্রতীকে।

'খুঁজতে-খুঁজতে এত দূর'-এ অরুণ মিত্র শুধু তাঁর যাত্রাপথের সীমান্তেই উপনীত নন, কাব্যগত বিভিন্ন দিকের বিবেচনাতেও যেন ঈষৎ অবসন্ন। তাঁর উদ্দীপনার স্রোতে ভাটার আভাস তিনি যেন আর গোপন করতে পারছেন না কিছুতেই। অবশ্য তেমন কোনো চেষ্টাও তিনি করেন নি, কেননা সহজকে সহজভাবে গ্রহণ করাই তাঁর কবি-স্বভাব ; অনিবার্যের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। ব্যাপারটির অন্য একটি দিক্‌ও আছে—অন্তত অরুণ মিত্রের ক্ষেত্রে। আমরা আগেই দেখেছি, তাঁর 'যাত্রাশুরু চলা' এবং তাঁর কাব্যপ্রগতির মধ্যের সম্পর্কটি আড়াআড়ি নয়, সমান্তরাল। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই একটিতে অবসান ঘনিয়ে এলে অন্যটিতেও সমাপ্তির সংকেত সূচীত হ'য়ে ওঠা অযৌক্তিক কিছু নয়। বস্তুত, ভিতরে-ভিতরে তিনি যে ক্রমেই নিঃশেষিত হ'য়ে আসছিলেন, শূন্যতার শিকারে পরিণত হচ্ছিলেন, সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন-তাই তাঁকে প্ররোচিত করেছে সেই শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হ'তে—'তখন থেকেই শুরু হয়েছে লড়াই /···শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই।' ('শূন্যতার বিরুদ্ধে')। শূন্যতা যে আছে, তা কবির পক্ষেও অনস্বীকার্য ; আর, তা আছে ব'লেই তো তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্ন ওঠে। তবু এই সঙ্গে এ-কথাটাও মনে না-রাখলেই নয় যে, শূন্যতার বিরুদ্ধে সেই সংগ্রামে শূন্যতাকে তিনি হয়তো পরাজিত করতে পারেন নি, কিন্তু শূন্যতার কাছে তিনিও পরাজয় স্বীকার করেন নি শেষ পর্যন্ত। আর, তাই যদি না-হ'তো, তাহ'লে এই গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় এমন জীবন-সম্পৃক্ত পংক্তি একাদি-ক্রমে তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতে থাকতাম কিনা, সেটাও ভেবে দেখার মতো বিষয়ে পরিণত হয়—

১.

বাংলার আপন মাটি প্রাণবীজে অন্ধকার ভ'রে রাখে / সমস্ত সুষমা সমস্ত করুণা সব শৌর্য ধরে রাখে, / কখনো খরায় পোড়ে, কখনো বা বাণে ডোবে / কখনো যে রক্তে রক্তময় / তবু ভরসার আশার এলাকা গ'ড়ে চলে, / কবেকার ধ্যান কর্ম গাঁথা থাকে দিন আর রাত্রির ধারায়··· ···। ('প্রতিমূর্তি')

২.

মনে মনে আমার আঁচ করা ছিল / সমস্ত লাবণ্য শব্দেই ছেঁকে তোলা যাবে / সেইজন্যে জোগাড় করেছিলাম বিস্তর ঃ / ঢেঁকিশালে পাড় দিচ্ছে পা / ঘরে ফেরার বাঁশি বাজছে / উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক বেলেহাঁস / ঠোঁট খুলে হাসছে মালতী / এবং এই ওই আরো। ('সবই ভণ্ডুল')

৩.

আমি হাওয়া থেকে রস টানছি, হাওয়া থেকে। মাটি নেই জল নেই
বুক নেই মুখ নেই, না নেই। এ কেমন ছোঁয়া আমি একদিন দেখাব,
দেখাবই। পৃথিবীটাকে আমি ঘুরিয়ে নেব ওই আধখানা ফালির ওপর।
তুমি, ভোঁ বাজার সময়কার শিশির ঝাঁ ঝাঁ বারোটা একটার শ্যাওলা,
ভরসন্ধের মাঠে বৃষ্টি পড়ছে আর হাওয়া হাওয়া এই হাওয়া!
('এই হাওয়া')

ছন্দকুশলী হ'য়েও প্রথাপ্রচলিত পদ্যছন্দ ছেড়ে তিনি গদ্যছন্দে চ'লে এসেছিলেন 'প্রান্তরেখা'র পরে-পরেই। তারপর থেকে সেই গদ্যের ছন্দকে বা ছন্দের গদ্যকে নানা-ভাবে ভেঙেচুরে তাতে নানা রূপ-বদল ঘটিয়েছেন তিনি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে তাঁর গদ্যের সেই রূপ-বদলের নানা নজীর রয়েছে। এটিতে তিনি অবলম্বন করেছেন এমন এক বাক্‌রীতি, বাক্যের গঠনকৌশল, যাতে যতিচিহ্নের নিয়ম-ভাঙা সেই ব্যাকরণশূন্য অবাধ গদ্যে কখনো-বা জেগে উঠেছে পদ্যের ধ্বনি আবার কখনো বা বেজে চলেছে সঙ্গীতের সুর। কবিতার সঙ্গে সঙ্গীত মিশে গেলে কোন্ শিল্পরূপের সৃষ্টি হয়, তার একটি সুন্দর উদাহরণ 'দুই ঠাট' রচনাটি। অবশ্য অন্য বহুবিধের মতো, মনে হয়, এটাও তাঁর পক্ষে একটা পরীক্ষা। স্বল্পসংখ্যক তৎসম শব্দের সঙ্গে বহুসংখ্যক দেশজ ও লৌকিক শব্দের যবনী মিশেলের এই মিশ্ররীতিতে তাঁর সাফল্য সন্দেহাতীত, তবু এই গ্রন্থের 'প্রদর্শনী' অংশের কবিতাগুলির কোনো-কোনোটিতে (যেমন 'সাপের পাঁচালি', 'এ এক রাজা,' 'নাটকীয়' বা 'খেলা'), এই সাফল্যের বিপরীত কোটিতে ভাবের তুলনায় ভঙ্গিই যেন প্রধান হ'য়ে উঠেছে। অন্য একটি কবিতাতেও যখন তিনি সম্ভবত কোনো পাঠক বা পাঠিকাকে লক্ষ্য ক'রে বলেন ঃ

কবিতায় কথা বলি তা নাকি তক্ষুনি হয়ে যায়
অলঙ্কার। তবে এই অলঙ্কারই পরো। /···পরো, প'রে দ্যাখো।
('অলঙ্কার')

তখনো, মনে হয়, যেন এক ভঙ্গিসর্বস্ব কবিতার খেলায় মেতে উঠেই নিজেকে তিনি সময়ের হাতে সমর্পণ করতে চাইছেন।

এই গ্রন্থের আরেকটি অংশ 'কামিলার দিনরাত'। এই অংশে একটি রহস্যময় চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে : কামিলা। মাত্র দশটি ক্ষুদ্রাবয়ব কবিতায় কবি উন্মোচন করেছেন তার স্বরূপ এবং এই উন্মোচন-প্রসঙ্গেই নির্ণীত হয়েছে তার সঙ্গে কবির সম্পর্কের প্রকৃতি। কিন্তু কে এই কামিলা, আর কেনই-বা তাকে নিয়ে কবির এই কবিতাপ্রয়াস? দুটি প্রশ্নেরই উত্তর বিধৃত রয়েছে কবিতা দশটিতে। 'কে এই কামিলা ?'—আমাদের এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কবির দ্বিধাহীন উচ্চারণ, 'একটা গোটা মানুষ এই কামিলা এই আমি।' ('জানিনা কত কাছে')। অর্থাৎ, কামিলা-চরিত্রে পরিপূর্ণ মানবিক সত্তা আরোপিত এবং কামিলার সঙ্গে কবির ব্যক্তিসত্তাগত (personal) সমস্ত পার্থক্যই অস্বীকৃত। 'এই কামিলা এই আমি' পংক্তিখণ্ডে কামিলার সঙ্গে কবির আত্ম-অভেদের প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কিন্তু মাত্র ইঙ্গিতের মাধ্যমেই নয়, আরো খোলাখুলিভাবেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন কামিলার সঙ্গে তাঁর দ্বৈততাহীন সম্পর্কের কথা :

১.

আমি ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে আছি
আমার কামিলার রাত্তিরে। ('ওই কোন্ নক্ষত্রের')

২.

আমি অগুন্তি মানুষের মধ্যে ঘুরছি
আর চব্বিশ ঘন্টার তাপ আমার গায়ে লাগছে
আমার কামিলার তাপ। ('এত সব চিনিয়েছিল')

৩.

সারা জীবন আমি ছোট ছোট কথা বলেছি।
এবং তা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি কামিলার আকাশ।
('আবার কথা খুঁজতে হবে')

এই হচ্ছে কামিলা, কবির দ্বিতীয় সত্তা—আর, এমনই হচ্ছে তার সঙ্গে কবির অদ্বৈত-সম্পর্ক-কবুল-করা সব উচ্চারণ। কিন্তু কামিলার প্রতি কবির এই আকর্ষণের কী কারণ? কামিলা কি কবিকে কোনো তীর্ণ দশায় উপনীত করিয়েছে অথবা করিয়ে থাকলে কোন্ অর্থে? এইসব প্রশ্নেরও উত্তর কবি দিয়েছেন এবং নির্দ্বিধচিত্তেই। কামিলা কবিকে কোনো তীর্ণ দশায় উপনীত করায় নি বটে, কিন্তু তাঁকে চিনিয়েছে, দেখিয়েছে এবং শুনিয়েছে অনেককিছু—ক্ষয়ের সমূহ রূপ, ইতিহাসের ভেতর দিয়ে বহে-যাওয়া জীবনের স্রোত, অস্তিত্বের নিগূঢ় রহস্যের গোপন উৎস :

১.

আমাকে এত সব চিনিয়েছিল কামিলা ঃ
সময় রক্তস্রোত আরম্ভের পথ
ইস্পাতফলায় সুফলা মাটি আর মৃত্যু, ('এতসব চিনিয়েছিল')

২.

কামিলা তো আমাকে দেখিয়েছিল সবুজ পাতা
বুক পেতে শুনিয়েছিল ঝর্নার হাজার ধারা।
('ফটিকজল চিৎকারে')

কিন্তু কবির জীবনে কামিলার অবদান (শেক্সপীয়্যারের জীবনে 'ডার্ক লেডি' বা কৃষ্ণা রমণীর ভূমিকার মতোই) স্মরণীয় হ'য়ে আছে এত সব কারণেও নয়, তা স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে অন্যবিধ একটিমাত্র কারণে—কামিলাই কবির চোখের সামনে তুলে ধরেছে তাঁর প্রজন্মের কালপ্রতিমার নিরাভরণ মূর্তিটিকে ঃ

আমি টের পাচ্ছি হাড় ভাঙছে কল্‌জে ছিঁড়ছে
আর মেশিনের জোড়দাঁত খুলছে বন্ধ হচ্ছে
ঠিক আমার সামনে।
এ হল কামিলার সময়
আমাকে উপহার দেওয়া আমার নেওয়া।
('কামিলার সময়ের ভিতরে')

কামিলারূপী এই সময়ই হচ্ছে কবি অরুণ মিত্রের সেই দ্বিতীয় হৃৎপিন্ড, যার ওপর হাত রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন…শেষ পর্যন্ত…অব্যাহত গতিতে ॥

মৌলিন্য ('originality' শব্দের রবীন্দ্র-উদ্ভাবিত বাংলা সমনাম)-সম্পৃক্ত কবি-মাত্রেরই অন্যতম সামান্য লক্ষণ চিরাচরিত ও অভ্যস্ত, পাঠকরুচিকে পরিতৃপ্ত না করা। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের খ্যাতকীর্তি বাঙালী কবি সমর সেনও তাঁর কবিপ্রতিভার মৌলিন্যের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কবিতায় প্রচলিত পাঠকরুচিকে পরিতৃপ্ত করেন নি; বরং, বিপরীতক্রমে, গভীর আন্তরিকতায় চেষ্টা করেছেন কালরুচির প্রাতিকূল্যে তাঁর কবিতাকে প্রবাহিত ক'রে শ্লথ পাঠকচৈতনাকে জাগ্রত করতে, যুগের বাস্তবতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে। সেই কারণেই তাঁর কবিজীবনের একেবারে প্রথম থেকেই তিনি অন্বেষণ করেছেন তেমন এক আঙ্গিক-প্রকরণ (technique), যা, জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত তাঁর একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা-অনুভূতির সঙ্গে পারস্পরিক সহ-সম্বন্ধে সংযুক্ত (objectively co-related)। এবং সেই সঙ্গে, আত্মবিজ্ঞাপনের প্রলোভনে নয়, পাঠকের সঙ্গে আত্মবিনিময়ের প্রয়োজনেই, 'তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' নিয়ে 'দুঃসহ' আঠারো বছর বয়সের পরম-পরিণত-অথচ-সদাযুবক সমর সেন কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েই ভাষাঘটিত যে অসুবিধার কবলে পড়েছিলেন, তা থেকে এটাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তৎকালীন কবিতার প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক ভাষা তাঁর প্রথম যৌবনের প্রাতিস্বিক অনুভূতি ধারণের ও আবেগ বহনের পরিপন্থী। কিন্তু নিজের কবিতার জন্য মাত্র অভিনব আঙ্গিকের অন্বেষণেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন নি কিংবা শুধু নূতন ধরনের ভাষার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিতেই তিনি ক্ষান্ত হন নি; অধিকন্তু, যা তাঁর পক্ষে আরো অনেক বড়ো কৃতিত্বের, সেই আঙ্গিক নির্মাণে এবং সেই ভাষা আবিষ্কারে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এবং সেই সাফল্যের মাত্রা তাঁর বয়সের স্বল্পতার অনুপাতে এতই বেশি ছিলো, যে-কারণে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও খুব অসঙ্গত ঠেকে না যে কবিজীবনের প্রারম্ভেই তিনি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন সমাপ্তির পরিণতি ও সম্পূর্ণতা। আর, এই সিদ্ধান্ত নেহাৎই অনুমান-প্রসূতও নয়, এর ভিত্তি বাস্তবতার গভীরে। কেননা, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬—অর্থাৎ তাঁর আঠারো থেকে তিরিশ বৎসর বয়স—পর্যন্ত একযুগব্যাপ্ত কবিজীবনে, তাঁর সমগ্র কবিতার নিবিষ্ট পাঠ থেকেই প্রতিভাত হয়, সামাজিক চেতনার গভীর থেকে গভীরতর প্রতিফলন ভিন্ন, তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষাগত বিশেষ কোনো 'বিবর্তন' নেই। 'বিবর্তন' নেই, মানে, শুধু যে পরিবর্তন নেই, তা-ই নয়; প্রগতিও নেই। কবি হিসেবে অল্প বয়সেই তাঁর অকালপরিণতি এবং তারই অনিবার্য পরিণামস্বরূপ তাঁর কবিতায় প্রগতিহীনতার প্রগতি (progress of lack of progress) সাধারণভাবে তাঁর সমগ্র

কবিজীবনের পক্ষে 'সু' অথবা 'কু' কোন্ ফল প্রসব করেছিলো কিংবা তাঁর সংক্ষিপ্ত কবিজীবনের অকাল ও আকস্মিক ইতিরচনায় কোন্ অর্থে বা কতটুকু দায়ী ছিলো অথবা আদপেই দায়ী ছিলো কিনা—এ-সমস্ত কূট বিতর্কের বিবেচনা, এখানে নয়, এই আলোচনারই অন্যত্র আমরা সম্ভব হ'লে করবো। আপাতত আমরা শুধু স্মরণ করবো বিদগ্ধ ধূর্জটিপ্রসাদের সেই বিতর্কমূলক মন্তব্য, যা সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৩ই জুন তারিখের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত হ'য়ে সমর সেনের কবিতার পাঠক-পাঠিকা মহলকে যুগপৎ আশা ও নিরাশায় আন্দোলিত করেছিলো। সমর সেনের কবিতায় তাঁর গদ্যের নিজস্ব ছন্দের প্রবহমানতার সন্ধান পেয়েও এবং ভাবের অভিনবত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সেই আলোচনায় সমর সেনকে কবি হিসেবে মাত্র আধুনিকই বলতে চেয়েছিলেন, 'প্রগতিশীল' শিরোপা দিতে চান নি। সন্দেহ নেই, সমর সেনের কবিতায় প্রত্যাশিত প্রগতির অপ্রত্যাশিত অবিদ্যমানতাই সমর সেন সম্পর্কে ধূর্জটি-প্রসাদকে এবম্বিধ মন্তব্যকরণে প্ররোচিত করেছিলো সেদিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও, সমর সেনের কবিতায়, '…শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।' কিন্তু এ-প্রসঙ্গও আপাতত মুলতবী রেখে আমরা বরং সমর সেনের পক্ষে 'এতই অভিনব এক' আঙ্গিক ও ভাষাসমন্বিত কাব্যকৌশল 'যার উৎস খুঁজতে যাওয়া'ও 'নিরর্থক', অবলম্বন করা কবিতা রচনাকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রাথমিক (এবং প্রধানতম) শর্ত হ'য়ে উঠেছিলো কেন, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে নিরত হবো। এটা খুবই জরুরী এবং এই আলোচনার এই প্রাথমিক পর্যায়েই, কেননা এই প্রশ্নের উত্তরটিই সমর সেন-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশের চাবিকাঠি এবং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার ওপরেই নির্ভরশীল তাঁর কবিতার সঠিক মূল্যায়ন।

আগেই দেখেছি, কবি হিসেবে সমর সেনের আবির্ভাবকাল-প্রচলিত কাব্যরীতি (আঙ্গিক ও ভাষা) তাঁর কাছে সর্বৈথ অগ্রহণীয় ব'লে মনে হয়েছিলো, যেহেতু সেই কাব্যরীতিকে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বাহনরূপে যথেষ্ট যোগ্য মনে হয়নি তাঁর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কী-ইবা সেই অভিজ্ঞতা আর কেমন-ইবা তাঁর সেই অনুভূতি, যার বিশ্বস্ত প্রকাশে তদানীন্তন কাব্যরীতি তাঁর বিবেচনায় ছিলো অনেকাংশেই অপারগ? অথবা এই প্রশ্নটির গভীরেই নিহিত গভীরতর প্রশ্নটি: কী বা কেমন ছিলো সেই পারিবারিক পরিবেশ এবং সামাজিক পারিপার্শ্ব, যা তাঁকে উপহার দিয়েছিলো তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ডালা, তাঁর নিবিড় অনুভূতির মালা? অর্থাৎ, তাঁর মনো-জৈবিক সংগঠন (psycho-somatic disposition)-এর উপাদানসমূহের সন্ধান নেয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন কবি হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশের পটভূমিকাটির সন্ধানী বিশ্লেষণ।

সমর সেনের কবিমানস প্রত্যক্ষত তাঁর পারিবারিক, সামাজিক ও স্বদেশীয় রাজনৈতিক এবং পরোক্ষত য়োরোপীয় সাহিত্যিক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রভাবের সমন্বিত রূপ। এই বিষম প্রভাবপুঞ্জের নিরন্তর সংঘাতের সংঘট্টেই গ'ড়ে উঠেছে তাঁর

কবিমনের বিশেষ গড়নটি, নির্মিত হয়েছে তাঁর কাব্যব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট কাঠামোটি। সেই কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে সেই বিশেষ গড়নের মনের বিচ্ছুরক (prism)-এর সাহায্যে তিনি বিশ্লিষ্ট করেছেন তাঁর চতুষ্পার্শ্বকে, তাঁর সমকালীন সমাজ এবং সেই সমাজের অঙ্গীভূত সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে,—এমনকি নিসর্গপ্রসৃষ্টি ও প্রেমকেও—যদিও নিপুণ বিশ্লেষণের অন্তেও ভাবনা-চিন্তাগত কোনো সুমিত সংশ্লেষণে তিনি নিজেও উপনীত হ'তে পারেন নি, আমাদিগকেও উপনীত করাতে পারেন নি।

'গৃহস্থবিলাপ' কবিতায় সমর সেন তাঁর নিজের ও তাঁর বংশের পরিচয় আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন ঃ

> শুনেছি পঞ্জিকা মতে
> শুভক্ষণে জন্ম অভাগার,
> ... ...
> সপ্তম সন্তান আমি ;
> ... ...
> আমাদের বংশে
> গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।
> রক্তে তাঁর কিছু ছিল পদ্মার উদ্দাম বেগ,
> সাক্ষী তাঁর ষোড়শ সন্তান !
> গুজব আছে যে গৃহত্যাগকালে
> দেবী তাঁকে স্বপ্নে বর দেন ঃ
> দুধেভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।
> সুতরাং
> সবুজ চশমা চোখে আমরণ ছিল,
> সে সবুজ আদি ভিটের জমিজমার,
> কিছু বা আপন পৌরুষের।

এই কাব্যায়িত বংশ-পরিচিতি থেকে আমরা জানতে পারি যে কবির পিতামহ (স্বনামধন্য দীনেশচন্দ্র সেন) পদ্মাপারের (ঢাকা জেলার) কোনো গ্রাম থেকে প্রথম শহরে (কলকাতায়) আসেন, তাঁর সন্তান-সংখ্যা ষোড়শ এবং তিনি ছিলেন তেজস্বী ও সম্পন্ন গৃহস্থ। এ-হেন বংশের সন্তান সমর সেনের জন্ম মহানগরী কলকাতায়, গঙ্গাতীরস্থ বাগবাজারে, ১৯১৬ সালে। ১৯১৬ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত জীবনের প্রথম ষোলোটি বৎসর তাঁর কাটে বাগবাজারেই, ১৯৩২-এর শেষ থেকে ১৯৩৯-এর শুরু পর্যন্ত ছ'/সাত বৎসর বেহালার গ্রামীণ পরিবেশে, পিতামহের উদ্যানবাটিতে, এরপর কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে সাময়িকভাবে অধ্যাপনাকালে কিছুদিন বালিগঞ্জে, ১৯৪০-এর অক্টোবর থেকে সর্বশেষ কবিতাটির রচনার দিন পর্যন্ত দীর্ঘকাল দিল্লীতে, প্রবাসে,

এবং অবশেষে, অবসন্ন জীবনের গোধূলিবেলায়, পাখির নীড়ে ফেরার মতো, আবার, তাঁর ভাষায়, 'লপেটা চালে'র বালিগঞ্জে, ১৫সি সুইন্‌হো স্ট্রীটের একতলায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাতেও সবিশেষ কৃতবিদ্য সমর সেনের পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতা ছিলো বিবিধ ও বিচিত্র। অধ্যাপনায়, 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের যুগ্ম-সম্পাদনায়, দিল্লীতে রেডিওর অতিব্যস্ততার ও অতিদায়িত্বের কাজে, সুদূর মস্কোয় সাহিত্যের অনুবাদকের ভূমিকায়, ইংরেজি ও বাংলা একাধিক দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় দায়িত্বগ্রহণে এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে সৃষ্ট ও পরিচালিত কয়েকটি স্বল্পায়ু পত্র-পত্রিকার—যেগুলির মধ্যে 'Frontier' এবং 'Now'-এর নাম উল্লেখ না করলেই নয়—সুষ্ঠু সম্পাদনায় তাঁর জীবিকা-জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিলো সমৃদ্ধ।

তাঁর সাধারণ জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জনের আরেক উৎস ছিলো অনেক ক'টি ভাই-বোন সমন্বিত তাঁদের বৃহৎ পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিশীলিত পরিবেশ ও রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিমণ্ডল। তাঁর পিতা, প্রধানত পিতামহের উৎসাহে-উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের একদা-ছাত্র, অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন, মুখ্যত ছিলেন সংস্কৃতি ও রাজনীতি-জগতের বাসিন্দা। আত্মীয়-পরিজনের নিয়মিত যাতায়াত এবং সাময়িক আতিথ্যগ্রহণ ছাড়াও তাঁর অমায়িকতার আকর্ষণে সেই সংসারে তাঁর বন্ধুস্থানীয় অনেকেরই আগমন ছিলো অবাধ। এঁরা সকলেই ছিলেন সাধারণ অর্থে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনায় ভাবিত এবং এঁদের কেউই কবিত্বের ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন না, অথবা নাবালক সমর সেনের মনের শরীরে সেই দৈব ও দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ সংক্রামিতও করেন নি। কিন্তু বিভিন্ন মেজাজ-মার্জির, বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এইসব গুণীজনের সমবেত আলাপ-আলোচনায় ও সম্মিলিত হাস্য-পরিহাসে বালক সমরের মনের আকাশ যে অনেকখানি অবারিত হয়েছিলো, তাঁর তদানীন্তন সামান্য অভিজ্ঞতার সীমিত ভাণ্ডারে অন্তত কিছু খুচরো অঙ্কও যে জমা পড়েছিলো, তাতে আর সন্দেহপোষণের সুযোগ কোথায়? অরুণচন্দ্রের বন্ধুদের মাত্র দু'জনের কথা এখানে অতি-সংক্ষেপে নিবেদন করি। এঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন জনৈক অ্যামেরিকান, শান্তিনিকেতনবাসী উইলিয়ম অ্যালেন; দ্বিতীয় জনও অ্যামেরিকা-প্রত্যাগত, জনৈক বাঙালী, তাঁর বাল্যবান্ধব ব্রহ্মবিহারী সরকার। লেখাপড়ায় সমর সেনের উৎসাহদাতা এবং সাহিত্যকর্মে (স্বল্পখ্যাত Van Loon-এর স্বল্পজ্ঞাত গ্রন্থ 'Ancient Man'-এর বাংলা তর্জমা ক'রে) তাঁর অর্থোপার্জনের প্রথম সুযোগ-সৃষ্টিকারী অ্যালেন ছিলেন পোশাকে-আহারে ষোলো আনা বাঙালী, প্রেমে-প্রণয়ে ষোলো আনা বেপরোয়া এবং তৎসংক্রান্ত ভয়ে-বিপদে ষোলো আনা পলায়নপর। অপরপক্ষে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ব্রহ্মবিহারী সরকার। যথার্থই তিনি ব্রহ্মে বিহার করতেন কি না, তা জানা না-থাকলেও এটা জানা আছে যে শরীরচর্চাই ছিলো তাঁর জীবনের প্রথম এবং প্রধান বিহারক্ষেত্র। মুষ্টিযুদ্ধে, কুস্তিলড়ায়, লাঠিখেলায় ও সাঁতারকাটায় তিনি

ছিলেন পারদর্শী। এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে এইসব অকাবিশোভন বিদ্যায় কিশোর সমর সেনের হাতেখড়ি হয়েছিলো। প্রেমের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একেবারেই অন্য ধরনের। স্ব-নির্বাচিত প্রেমপাত্রীকে সমাজ-অসিদ্ধ মতে বিবাহের মাধ্যমে প্রেমের গলায় বিজয়মাল্য পরিয়েছিলেন তিনি এবং যে-যুগে সমাজানুমোদিত বিবাহের গুরুভাগই বাস্তবত ছিলো হয় নির্লজ্জ ও নির্মম বৈশ্যতায়, নয় বিশুদ্ধ legalised prostitution-এ পর্যবসিত, সে-যুগে প্রেমজ বিবাহের এই মানবিক আদর্শ অনুসরণের মূল্য-স্বরূপ সর্বহারা হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু দিশাহারা হননি ; আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, তবু পরাজিত হননি। এই জ্বলন্ত আদর্শবাদ, আদর্শের জন্য এই নিঃশর্ত সর্বস্ব ত্যাগের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত থেকে সমর সেনের গ্রহীষ্ণু চিত্ত অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো নিশ্চয়।

অরুণচন্দ্রের মনের মাটিতে উপ্ত ছিলো রাজনীতির—বিশেষত মার্কসবাদের—বীজ। ফলে, যখন তিনি ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা, স্বাধীনোত্তর বাংলার বিপিন পাল (বাগ্মিতায়), বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার খালাসপ্রাপ্ত আসামী বিপ্লবী রাধারমণ মিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন, তখন স্বাভাবিক-ভাবেই সেই বীজ ধীরে-ধীরে অঙ্কুরিত এবং পরবর্তীকালে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। এই দু'জনের মতো সন্ত্রাসবাদীদেরও অবাধ গতায়াত ছিলো অরুণচন্দ্রের বাড়িতে। এঁদের আগমন এবং আলাপ-আলোচনাকে কেন্দ্র ক'রে সেই বাড়িতে গ'ড়ে উঠেছিলো এমন একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, যার মধ্যমণি ছিলেন স্বয়ং অরুণচন্দ্র। সন্ত্রাসবাদীদের মুখে মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জেলাশাসক কিংস্‌ফোর্ড হত্যায় অগ্নিকিশোর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ব্যর্থ প্রয়াস এবং এই ধরনের আরো জীবন-মৃত্যুকে-পায়ের-ভৃত্য-করা দুঃসাহসিক ক্রিয়া-কলাপের বিবরণ শুনতে-শুনতে পুত্র সমরের তরুণ মন নিশ্চিতই উত্তেজনার আগুন পোহাতো, পোহাতে-পোহাতে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠতো। আর, পিতা অরুণচন্দ্র, সন্ত্রাসবাদী তথ্যের বিশ্বস্ত ভাণ্ডারী রাধারমণ মিত্রের কাছ থেকে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের স্বাদ নিতে-নিতে প্রথমে উৎফুল্ল, পরে অভিভূত এবং অবশেষে দিশাহারা হ'য়ে পড়তেন। বস্তুত, শেষ পর্যন্ত তিনি হয়েছিলেনও তা-ই ; রাজনৈতিক নানা বিপ্রতীপ চিন্তা-ভাবনার সংঘাতে এবং বামপন্থী মতাদর্শের প্রায়োগিক বিরুদ্ধতার (pragmatic antonomy) অভিঘাতে মার্ক্সবাদচর্চার শেষদিকে খুবই বিভ্রান্তি-বিমূঢ়তায় তিনি তাঁর অবশিষ্ট দিন ক'টি কাটিয়ে গিয়েছেন।

সন্দেহ নেই, পিতার সাহচর্যেই মার্ক্সীয় রাজনীতির প্রতি সমর সেনের মানসিক সংরাগের সূচনা ; কিন্তু এ-কথাও সন্দেহের অতীত যে এই বিশেষ রাজনৈতিক মতা-দর্শের সামগ্রিক প্রয়োগসম্ভাব্যতা (pragmatic feasibility) এবং সামূহিক অভ্রান্ততা বিষয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত পোষিত তাঁর সংশয়-দোলায়িত মনোভাবটিও উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকেই পাওয়া। সেই মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে পিতার সঙ্গে

তাঁর মার্ক্সবাদ সম্পর্কে শুধু আলাপ-আলোচনাই হ'তো না, আলাপ-আলোচনা সময়ে-সময়ে তুমুল তর্কে-বিতর্কেও পরিণত হ'তো। স্বকীয় যুক্তির আয়ুধে পিতাকে তিনি আঘাত করতেন, আবার পিতার উত্তরের আঘাতে কখনো-বা নিজেও আহত হতেন। কিন্তু নিরস্ত্র হতেন না কিছুতেই এবং অবশ্যই বিতর্কের কোনো উপসংহারেও উপনীত হ'তে পারতেন না সহজে। অর্থাৎ, যে-দ্বান্দ্বিকতা (dialectics) মার্ক্সবাদের অন্যতম মূলসূত্র (অপরটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা historical materialism), তা যে তাঁর নির্ণীয়মান ব্যক্তিত্ব-কাঠামোর (personality-structure under formation) অঙ্গীভূত হ'য়ে যাচ্ছিলো ধীরে-ধীরে, তাকে যে তাঁর 'আত্মতা' (character-এর রবীন্দ্র-কৃত বাংলা প্রতিশব্দ) সাঙ্গীকৃত ক'রে নিচ্ছিলো মন্থর মানসিক প্রক্রিয়ায় (slow mental process), এখান থেকেই তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব—যদিও তার উৎস আরো আগে। বস্তুত, তাঁর মনের অঙ্গনে গ্রহণ-বর্জনের পালা-কীর্তন শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো তাঁর বালক-বয়সেই, যখন দীনেশচন্দ্রের মধ্যস্থতায় তাঁর পরিচয় ঘটেছিলো নজরুল ও জসীমউদ্দীনের সঙ্গে। যুদ্ধ-প্রত্যাগত নজরুলের কবিতায় বাল্য-কাঙ্ক্ষিত রোমাঞ্চের সন্ধান পেয়েছিলেন ব'লেই সেই বয়সেই তাঁকে তিনি অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জসীমউদ্দীনের জন্য তাঁর কোনো উষ্ণ অভ্যর্থনা ছিলো না। একইভাবে এবং সেই একই প্রক্রিয়ার প্রভাবে তিনি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন তাঁর পিতামহের আমলে অনুষ্ঠিত তাঁদের পারিবারিক প্রাত্যহিক সান্ধ্যানুষ্ঠান কীর্তনের প্রতি—যদিও পরম বৈষ্ণব গৌরদাস বাবাজীর এবং দ্বিজেন্দ্র-তনয় দিলীপকুমারের কীর্তনগানের আসরে একাধিকবার তিনি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন। পরবর্তীকালে কীর্তন সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে এই ভাষায়—'কীর্তন মন্দ লাগে না। কিন্তু কতক্ষণ ?···বড়ো বড়ো লোক, অনেক বুড়ো, কী ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেশাগ্রস্তের মতো মাথা দোলায়, মাঝে মাঝে অশ্রু-বিসর্জণ করে, বুদ্ধিলোকের পারে চলে যায়।' আবার গ্রহণের ও বর্জনের দ্বান্দ্বিকতায় তাঁর মধ্যে যে-স্বাতন্ত্র্যের সূচনা হয়েছিলো, যে-স্বকীয়তার উন্মেষ ঘটেছিলো, তারই সামর্থ্যে নিজেকে তিনি মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন তাঁর প্রভাবশালী পিতামহের এবং পিতামহের প্রভাবশালী পার্শ্বচরদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে। এ-কথা আদপেই অসত্য নয় যে পৌত্র সমর সেন পিতামহ দীনেশ সেনের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার এবং সামাজিক মানসিকতার উত্তরাধিকারকে নিজের জীবনচর্যা এবং কাব্যচর্চায় আদৌ বহন করেননি।

মার্ক্সবাদ-সম্পর্কিত মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে সমর সেন এ-পথের পথিক তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধবের মতো যান্ত্রিক (mechanistic) ও গোঁড়া (fanatic) ছিলেন না। অবশ্য এ-বিষয়ে যান্ত্রিক ও গোঁড়া হবার কোনো সম্ভাবনাই তাঁর ছিলো না। কেননা, আগেই বলেছি, মার্ক্সবাদে সর্বৈথ শুভদ শক্তির অস্তিত্ব তাঁর বিবেকী মানসিকতায় কখনোই সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। তদুপরি, তদানীন্তন ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে মার্ক্সবাদ মাত্র-আবির্ভূত। কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হিসেবে তখনো তা

শৈশবদশায়—যার পুষ্টিরসের জোগান আসতো সুদূর রাশিয়া থেকে। ভারতবর্ষীয় জনমানসে এই বৈদেশিক শিশুর পুনর্বাসন কোন্ পন্থায় সম্ভব, সে-সম্পর্কেও সেদিনের মার্ক্সবাদী নানা মুনির নানা মত ও নানা গোষ্ঠীর নানা পথ তাঁকে বিচলিত করেছে—এমন কি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কয়েকজনের ক্ষেত্রে এই নিয়ে মতান্তর মনান্তরে পরিণত হ'তেও তিনি দেখেছেন। এ-সমস্তই মার্ক্সবাদে অনড় আস্থা পোষণের পক্ষে তাঁর প্রতিবন্ধকতা করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মার্ক্সবাদে দুঃস্থিত হবার কথা কখনো তিনি ভাবেন নি, ভাবতে পারেন নি। ফলে, মার্ক্সবাদী সংসর্গে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ একটা মধ্যপন্থার অবলম্বনই তাঁর পক্ষে একমাত্র পন্থায় পরিণত হয়েছিলো। কবি হিসেবে পার্টিকে ভালোবেসে পার্টির হ'য়ে তিনি বিপ্লবী কবিতা লিখেছেন, সমর্থক হিসেবে পার্টিকে চাঁদা দিয়েছেন, কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে কোনোদিনই পার্টির সক্রিয় সদস্য হন নি ; সভা-সমিতিতে গিয়েছেন, নরম-গরম বক্তৃতাও শুনেছেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীসচেতনতার নিরুদ্ধতায় (inhibition of middle-class consciousness) সর্বহারা জনসমুদ্রের ঢেউয়ের তলায় আত্মবিলুপ্ত হ'তে সাহস পান নি। সত্যের সম্মানে, এ কালের উগ্র মার্ক্সগ্রস্ত বাঙালী কবিদের কাছে যতই অস্বস্তিকর ব'লে মনে হোক, এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, শেষ পর্যন্তও স্বঘোষিত 'মার্ক্সিস্ট' সমর সেন তাঁর জীবনে ও সৃষ্টিতে এই আত্মপ্রত্যয়েই সুস্থিত ছিলেন যে কোনো দলের অবস্থানই ব্যক্তির ঊর্ধ্ববর্তী নয়, কোনো 'ইজম্'ই 'ইনডিভিজুয়েল'-এর চেয়ে বড়ো নয়।

সমর সেনের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি করার ব্যাপারে তাঁর সময়কার বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির অবদানও বড়ো নগণ্য ছিলো না। ইদানীংকার বস্তাপচা 'প্রগতি সাহিত্য' কথাটা আমাদের সাহিত্যে মাত্র চালু হয়েছে তখন ; মার্ক্সীয় ফর্মুলায় সাহিত্যকে গণমুখী ক'রে তোলার অসাধ্য সাধনায় এবং সাহিত্যকে রাজনীতির দিনমজুরীতে নিযুক্ত করার অশুভ প্রয়াসে ত্রিশের দশকেই গ'ড়ে উঠেছিলো বামপন্থী সাহিত্যিক, শিল্পী এবং রাজনীতিকদের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট—গালভরা তথাকথিত 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ', পরবর্তীকালে যার অপভ্রংশ-রূপ শুধু 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'। হ্রস্বতর নামে রূপান্তরিত সেই শেষোক্ত সঙ্ঘটির সঙ্গে একদা আমিও যুক্ত ছিলাম। সেদিনের বহু প্রচারিত মার্ক্সবাদী লেখক, শিল্পী ও রাজনীতিকদের জগাখিচুরিতে গ'ড়ে-ওঠা সেই সঙ্ঘের উদ্যোগী পরিচালকদের মৃত্তিকাভিসারী একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন এ-দেশের বুকে গ'ড়ে তোলার শুভ বাসনা এবং পরিকল্পনা—দুই-ই হয়তো ছিলো, কিন্তু ছিলো না সেই বাসনা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য অধিকতর আবশ্যকীয় তৃতীয়টি, গণজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতিলব্ধ লোকায়তিক অভিজ্ঞতা। ফলে, গণবাদী সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির নামে যে-জড়বস্তুর নির্গমনকে তাঁরা সমস্বরে উৎসাহিত করতে থাকলেন, তাতে না ছিলো মৃত্তিকার ঘ্রাণ, না ছিলো মৃত্তিকার সন্তানদের জীবনের যথার্থ শরিক হবার জন্য অন্তরের টান। সমাজের অন্ত্যবাসী নরনারীরাই প্রাধান্য পেয়েছে সেদিনের সাহিত্যে, ঠিক ; কিন্তু কত-

টুকু? কতটুকু জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো তাদের জন্য? ঠিক ততটুকুই যতটুকু সেই সাহিত্যের রচনাকারদের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বৃত্তবন্ধ ছক (encircled pattern of middle-class mentality) তাঁদের ছেড়ে দিতে দিয়েছিলো। ফলে, গণসাহিত্যের আকাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণ চিত্রায়ণ (total picturisation)-এর পরিবর্তে নিতান্তই আংশিক বর্ণায়ন (partial colourisation)-এ সেই সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভুলিয়ে রাখা কি এতই সহজ, না তা আদৌ সম্ভব? কোনোটাই নয়। তিরিশের দশকের বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পরিকল্পিত উত্থানের শোচনীয় ব্যর্থতা এই আর্থ-সমাজতাত্ত্বিক (econo-sociological) সত্যকেই আরো একবার প্রমাণিত করেছে যে সংকীর্ণ বুর্জোয়া ভাবাবেগ (narrow bourgeois sentimentalism)-এর দ্বারা ব্যাপক সর্বহারা বিপ্লব (broad proletariat revolution) কোনোদিনই সম্পন্ন হবার নয়।

প্রগতি সাহিত্যের নামে সেই পাঠক-প্রতারণা, গণসাহিত্যিকের ছদ্মবেশে দলীয়তা-প্রচার, সমর সেনের সজাগ দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাঁর আত্মপ্রকাশকালীন বাংলার সাহিত্যিক আকাশের মসীলিপ্ত অবস্থাই তাঁর নজরে পড়েছে, আলোকোজ্জ্বল কোনো রূপ নয়। এতে তিনি বিষাদ বোধ করেছেন, হয়তো বিক্ষোভও। কিন্তু তাঁর সেই বিষাদ ও বিক্ষোভ থেকে এই মস্ত শিক্ষাটাও তিনি পেয়েছিলেন যে অর্ধসামন্ততান্ত্রিক (pseudo-feudal) সমাজের কালনিদ্রা ভাঙতে হ'লে, তাঁর ধৃতরাষ্ট্রিক অন্ধত্বের অবসান কামনা করলে শুধু সাহিত্যিক উদ্যোগই যথেষ্ট নয় (যেহেতু সাহিত্যের সামর্থ্য সীমিত), সেই সঙ্গে সার্বিক সামাজিক রূপান্তর (total social transformation) সাধনের মহাব্রতে অন্যান্য সামাজিক শক্তিকেও অংশভাক (partner) ক'রে নিতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। তাঁর সমকালের প্রগতি সাহিত্যের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে 'সাহিত্যিক বিপ্লব' হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা অথবা ভুঁইফোঁড় কোনো ব্যাপার নয়, সামাজিক সামগ্রিক অগ্রগতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়গ্রন্থিল; জনমানসে তীক্ষ্ন সামাজিক সচেতনতার জাগরণ ব্যতিরেকে সাহিত্যিক বিপ্লবে সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এবং এই বিবেকী তাড়নাও সেদিন তিনি তাঁর অন্তরে অনুভব করেছিলেন যে সাহিত্যকে সামাজিক চৈতন্য জাগরণে অনুঘটক (catalyst)-এর ভূমিকায় নিয়োজিত করতে হবে; কিন্তু সেই ভূমিকায় সাহিত্যকে নিযুক্ত করতে মার্ক্সবাদী অনুশাসনের অন্ধ আনুগত্য সর্বদা অথবা সর্বথা স্বীকার করতে চাননি তিনি। সেইজন্যই সমাজ-প্রগতির পরিপন্থী শক্তিসমূহকে সনাক্তকরণ এবং সেগুলির পশ্চাদমুখী টান (backward pull) সম্পর্কে সকলকে সচেতন ক'রে তোলার অভিপ্রায়ে নিজস্ব পন্থায় নিজস্ব (বিপ্লবী?) ধ্যান-ধারণাকে তিনি তাঁর কবিতায় বাণীমূর্ত করেছেন; মাধ্যমস্বরূপ বেছে নিয়েছেন, শ্লোগান-পন্থার বিকল্প হিসেবে, প্রখর বৈদগ্ধ্য, তীব্র ব্যঙ্গ, শাণিত বিদ্রূপ—অবশ্য তা-ও তাঁর নিজস্ব ধরনের।

তাঁর সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মতো তৎকালীন য়োরোপীয়

সাহিত্যের (বিশেষত ইংরেজি কবিতার) সাগ্রহ পঠন-পাঠনও সমর সেনের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলো। তখনকার ইংরেজি সাহিত্যের কাব্যিক আবহাওয়াটি কেমন ছিলো ? মহাযুদ্ধোত্তর অধঃপাতিত মূল্যবোধে বিপর্যস্ত জীবনের প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে সে-আবহাওয়া ছিলো বিলাপিত ও ভারী। গুরু পাউণ্ড, শিষ্য এলিয়ট এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী, আধুনিক ইংরেজী কাব্যের জ্যোতিষ্কপঞ্চক, অডেন-স্পেণ্ডার-ইশেরউড-ডে লুইস্-ম্যাকনীস্ ইত্যাদির কবিতায় সেই বিলাপ অনুরণিত, সেই ভার অনুভূত। তিরিশের যুগের ইংরেজি সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির বর্ণনা, তিরিশের যুগেরই বাঙালী সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—"ততদিনে ইংরেজি সাহিত্যে 'টোয়েনটিজ'-এর রঙিন দিন অস্তমান ; অল্ডস হক্সলি ও লিটন স্ট্রেচির ব্যঙ্গ, লরেন্সের সংরাগ, ভার্জিনিয়া উলফের অতি সূক্ষ্ম ভাবনা-জাল—এই সবের উপর দিয়ে পোড়ো জমির হিম-হাওয়া বইতে শুরু করেছে।" কিন্তু মাত্র পোড়ো জমি থেকে প্রবাহিত হিম-হাওয়ায় চতুর্দিক কম্পিতই হয়নি, উপচীত রক্তের জোয়ারে য়োরোপের দিগ্বিদিক্ প্লাবিতও হয়েছিলো সেদিন। প্রবীণতম Yeats-এর কবিতায় রয়েছে তারই মর্মান্তিক স্বীকৃতি ঃ

> The blood-deemed tide is loosened
> And everywhere
> The ceremony of Innocence is drowned.

উল্লিখিত কবিদের রচনা সমর সেন নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন, এঁদের কবিতাতেই য়োরোপের শোচনীয় শ্মশানসজ্জার সাক্ষ্য তিনি খুঁজেছিলেন—হয়তো অভিজ্ঞতার উপাদান সংগ্রহের গরজেই—এবং তা তিনি পেয়েও ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার, সেই প্রাপ্তি তাঁর কবিতায় বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলেনি, এঁদের কেউই, একমাত্র এলিয়ট ছাড়া, কবি হিসেবে তাঁকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেন নি। এবং তাঁর ওপর এলিয়টের প্রভাবেরও মাত্র একটিই দিক্—গদ্যছন্দ। সে-আলোচনা, পারে, যথাস্থানে করা হবে।

এই পর্যন্তই নানা উৎস থেকে সমর সেনের অভিজ্ঞতা অর্জনের নেপথ্য কাহিনী। এবার আমাদের বিবেচ্য, সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সংশ্লেষণের পরিণতিতে ও পরিণামে তাঁর মধ্যে বিশেষ যে-মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিলো, জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণের স্বতন্ত্র যে প্রেক্ষিতটি গ'ড়ে উঠেছিলো, তাঁর বৈশিষ্ট্য কী আর তাতে তাঁর নিজস্বতাই বা কোথায় ? অর্থাৎ, গড়চলতি কথায় যাকে আমরা ব'লে থাকি জীবনদৃষ্টি (view of life) বা জীবনদর্শন (philosophy of life), সমর সেনের ক্ষেত্রে তাঁর সেটির অনন্যতা কিসে, সেটি মৌলিক কোন্ বিবেচনায় ? এবং সেই সঙ্গে আরো দেখতে হবে, তাঁর কবিতায় তাঁর জীবনদৃষ্টির মৌলিকত্ব আদৌ প্রতিফলিত হয়েছে কিনা, অথবা হ'য়ে থাকলে কীভাবে এবং কতটুকু। বলা বাহুল্য, তাঁর কাব্যকৃতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ব্যতীত এ-সমস্ত বিষয়ের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কিংবা এ-সব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ—কোনোটাই সম্ভবপর নয়। অতএব এবার আমরা সেদিকেই মনোনিবদ্ধ হবো।

সমর সেনের জীবনদৃষ্টি বা জীবনদর্শন তাঁর সমাজদৃষ্টি বা সমাজদর্শনেরই নামান্তর এবং অবিকৃত প্রক্ষেপণ। কেননা সেই দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দুই সমাজ, মুখ্য উপজীব্যই সামাজিক শক্তির বিচিত্র প্রকাশ, তার নানা রূপ-রূপান্তর। মানুষের নানা আচার-আচরণে, রাজনীতির বর্তুল গতি-প্রকৃতিতে, নিসর্গের নিরাভরণ রূপ-সৌন্দর্যে—এমন কি প্রেমের প্রাণদ স্পর্শ-অনুভূতিতেও একই সামাজিক শক্তির অস্তিত্বকে তিনি অনুভব করেছেন, একই সামাজিক শক্তিকে তিনি প্রকাশিত হ'তে দেখেছেন। ফলে, মানুষ ও তার রাজনীতি, প্রকৃতি ও তাঁর রূপ এবং প্রেম ও তার প্রকাশ—ইত্যাদি সমস্ত কিছুই কবির সামগ্রিক সমাজ-ভাবনার বৃত্ত-বলয়িত, তাঁর জীবনদর্শনের পরিধি-অন্তর্ভূত। অর্থাৎ, সমাজের একই সত্তার বিবিধ প্রকাশকে (varied menifestation of the same spirit of society) তাঁর সমাজদর্শনে তিনি সমন্বিত করতে চেয়েছেন, তাঁর জীবনভাবনায় তিনি সংশ্লেষিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

কিন্তু সমর সেনের জীবনভাবনায় একই সমাজসত্তার বিভিন্ন প্রকাশের শুধু সংশ্লেষণপ্রয়াসই নয়, বিশ্লেষণপ্রবণতাও অতি স্পষ্ট—এবং সত্যি বলতে, সংশ্লেষণ অপেক্ষা বিশ্লেষণই বরং অধিকতর স্পষ্ট ও প্রবল। অবশ্য তাঁর পক্ষে সেটাই ছিলো স্বাভাবিক, কেননা কবি হিসেবে তিনি ছিলেন বিষ্ণু দে-র মতো সন্ধান-প্রয়াসী, সুধীন্দ্রনাথের মতো সিদ্ধান্তপ্রিয় নন। সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও তথ্যের সংশ্লেষণ (synthesis) আর সন্ধানের নিমিত্ত আবশ্যক ঠিক তার বিপরীতটি—অর্থাৎ, অচ্ছিন্ন ঘটনা ও তথ্যের বিশ্লেষণ (analysis)। সমর সেন তাঁর কবিতায় তাঁর সমকালীন সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন, মাত্র পর্যবেক্ষণ নয়। এবং অতি অনুপুঙ্খ সেই বিশ্লেষণ—সমাজ-বিশ্লেষণে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। সেই দৃষ্টির আলোক-ছটায় সমাজদেহের ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গগুলি তিনি উদ্ভাসিত করেছেন। নিপুণ ব্যবচ্ছেদকের মতো তিনি সমাজদেহকে ব্যবচ্ছিন্ন (dissected) করেছেন, তন্ন-তন্ন ক'রে কেটে দেখেছেন ব্যাধির বিস্তার কতদূর পর্যন্ত। কিন্তু ব্যাধিমুক্তির উপায় হিসেবে মার্ক্স-নির্দেশিত নির্মম পন্থায়—অর্থাৎ, যতখানি ব্যাধির বিস্তৃতি (ধনবাদের সম্প্রসারণ), তার সবটুকু শ্রেণী-সংগ্রামের ধারালো অস্ত্রে কেটে-ছেটে বাদ দিয়ে ভয়াবহ নিরাময় অর্জনে—কোনোদিনই তিনি অবিচলিতভাবে আস্থাশীল হ'তে পারেন নি। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এই নিজস্ব বিশ্বাসেই শেষাবধি তিনি সুস্থিত ছিলেন যে সমাজের রোগমুক্তি শ্রেণী-সংঘর্ষের সহিংস পথে নয়, সামাজিক চেতনার সামগ্রিক জাগরণের মাধ্যমেই সম্ভব। তাহ'লেও, অস্বীকারের উপায় নেই, শরৎচন্দ্রের মতোই, সামাজিক সমস্যার সমাধানের পথ-নির্দেশের চেয়ে সেই সমস্যার উন্মোচনের দিকেই তাঁর স্রষ্টাসত্তা অধিকতর নিবিষ্ট ছিলো।

কিন্তু কোন্ সমাজকে তাঁর কবিতায় তিনি ধ'রে রেখেছেন? কী তার স্বরূপ? সেই সমাজ তাঁর সমকালের, সেই সমাজ বাঙালী মধ্যবিত্তের এবং সেই সমাজ 'প্রধানত' শহরের। 'প্রধানত' শব্দটাকে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখার কারণ সমর সেন সম্পর্কে

একটি বহুপ্রচলিত ও বহুপ্রচারিত ভুলের সংশোধনের ইচ্ছা। তাঁর কবিতা-সম্পর্কিত একাধিক আলোচনায়—এমন কি তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপনেও—তাঁর সম্পর্কে যে-কথাটা বিশেষভাবে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে তিনি নগরজীবনের কবি, তাঁর 'কবিতার বিষয় নগর, নগরজীবনের ক্লান্তি, বিকার, বিক্ষোভ', 'নগরজীবনের সমগ্র সুরটি··· ধরা পড়েছে' তাঁর কবিতায়। খুবই সত্যি কথা ; তাঁর ও তাঁর কবিতা-সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি সত্য আর কী-ই বা বলা যেতে পারে ! কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে, এই সত্যও আংশিক, সামগ্রিক নয়। কেননা তাঁর মানসে শুধু শহরই নয়, গ্রামও সক্রিয় ছিলো ; তাঁর কবিতায় কেবল নগরের জীবনই নয়, গ্রামের জীবনও বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কবিতার নিবিষ্ট পাঠে আমরা নগরজীবনের সহস্র জটিলতার মতো গ্রামজীবনের সমস্ত আবিলতার সঙ্গেও সম্যকরূপে পরিচিত হই। তবু, সন্দেহ নেই, 'প্রধানত' তিনি শহুরে সমাজেরই কবি, যেহেতু তাঁর মনের গড়নটাই ছিলো বিশেষভাবে শহুরে।

সমর সেনের শহুরে সমাজ 'গ্রহণে'র ঘোর-লাগা, রাহুগ্রস্ত ; 'মীরজাফরী অতীত' আর 'মেকলের বিষবৃক্ষের ফল' এই সমাজের অধিবাসীরা। এই ক্লিন্ন ঐতিহ্যের ক্লিন্নতর দায়ভাগ বহন ক'রে বিড়ম্বিত অস্তিত্বের যে-গোলকধাঁধা তারা রচনা করেছে, সে বড়ো আশ্চর্য, সে বড়ো অদ্ভুত। সেখানে 'আসন্নপ্রসবা অন্ধকারে / খুরধার নখে মাটিতে অঙ্ক ক'ষে / কারা টাকা গোণে, আর কালো তাশ ভাঁজে ('শবযাত্রা'), 'মধ্যপদ ধীরে ধীরে লোপ পায়, / বণিকেরা প্রাকার বানায়, / দিনে দিনে চক্রবৃদ্ধি হারে / নিরন্ন বেকারের···সংখ্যা বাড়ে' ('নববর্ষে'র প্রস্তাব') ; সেখানকার কেউই 'পিঞ্জরিত সিংহ' নয়, 'কলে বিকল ইঁদুরের সঙ্গে' তাদের 'সম্ভবত সাদৃশ্য আরো বেশি' ('নানা কথা'), সকলেরই 'সত্তার গভীর নীলে কল্পনার পায়রা' ওড়ানো ('২২শে জুন') এবং 'প্রেম ও পলিটিক্সের বিচিত্র গতি' দেখে 'হৃদয় বিষাদে' ভরানো ('হৃসন্তিকা') অভ্যাস, 'অন্ধকারে অন্ধলোকের চলাচল, / বধির জনের সঙ্গে কথা বলা !' ('শবযাত্রা') অমোঘ নিয়তি। নিয়তির এই অমোঘতার বিরুদ্ধে এদের অজস্র অভিযোগ, অথচ আশ্চর্য, কোনো উত্থান নেই—উত্থানের সম্ভাবনাও সম্ভবত আর অবশিষ্ট নেই। অতএব তাদের পক্ষে বৃহত্তর জনজীবনের 'লোকায়ত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বিধুর / মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি' ('বিকলন') হ'তে অব্যাহতি লাভের সকল পথই অবরুদ্ধ, একমাত্র পলায়ন ছাড়া——'পলায়ন ছাড়া বেরোবার পথ জানা নেই' ('গ্রহণ')। কিন্তু, কবির মনে হয়েছে, 'মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাসে'র 'গ্রহণ'-লাগা রাহুগ্রস্ত দশা থেকে তাদের পক্ষে পলায়নও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কেননা যে-সমস্ত শহর ও নগরকে কেন্দ্র ক'রে মধ্যবিত্তের সমাজ আবর্তিত, সেই শহর ও নগরগুলিই আবিল আনন্দের দুর্মর আকর্ষণে তাদের টেনে রেখেছে আপন-আপন বৃত্তের পরিসরে। সেই অদৃশ্য দড়ির টান অগ্রাহ্য করা তাদের ক্ষমতার বাইরে,—যে-শহরে 'দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক' 'সদলবলে' গান গায়' ('মেঘদূত'), 'রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা' 'চোখ বোজে'

('মৃত্যু'), 'সকালে কলতলায় / ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে' ('একটি বেকার প্রেমিক'), 'নরম মাংসস্তূপে গভীর চিহ্ন এঁকে / নববর্ষের নাগর চলে' যায় ('কয়েকটি দিন') এবং 'পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ' ('বকধার্মিক'), 'গলিত দেহের উপরে গভীর রাত্রে ঘোরে / দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন' ('একটি বুদ্ধিজীবী), 'রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে···তন্দ্রা ভাঙে' ('একমাত্র তোমাকে সত্য ব'লে মানি'), 'কলেরা আর কলের বাঁশি আর গনোরিয়া আর বসন্ত / বন্যা আর দুর্ভিক্ষ'কে জীবনযাত্রার অঙ্গে পরিণত ক'রেও সেখানকার বাসিন্দরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ('নাগরিক') —সে-শহরের জীবন-গণিকার চৌম্বক হাতছানি এড়ানো তাদের সাধ্যের অতীত। অতএব সেই গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে মরাই তাদের বিধিলিপি।

সমর সেনের নাগরিক সমাজ-ভাবনার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে 'নাগরিক', 'একটি বুদ্ধিজীবী', 'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি' (বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র প্রথম সংস্করণে এই কবিতাটিরই নাম রয়েছে ইংরেজিতে—'For Thine is the kingdom'), 'বকধার্মিক', 'গ্রহণ', 'একটি বেকার প্রেমিক' এবং 'রোমন্থন' (বিশেষত '২' অংশ) কবিতায়—যদিও এগুলির মধ্যেও সেই ভাবনার প্রকাশের মাত্রাভেদ রয়েছে। তবু কোনোটিরই বিস্তারিত বিশেষণে না-গিয়ে এখানে সব ক'টি কবিতারই বিশ্লেষণ সংক্ষেপে সেরে নেয়া যেতে পারে।

সমর সেনের যৌবনকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালীর শহুরে সমাজ দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিলো—একটি বর্ণে কুলীন, বিত্তে অভিজাত এবং কৃতিত্বে মীরজাফরকল্প কিছু বুদ্ধিজীবী, বাণিজ্যজীবী ও রাজনীতিজীবী-সমন্বিত, আর অন্যটি আনুষ্ঠানিক ধর্মের সুনিপুণ ব্যবসায়ী ও ন্যাসরক্ষক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, পাণ্ডা-পুরোহিত এবং সমাজ-অভিভাবক-অধ্যুষিত। স্বভাবে-স্বার্থে এই দুই অংশের অধিবাসীরা ছিলো বিষম—প্রায় বিপরীত মেরুর অন্তর্গত। প্রথমোক্ত অংশের নরনারীদের চিন্তা-ভাবনার মুখ্য নিয়ন্ত্রক ছিলেন মার্ক্স এবং ফ্রয়েড। 'সমস্তই অর্থনৈতিক' এবং 'সব কিছুই যৌনতা-তাড়িত'—এই দুই মহামন্ত্র তখন তাদের জীবনের বীজমন্ত্রে পরিণত। কিন্তু তাদের জীবনের সঙ্গে তাদের জীবিকার ছিলো বিস্তর ব্যবধান ; মেকলে সাহেবের এই 'মর্কট'রা একদিকে যেমন ছিলো সামাজিক প্রগতির স্বপ্নতাড়িত, অন্যদিকে তেমনই ছিলো সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার অক্ষমতাজাত গ্লানিপীড়িত। ফলে, এক অনিবার্য আত্মদ্বন্দ্বের অসহায় শিকারে পরিণত হ'তে হয়েছিলো তাদের। এবং এই আত্মদ্বন্দ্বই ছিলো তাদের জীবনের সমূহ ট্র্যাজেডির মূল। 'নাগরিক' কবিতার 'বিবর্ণ দিন' আর 'আলকাতরার মতো রাত্রি'র বিমর্ষ পটভূমিকায় ঃ

> রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
> মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
> হাওয়ার চাবুক,
> আর ঝাপ্‌সাভাবে শুধু অনুভব করি
> চারদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চরণ।

—এই শঙ্কিত অনুভূতিতে এবং 'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি' কবিতার ঃ

…বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলি মানি,
দুর্গম দিন,
নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি,
তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি
ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না,

এই করুণ স্বীকারোক্তিতে সেই আত্মদ্বন্দ্বের স্বরূপ যেমন চকিতে আভাসিত, 'একটি বুদ্ধিজীবী' কবিতার ঃ

নিষ্ফল দিন কাটে ক্ষয়রুগীর কামার্ত প্রার্থনায় ;
তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলিঃ
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই ;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।

পংক্তি কতিপয়ে উচ্চারিত মর্মান্তিক খেদোক্তিতেও সেই ট্র্যাজেডির গভীরতা তেমনই স্পষ্টত উন্মোচিত।

'একটি বেকার প্রেমিক' একটি প্রতীকী কবিতা। কবিতাটির একমাত্র চরিত্র তেমন একজন যুবক, যে একই সঙ্গে বেকার এবং প্রেমিক। আসলে এই যুবকটি কবি নিজেই। কবিতাটিতে সমাজের নির্বিশেষ কোনো মানুষের কথা না-ব'লে একজন বিশেষ মানুষের —তাঁর নিজের—যৌবনকালীন জীবনের কথাই তিনি 'একটি বেকার প্রেমিকে'র জবানীতে আমাদের কাছে খুলে বলেছেন। এই অর্থে কবিতাটি আত্মজৈবনিক এবং এটির বক্তব্যউপস্থাপনারীতিটিও আত্মকথনমূলক। কিন্তু কবিতাটি মাত্র এই অর্থেই প্রতীকী নয় যে এটিতে একটি কর্মহীন ও প্রেমতাড়িত যুবকের জবানীতে কবি তাঁর নিজের কথা ব'লে চলেছেন ; এটি এই বিপরীত অর্থেও প্রতীকী যে যুবকটির মুখ দিয়ে নিজের কথা বলাবার মধ্য দিয়ে তিনি এই কবিতাটির রচনাকালীন (১৯৩৪-৩৭) আপামর শহুরে শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের প্রাত্যহিক দিনযাপনার কাহিনীকেই সাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। এই দিক্ থেকে দেখতে গেলে, সমর সেন মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত যে-সমাজের কবি, এই কবিতাটিতে সেই সমাজের (অংশবিশেষের হ'লেও) একটি ছবি ফুটে উঠেছে এবং ছবিটি রীতিমতো স্পষ্ট।

'একটি বেকার প্রেমিক' কবিতাটি দু'টি অংশে বিন্যস্ত না-হ'লেও দু'টি অংশে বিভক্ত করা চলে এটিকে। প্রথম অংশটি শহুরে জীবনের বিস্তারমান অন্ধকারের

আবরণে মোড়া—বেকার ও প্রেমিক যুবকটি দিনের-পর-দিন চোরাবাজারে ঘুরে বেড়ায়, সকালে কলতলায় ক্লান্ত গণিকাদের কোলাহল শোনে, রাত্রে খিদিরপুরের ডকে জাহাজের শব্দ তার কানে আসে, মাঝে-মাঝে কী-যেন ভাবে তার নিজেরই অজানা, তার নিদ্রাহীন রাত সিগারেট টেনে এবং কর্মহীন দিন 'ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক' দেখে কেটে যায়। এই ছবি অবশ্যই অন্ধকারের, একজন যুবকের দিনরাত্রি অতিবাহনের এই পরিচয় অবশ্যই অবসাদের। এই পর্যন্ত কবিতাটি অবসাদের ধূসরতাতেই সমাচ্ছন্ন। কিন্তু এই ধূসরতা কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা মাত্র এই যুবকটির একারই নয়, এই ধূসরতা কবির সমকালের সমগ্র সমাজেরই।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে এই অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই বলবো না, বরং বলবো এর অবসান, অন্তত কিছুটা হ'লেও, সূচীত হয়েছে, ফুটে উঠেছে আশাবাদের একটা ক্ষীণ রশ্মিরেখা। সমগ্র কবিতাটিতে যে-অনুভূতি কবির কাছে মুখ্য—'সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে/ বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।'—সেই অনুভূতি থেকে কবিতাটির এই অংশে তিনি অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সামগ্রিক কুশ্রীতা থেকে, তার প্রেমহীনতা থেকে, তার অন্ধকার ও অবক্ষয় থেকে—অর্থাৎ, এককথায়—পুরাতন পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়ে 'নতুন পৃথিবী'তে তিনি উত্তীর্ণ হ'তে চেয়েছেন। এই মুমুক্ষাই তাঁর চোখে নূতন একটা স্বপ্নের মায়াঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছে, এই মুমুক্ষাতেই এই পুরাতন পৃথিবীতে একটা 'নতুন পৃথিবী' গড়ার স্বপ্নে তিনি বিভোর হ'য়ে উঠেছেন এবং সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তোলার জন্য—'পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো / হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।'

সমর সেনকে আমরা সাধারণত বিষাদ-অবসাদের বা বিষণ্ণতা-বিবর্ণতার কবি হিসেবেই গণ্য করি; কিন্তু তাঁর সেই বিষাদ-বিষণ্ণতা নেতিবাদের সমার্থক নয়। আশার ভূমিকাও তাতে রয়েছে, রয়েছে স্বপ্নের স্ফুরণ। যুগের অবসাদকে নিজের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই অবসাদে নিজেকে তিনি অবসিত হ'তে দেননি। যুগের ধিক্কার অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতায় আত্মধিক্কারে পরিণত, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তা নৈরাশ্যবাদে পর্যবসিত নয়। আলোচ্য কবিতাটির শেষাংশে সেই নিদর্শনই বিদ্যমান।

'রোমন্থন' কবিতাটি সমর সেনের সমকালীন ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং অতীতের স্মৃতিচারণ। সেই বিবেচনায় কবিতাটির নামকরণ অতিশয় সার্থক। এই কবিতাটির সঠিক উপলব্ধির জন্য কবির 'নানাকথা' কাব্যগ্রন্থিকাটির আদ্যোপান্ত পাঠ বিশেষ সহায়ক; কেননা 'নানাকথা'র মূল সুরটিকে ধরতে না-পারলে 'রোমন্থন' কবিতাটির মর্মকথার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। 'নানাকথা'র নানা কবিতায় নানা কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে কবি একটাই মূল কথা ঘুরে-ফিরে উচ্চারণ করেছেন এবং সেই মূল কথাটি হচ্ছে, তদানীন্তন রাজনীতির শূন্যগর্ভ উন্মাদনা-সর্বস্বতা। এই রূঢ় সত্যের স্বীকৃতিই 'নানাকথা' গ্রন্থিকাটির মূল সুর।

সমগ্র 'রোমন্থন' কবিতাটিকে কবি '১' এবং '২'—এই দু'টি অংশে বিভক্ত ক'রে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিভাজনের প্রধান উদ্দেশ্য কবিতাটির দু'টি পর্যায়ের প্রতি এটির পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অবশ্য দু'টি পর্যায়ের উপজীব্যগত পার্থক্য নিজ থেকেই তাঁদের লক্ষ্যে পড়ার মতো। কবিতাটির প্রথম পর্যায় কবির আত্ম-জৈবনিক বিবরণ—তাঁর কৈশোরের সীমান্ত পেরিয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার বিচিত্র কাহিনী। এই পর্যায়ে কবিতাটিতে নানাবিষয়ক পর্যবেক্ষণের অনুপুঙ্খতা আছে। প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আইন ভাঙা, সন্ত্রাসবাদীদের সহিংস পন্থাগ্রহণ, বোমা-লাঠি-গুলির বেপরোয়া ব্যবহার, 'গণ-আন্দোলনের তত্ত্বকথা'—ইত্যাদি নানা বিষয়। এই পর্যায়েই আছে কবির কলেজে প্রবেশের এবং প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতার কথা। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে মোটেই প্রীতিপ্রদ হয়নি। 'তিনি মদনরাজত্ব থেকে বার কয়েক বিতাড়িত' হয়েছেন, 'নিরালা কোনো কেন্দ্রে / স্বচ্ছন্দ্যে যুগল জীবনযাত্রা'র স্বপ্নও তাঁর চুরমার হ'য়ে গিয়েছে। তিনি দেখেছেন, মিছিলে-স্লোগানে-আন্দোলনে আকাশ মুখর, ধর্মঘটী শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামে ও জমিদারবিরোধী জাগরণে বাতাস ভারী। স্বাভাবিকভাবেই সেই বিরূপ পরিস্থিতিতে নিজেকে তিনি অসহায় বোধ করেছেন; নিজেকে তাঁর মনে হয়েছে 'অসংখ্য নিরক্ষর দুঃস্থের দেশে / নিঃসম্বল পর্যটক মাত্র'। এইখান থেকেই কবিতাটির দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং কবিরও স্মৃতি-রোমন্থনের শুরু।

প্রথম পর্যায়ে তিনি যেমন কানা গরু, মরা মাঠ এবং শূন্য গোলাঘরের উল্লেখে সময়ের রিক্ততাকে কিছুটা এলিয়টি কৌশলে ব্যঞ্জিত করেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভেই তেমনই মাত্র তিনটি কথায় এলিয়টের ধরনে তদানীন্তন সময়ের শূন্যতার একটি চাক্ষুষ (visual) ছবিও এঁকেছেন তিনি ঃ 'শূন্যমাঠে স্তব্ধ দিন।' 'যতদূর চোখ যায়', তাঁর সামনে শুধু 'লৌহরেখা প্রসারিত / নির্বিকার অদৃষ্টরেখায়।' অর্থাৎ, অতীতের স্মৃতিচারণায় তাঁর কাছে অনুভূত হয়েছে যে অদৃষ্টের লৌহরেখার বন্ধনে তাঁর অস্তিত্ব সামগ্রিকভাবে আবদ্ধ এবং এর হাত থেকে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। অদৃষ্টের এই অমোঘতা হেতুই 'নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে' তাঁর—যদিও তাঁর 'বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ' এবং তাঁর 'পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোনা যায়'। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা মাত্র তাঁর একারই বিধিলিপি নয়. সমস্ত মধ্যবিত্ত সমাজই এই অবস্থার আগ্রাসন-কবলিত। তাঁর দৃষ্টিতে শহুরে সমাজের মধ্যবিত্ত অংশের আগাগোড়াই অকালজরাপীড়িত, অকালবার্ধক্যে পর্যুদস্ত।

কিন্তু এই অসহ্য পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কবিতাটিতে বিদ্রোহের একটা ধ্বনিও স্পষ্টত উচ্চারিত। কবিতাটির প্রথম পর্যায়ের 'কেন শেষ আমাদের দিন?'—এই প্রশ্নের উত্থাপনে এবং 'নির্বীর্য অহিংস ক্লীব নই।'—এই ঘোষণার স্পষ্টায়নে সেই বিদ্রোহই ধ্বনিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই বিদ্রোহও কবির একার নয়, এই বিদ্রোহ সমাজের সকলের—বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্তের। অর্থাৎ, ব্যক্তিমনে সমাজমনকে প্রতি-

ফলিত করার ক্ষমতা, যা সমর সেনের অন্যতম কাব্যবৈশিষ্ট্য, এই কবিতাটিতেও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

'বকধার্মিক' কবিতাটির মূল আলম্বন বাঙালী মধ্যবিত্তের শহুরে সমাজের দ্বিতীয়, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্মধ্বজীদের অপ্রতিহত প্রতাপ-পরিকীর্ণ, অংশটি। বাঙালী জাতি অতিশয় ধর্মপরায়ণ, এই জাতির দেব-দ্বিজে ভক্তির কথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুবিদিত। বাঙালীর এই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের তথা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহু মতের ও পথের সাধু-সন্ন্যাসী, পাণ্ডা-পুরোহিত এবং ব্রহ্মচারী-বাবারা এই সমাজের চৌহদ্দীর মধ্যেই গ'ড়ে তুলেছে আরেকটি সমাজ—যেখানে শ্রদ্ধার বদলে ভক্তির (অবশ্যই অন্ধ), যুক্তির স্থলে আবেগের, জিজ্ঞাসার পরিবর্তে আনুগত্যের এবং হরেক রকমের তাগা-তাবিজ, মন্ত্র-মাদুলী ও তুক-তাকের একছত্র আধিপত্য। প্রতাপে প্রায় অপ্রতিহত এবং সাধারণ জনমানসে জীবনাচরণের পদে-পদে প্রভু-ঈশ্বর-ভগবান ও অদৃষ্ট-নিয়তি-বিধিলিপি ইত্যাদির অস্তিত্বে বা কার্যকারিতায় বিচারবিবেচনাহীনভাবে বিশ্বাসী হ'য়ে ওঠার মতো একটি বাতাবরণ তৈরী করার ব্যাপারে রীতিমতো সফল হওয়া সত্ত্বেও কবির চোখে এই সমাজপতি-সমাজপিতাদের প্রতিটি আচরণই যে ভণ্ডামীতে ভরা, এরা সকলেই যে স্বভাবে-স্বরূপে ভণ্ড-কপট, 'বকধার্মিক' কবিতায়, কবিতাটির এই ব্যঙ্গ-বক্র নামকরণের মধ্য দিয়েই, সে-ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। অথচ এই 'বকধার্মিক'দের শাসনে-শোষণেই দেশের 'চারিধারে অদৃশ্য ধ্বংসের গ্লেসিয়ার', দেশের মানুষদের 'মন' 'নিজেরই গোলকধাঁধায় অবিরত ঘোরে'; অর্থাৎ, এদের আস্তিত্বিক দাপটে দেশ ও জাতির সামগ্রিক অগ্রগতিই ব্যাহত। এমনকি, এ-কথাও কবির মনে হয়েছে, এই 'বকধার্মিক'দেরই দৌরাত্ম্যে মঠ-মন্দিরের পরিখা-প্রাচীরে কালের অগ্রগতিও যেন বাধাপ্রাপ্ত। এদের বচনে ও কর্মে ঘোর অসঙ্গতি, বিতরিত উপদেশে বঞ্চনার প্রতিধ্বনি। সমাজমৃত্তিকায় দৃঢ়মূল এই বঞ্চনা-বৃক্ষকে কবি নানাভাবে পল্লবিত হ'তে দেখেছেন, কিন্তু তার স্বরূপ-উন্মোচনটি বড়োই বিদ্রূপ-শাণিত:

> সন্ধ্যায় ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
> দেবতারও চোখে অনিদ্রা আনে;
> পুজোর পচা ফলেফুলে পিচ্ছিল পথে
> রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
> হাঁকে জগদ্দল বৃষভ।

লক্ষ্যণীয়, কৃত্যকর্মের বিচারে 'রক্তচক্ষু পুরোহিত' কবির কাছে 'জগদ্দল বৃষভে'র সমপর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া,

> …শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে
> ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাব!—

উক্তিতেও এই 'বকধার্মিক'দের প্রতি নিক্ষিপ্ত কবির বিদ্রূপবাণ সমানভাবেই সূচীমুখ।

'গ্রহণ' সমর সেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতায় বুদ্ধিজীবী-ধর্মজীবী-

নির্বিশেষে সমগ্র মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের আন্তর-স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন কবি। 'গ্রহণ' নামটির মধ্যেই রয়েছে কবিতাটির আদ্যোপান্ত ভাবরূপের সুব্যাপ্ত ব্যঞ্জনা। এই ভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে রূপকের আশ্রয়ে। কবিতাটির আরম্ভে এবং সমাপ্তিতে যথাক্রমে 'মরা গঙ্গা' ও 'মরা সমুদ্রে'র রূপকের আড়ালে তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের ক্ষীয়মাণ মুমূর্ষু অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং কবিতাটিতে প্রলম্বিত 'গ্রহণে'র ছায়াটিও আসলে সেই সমাজের অধিবাসীদের আস্তিক্ষিক সার্বিক সংকটেরই রূপক। যে-সমাজকে সমর সেন তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়রূপে বেছে নিয়েছিলেন, সে-সমাজ প্রকৃতপক্ষে ছিলো বহুতর স্বার্থে তাড়িত এবং বহুতর শ্রেণীতে বিভক্ত একদার একাধিক সমাজের গলিত-মিলিত এক অদ্ভুত অব্যবস্থিত সমাজ। সেই সমাজের কাছে তার সদস্যরা তাদের বহুবিধ দাবি প্রতিনিয়তই উত্থাপন ক'রে চলেছিলো, অথচ সেই দাবি-সমূহের কোনোটিরই পূরণের কোনো ক্ষমতা সেই সমাজের ছিলো না। ফলে, অনিবার্যভাবেই সেই সমাজের ভিতে দেখা দিয়েছিলো বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম চিড় নয়, বড়ো-বড়ো ফাটল ; গড়ে উঠেছিলো সেই সমাজ ও তার বাসিন্দাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য এক ব্যবধান। সমাজবাসিন্দারা সেই ব্যবধান ঘোচাতে যে চায়নি, তা নয় ; বরং তা ঘোচাবার জন্য তারা ছিলো রীতিমতো ব্যগ্র। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী তারা ছিলো না। অতএব তখন তাদের অবস্থা হয়েছিলো 'ত্রিশঙ্কু' মদনের মতো 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ; অর্থাৎ, তখন তারা ঘাটেরও না, পারেরও না। তাদের তখনকার সেই দোলাচল অবস্থার অসহায়তা সহজেই অনুমেয়।

'গ্রহণ' কবিতায় সামাজিক যে-বিশৃঙ্খলার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, সে-বিশৃঙ্খলার মূল উৎস কিন্তু আরো অনেক দূরে—তদানীন্তন যুগমানসেরই—গভীরে নিহিত ছিলো। পাশ্চাত্য শিক্ষার ছিটেফোঁটা আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নিষ্ফল আত্মাভিমান, মার্ক্স সাহেবের সাম্যবাদী ও ফ্রয়েড সাহেবের মনোবিকলনী তত্ত্বের বিভ্রান্তিকর প্রতিক্রিয়া, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নাভিশ্বাস মুহূর্তের সুবর্ণ-সুযোগে আনুষ্ঠানিক ধর্মধ্বজীদের ক্রমাগত শক্তিসঞ্চয় এবং আনুষঙ্গিক আরো বহুবিধ হেতুপরম্পরার যৌথ অভিঘাতে তদানীন্তন সমাজজীবনের সর্বস্তরে দেখা দিয়েছিলো এক ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা, যার অনিবার্য পরিণতি ঘটেছিলো সামাজিক মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়ে। সমাজের এই অবক্ষয়িত (decadent) রূপের উন্মোচন এবং তার অধিবাসীদের জরিষ্ণু দশার চিত্রায়ণ (depiction)-ই 'গ্রহণ' কবিতায় সমর সেনের প্রধান অভীষ্ট।

এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে কবি কবিতাটির আরম্ভেই একটি ছবি এঁকেছেন। ছবিটি একই সঙ্গে নৈসর্গিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ; কেননা সেটি যেমন নিসর্গের রূপায়ণ, তেমনই কবির ভাবনা-চিন্তারও প্রতিফলন ঃ

> মরা গঙ্গার স্নানের আগে
> একবার ভাবি,

মসৃণ মানুষ নয়,
তার চেয়ে ভালো ক্ষীণজীবী পাখি,
কিম্বা ক্ষিপ্রগতি ঘোড়া··· ··· ।

কিন্তু সভ্যতা-মার্জিত 'মসৃণ মানুষ' অপেক্ষা 'ক্ষীণজীবী পাখি' অথবা 'ক্ষিপ্রগতি ঘোড়া'কেই কবির শ্রেয়তর মনে হয়েছিলো কেন ? এর মূলে কি ছিলো মানববিদ্বেষ বা misanthropy (এখানে জানিয়ে রাখি, তাঁর বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ 'বাবুবৃত্তান্তে' নিজেকে তিনি 'নারীবিদ্বেষী' ব'লে অভিহিত করেছেন, যদিও একই সঙ্গে এ-কথাও তিনি আমাদিগকে জানিয়েছেন যে কোনো গুণবতী, রূপবতী ও রুচিবতী মহিলার সাক্ষাৎ পেলে মুহূর্তেই তাঁর নারীবিদ্বেষ কর্পূরের মতো উবে যেতো), নাকি সেই রিরংসা-পরায়ণতা বা cynicism, যা তাঁর নামের ও তাঁর কবিতার আলোচনার সঙ্গে academic কাব্যসমালোচকদের দাক্ষিণ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ? আমার মনে হয়, এর কোনোটাই নয় ; আসলে এর মূলে ছিলো তাঁর সমকালীন বিগলিত সমাজের বিকলিত মানুষগুলির জন্য তাঁর গভীর মমত্বের বোধ, তাদের 'নিজের ছায়াভীরু', 'অদৃষ্ট বিরূপ হলে নিষ্ফল পুরুষকার'-বিশ্বাসী অসহায় অবস্থার জন্য অসীম অনু-কম্পার অনুভূতি । এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই সমৃদ্ধ-সচ্ছল বিগত দিনের জন্য নস্ট্যাল-জিয়ার তাড়না । বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের গভীর জ্ঞান থেকে কবি জেনেছিলেন যে তাঁর সমকালের সেই ভাগ্যাহত মানুষগুলিরও শান্ত-সুখী একটা অতীত ছিলো । এবং সেই অতীতের জন্য তাদের আকুলতার তখনো অবসান ঘটেনি, তখনো তাদের 'অন্তরে অন্য এক পুরুষ' (অর্থাৎ সেই অতীত) 'বিচ্ছুরিত চাপা হাসি হাসে ।' কিন্তু অতীতের সেই একদা-সচ্ছল জীবন (যাকে কবি 'মরা গঙ্গা'র বিপরীত, অর্থাৎ ভরা গঙ্গা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন) ইতিমধ্যেই হ'য়ে উঠেছিলো তাদের পক্ষে চির-অলভ্য ; অথচ সেই জীবনের প্রাণপ্রাচুর্য থেকে নির্বাসিত ক'রে মসৃণ ও মার্জিত তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা তার অলীক ইন্দ্রধনুকের মোহনছটায় তাদের অস্তিত্বকে বিন্দুমাত্র উদ্ভাসিত করতে পারেনি । সেই সমস্ত মানুষ, যাদের অতীত অলীক এবং বর্তমান অস্বস্ত, তাদের ত্রিশঙ্কু অস্তিত্বের গভীর সংকটপ্রসূত 'গ্রহণ'দশা নিয়ে 'গ্রহণ' কবিতায় কবির মনের চোখের সামনে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলো । কবিও তাঁর মনের চোখেই তাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে যদিও সেই বিগত জীবনের অনুধ্যানে এখনো মাঝে-মধ্যে 'রক্তের জোয়ার' তাদের 'হৃদয় কাঁপায়' এবং যদিও তাদের 'অভিশাপে শতছিদ্র মনের উপর / বাঁধন টুটে বুঝি নামে রক্তের প্লাবন', তবু যেহেতু অবস্থার দুর্বিপাকে তাদের 'ভীরু মজ্জায় আর কিছু নেই', অতএব তাদের 'কঠিন বুক দুরুদুরু কাঁপে', তাদের 'অলস চোখে' শুধু 'শান্ত সমর্পণ' । অতএব সেই অবস্থায়, যখন সব-বিশেষণ-বর্জিত নিছক মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য ধূল্যাবলুণ্ঠিত, তখন মধ্যবিত্ত জীবনের শরিক হিসেবে, প্রাণীজগতের দীনসদস্য 'ক্ষীণজীবী পাখি' অথবা

'ক্ষিপ্রগতি ঘোড়া'কেও যে কবির বিবেচনায় শ্রেয়তর ব'লে মনে হয়েছিলো, তাতে তেমন বিস্ময়ের আর কী আছে ?

সমর সেনের নগর-সমাজে বুদ্ধিজীবী ও ধর্মজীবীদের পাশে ঐ সমাজেরই উপাঙ্গ-স্বরূপ আরো অন্তত তিনটি সম্প্রদায়ের মানুষের অস্তিত্ব অনুভূত—ছাত্র, বেকার এবং ভিখারি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এক যুগের কবিজীবনে পথে-বিপথে, মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে—এমন কি হস্টেলে-ছাত্রাবাসেও অক্লান্ত পর্যটকের মতো ঘুরে-ঘুরে এদের জীবনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সামাজিক চেতনার জাগরণে তথা সমাজ বিপ্লবের ত্বরায়নে প্রথম দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের ভূমিকার কোনো মূল্যায়নে প্রবৃত্ত না-হ'য়ে তাদের জীবনের চিত্রাঙ্কনে নিজের কবিতায় নিজেকে তিনি নিরত রেখেছেন। ভিখারিদের মতো একান্ত অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের কথাও যে তিনি ভেবেছেন, তাদের জীবনকেও যে তিনি তাঁর কবিতার বিষয়ে পরিণত করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁর সমাজ-পর্যবেক্ষণের বৃত্ত-পরিসীমা কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। তাছাড়া, এই উপেক্ষিতরা সমাজদেহের অপরিহার্য অঙ্গ না-হ'লেও অন্তত যে সামান্য অংশ, এই কাব্য-স্বীকৃতিটুকুর ভেতর দিয়ে সমাজ-সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সমগ্রতার পরিচয়ও প্রকাশিত। উদাহরণ হিসেবে উদ্ধার করছি মাত্র তিনটি ছবি—কবির কলমে আঁকা যথাক্রমে ছাত্র, বেকার ও ভিখারি সম্প্রদায়ের তিনটি শব্দচিত্র ঃ

১.

কলেজ ছুটি হল ;
কিন্তু এই মন্থর ক্লান্ত বিকেলে বাড়ি ফিরে কী হবে ?
... ...
তার চেয়ে ভালো
কাছাকাছি কোনো বন্ধুর আড্ডা, কোনো হস্টেল,
সেখানে উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায়
কাটুক একটি সন্ধ্যা।

('ঝড়' ১)

২.

চাকরি খালির বিজ্ঞাপনে বেকারের সকাল শুরু,
শূন্যমনে সকালে ওঠে ; মুরগী আর কুকুর ডাকে,
দুপুরের ঘুঘুডাকা বিষণ্ণতা,
গোধূলিতে বিবেক দংশন, অনাগত সর্বনাশ
যেন আসে দেয়ালের পাশে ;

('নানাকথা' ১)

৩.

খড়কুটোয় ছোট ছোট আগুন জ্বালে ভিখিরিরা,
সেঁকে দিনশেষের চাপাটি ; কোথায় কুটির,
উপরে মহাশূন্য, মারণমন্ত্র পড়ে উত্তুরে হাওয়া।
... ...
স্মরণের মাছি ঘোরে
পথপ্রান্তে নিঃস্ব কত জরদ্‌গব্ ভিখিরিকে ঘিরে।
('নববর্ষের প্রস্তাব')

নগর-সমাজের পাশাপাশি সমর সেনের পল্লী-সমাজ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন ; কেননা তাঁর কাব্যগত মূল যে-বিষয়, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজ—নগর ও পল্লী, এই উভয় অঞ্চলের জনজীবনই তার পারস্পরিক পরিপূরক এবং সামাজিক প্রগতির জটিল সমস্যাটিকেও তিনি এই দুই সমাজের সামগ্রিক বিকাশের অভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। পল্লী যেমন নগরকে রসদ জোগাবে, নগরও তেমনই পল্লীকে এগোবার পথ দেখাবে—এই মূল বিশ্বাসে অবিচলিত থাকতে চেয়েই মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের পরিক্রমা সমাপ্ত ক'রে গিয়েছেন তিনি—যদিও এ-কথা স্বীকার্য, নগর-সমাজ পর্যবেক্ষণে তাঁর দৃষ্টির ব্যাপ্তি ও গভীরতার তুলনায় পল্লী-সমাজ পর্যবেক্ষণে তাঁর দৃষ্টির দুই-ই অনেক কম। পল্লীর সমাজ পর্যবেক্ষণে তাঁর দৃষ্টি আংশিক ও অগভীর। আংশিক এই কারণে যে বসবাসের অভিজ্ঞতার সূত্রে পল্লীর সমগ্র সমাজর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার বিশেষ সুযোগই তিনি পান নি। পল্লীঅঞ্চলে বসবাসের যেটুকু সময় ও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, তার সবটুকুই কেটে গিয়েছিলো পল্লীর সমাজের মাত্র একটা—অবশ্য সেটাই প্রধান—অংশের অবস্থা পর্যবেক্ষণেই। সেই অংশটা কৃষক ও তার জীবন। সুতরাং পল্লীর কৃষক-স্বতন্ত্র সাধারণ জনজীবন তাঁর কবিতায় অতি সামান্যই উপস্থিত। আর, তাঁর পল্লী-দৃষ্টি অগভীর এজন্য যে যদিও তাঁর কবিতায় একদিন 'রুক্ষ মাঠে গ্রীষ্মের কিষাণের গান' ('শেষ সন্ধ্যা') তিনি শুনেছেন, দেখেছেন ঃ

...ঝুড়ি ঝুড়ি শাকসব্‌জী, সহজ সবুজ,
সপ্তাহে দুদিন গ্রাম্যহাট বসে,
বেচাকেনা সাঙ্গ হলে
হুঁকো কল্‌কে ঘন ঘন হাত বদলায়,
মহাজনচিন্তাহরা গন্ধ ছড়ায়।
('রোমন্থন')

এবং যেখানে

দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাঙ্‌লার বধূ নামে—

তেমন 'শেয়াল-সঙ্কুল কোনো নির্জন গ্রামে' 'কুঁড়ে ঘর' বেঁধে 'গরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, ক্ষেতের ধান' খেয়ে 'রাত্রে কান পেতে···বাঁশবনে মশার গান' ('নিরালা') পর্যন্ত শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তবু, সত্যি বলতে, জমিদার-মহাজন-সুদখোর-মোল্লা-পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত প্রচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বাংলার পল্লীঅঞ্চলের গোটা সামাজিক জীবনের শ্রেণীগত বিন্যাস কী ধরনের ছিলো কিংবা সহ-সম্বন্ধে (co-relation) সেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী কতটুকু সম্পর্কিত ছিলো অথবা সেই সম্বন্ধের গাঢ়তায় সমগ্র সমাজ কতখানি সংপৃক্ত ছিলো—ইত্যাদি, অর্থাৎ এককথায়, পল্লীবাংলার সমগ্র সমাজের জীবনের জলছবি তাঁর কবিতায় তেমন স্পষ্টভাবে তোলা নেই। অবশ্য এই বিষয়টি উপন্যাসের পক্ষেই উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হবার যোগ্য, কবিতার পক্ষে নয়। এবং এই বিশেষ কাজটিই শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রে গিয়েছেন।

মূল্যবোধের অবনমনজনিত আত্মিক যে-ব্যাধিতে শহরের সমাজ আক্রান্ত ও অবক্ষয়িত, মারাত্মক সে-ব্যাধি গ্রামের সমাজের শরীরেও যে তাঁর সমকালেই সংক্রামিত হয়েছিলো এবং সেই ব্যাধির প্রকোপই যে ছিলো তাঁর সমকালীন পল্লীবাংলার সমাজ-জীবনের জরিষ্ণু ও ক্ষয়িষ্ণু দশার মূল হেতু, পল্লীজীবনাশ্রিত তাঁর স্বল্পসংখ্যক কবিতার সব ক'টিই এই স্বীকৃতিতে সরল ও সোচ্চার। এবং এই রূঢ় সত্যকে স্বীকৃতি জানিয়েই তাঁর কবিতায় পল্লী-বাংলার যে-সমাজ-জীবনকে তিনি অংশত তুলে ধরেছেন, তা আনন্দউচ্ছল নয়, তা বিষাদবিধুর ; তা যৌবনস্পন্দিত নয়, তা জরাপীড়িত। 'গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্যে' ('বসন্ত') কিংবা 'কানা গরু, মরা মাঠ, শূন্য গোলাঘর' ('রোমন্থন')—এই স্বীকৃতিতে যেমন সেই বিষাদের বিধুরতা প্রকাশিত, 'নষ্টনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে / রক্তমাখা হাড় দেখি সাজানো বাগানে' ('নষ্টনীড়') অথবা 'গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যাই / কঙ্কালে ভরেছে দেশ' ('২২শে জুন')—এই খেদোক্তিতে তেমনই সেই জরার পীড়াই অনুভূত। 'প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো।'—'ক্লান্তি' কবিতায় তাঁর এই উক্তি তিনি শুধু শহর সম্পর্কেই প্রয়োগ করেন নি, গ্রাম সম্পর্কেও তিনি তা প্রয়োগ করেছেন—বলেছেন, 'শহরে, বন্দরে, গ্রামে'। একদা-সমৃদ্ধ পল্লী-বাংলার তাঁর সময়-পর্বের হৃতসর্বস্ব রূপের উন্মোচন এই পংক্তি-কতিপয়ে কত বাস্তবানুগ!

> গোধূলির পরে
> পুরোনো গ্রামের পরিচিত দোকানে আসি,
> টিমটিমে আলো, দেয়ালে দেয়ালে করুণ ছায়া,
> শূন্য চালের থলি, শীর্ণ ইঁদুর!
> অন্দরে যাব না।
> শুনেছি বৃন্দাবন পরলোকগত, পীত বোমায় পরলোকগত,
> এ দোকান তারি ছিল।
>
> ('ক্লান্তি')

যদি কোনো একটিমাত্র কবিতায় সমর সেন তাঁর সমকালীন পল্লী-বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হ'য়ে থাকেন, তা'হলে সেই কবিতাটি 'জোয়ার ভাটা'। কবিতাটির রচনাকাল সম্ভবত ১৯৪২ অথবা ৪৩ সাল। 'জোয়ার-ভাটা' নামকরণ থেকেই কবিতাটিতে কবির বক্তব্য সম্পর্কে আমরা অবহিত হ'তে পারি। একদা-অতীতে পল্লী-বাংলার সমাজ-জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির যে-জোয়ার এসেছিলো, বর্তমানের (অর্থাৎ সমর সেনের সমকালের) সার্বিক অবক্ষয়ের অভিঘাতে তাতে নেমে এসেছে ভাটা এবং সেই ভাটার টানে সমগ্র পল্লী-সমাজ ধ্বংসের মুখে উপনীত—এই বিষাদান্ত বক্তব্যকেই কবি আলোচ্য কবিতায় পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর অনুভূত অভিজ্ঞতায় (felt experience) পল্লী-বাংলার দুই সময়ের দুই বিপরীত ছবি ঃ

১.

একদা সহজ লীলায় পড়েছে দুরন্ত দানব,
আত্মস্থ রাখাল ফিরেছে আপন বাটে,
পাশে তার ধানের হরিৎ
মনে তার বর্ণচ্ছটা আদিম সূর্যের।
সেদিন সন্ধ্যায়
আমারো নির্জন ঘরে এসেছে দিগন্তের গান।

২.

আজ সে-রাখাল কালের সারথি,
ধূর্ত কঠিন! রথচক্রে নির্বান্ধব প্রান্তর।
অন্ধঘরে বসে লোকক্ষয়ের দিনে
নিজের নাড়ীতে শুনি জরার গান·

গ্রামজীবনের সহজতা-সরলতা যে কালের সংঘাতে (এই বিশেষ কবিতাটির ক্ষেত্রে '৪২-এর অগাস্ট আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনীতির হঠকারিতা, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সামগ্রিক অভিঘাতে) বহুবিধ জটিলতা-কুটিলতায় পর্যবসিত, তারই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে অতীতের 'আত্মস্থ রাখাল'কে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-উপান্তিক 'ধূর্ত' ও 'কঠিন' 'কালের সারথি' হিসেবে উল্লেখকরণে।

সমর সেনের পল্লীভাবনায় 'বটগাছ' কোনো-কোনো কবিতায় (যেমন 'পলাতক' কবিতার—'নিঃসঙ্গ বট / যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত' পংক্তিতে—) গ্রামীন সমাজের প্রতীক। বর্তমান কবিতাটিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কবিতাটির শেষ (৩) অংশে 'প্রৌঢ় বটে'র প্রতীকেই পল্লীবাংলার ধ্বংসোন্মুখ সমাজের ছবিটি তিনি এঁকেছেন ঃ

··· ··· জনহীন গ্রামে
ভিটেতে ঘুঘু ডাকে ;

চাষীরা পায়ে হেঁটে গেছে দূর দেশান্তরে
প্রাণের সন্ধানে নগরের প্রেতলোকে।
একটি গ্রাম্য কুকুর পড়ন্ত রোদে জল খুঁজে ধোঁকে,
একটি একেলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়,
প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখেনি সবুজ কলপ,
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশ-সন্ধানে।

এবং কবিতাটির অন্তিম পংক্তিতে কবি যদিও বলেছেন, 'জানি না বুড়ো বট কিসের প্রতীক', তবু এটির পাঠান্তে আমরা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারি, 'বুড়ো বট'কে তিনি কিসের প্রতীক হিসেবে জেনেছিলেন।

সমর সেনের কবিতায় তার সমকালীন রাজনৈতিক হাওয়া কতটা এবং কীভাবে প্রবাহিত হয়েছিলো? এই আলোচনায় আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সমর সেন নিজেকে 'আমি মাক্সিস্ট' ব'লে ঘোষণা করলেও এবং তাঁর কবিজীবনের একটা সময়ে কমিউনিস্ট ক্রিয়াকলাপে নিজেকে কিছুটা লিপ্ত ক'রে থাকলেও, শেষ পর্যন্ত নিজের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাকে মাত্র মার্ক্সবাদেই সীমাবন্ধ রাখতে পারেন নি। কেননা তৎকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির সার্বিক বিশ্লেষণের অন্তে এই সিদ্ধান্তেই তিনি উপনীত হয়েছিলেন যে, তীব্র মাদকতা সত্ত্বেও সেই জটিল পরিস্থিতির সামগ্রিক মোকাবিলায় মার্ক্সীয় দলীয় রাজনীতিই যথেষ্ট ছিলো না, প্রয়োজন ছিলো অধিকতর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির। সেইজন্যই তাঁর রাজনৈতিক কবিতায় কোথাও মার্ক্সবাদের প্রতি অন্ধ অনুগতা তেমন প্রকাশিত হয়নি, বরং কোথাও-কোথাও অন্ধ মার্ক্সবাদীদের উদ্দেশে সূচ্যগ্র বিদ্রূপবাণই নিক্ষিপ্ত হয়েছে—'বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর'-ভক্ষক এবং 'যদিও বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক, / তথাপি বামপন্থী পত্রিকায় / আসন্ন বিপ্লবের গান' গাওয়াকে 'অবশ্য উচিত' ('পরিস্থিতি') বিবেচনাকারী তৎকালীন তথাকথিত মার্ক্সবাদীদের একরোখা, জেদী ও হঠকারীসুলভ ক্রিয়া-কলাপ তাঁর চোখে 'নৈরাজ্য আর লাল ধ্বংস শুধু' ('হসন্তিকা') ব'লেই প্রতিভাত হয়েছে।

বস্তুত, নিছক দলীয়তা নয়, উদার মানবিকতাই সমর সেনের রাজনৈতিক কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেই মানবিক ঔদার্যের কারণেই তাঁর সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তিনি তৎকালীন বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টি যথার্থ অর্থেই ছিলো ঐতিহাসিক জ্ঞানলব্ধ। সেই জ্ঞানের আলোকেই সমকালীন সমূহ অন্ধকারকে তিনি চিনে নিয়েছিলেন ; সেই জ্ঞানের গভীরতাতেই তাঁর উপলব্ধ হয়েছিলো যে তাঁর সমকালের পৃথিবীর অঙ্গে-অঙ্গে অনেক গরল সঞ্চিত হয়েছে, বহু বদরক্ত জমে উঠেছে—যার মোক্ষণ অত্যাবশ্যক। 'ঘরে বাইরে' কবিতায় প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সেই উপলব্ধির—'পৃথিবীর বদরক্ত বের হোক, / অস্ত্রোপচার নিতান্ত প্রয়োজন'। কিন্তু সেই অত্যাবশ্যক অস্ত্রোপচারটি কে বা কারা করবে, কোন্ পন্থায় সম্ভব

পৃথিবীর অনভীপ্সিত বদরক্তটুকু বের ক'রে দেয়া? মানবসভ্যতার সেই দারুণ দুর্দিনে, এই মূল প্রশ্নের উত্থাপনে সমর সেন তাঁর সমকালীন মার্ক্সিস্ট বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিতকণ্ঠ, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর উচ্চারণে তিনি স্বতন্ত্রকণ্ঠ; পৃথিবীকে বদরক্তমুক্ত করার উপায়-সন্ধানে তাঁর পথ তাঁর মার্ক্সবাদী বন্ধুদের পথের থেকে স্পষ্টতই পৃথক। মার্ক্স-নির্দেশিত শ্রেণীসংগ্রামের সরল ও ঢালু পথে নয়, হৃদয়-অনুভূত মানবিকতার জটিল ও উত্তুঙ্গ পথেই পৃথিবীর সমস্যার (বিশেষত রাজনৈতিক) সমাধানের সূত্র তিনি অন্বেষণ করেছেন। সেই কারণেই তাঁর ('নানাকথা') কবিতায় পশ্চিমী গণতন্ত্রকে 'দাঁতচাপা বৃদ্ধা গণিকা' অভিধায় অভিহিতকরণের মাধ্যমে তার জরাগ্রস্ততার প্রতি আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ ক'রে কোনো রাজনৈতিক তৃপ্তি তিনি পান নি, এমনকি জরিষ্ণু সেই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 'পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে'—এই সতর্কতাবাক্য উচ্চারণেও স্বাধীন চিন্তাশূন্য মার্ক্সীয় বিপ্লবীদের মতো কোনো অহৈতুক উল্লাসও তিনি অনুভব করেন নি। তিনি তাঁর দৃষ্টিকে আরো গভীরে প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন এবং মানব-প্রগতির সমগ্র সমস্যাটিকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছেন। ইতিহাসের জ্ঞান থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন, 'কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী / যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে' ('ঘরে বাইরে')। কিন্তু এই 'বিপ্লবের ধাত্রী' কারা, যারা 'কালের গলিত গর্ভ থেকে' 'যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে'? এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের গভীরেই নিহিত রয়েছে রাজনীতি-বিষয়ক তাঁর চিন্তার স্বাধীনতার পরিচয়। 'বিপ্লবের ধাত্রী'দের সন্ধান, তাঁর বিশ্বাসে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অন্ধ অনুসারীদের মধ্যে লাভ করা সম্ভব নয়। 'বিপ্লবের ধাত্রী'রা ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী-পরিধিব্যাপ্ত ব্রাত্য-জনসমাজে। তাঁর ধারণায় বিপ্লবের প্রকৃত ধাত্রী তারাই:

> যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়,
> অন্নের প্রাণের কাঙাল,
> নয়নাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোণে,
> কারখানায় কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
> শহরে শহরে।
>
> ('খোলা চিঠি')

এই সমাজব্রাত্যদের যথোচিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না-ক'রে সমাজ-বিপ্লব যে কিছুতেই সম্পন্ন হবার নয়, ইতিহাসের এই মূল ও স্থূল সত্যটি মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ব'লেই আমাদের উদ্দেশে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন—'শূদ্রের অসমাপ্ত বৃত্ত সম্পূর্ণ কর' ('শবযাত্রা')। সেই সঙ্গে ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐক্যই যে রাজনৈতিক পারবশ্যমুমুক্ষার অন্যতম প্রধান প্রেরণা, সে-সম্পর্কে নিজের নিঃসংশয়তাকেও আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি—'চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এ দেশ,

'এখানে নোকরশাহীর হবে শেষ / যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র হিমাচল-গান' ('লোকের হাটে')।

রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় ব্রাত্যজনজীবনস্পর্শিতায় সমর সেন রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী। অন্ত্য-পর্বের রবীন্দ্রনাথের মতো—অবশ্য নিজের ধরনেই—তিনিও তাঁর কবিতায় নানাভাবে গণজীবনের বন্দনাসঙ্গীত রচনা ক'রে গিয়েছেন। সেই জীবনের মহত্বের স্বীকৃতিতে তিনি কত উদার ছিলেন, সেই জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে মানসিকভাবে তিনি কত বেশি আবদ্ধ ছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ মাত্র তিনটি দৃষ্টান্ত ঃ

১.

প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা।

('২২শে জুন')

২.

জীবাণুর আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে যারা
বাঙলাদেশে, উড়িষ্যায়, মালাবারে, উত্তর বিহারে,
যারা লড়ে ইউগোশ্লাভিয়ার বন্ধুর মারাঠি পাহাড়ে,
রাশিয়ায় রক্তমাটিতে, বেদনাহলুদ চীনে, ফ্রান্সের ফিনিক্স্ প্রান্তরে,
আমারি আত্মীয় তারা ;

('লোকের হাটে')

৩.

যারা মাঠে খাটে,
উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে,
ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে,
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,
তাদের মিতালি খুঁজি।
তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,
হয়তো মলিন
নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,
তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোপ্তি, তাদের গতি
আমার পরমা যতি।

('গৃহস্থবিলাপ ')

সমর সেনের রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি খুব স্পষ্ট না-হ'লেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা যথেষ্ট প্রবল। বিজিত বর্তমানের অন্ধকার গর্ভ চিরে বিজয়ী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আবির্ভাবের প্রত্যাশায় তাঁর কবিতায় বারে-বারেই তিনি অধীর হ'য়ে উঠেছেন, সেই প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ইতিহাসের অদৃশ্য দেবতার প্রতি নিবেদন করেছেন তাঁর প্রার্থনা ঃ

অস্ত্রের দম্ভ চূর্ণ কর, ইতিহাসপতি,
বিপ্লবী চেতনার সেতুতে
সঙ্কীর্ণ কর এ দুস্তর ব্যবধান,
তোমার অখণ্ড সত্তায় দাও অধিকার,
এ প্রার্থনা আমার।

('ক্রান্তি')

বেদনাসঘন চিত্তে উচ্চারণ করেছেন সর্বমানবের জন্য তাঁর অন্তরের গভীর মঙ্গলেচ্ছা ঃ

…আগামীকাল আসুক ঘর-ফিরতি মজুরের গানে
কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়
নবজাত শিশুর সহজ কান্নায় :
শতাব্দীর যন্ত্রণার পর
নতুন দিন আসুক সভ্যতার পরম চিত্তশুদ্ধিতে।

('পঞ্চম বাহিনী')

এই বেদনাসঘন মানবমঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণেই সমর সেনের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার স্বকীয়তা ও শেষ পরিণতি।

সমর সেন নিজেকে 'মার্ক্সিস্ট' শীলমোহরে চিহ্নিত ক'রে যেমন তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার স্বকীয়তা ও তাঁর রাজনীতি-বিষয়ক কবিতার স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সমূহ বিভ্রান্তির ইন্ধন জুগিয়েছেন, 'আমি রোমান্টিক কবি নই' ব'লে নিজেকে সনাক্ত ক'রেও তেমনই তাঁর প্রেম-ভাবনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের ও তাঁর প্রেমের কবিতার মর্মরস আস্বাদনের পথে যথেষ্ট অন্তরায়ের কারণ হয়েছেন। কেননা তাঁর এই দুই আত্ম-ঘোষণায় (self-declaration) আস্থা স্থাপন ক'রে তাঁর কবিতার স্বরূপ-সন্ধানে ব্রতী হ'লে সুবেদী পাঠকের পক্ষে তাঁর চিন্তন-মননের সঙ্গে তাঁর কবিতার ছক মেলানো ক্রমশই কঠিন হ'য়ে পড়ে।

কৌতূহল জাগে—এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ও—যখন ভাবি, কেন তিনি 'রোমান্টিক কবি নই' ব'লে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। সাধারণভাবে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় এবং বিশেষভাবে তাঁর প্রেমের কবিতায় তাঁর এই আত্মঘোষণার বিশেষ কোনো সমর্থন নেই ; তাছাড়া, 'আমি রোমান্টিক কবি নই'—এত বড় অনৃতভাষণের দৃষ্টান্ত তাঁর সমগ্র কবিজীবনেও আর দ্বিতীয়টি আছে ব'লে অন্তত আমার জানা নেই। বস্তুত, প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে তিনি রোম্যান্টিক নন—এ-কথা সত্য তো নয়ই, বরং কোনো-

কোনো কবিতায় (যেমন 'নিঃশব্দতার ছন্দ', 'একটি রাত্রির সুর', 'বিরহ', 'ইতিহাস', 'স্মৃতি', 'একটি মেয়ে' ইত্যাদিতে) তিনি মাত্র রোম্যান্টিকই নন, তিনি আরো বেশি—তিনি অতি (ultra) রোম্যান্টিকও। এই কবিতাগুলির অঙ্গে-অঙ্গে রোম্যান্টিক বেদনা (agony)-র বাঁশি তিনি কেবল বাজিয়েই ক্ষান্ত হননি, সেই বাঁশির সুরের সূক্ষ্ম অনুরণনটুকু পর্যন্ত পাঠক-হৃদয়ের সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশে অনুভূত করাতেও তিনি সক্ষম হয়েছেন। ফলত, 'কালের পুতুল' গ্রন্থের নিউ এজ (জানুয়ারি, ১৯৫৯) সংস্করণের ভূমিকায় 'রোমান্টিক হবার ভরপুর ইচ্ছে নিয়েও রোমান্টিক হ'তে পারেন নি ব'লে সমর সেন···দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন' মন্তব্যে সমর সেনের প্রতি প্রীতিবশত বুদ্ধদেব বসু নিজেও যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। অবশ্য তাঁর মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে ; কিন্তু তা পৃথক প্রবন্ধের বিষয়।

প্রেমের কবিতায় সমর সেন রোম্যান্টিক, এমন কি কবিতাবিশেষে অতিরিক্ত রকমের রোম্যান্টিক—এই মন্তব্যে প্রেমের কবি হিসেবে সমর সেনের গোত্রপরিচয় সম্পর্কে অনেকখানি বলা হ'লেও প্রেম-সম্পর্কে তাঁর রোম্যান্টিক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে অতি সামান্যই বলা হয়। প্রেম-ভাবনায় তিনি রোম্যান্টিক, কিন্তু তাঁর রোম্যান্টিকতা গতানুগতিক অর্থের রোম্যান্টিসিজম্ নয়। রবিদ্রোহিতার অন্ধ উন্মাদনায় এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যাদর্শের অনুকরণে-অনুসরণে আমাদের সাহিত্যের 'তিরিশের বিদ্রোহী'রা বাস্তবতার বন্দনায় যে-রোম্যান্টিকতাকে পরিহার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেই রোম্যান্টিকতাই কিন্তু, বাস্তবতার ছদ্মবেশে, নূতন কালের নূতন রোম্যান্টিকতায় রূপান্তরিত হ'য়ে, তাঁদের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলো। নূতন কালের এই নূতন রোম্যান্টিকতা বা neo-romanticism-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য আবেগের অনুচ্ছ্বাস, কল্পনার মনন-নির্ভরতা এবং লক্ষ্যের ইন্দ্রিয়মুখিনতা। নূতন কালের এই নূতন বা নব্য-রোম্যান্টিক (neo-romantic)-দের চোখেও ছিলো স্বপ্নের মায়াঞ্জন, কিন্তু সেই স্বপ্নের স্বরূপটা ছিলো স্বতন্ত্র।

বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-পরবর্তী এই নব্য-রোম্যান্টিকদের অন্যতম প্রধান সমর সেন এবং কবিতার ক্ষেত্রে এই নব্য-রোম্যান্টিকতার নিবিষ্ট চর্চায় তিরিশের দশকের বাঙালী কবিদের মধ্যে, কঠোর বিচারে, তিনিই 'সম্ভবত' সর্বপ্রধান। ('সম্ভবত' শব্দটি ব্যবহার করলাম এজন্য যে এ-বিষয়ে তিরিশের যুগেরই আরেক ক্ষুরধার মননশীল কবি বিষ্ণু দে-র ভূমিকা তাঁর ভূমিকার সমান অথবা আপেক্ষিক বিচারে তাঁর ভূমিকার চেয়ে কম বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে-সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ খুব সহজ ব্যাপার নয়।) সমর সেন নব্য-রোম্যান্টিকতায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন ব'লেই তাঁর প্রেমের কবিতায়, পূর্ব-স্তবকে উল্লিখিত, নব্য-রোম্যান্টিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের সব ক'টিই স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত। তাঁর প্রেমের কবিতা আবেগে আপ্লুত, অথচ আবেগের প্রকাশে উচ্ছ্বসিত নয় ; মননে সমৃদ্ধ, তথাপি কল্পনার দৈন্যপীড়িত নয় ; লক্ষ্যে ইন্দ্রিয়মুখী, কিন্তু

ইন্দ্রিয়সর্বস্ব নয়। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের সহ-সন্নিবেশে ও সহ-সন্নিপাতে তাঁর প্রেমের কবিতা অর্জন করেছে এমন একটা চরিত্র, যার অসাধারণত্ব সেই কবিতার সতর্ক পাঠক-পাঠিকাদের নজরে না-প'ড়েই পারে না। সে-চরিত্র একই সঙ্গে কঠোর ও কোমল, ক্ষুব্ধ ও মুগ্ধ, বিষণ্ণ ও প্রসন্ন। প্রায়শ তার প্রকাশে গদ্য উপস্থিত, কিন্তু কদাচ কবিত্ব অনুপস্থিত। রুক্ষ বালুকার অন্তরালে স্নিগ্ধ অন্তঃসলিলার মতো কর্কশতার আড়ালে কমনীয়তা সে-চরিত্রে আত্মগোপন ক'রে আছে। যাঁরা সমর সেনের প্রেমের কবিতায় কেবলই দেহ-কামনার অতৃপ্তিজনিত বিকারগ্রস্ত হাহাকার শুনতে পান, ক্ষুব্ধতা ও লুব্ধতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান অথবা উশৃঙ্খলা ও উদ্‌ভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেন, তাঁরা তাঁর প্রেমের কবিতার সদর থেকেই ফিরে যান, অন্দরে প্রবেশ করতে হয় অপারগ, নয় অনিচ্ছুক। কেননা যদি তাঁরা তাঁর সেই কবিতার ভেতরে প্রবেশ করার মতো ধৈর্যসাপেক্ষ কাজটি সম্পন্ন করেন, করতে পারেন, তাহ'লে উপলব্ধি করবেন যে তাঁর প্রেমের কবিতা শুধু বিকারগ্রস্ত হাহাকারে সংক্ষুব্ধ কিংবা ক্ষুব্ধতা-লুব্ধতার প্রতিচ্ছবি চিত্রণে অথবা উশৃঙ্খলা-উদ্‌ভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশেই অবসিত নয়, এ-সমস্তের কখনো-আড়ালে-কখনো-পাশাপাশি কিছু সুরময়তাও তাতে রয়েছে, যা শ্রুতি বা লক্ষ্যের একেবারেই অগোচর নয়। শুধুই পাহাড়ের মতো ভারস্তব্ধ কিংবা মরুভূমির মতো তৃষ্ণাদগ্ধ নয় সেগুলি, সেগুলি অরণ্যের মতো বীজনব্যাজিত এবং সমুদ্রের মতো তরঙ্গমুখরিতও বটে। প্রেমিকের কামনাজ্বলন্ত অস্তিত্বের দুর্বিষহ যন্ত্রণার মাত্র স্বরলিপিই নয়, একই সঙ্গে তার বিরহবিধুর হৃদয়ের কোমল-গভীর বেদনার সুরলিপিও সেগুলি। অর্থাৎ, শুধু বাণী নয়, ধ্বনিও সেগুলিতে রণিত ; শুধু স্বর নয়, সুরও সেগুলিতে স্বনিত। সমর সেনের প্রেমের কবিতায় সুরের এই স্বননের ওপর আমি একটু বেশি মাত্রায় জোর দিতে চাই, কেননা তাঁর প্রেমের কবিতার আপাত-বিশৃঙ্খল মেজাজের অন্তরালবর্তী এই সুরের স্বননের সাহায্যেই এই কবিতাগুলিতে প্রেমিকচিত্তের পাহাড়-মরুভূমি-অরণ্য-সমুদ্র-ব্যাপ্ত Romantic Agony (পাঠক, মার্জনা করবেন, Romanticism-এর অন্যতম মুখ্য ভাষ্যকার মারিও প্রাৎজ্‌-উদ্ভাবিত এই শব্দ-যুগ্মের যথাযথ বাংলা যুগ্ম-প্রতিশব্দ আমার জানা নেই।)-কে তিনি নিজে স্পর্শ করতে এবং আমাদের দ্বারা স্পৃষ্ট করাতে সক্ষম হয়েছেন, ব্যক্তিগত বেদনাকে কালগত ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করতে সাফল্যলাভ করেছেন। তাছাড়া, সত্যি বলতে, সুরের মূর্চ্ছনাকে বাদ দিয়ে, অনুভূতির পেলবতাকে পরিহার ক'রে, কোনো কবিতা—বিশেষত প্রেমের—রচনা করা কি আদপেই সম্ভব ?

সমর সেনের প্রেমের কবিতার প্রধান বিষয় অতীত ও স্মৃতি : স্মৃতি ও অতীত। কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি অতীত শীতের অন্ধকারে আবৃত নয়, বিগত বসন্তের স্মরণালোকে উদ্ভাসিত ; এগুলির অন্তরে বিগতের হাহাকার, অঙ্গে অতীতের স্মৃতি-ভার। অতীত স্মৃতির এই দুর্বহ গুরুভার তাঁর মনের কাঁধে চাপিয়েই সমর সেন প্রেমের কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রেমের কবিতায় তিনি স্মৃতিনির্ভর, স্মৃতিতাড়িত—

এমনকি কবিতাবিশেষে সম্পূর্ণরূপে স্মৃতি-কবলিত। তাঁর আঠারো বছর বয়সে, 'রাত্রি' কবিতায় 'হাওয়ায় ফুলের মদির গন্ধ / তীক্ষ্ম স্মৃতির মতো।'—এই পংক্তি প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে সেই যে তিনি স্মৃতির অস্পষ্ট-ধূসর জগতে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, জীবনের সর্বশেষ প্রেমের কবিতাটি রচনা করা পর্যন্ত সে-জগত থেকে আর নিষ্ক্রান্ত হ'তে পারেন নি, অসহায়ের মতো সে-গোলকধাঁধায় বন্দী থেকেছেন, পথভ্রষ্টের মতো পথ খুঁজে মরেছেন, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পান নি—কখনো না, কোনোদিনো না। বিগত জীবন থেকে স্মৃতির দস্যুরা দলে-দলে এসে তাঁর বর্তমান জীবনে ক্রমাগত হানা দিয়েছে, স্মৃতির সেই দৌরাত্ম্য থেকে আত্মরক্ষা তিনি করতে পারেন নি—তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, স্মৃতির সেই সুদূর জগৎ থেকে তাঁর 'রক্তে যেন চঞ্চল বলাকা আসে' ('রক্তকরবী')। আবার স্মৃতির দৌরাত্ম্যবশতই অতীতে-অবলুপ্ত প্রেমিকা-প্রসঙ্গে কবিতাপরম্পরায় তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে :

১.

ভুলে-যাওয়া গন্ধের মতো
কখনো তোমাকে মনে পড়ে।
('বিস্মৃতি')

২.

মনে পড়ে,
টানা চোখে মদির অলস,
('অজ্ঞাতবাস')

৩

শুধু মনে পড়ে
কঠিন অন্ধকারে অবরুদ্ধ বাতাস
দেওয়ালের উপরে বিষণ্ণ ছায়া,
আর তোমার পাশে
রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত আমার দীর্ঘশ্বাস।
('চার অধ্যায়' ১)

শুধু তা-ই নয় ; একদা-নায়িকা-প্রাসঙ্গিক স্মৃতির এই তাড়না অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে এই অনুভূতিতেও তিনি সমানভাবেই তাড়িত হয়েছেন যে স্মৃতি তাঁর প্রতি আর যা-ই করুক, বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তাঁকে প্রতারিত করেনি। বরং অতীতের মৃত্তিকায় মূলকে নিবন্ধ রেখেও অতিকায় মহীরুহের মতো সে তার ডালপালা মেলে দিয়েছে কবির বর্তমান অস্তিত্বের অবারিত আকাশে। স্মৃতির সেই মহীরুহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছেন তিনি। তাঁর একদার প্রেমিকা আজ কাল-কবলিতা, প্রত্যক্ষের জগৎ থেকে সে আজ চির-অন্তর্হিতা। কিন্তু স্মৃতির ভুবনে আজো তার অবলুপ্তি ঘটেনি। স্মৃতির দাক্ষিণ্যেই কবি আজো তার অস্তিত্বকে মুহূর্তে-মুহূর্তে অনুভব করতে পারেন

এবং একই সঙ্গে এই উপলব্ধিতেও প্রাপ্ত হ'য়ে ওঠেন যে স্মৃতির জগতে কোনো কিছুরই মৃত্যু নেই। সেই কারণেই স্মৃতির উদ্‌ভাসনের (flash of memory) পথে কোনো প্রতিবন্ধক স্থাপন করেন নি তিনি, তাকে অবদমিত (repressed) করতেও সচেষ্ট হন নি : বরং তাকে স্বাগত জানিয়েছেন, তার বৃশ্চিক-দংশনকেও অক্লেশে সহ্য ক'রে নিয়েছেন। নিজের জীবনে স্মৃতির এই সদয় ভূমিকাকে তিনি অক্ষয় ক'রে রেখেছেন তাঁর 'স্মৃতি'-শীর্ষক একদার-প্রেমিকা-স্মরণ কবিতায় ঃ

> আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
> রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
> পার হয়ে এলাম
> মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর :
> স্মৃতির দিগন্তে নেমে এল গভীর অন্ধকার,
> আর এলোমেলো,
> ভুলে যাওয়ার হাওয়া এল ধূসর পথ বেয়ে ঃ
> রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
> শ্রান্ত হয়ে এল অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
> তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

অতীত ও স্মৃতি সমর সেনের প্রেমের কবিতার প্রধান বিষয়, কিন্তু একমাত্র নয়। এ-দু'টি বিষয় ব্যতীত অন্যবিধ বিষয়েও অনেক প্রেমের কবিতা তিনি রচনা করেছেন, যেগুলির অধিকাংশই জীবন্ত এবং কয়েকটি তো রীতিমতো জ্বলন্ত। এই কবিতাগুলির বেশির ভাগেরই পটভূমি কবির কালের বর্তমান এবং উপজীব্য নর-নারীর হৃদয়লীলার অতি-পুরাতন-অথচ-চিরনূতন একটি বিষয় ঃ বিরহ। কিন্তু এই অতি-পুরাতন-অথচ-চিরনূতন বিষয়টির প্রকাশ সমস্ত কবিতায় সমান নয়, প্রকাশের মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন কবিতায়। এই কবিতাসমূহের অনেকগুলি যেমন বিরহের বেদনায় আর্ত ও আকুল, কোনো-কোনোটি তেমনই মিলনের কামনায় উদ্দাম ও ব্যাকুল। প্রথম ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় 'বিরহ' কবিতাটির এবং পরে সেই সঙ্গে 'নিঃশব্দতার ছন্দ', 'একটি রাত্রের সুর', 'দুঃস্বপ্ন', 'তুমি যেখানেই যাও', 'মুক্তি' ইত্যাদি কবিতার। দ্বিতীয় প্রকারের কবিতাগুলির মধ্যে 'একটি মেয়ে', 'নাগরিকা', 'প্রেম' এবং 'চার অধ্যায়' (বিশেষত শেষ পংক্তি দু'টি) প্রধান। প্রথমোক্ত কবিতাসমূহে বিরহার্ত কবির মনোবেদনা—কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ—বিচিত্র ব্যঞ্জনায় আভাসিত। এই ব্যঞ্জিত বিষাদ তীক্ষ্ন অভিঘাতে আমাদের চিত্তকেও আলোড়িত ক'রে তোলে। যে-প্রেম প্রত্যাশিত মিলনে পরিপূর্ণতা লাভের আগেই বিরহের অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে গিয়েছে, সে-প্রেমের অভিশাপ-স্পৃষ্ট কবি 'নিঃশব্দতার ছন্দ' কবিতায় তাঁর প্রেমিকাকে বিষাদ-অবগাঢ় প্রশ্ন করেছেন, 'আমাকে কেন ছেড়ে যাও / মিলনের মুহূর্ত হতে বিরহের স্তব্ধতায় ?' ; 'একটি রাত্রের সুর' ও 'দুঃস্বপ্ন' কবিতায়

অপ্রাপণীয়া প্রেমিকার বিরহের অনুষঙ্গে ব্যথিত হৃদয়ে অনুভব করেছেন, 'বাতাসে ফুলের গন্ধ, / আর কিসের হাহাকার' এবং 'অন্ধকারের মতো ভারি তোমার দুঃস্বপ্ন, / তোমার দুঃস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারি' ; 'তুমি যেখানেই যাও' কবিতায় প্রেমিকার প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁর আর্ত প্রশ্ন 'আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?' উত্তরবিহীনতার অন্ধকারে অবলুপ্ত হ'য়ে গেলে, 'মুক্তি' কবিতায় তিনি নিজেও ধীরে-ধীরে ডুবে গিয়েছেন নিজের নিঃসীম অন্ধকারে —'আমার অন্ধকারে আমি / নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।' সর্বশেষে, সর্বপ্রথমে উল্লেখিত 'বিরহ'—সমর সেনের বিরহ-বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটি, —যেটি অবয়বে মাত্র সপ্ত-পংক্তিক হ'য়েও নিহিত ব্যঞ্জনায় সপ্ত সমুদ্রের মতো ব্যাপ্ত। সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে মূল্যহানি না-ঘটিয়ে বরং সমগ্র কবিতাটিকেই তাঁর অনুরাগী-অনুরাগিণীদের মনের চোখের সামনে তুলে ধরা যাক ঃ

রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে,
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।

তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এল ঃ পশ্চিমের করুণ আকাশ,
গন্ধে-ভরা হওয়া,
আর পাতার মর্মরধ্বনি।

বিরহকেন্দ্রিক উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা হওয়া ছাড়াও কত কম কথায় কত বেশি ভাব পাঠক-পাঠিকাচিত্তে সংক্রামিত করা যায়, তার দৃষ্টান্ত হিসেবেও কবিতাটি স্মরণীয়।

স্মার্ত-আর্তি-ব্যতিরেকী প্রেমের কবিতার দ্বিতীয়োক্তগুলিতে, আগেই বলেছি, বিরহের বিধুরতা নেই, আছে কামনার বলিষ্ঠতা। একদা যে-প্রেম কবির জীবনে নিঃশব্দচরণে এসে আবার নিঃশব্দচরণেই ফিরে গিয়েছে, অবস্থান করে নি, সেই অতীত প্রেমের চকিত ও অপ্রত্যাশিত অস্তগমনের অবসাদে এই কবিতাগুলি আদৌ অবসন্ন নয়, বর্তমান প্রেমের অনুভূতিতে এগুলি উদ্দাম ও উদ্বেল। বিরহের বিলাপ এগুলিতে উচ্চারিত নয়, কামনার কলাপ এগুলিতে বিস্তারিত। 'একটি মেয়ে' ও 'নাগরিকা' কবিতার যথাক্রমে 'রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম, / আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস' এবং 'সে চোখে নেই নীলার আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা, / শুধু কিসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা, / কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে' পংক্তি-প্রচয়ে সেই কামনা-কলাপেরই বিস্তার আমাদের লক্ষ্যে আসে। সেই সঙ্গে আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে উপস্থিত প্রেমের এই দহন ও দীপ্তি ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে-হ'তে কয়েকটি কবিতায় হিংস্রতার প্রান্তস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে—যেমন 'প্রেম' কবিতাটির প্রথম পংক্তিদ্বয়ে, 'বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে / তোমাকে পাবার বাসনা' কিংবা 'চার অধ্যায়' কবিতার শেষ পংক্তি দু'টিতে, 'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন / এপ্রিলের

বসন্ত আজ।' এ-রকম কামনা-ক্ষুধিত ও কামনা-খোদিত কবিতা সমর সেনের যে আর একটিও নেই, তা নয়; তবে এ-দু'টিই এ-ধরনের কবিতার মধ্যে সর্বাধিক জ্বলন্ত। এ-শ্রেণীর সব ক'টি কবিতারই বিশেষত্ব যা, এই দু'টি কবিতারও বিশেষত্ব তা-ই—অর্থাৎ, দেহ-সম্ভোগের বিপুল তৃষ্ণাকে অরুগ্ন, আদিম ও আরণ্যক হিংস্রতায় রূপান্তর আর তার প্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপায়ণ, এবং তা-ও আবার বর্ণনার বাহুল্যে নয়, মাত্র আভাসে-ইঙ্গিতে, একটি-দু'টি উপমার প্রয়োগে। এ-প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ও যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়; সেটি হচ্ছে এই যে, কামনার এই হিংস্র অনুভূতি ও প্রকাশ সত্ত্বেও সেই কামনার অপূর্ণতাজাত অত্যয়ের ফলে শেষ পর্যন্তও তিনি মতুর্কাম (suicidal) প্রবৃত্তিকে তাঁর কবিতায় কোথাও প্রশ্রয় দেন নি। বরং বিপরীতক্রমে, তাঁর নাতিদীর্ঘ প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রেমকেই তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন,—'স্যাকারিনের মতো মিষ্টি / একটি মেয়ের প্রেম'কে বিস্মৃত হওয়ার সংকল্প ও সেই সংকল্পচ্যুতির দোলাচলে আন্দোলিত তাঁর দীর্ঘতম প্রেমের কবিতা 'চার অধ্যায়ে' 'মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস' ব'লে উপহাস পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য; প্রেমের কবি হিসেবে সমর সেনের আরো একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এখনো বাকি রয়েছে: প্রেমের প্রতি তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণার যুগপৎ জাগরণ। 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন' ('মৃত্যু') ঘোষণার মাধ্যমে তিনি যেমন প্রেমের অমরত্বের প্রতি তাঁর আস্থা ও আকর্ষণের কথা অকপটে প্রকাশ করেছেন, 'মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও' ('একটি বেকার প্রেমিক') উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি তেমনই অনাস্থা ও বিকর্ষণবশত সেই একই প্রেম থেকে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনার কথাও এতটুকু গোপন করেন নি। 'মদনভস্মের প্রার্থনা' কবিতাটিতেও প্রেমমুমুক্ষু কবিকণ্ঠ ('কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু, / আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ') স্পষ্টত শ্রুত।

সমর সেনের 'মৃত্যু', 'স্বর্গ হতে বিদায়,' 'অগ্নিবর্ণ', 'ঘরে বাইরে', 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদিতে এবং আরো কয়েকটি (এগুলিও প্রেমের) কবিতায় গণিকার উপস্থিতি যে-সমস্ত পিউরিটান পাঠক-পাঠিকার পক্ষে মর্মপীড়ার কারণ, তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করি যে এই কবিতাসমূহে গণিকা-প্রসঙ্গের অবতারণা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর সিনিক মনোবৃত্তির প্রকাশ বা রিরংসার কণ্ডুয়নমাত্র নয়, পচনশীল-গলনশীল সমাজ-ব্যবস্থায় 'মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাসে'র অপরিহার্য উপকরণ হিসেবেই বহুবল্লভা ও বহুনিন্দিতা স্বৈরিণীদের তিনি তাঁর কবিতায় স্থান দিয়ে গিয়েছেন। ফলত, এই প্রসঙ্গের অবতারণা তাঁর পক্ষে সমাজ-অনীহার নয়, সমাজ-অন্বীক্ষারই পরিচায়ক।

প্রেমের কবিতায় নায়িকার রূপ-বর্ণনায় সমর সেন কল্লোলীয় কবিদের মতো তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করেন নি, বরং মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে তাঁদের কৃতকর্মের (অতিবর্ণনের) প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গিয়েছেন। নায়িকার রূপোন্মোচনে বর্ণনার প্রত্যক্ষতার পরিবর্তে ইঙ্গিতের পরোক্ষতার তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন, শুধু চোখের চাহনিতে এবং হাসির ভঙ্গিতেই তিনি নায়িকার রূপের ও চরিত্ররহস্যের সন্ধান করেছিলেন এবং পেয়েওছিলেন। নারীদেহের রূপ-বর্ণনায় তাঁর পরাঙ্মুখতা আধুনিক বাংলা প্রেমের

কবিতার আরেক রূপশিল্পী ত্রিশের দশকের অমিয় চক্রবর্তী'র কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়িয়ে দ্যায়—অবশ্য অমিয় চক্রবর্তী এ-ব্যাপারে আরো কয়েক ধাপ অগ্রবর্তী, কেননা তাঁর প্রেমের কবিতায় নারীদেহের রূপবর্ণনা তো নেই-ই, এমন কি বর্ণনযোগ্য নারীদেহই উপস্থিত নেই। তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য রক্তমাংসের নারীদেহের অনুপস্থিতি অথচ নারীপ্রেমের সুরভিটুকুর উপস্থিতি।

সমর সেনের কবিতায় নিসর্গচিত্রণ নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতিচেতনাসঞ্জাত নয়, তা সামগ্রিক সমাজচৈতন্যপ্রসূত। জরিষ্ণু যে-সমাজ ও তার সহস্র জটিলতাকে তিনি তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, সেই সমাজের স্বরূপ উন্মোচন ও তার বিবিধ জটিলতার প্রকৃতি নির্ধারণ—এই প্রাথমিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁর কবিতায় নিসর্গকে তিনি অভ্যর্থিত করেছিলেন। নিসর্গ, তাঁর কবিতায়, সমাজের অংশ-সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। এই স্বীকৃতি তাঁর কবিতায় রয়েছে যে, জীব-জগৎ ও নিসর্গ-জগৎ, আপাতপার্থক্য সত্ত্বেও, আসলে বৃহত্তর সৃষ্টিজগতেরই দুই পরিপূরক অংশ—একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্পূর্ণ ও আংশিক। ফলে, তাঁর কবিতায় যে-নিসর্গের আমরা সাক্ষাৎ পাই, তা সাধারণ নিসর্গ নয়, তা বিশেষ ; তা মানব-সম্পর্ক বিরহিত নিসর্গ নয়, তা মানব-সম্পর্ক আরোপিত—এমন কি তা মানবায়িত নিসর্গ বা Humanised Nature, তা ব্যক্তিত্বমন্ডিত নিসর্গ বা Personified Nature। অতএব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিসর্গ-কবিতায় চুলে সোনার কলপ-মাখানো বৃদ্ধ দিনের আগমন ঘটে, শোকবিধুরা রমণীর মতো 'রক্তহীন মুখ অন্ধকারে ঢেকে' দিন চ'লে যায়, দেহের পরতে-পরতে অন্ধকারের মায়াজাল বিছিয়ে ও চোখে সুর্মার মায়াঞ্জন বুলিয়ে মোহময়ী স্বৈরিণীর সাজে সন্ধ্যা আবির্ভূত হয়, পরিস্থিতির পরিবর্তনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে একাকী বিষাদের গান গাইতে-গাইতে বাতাস ফেরারী হ'য়ে যায়, কারখানার চিমনি আকাশে উদয়াস্ত কালো রক্ত উগ্‌রে দেয়, বিদ্যুৎ ঘৃণা জানায়, শুষ্ক ফনিমনসা ও রুক্ষ বালিমৃত্তিকা প্রাণের প্রতিরোধে ষড়যন্ত্র করে। তাঁর নৈসর্গিক কবিতায় নিসর্গের ললাটে সমস্যাসঙ্কুল সমাজ-জীবনের বলিরেখা, সেই রেখার কখনো-স্পষ্ট-কখনো-অস্পষ্ট আঁচড় তাঁর কবিতায় কিছুতেই আমাদের নজর এড়াবার নয়। 'নাগরিক', 'নাগরিকা', 'ঝড়', 'ঘুম', 'মৃত্যু', 'মুক্তি', 'নিরালা', 'গ্রহণ', 'শবযাত্রা', 'মেঘদূত', 'কয়েকটি দিন', 'মহুয়ার দেশ' ইত্যাদি কবিতার প্রতিটিই এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে আঁকা অপূর্ব Landscape যে-নিসর্গপ্রসৃষ্টি, মানুষ তার সভ্যতাবিস্তারের অঙ্গস্বরূপ নগর-পরিকল্পনায় তাকে যেভাবে বিকৃত করেছে, সেই বিকৃতির ক্লেদরক্ত সমর সেনের কবিতার নগর-নিসর্গের অঙ্গে-অঙ্গে প্রলেপিত। সে-নিসর্গ প্রশান্তি-নীরব নয়, যন্ত্রের বিবিধ শব্দে, মানুষের বিচিত্র কোলাহলে এবং জীব-জন্তুর বহুবিধ চীৎকারে-শীৎকারে তা নিয়ত-মুখরিত ; সে-নিসর্গ শুধুই বিকচ পুষ্পের সুবাস-সুরভিত নয়, ইভ্‌নিং-ইন-প্যারিসের, গোল্ডফ্লেকের, গলানো পিচের, ব্লিচিং পাউডারের, কেরোসিনের, ধোঁয়ার—এমন কি বারুদেরও—নানাবিধ গন্ধে তা

সতত-কলুষিত। এই এবং এমন যে-নিসর্গ, যার আরেক নাম নগর-নিসর্গ, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে তার সার্থক রূপায়ণে সমর সেন অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ।

সমর সেনের নিসর্গদৃষ্টির স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে 'নাগরিক', 'শবযাত্রা', 'মহুয়ার দেশ' এবং 'নিরালা'—অন্তত এ-চারটি কবিতার আলোচনা, সংক্ষেপে হ'লেও, অত্যাবশ্যক ; কেননা এই কবিতা চারটিতেই তাঁর সেই দৃষ্টির প্রকাশ সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। 'নাগরিক' কবিতায় স্বয়ং মহানগরী কলকাতাই কবিকল্পনার সেই নাগরিক, যার দিনগুলি 'বিবর্ণ', রাতগুলি 'আলকাতরার মতো' ঘনকালো। ইংরেজ-আগমনপূর্ব যুগের সামন্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধের ভূমিশয্যায় সে শায়িত। তার সেই শয্যা, কবির দৃষ্টিতে, 'ভস্মঅপমান শয্যা।' সেই শয্যায় শুয়ে 'সমস্ত দিন ভরে' সে শোনে 'রোলারের শব্দ', সে দ্যাখে 'পাটের কলের উপরে আকাশ…/ পাথরের মতো কঠিন' ; তার নাসিকা ব্যেপে হাওয়ায়-ভেসে-আসা 'গলানো পিচের গন্ধ,' দৃষ্টি জুড়ে 'যতদূর চাই ইঁটের অরণ্য'। কিন্তু সেই 'ভস্মঅপমান শয্যা' থেকে তার চোখে অন্য দৃশ্যও ভেসে ওঠে—বিপরীত—অনাবিল নিসর্গের ঃ

> দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
> মাঝখানে গেরুয়া পথ,
> দূরে সূর্য অস্ত গেল ;
> ভরা চাঁদ এল নদীর উপরে,
> চারদিকে অন্ধকার—রাত্রের ঝাপসা গন্ধ…।

তার শরীরের চোখে দ্রুত বিস্তার্যমান নগর-নিসর্গের দৃশ্য, মনের চোখে দ্রুত অপসৃয়মান পল্লী-নিসর্গের স্বপ্ন। এই দোটানায় সে আর্ত, তার সমগ্র সত্তা উন্মথিত। কবিতাটিতে ব্যবহৃত 'ইঁটের অরণ্য' শব্দ-যুগ্মে এই ভাবটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনালাভ করেছে। 'ইঁটের' মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে নগর-নিসর্গের রুক্ষ-রূঢ়-কর্কশ রূপ আর 'অরণ্য' শব্দটিতে ব্যঞ্জনা পেয়েছে পল্লী-নিসর্গের নরম-কোমল-পেলব মাধুর্য। সমর সেনের নাগরিক নৈসর্গিক কবিতায় একটি কাম্য ও রম্য জীবনের সঙ্গে 'মুক্তকচ্ছ' ও 'হোঁচটে ভরা' নগর-জীবনের প্রতি মুহূর্তের সংঘাত ঘুচিয়ে একটি সুমিত সহাবস্থানে স্থিত হবার বাসনা বারে-বারেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর যুগব্যাপ্ত কবিজীবনে সেই বাসনাপূরণ দিনেকের জন্যও ঘটেনি ; এবং ঘটেনি ব'লেই অপূর্ণ সেই বাসনার তাড়নায় কবিতার-পর-কবিতায় তিনি আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত উন্মোচিত করেছেন, স্বপ্নের আর দুঃস্বপ্নের জাল বুনে গিয়েছেন। 'নাগরিক' কবিতাটি এ-বিষয়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

'শবযাত্রা' কবিতাটিও নাগরিক নিসর্গের ; কিন্তু এটির পটভূমি কলকাতা মহানগরী নয়, মহানগরী দিল্লী। কবিতাটিতে দিল্লী, কবির কল্পনায়, হৃতস্বাস্থ্য ও বিলুপ্ত যৌবনা এক মুমূর্ষু শাহজাদী। তার সর্বাঙ্গ ব্যেপে নবাবী আমলের বিগতশ্রী, তার আলো-অন্ধকার, তার দিবাবসানের শেষ রশ্মিচ্ছটা ; তার জীবন জুড়ে তখনো পাখোয়াজের বোল এবং বাঈজীর কণ্ঠোত্থিত সুরের মূর্চ্ছনা। অথচ তার সাম্রাজ্য

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত, সে-সাম্রাজ্যের দশা নাভিশ্বাসগ্রস্ত। কালের করালঝঞ্ঝায় ক্ষত-বিক্ষত সেই সাম্রাজ্যের কবিপ্রদত্ত বর্ণনা :

ভাঙা পাথর, মাইলের পর মাইল ;
জরাগ্রস্ত মসজিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ণ গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব ;

নগর-নিসর্গের এবং সেই সঙ্গে নাগরিক জীবনেরও সর্বাঙ্গীন রিক্ততাস্পৃষ্ট কবিতাটির আদ্যোপান্ত হতভাগিনী শাহজাদীর ক্ষীণশক্তি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, দৈন্যাক্লিষ্ট বর্তমান থেকে দৈন্যমুক্ত অতীতের দিকে সকাতর দৃষ্টিপ্রক্ষেপণ পাঠকপ্রাণের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে সমবেদনার অনুরণন জাগায়, এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সমর সেনের কবিতায় নিসর্গের প্রেক্ষিতে জীবন এবং জীবনের পটভূমিকায় নিসর্গ রূপায়িত হয়েছে।

সমর সেন তাঁর কবিতায় সমাজকে যেমন পল্লী ও নগর—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, নিসর্গকেও তেমনই নাগরিক ও গ্রাম্য—এই শ্রেণীবিন্যাসে অবলোকন করেছেন। 'নাগরিক' ও 'শবযাত্রা' নগর-নিসর্গের এবং 'মহুয়ার দেশ' ও 'নিরালা' গ্রাম-নিসর্গের কবিতা। 'মহুয়ার দেশ', নাম থেকেই অনুমিত হয়, সাঁওতাল পল্লীর এবং 'নিরালা' (এ-ক্ষেত্রেও নাম থেকে বোঝা যায়), বাংলার নিভৃত পল্লীর নিসর্গ-রূপায়ণ। স্মৃতিরোমন্থনপ্রবণ সমর সেনের কবিমানসে সাঁওতাল পরগনার নিসর্গ-পরিবেশ অনেকটা এলাকা জুড়ে বিরাজিত ছিলো ; কিন্তু সেই নিসর্গ কখনোই উজ্জ্বল নয়, তা সর্বদাই নিষ্প্রভ ; রৌদ্র-দীপ্ত না-হ'য়ে তা কুশায়া-আবৃত। সাঁওতালী পল্লী-নিসর্গকে এই কুয়াশার অবগুণ্ঠনে আবৃত করা, আমার বিবেচনায়, কোনো আপতিক বা আকস্মিক ব্যাপার নয়, তা প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত। এই কুয়াশার আবরণ আগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার ক্রমবিস্তার্যমানতার প্রতীক। 'বকধার্মিক' ('কুয়াশায় ঝাপ্‌সা পাহাড়, / লাল পথে কালো সাঁওতাল মেয়ে'), 'পলাতক' ('বন্ধুর পাহাড়, / কুয়াশায় ভরেছে সাঁওতাল গ্রাম') এবং আরো কয়েকটি কবিতাতে এই কুয়াশার সাক্ষাৎ মিললেও 'মহুয়ার দেশ' (এবং 'ঝড়') কবিতায় তার তাৎপর্য অনেক গভীর। সভ্যতার দ্রুতবর্ধমান গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সাঁওতালী জীবনের স্বাভাবিক স্বপ্ন কীভাবে দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে, 'মহুয়ার দেশ' কবিতাটি তারই নিপুণ উন্মোচন :

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

'নিরালা' কবিতাটিতেও কবি পলায়নী মনোবৃত্তির বশে নয়, সমগ্র দেশ ও জাতির হৃদ্স্পন্দনের উৎসে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষেই 'বর্তমানে মস্তকচ্ছ, ভবিষ্যত হোঁচটে ভরা' নগরজীবনের সহস্র কৃত্রিম আকর্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে বাংলার 'শেয়াল-সঙ্কুল কোনো নির্জন গ্রামে', 'নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে', 'কুঁড়ে-ঘর' বাঁধতে চেয়েছেন। কবিতাটিতে বঙ্গপ্রকৃতির কেবল পেলব-কোমল দিক্‌টিই নয়, সেই প্রকৃতির করুণ-শ্রীহীন দিক্‌টিও আন্তরিকভাবে উদ্ঘাটিত। কবিতাটির নস্ট্যাল্‌জিয়া এখানটায় যে এটিতে নিরবধি কাল বাংলার পল্লীপ্রকৃতিকে আপন অঙ্কে শায়িত ক'রে উন্মুক্ত আকাশের নিচে সহ্যশীলা জননীর মতো একাকিনী সমসীনা :

> নিরালা কাল আপন মনে
> পুরোনো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে।

সমর সেনের নিপুণ কলমে আঁকা নগর-নিসর্গের চিত্রগুলি পোস্টারধর্মী, কিন্তু পল্লী-নিসর্গের অঙ্কনরীতি পটচিত্রের। তাঁর, কি শহরের কি গ্রামের, অধিকাংশ নিসর্গদৃশ্যই —'একটি বেগুনি রঙের মেঘ দিগন্ত ছেড়ে উঠল' ('মৃত্যু'), 'উড়ন্ত চিল আকাশে নীল বিন্দু' ('শবযাত্রা'), 'গেরুয়া ধানক্ষেতে অতিকায় সূর্য অস্ত যায়' ('স্টালিনগ্রাড'), 'ধানক্ষেতে হেমন্তের ঈষৎ-বিষণ্ণ হাত, দূর গ্রামে কুয়াশা' ('নষ্টনীড়'), 'ধূসর মাঠের পাশে ধূমায়িত নদীর রেখা' ('৯ই আগস্ট ১৯৪৫')—বিধুরতার স্পর্শ-লাগা।

বাংলা কাব্যে সমর সেন ঐতিহ্যবিচ্যুত নন, ঐতিহ্যাশ্রিত। দীর্ঘ কালপ্রবাহে মুকুন্দরাম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শ্লাঘনীয় যে-ঐতিহ্য আমাদের কাব্যে গ'ড়ে উঠেছে, সে-ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে পরিচিত ও বিজড়িত। তাঁর কবিতার বিচিত্র আবহে তাঁর পূর্ববর্তী বহু বাঙালী কবি ও গদ্য-লেখককে তিনি উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর, শুধু আমন্ত্রণ জানানোই নয়, তাঁদের অনেকের অনেক রচনার অনেক বাক্য ও বাক্যাংশ, পংক্তি ও পংক্তি-খণ্ড, শিরোনাম ইত্যাদিকে অক্লেশে তাঁর কবিতায় তিনি গ্রহণও করেছেন। এটা, অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে, পরস্বাপহরণের প্রমাণ নয়, এটা ঐতিহ্যকে আত্তীকরণের এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে সমগ্রত যুক্তকরণের প্রমাণ। কেননা গৃহীত অংশগুলি পরস্ব হ'লেও নিজের কবিতায় সেই অংশসমূহকে ব্যবহারের—অর্থাৎ, উদ্ধৃতির ফাঁদে বন্দী করার—কৌশলটি কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাঁর কবিতায় এ-ধরনের আগত অংশ রবীন্দ্রনাথ থেকেই সর্বাধিক। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা যদিও তাঁর বিখ্যাত গদ্যরচনা 'বাবুবৃত্তান্তে'র এক স্থানে (১২৯ পৃষ্ঠায়) রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে মনে হতো জোলো', তবু ঐ একই গ্রন্থের অন্যত্র (২৭ পৃষ্ঠায়) তাঁর স্বীকৃতি, 'রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতাগুলি অন্য জগতের লেখা।' তাছাড়া, কালসংবিত কবি সমর সেনের নিজের কবিতার ধ্রুবপদটিই তো কবি রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও'-এর সুরে বাঁধা। তবু একই সঙ্গে এ-কথাও সমানভাবে স্মর্তব্য যে রবীন্দ্র-পংক্তির পৌনঃপুনিক উদ্ধৃতিকে প্রায়শ তিনি প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের নিসর্গদৃষ্টি ও প্রেমভাবনার স্বপক্ষে নয়—নিজের মতো

ক'রে—বিপক্ষে। কিন্তু, তাঁরই ভাষায়, 'বেদ-উপনিষদের বুলি মুখে···অক্লান্ত বাউল' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-বিশ্বাস হ'তে দিনেকের তরেও তিনি বিচ্যুত হন নি যে অমিত-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ মাত্র দেশকালাতীতই নন, তিনি সর্ব-বিবাদী-মূল্যবোধ-অতিক্রমী, তিনি সমগ্র মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও প্রকাশ-মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদন—এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর কবিতায় বারে-বারে পদার্পণ করেছেন। এ-সম্পর্কে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি কবিতা 'রোমন্থন', 'স্তোত্র' ও 'ক্লান্তি'র কথা বাদ দিলেও, মাত্র 'গৃহস্তবিলাপ' কবিতাটির পর্বানুক্রমিক বিশ্লেষণ থেকেই প্রভূত প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। তাঁর কবিতায় গৃহীত পরস্মৈপদী অংশগুলি অধিকাংশ স্থলে যেমন আত্মনেপদীতে পরিণত, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তেমনই 'প্যারোডি'তে পর্যবসিত।

পূর্ণত পংক্তিগ্রহণের মতো অংশত শব্দের নির্বাচনে, প্রতীকের প্রয়োগে, উপমার উদ্ভাবনে এবং ব্যঙ্গের বিষয় স্থিরীকরণেও সমর সেনের পরস্বকে স্বীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজস্বে পরিণত করার প্রবণতা স্পষ্টত লক্ষ্যণীয়। আসলে, উপলব্ধির সমধর্মিতা যে অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গ-প্রসাধনের সাদৃশ্যের হেতু—এই সত্যটি তাঁর কবিতায় স্বীকৃত। যদিও তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব ও দেশী—ইত্যাদি সর্ববিধ বাংলা শব্দের ব্যতিক্রমজনক বিশুদ্ধ ব্যবহারই তাঁর কবিতার ভাষাঘটিত প্রধান গৌরব, তবু সেই সঙ্গে কিছুসংখ্যক হিন্দী, উর্দু ও নিত্যচলিত ইংরেজি—অর্থাৎ বঙ্গভাষা-বহির্ভূত—শব্দের সুপ্রয়োগও তাঁর কবিতার পক্ষে কিছু কম গৌরবের নয়। তাঁর সংখ্যাল্প অথচ মৌলিক কবিতাগুলির অনেকগুলিতেই নির্দিষ্ট কতিপয় শব্দের আবৃত্ত-প্রয়োগ (recurring use) লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু সেই শব্দগুলি একই অর্থে বা প্রসঙ্গে পুনঃপুন ব্যবহৃত না-হওয়ায় কোনো মুদ্রাদোষ বা ম্যানারিজমের সৃষ্টি হয় নি। পুনরুক্তিতে অধঃপতিত না-হ'য়ে নূতনোক্তিতে সেগুলি উন্নীত হয়েছে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত সীমিত অথচ সুনির্বাচিত শব্দাবলী মাত্র অর্থেই সমৃদ্ধ নয়, মৃত অতীতের কাহিনীকথনেও মুখর। তাঁর কবিতায় প্রতীকের প্রয়োগ ব্যাপক, তার পরিধি ব্যাপ্ত। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নানা চরিত্র (উর্বশী, যযাতি, পুরূরবা, নচিকেতা, পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, অগ্নিবর্ণ ও দধীচি এবং (মকলে, মীরজাফর ও মহম্মদী বেগ), সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনা (বেকারীত্ব, বিরহজ্বালা, অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ এবং শ্রেণী-সংঘর্ষ, বিপ্লব ও বিদ্রোহ), প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক বিভিন্ন বস্তু ও শক্তি (অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র ও মরুভূমি এবং ঝড়, বৃষ্টি, খরা ও বন্যা), এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে উপমা ('মৃত্যু' কবিতায় শেষ পংক্তিতে 'আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো।') এবং প্রবচনও ('পিরীতি বালুর বাঁধ', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', 'বিষে বিষক্ষয়', 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', 'সবেধন নীলমণি' ও আরো অনেক)—ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তাঁর কবিতায় প্রতীকায়িত। তাঁর প্রতীকী-নৈপুণ্যের নিদর্শনস্বরূপ বিশেষভাবে উল্লেখ করছি তিনটি কবিতার নাম—'একটি বুদ্ধিজীবী', 'লোকের হাটে' এবং 'ক্লান্তি'। তিনটি

কবিতাতেই, বক্তব্যের বিভিন্নতায় একই পৌরাণিক চরিত্র ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব অবলম্বনে তিনটি প্রতীকের অবতারণা করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু, আলো ও অন্ধকার, পেঁচা ও শকুন, সূর্য ও বটবৃক্ষ—ইত্যাদিও তাঁর কবিতায় বিশেষ অর্থব্যঞ্জক প্রতীক। প্রতীক, যে-কোনো কবির পক্ষেই, তাঁর বক্তব্যকে অর্থসঘন ও সংক্ষিপ্তকরণের উপায়। ফলে,, প্রতীকমাত্রেই প্রকৃতপক্ষে বীজাকারে মহীরূহ। কবি হিসেবে সমর সেন অপ্রগল্ভ, সংক্ষিপ্তধর্মী এবং ব্যঞ্জনাবহুল রচনারীতির পক্ষপাতী ছিলেন ব'লেই তাঁর কবিতায় প্রতীকের প্রয়োগ এত প্রচুর, বিচিত্র ও সার্থক। কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তিনি একাধারে ঈশ্বর গুপ্তের উত্তরসূরী ও উত্তরসাধক। তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গে ভারের চেয়ে ধারের বাহুল্য, বিদ্রূপে প্রহারপ্রবণতার তুলনায় দংশনসুখোপভোগপ্রবৃত্তির প্রাবল্য। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিল্পীরূপে তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তার শরাঘাত সমস্ত সমাজের সঙ্গে নিজেকেও তিনি জর্জরিত করেছেন।

সমর সেন সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর গদ্যছন্দের প্রসঙ্গের উত্থাপন শুধু সঙ্গতই নয়, অনিবার্যও ; কেননা এই গদ্যছন্দই—যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, আগেই বলেছি, 'এতই অভিনব···যে তার উৎস খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক'—তাঁর কাব্যের প্রধান টেকনিক, তাঁর কবিতার একমাত্র বাহন। তাঁর গদ্যছন্দের উৎস-সন্ধান হয়তো 'নিরর্থক', কিন্তু এই ছন্দে তাঁর সাফল্যের হেতুনির্ণয় নিশ্চয়ই অনর্থক নয়। তাঁর একটি কবিতায় সেই যে অতীতে একদা তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, 'কালক্রমে টেকনিক নিয়ে যাবে নব কাব্যলোকে', পরবর্তীকালে তাঁর সে-আশা পূর্ণতা লাভ করেছিলো প্রধানত এই গদ্য-ছন্দের কারণেই ; কেননা, বস্তুত, গদ্যছন্দরূপী টেকনিকের সাহায্যেই একদিন তিনি তার ঈপ্সিত 'নব কাব্যলোকে' উত্তীর্ণ হ'তে সক্ষম হয়েছিলেন।

গদ্যছন্দের দুরূহতায় সমর সেনের সাফল্যের প্রধান কারণ এই দুরূহ ছন্দরূপে তাঁর পূর্ববর্তী ও প্রায় সমকালীন বাঙালী কবিদের স্মরণীয় বৈফল্য ও বিপর্যয়। শিল্প-সাহিত্যের সংসারে এ-রকম দৃষ্টান্তের একেবারেই অভাব নেই, যে-ক্ষেত্রে একজনের বিফলতার হেতু অন্যজনের সফলতার কারণ। গদ্যকবিতার দুর্গম অভিযাত্রায় তাঁর পূর্বজ ও সমকালীনদের বৈফল্যবরণ এবং তাঁর সাফল্যঅর্জন বাংলা কাব্যের ইতিবৃত্তে একই যাত্রার পৃথক (এ-ক্ষেত্রে প্রায় বিপরীত) ফলের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গদ্যছন্দে তাঁর পূর্বজ-সমজ বাঙালী কবিদের বৈফল্য-বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত থেকেই এই মূল্যবান শিক্ষাটুকু তিনি গ্রহণ করেছিলেন যে প্রথা-নিগড়িত ছন্দের বন্দনদশা থেকে মুক্তি না-ঘটলে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। উপরন্তু একই সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও তিনি উপনীত হয়েছিলেন যে গদ্য-পদ্যের বিবাদভঞ্জন ব্যতীত সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রগতির পথ অবরুদ্ধ। ফলত, কাল-সচেতন, ইতিহাস-সচেতন ও জীবন-সচেতন একজন কবি হিসেবে তিনি তাঁর আনুপূর্বিক কবিতার একমাত্র বাহনরূপে গদ্যছন্দকেই গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য বাংলা কবিতার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবম্বিধ শঙ্কাতুর উপলব্ধির অঙ্কুর তাঁরও আগে রবীন্দ্রমানসেই প্রথম উদ্গত

হয়েছিলো, যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে গদ্যছন্দের আদি উৎসের সন্ধান পেয়ে গদ্যছন্দের চর্চায় এবং গদ্যকবিতা রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন—যদিও এ-প্রসঙ্গে এই অপ্রিয় সত্যটি অনস্বীকার্য যে একমাত্র 'শেষলেখা'র কবিতাগুলি ছাড়া তাঁর অন্য গদ্যকবিতাগুলিতে কিন্তু গদ্যের ছন্দ নেই, আছে ছন্দের গদ্য। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন গীতিকবি, সুরের সাধক—স্বরের আরাধক নন। সুর-সমন্বিত সঙ্গীত রচনা তাঁর পক্ষে ছিলো প্রশ্বাস গ্রহণের মতো সহজ আর নির্ভাঁজ গদ্যছন্দে কবিতা লেখা নিঃশ্বাস নিরোধের মতোই কঠিন।

গদ্যছন্দের কবিতায় সাফল্য অর্জনের ব্যাপারে সমর সেনকে যিনি সর্বাধিক সাহায্য করেছেন, তিনি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ কিংবা কোনো ভারতীয় কবি নন, তিনি বিশ্বকাব্যের ইতিহাসে গদ্যছন্দের আদি উদ্ভাবক ফরাসী কবি লাফুর্গ-প্রভাবিত ইংরেজ কবি এলিয়ট। অন্ত্যমিলপ্রধান ছন্দের প্রাকরণিক বন্ধনমুমুক্ষাই যে গদ্যছন্দের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বা তার শেষ কথা নয়, বরং উত্তম গদ্যের পরিমিতিবোধ এবং বাক্যের গঠন ও বিন্যাস-রীতিকে উৎকৃষ্ট কবিতার অন্তর্নিহিত সাঙ্গীতিক মূর্চ্ছনার (musical resonnance) সমীপবর্তী ক'রে তোলার যৌগপদ্যই যে গদ্যছন্দের মুখ্য অন্বেষণ, গদ্যকবিতার ছন্দ যে আসলে একই সঙ্গে চোখে দেখার ও কানে শোনার, নীরব ও সরব হওয়ার সম্মিলিত প্রয়াসের পরিণতি ও পরিণাম, বলিষ্ঠ ও বেগবান শব্দপ্রয়োগের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অর্থ-ব্যঞ্জক বাক্-পর্ব (word-phase) গঠন করাতেই যে গদ্যকবিতার সিদ্ধি,—ইত্যাদি গদ্যছন্দ ও গদ্যকবিতা-সংক্রান্ত মূল ভাবনাসমূহের সঙ্গে এলিয়টের রচনার মাধ্যমেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, আধুনিক কাব্যসমালোচনায় বহু-ব্যবহৃত ও বহুশ্রুত 'objective correlative' (অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যানুভূতি)-এর জটিল ধারণাটির সঙ্গেও এলিয়ট-মারফৎই তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো। পঠনসূত্রে এলিয়টের কাব্যগত ধ্যান-ধারণাকে যেভাবে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন, তারই ফলে তাঁর আয়ত্তে এসেছিলো এমন এক কাব্যকৌশল বা টেকনিক, যার সাহায্যে ছুতোরের বাটালির মতো চেঁছে-কুঁদে পুরোনো কালের পুতুলকে তিনি আধুনিক যুগের প্রতিমায় রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন, পেরেছিলেন সমকালীন ইতিহাসকে কবিতার নক্সায় নিপুণভাবে বুনে রাখতে। বস্তুত, এলিয়ট সাহেবের দাক্ষিণ্যেই তিনি প্রমাণ ক'রে গিয়েছেন যে কবি হিসেবে তিনি 'Amalgamation of disparate experience' বা বিবাদী অভিজ্ঞতাকে একীভূত করার কৌশলী শিল্পী, তাঁর কবিতা প্রমাণ করতে পেরেছে যে উত্তম গদ্যছন্দ বা 'Good blank verse' 'should be sonorous'।

Middle-claas frustration অবলম্বনে এবং wit ও humour-এর আশ্রয়ে এমন সামগ্রিক কবিতা (total poem) সৃষ্টি বাংলা ভাষায় সমর সেনের সমসাময়িক-দের মধ্যে অন্য কেউই করতে পারেন নি, যদিও তিরিশের যুগের অন্য বাঙালী কবিদের তুলনায় সমর সেন তাঁর কবিতায় ক্রমপরিণতিহীন এবং বৈচিত্র্যবিহীনও। ক্রমপরিণতি-হীন এই কারণে যে কবি হিসেবে তিনি ছিলেন অকালপরিণত, অতিপরিণত কবিতা

দিয়েই তিনি কাব্যযাত্রা শুরু করেছিলেন ; ফলে, ক্রমাগত কাব্যপরিণতির পথে অগ্রসর হওয়ার কোনো আন্তর-তাড়না (inner drive) তাঁর নাতিদীর্ঘ কবিজীবনে কোনোদিনই তিনি অনুভব করেন নি। আর, তিনি বৈচিত্র্যবিহীন এজন্য সে একই গদ্যছন্দে এবং একই নাগরিক বিরোধ (urban antinomy)-বিষয়ে রচিত তাঁর অধিকাংশ কবিতা। অর্থাৎ, আসলে সারাজীবনে সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি এক এবং একটি কবিতাই রচনা ক'রে গিয়েছেন। এই ক্রমপরিণতিহীনতা এবং বৈচিত্র্যবিহীনতা কবি হিসেবে তাঁর ভবিষ্যতের পক্ষে আদৌ সুফলপ্রসব করেনি, কেননা এরই ফলে তাঁর কবি-প্রতিভায় ঘনিয়ে এসেছিলো অকালবন্ধ্যাত্বের ঘন অন্ধকার।

সমাপ্তিতে পৌঁছে ফিরে যাই এই আলোচনারই প্রথম দিকে—ধূর্জটিপ্রসাদের সমর-মূল্যায়নে। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে প্রগতিশীলতার মধ্যে আধুনিকতা নিহিত থাকে, কিন্তু আধুনিকতার মধ্যে প্রগতিশীলতা না-ও থাকতে পারে—সৃষ্টির দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া (dialectical process) এমনই জটিল। সমর সেন তাঁর কবিতায় আধুনিকের মতো বলেছেন, 'পৃথিবীতে নূতন পৃথিবী আনো, / হানো ইস্পাতের উদ্যত দিন', কিন্তু পারেন নি প্রগতিশীলের মতো সেই পৃথিবী ও সেই দিনকে আনতে। পারেন নি, কারণ তাঁর ছিলো না সেই যথার্থ অতীত, যার গুরুত্ব প্রসঙ্গে 'The Family Reunion'-এর এক স্থানে এলিয়টের প্রাজ্ঞ মন্তব্য—'The future can only be built upon the real past.'। সমর সেনের কালচেতনায় এলিয়টের এই প্রাজ্ঞতা অনুপস্থিত ॥

ইতিপূর্বে প্রকাশিত আমার 'সাহিত্যের স্বাধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮২) এবং 'তিরিশ-পরবর্তী বাংলা কবিতার দিক্‌চিহ্ন' (১৯৮৮) গ্রন্থ দু'টিতে, বিশেষত শেষোক্তটিতে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। কবি হিসেবে তাঁর এবং শিল্পরূপে তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমার যা বলার, তার প্রায় সবই ঐ আলোচনাগ্রন্থদ্বয়ের দু'টি প্রবন্ধে আমি বলেছি। সেই কথাগুলির এখানে আর পুনরুক্তি করবো না, কেননা তা নিষ্প্রয়োজন। এখানে আমি সেই প্রবন্ধ দু'টিতে ভালোভাবে যা বলা হয়নি, মাত্র তেমন কয়েকটি কথাই বলার চেষ্টা করবো। অবশ্য তাতেও পুরোনো কথার কিছু-না-কিছু অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে—এই আলোচনার সম্পূর্ণতার প্রয়োজনেই।

সামগ্রিকভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলার সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে কবি হিসেবে তিনি যত না মৌলিক, সজীব তার চেয়ে অনেক বেশি। সেই সজীবতার সাক্ষী তাঁর দীর্ঘ কবিজীবন—যার আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সমানভাবে সক্রিয়—এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থের উপর্যুপরি প্রকাশ। বস্তুত, সেই সুদূর ১৯40 সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশের পর থেকে তাঁর আপাত-সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক ব্যাপ্ত কালসীমায় কবিতারচনায় বিরতিপর্ব ব'লে তাঁর কিছু ছিলো বা আছে কিনা, সন্দেহ। তিরিশের দশকের দুর্ধর্ষ কবি মণীশ ঘটককে নিয়ে তিনি যে একবার ছড়া কেটেছিলেন, 'এমন মানুষ পাওয়া শক্ত / লেখার রাজ্য ঢুঁড়ে / এই নিচ্ছেন কলম এবং / এই ফেলছেন ছুঁড়ে।'—সে-কথা তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছুতেই প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু সেই দশকেরই আরেক কবি-বরোত্তম অরুণ মিত্র-সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় তিনি যে লিখেছিলেন, 'বয়স যাঁকে ছুঁতে পারে নি'—সেটা তাঁর নিজের সম্পর্কেও সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হবার যোগ্য। তাঁর শারীরিক বয়স (chronological age) সত্তর অতিক্রান্ত, কিন্তু তাঁর মানসিক বয়স (mental age)-এ বার্ধক্যের কোনো ছায়াপাত নেই। কবি ও কবিতাবিষয়ক উদ্যমে ও কর্মিষ্ঠতায় আজও তিনি মনের, এমন কি শরীরের দিক থেকেও, অদম্য তরুণ। আজও তিনি এগিয়ে চলেছেন বয়সের সঙ্গে পাঞ্জা কষে, সময়ের তালে তাল মিলিয়ে, ঘটনার স্রোতে ভাসতে-ভাসতে। এই জঙ্গমতা, বিরতিহীন এই চলিষ্ণুতা, কবি হিসেবে তাঁর সজীবতার মাত্র লক্ষণই নয়, অন্যতম কারণও বটে।

কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর এই সজীবতার স্বপক্ষে সাতকাহন গাইলেও এখনই এবং 'এখানেই' যে-কথাটা না-বললেই নয়, সেটা হচ্ছে এই যে তাঁর কবিসত্তায় সজীবতার

তুলনায় মৌলিকতা অনেক কম। অবশ্য সজীবতা ও মৌলিকতার মধ্যে কোনো সহ-সম্পর্ক (corelation) যেমন নেই, তেমনই নেই কোনো স্পষ্ট বিরোধাভাস (sense of opposition)-ও। মৌলিকতারিক্ত সজীব কবি এবং সজীবতাশূন্য মৌলিক কবি—এই দু'য়েরই সাক্ষাৎ আমরা পৃথিবীর সকল দেশেই এবং সকল কালেই কমবেশি লাভ ক'রে থাকি। এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে তাঁর কবিতায় বিবর্তন আছে এবং অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে সেই বিবর্তনের স্তর-পরম্পরা ও রূপরেখাও যথেষ্ট স্পষ্ট। কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও অবশ্যই অনস্বীকার্য যে স্তরান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতার বিবর্তন বহুরৈখিক (multilinear) নয়, একরৈখিক (unilinear); বহুমাত্রিকতা (multidiamensionality) নয়, একমাত্রিকতা (unidiamensionality)-ই সেই বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য। নিজের কবিতার বিবর্তনের এই একরৈখিকতা ও একমাত্রিকতার মূল কারণ অবশ্যই তাঁর জীবনদৃষ্টির একমুখিনতা।

অথচ জীবনদৃষ্টির একমুখিনতা কোনোক্রমেই মৌলিকতার পরিপন্থী নয়, বরং বহুক্ষেত্রেই অনুপন্থী। জীবন ও জগৎ পর্যবেক্ষণে দৃষ্টির একাভিমুখ্য দেশ-বিদেশের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষেই মৌলিকতার উদ্‌বোধক ও পরিপোষক ব'লেই প্রতিপন্ন হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ-প্রসঙ্গে এ-মুহূর্তে যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ছে, তাঁর কথাই বলি ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তর-শরৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বিশেষ যে-কারণে আমাদের সাহিত্যে তিনি আক্ষরিক অর্থেই অদ্বিতীয়, সেই প্রকৃতিদৃষ্টিতে তিনি বিশেষভাবে একমুখিন, আত্মহারার মতো একাভিমুখী। তিনি প্রকৃতিকে শুধু দেখেনই নি, শুধু প্রকৃতিকেই দেখেছেন তিনি। অথবা আরো সঠিকভাবে বলা যায়, প্রকৃতির ভিতর দিয়েই তিনি জগৎ ও জীবনকে অবলোকন ও গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই সাহিত্যশিল্পী হিসেবে তিনি এত মৌলিক, সাহিত্যশিল্পরূপে তাঁর রচনা এত স্পষ্টরূপে মৌলিকতাসম্পন্ন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও জীবনদৃষ্টিতে—সমগ্র কবিজীবনে না-হ'লেও, অন্তত প্রথম পর্বে তো নিঃসন্দেহেই—একমুখিন। কিন্তু সৃষ্টির মৌলিকত্ব অর্জনের জন্য কেবল দৃষ্টির একমুখিনতাই যথেষ্ট নয়, যাকে আশ্রয় ক'রে একাভিমুখ্যের বিকাশ ও বিবর্তন, প্রয়োজন সেই আশ্রয়টির চিরন্তনতা (eternity) থাকার। বিভূতিভূষণের দৃষ্টির আশ্রয় নিসর্গ-প্রকৃতি চিরন্তন, কিন্তু প্রথম পর্বের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টির একাভিমুখ্য যাকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে, সেই দলীয় রাজনীতি নিতান্তই সাময়িক—চিরন্তনতার সম্ভাবনাশূন্য এবং সকল সম্পর্ক-বিরহিত। দৃষ্টির একমুখিনতার আকড়ে-ধরা আশ্রয়ের এই স্বরূপগত পার্থক্যের দরুণই গদ্যশিল্পী হিসেবে বিভূতিভূষণ মৌলিকতায় যত ভাস্বর, কবি-রূপে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কখনোই তত নন। এমন কি চল্লিশের দশকের সেই উত্তপ্ত সময়ে, যখন দলীয় প্রচারের অত্যুগ্র কোলাহলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠ জীবনানন্দের কণ্ঠকেও ছাপিয়ে উঠেছিলো, তখনো মৌলিকতার নিরিখে তাঁর অবস্থান ছিলো জীবনানন্দের কত নিচে! অর্থাৎ, মৌলিকতার প্রশ্নে বিভূতিভূষণ বা জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর কোনো

বিস্তারিত তুলনায় প্রবৃত্ত না-হ'য়েও মাত্র ইঙ্গিত-তুলনাচ্ছলে (hint-comparison) এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি যে কবিতায় বিবর্তনের কতিপয় স্তর-পরম্পরা অতিক্রম ক'রেও অনন্যপরতন্ত্রতার এমন কোনো উত্তুঙ্গ শিখরে নিজেকে তিনি আজও অধিষ্ঠিত করতে পারেন নি, যে-কারণে তাঁর 'কবি' শিরোপাটির পূর্বে 'মৌলিক' শব্দটিকে বিশেষণরূপে স্থান দেয়া যেতে পারে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' যখন প্রকাশিত হ'লো, তখন তিনি কুড়ি / একুশ বৎসরের সদ্য যুবক। 'পদাতিকে'র কবি বয়সে তরুণ, কিন্তু কবির বয়সের তুলনায় 'পদাতিকে'র কবিতাগুলি অনেক পরিণত। ফলে. কবিতাগুলির পক্ষে তদানীন্তন সমালোচকদের প্রশংসা আদায় করা কঠিন হয়নি। অবশ্য সমালোচকরা সেদিন যে-কারণে 'পদাতিকে'র প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন, তার বেশির ভাগটাই ছিলো কাব্য-কলা-কৌশলগত—এবং তারও আবার বেশিটা প্রধানত ছান্দসিক কৃতিত্বমূলক। কিন্তু শুধু সমালোচকদেরই প্রশংসা কুড়োয় নি 'পদাতিক', তা তখনকার পাঠক-পাঠিকাদেরও মন জয় করেছিলো। আধুনিক কবিতার সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই সেদিন মোহিত হয়েছিলেন 'পদাতিকে'র কবিতাগুলি প'ড়ে। তাঁদের সেই মুগ্ধতার হেতু অবশ্য কবিতাগুলির কারুরীতিগত ছিলো না, ছিলো একেবারেই অন্যবিধ—সেগুলির ভাব বা আরো স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্যগত। সমালোচকদের কাছে 'পদাতিকে'র কবিতাগুলির কারুকৌশলের ধার যতই অনুভূত হোক না কেন, বক্তব্যের ভারই জনপ্রিয়তার পাল্লাকে সেগুলির দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলো সেদিন।

কিন্তু কী কথা ছিলো সেই কবিতাগুলিতে কিংবা কোন্ বক্তব্য, যা জনগণচিত্ত-বিমোহন ব'লে প্রতিভাত হয়েছিলো একদা? এ-প্রশ্নের উত্তরে সত্যের খাতিরে আমি জানাতে বাধ্য যে 'পদাতিকে'র কবিতাগুলিতে ছিলো সেগুলির প্রকাশকালীন যুগের অথবা আরো নির্দিষ্টভাবে 'যুগের হুজুগে'র নির্ভুল প্রতিধ্বনি ঃ

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আজ স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

'মে-দিনের কবিতা'য় যখন তিনি এই ভাষায় তদানীন্তন যুগসংকটকে বিশ্লেষণ করলেন এবং সেই সংকটমোচনের পন্থা হিসেবে 'সকলের গান' কবিতায় সকল কমরেডদের 'লাল উল্কিতে পরস্পরকে' চিনে 'নবযুগ' আনার আহ্বান জানালেন, তখন তা অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাপীড়িত জনচিত্তে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, গণমানসকে তুমুলভাবে আলোড়িত ক'রে তুললো। যুবক পদাতিকের মতোই 'পদাতিকে'র যুবক-কবি কবিতার পদক্ষেপে একেবারে কৃষক ও মজুরদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের কাছেই (সমাজের অন্য স্তরের মানুষদের কারো কাছে নয়) ব্যক্ত করলেন তাঁর তদানীন্তন মনের অভিলাষ ঃ

কৃষক, মজুর ! তোমরা শরণ—
জানি, আজ নেই অন্য গতি ;
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে ।

কিন্তু মাত্র এই কবিতাটিতেই নয়, গ্রন্থটির আরো অনেক কবিতাতেও তাঁর মনের ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছার প্রকাশের ধরনটি প্রায় একই রকমের । 'পদাতিকে'র শেষ কবিতার ঃ

তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমারে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই ।

এই শেষ পংক্তি দু'টির পাঠ থেকেও স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে জীবনের প্রথম গ্রন্থটির কবিতাগুলি লেখার সময় 'নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ'—এই বোধটাই তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিলো ।

অর্থাৎ, 'পদাতিকে'র কবিতাগুচ্ছে এই বোধের প্রাবল্য থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত নয় যে কবিজীবনের প্রথম পর্বের সূচনাতেই কবি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-বৈশিষ্ট্যটি প্রকটিত হ'লো, সেটি হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিতন্ত্র (individualism)-বিপক্ষতা এবং যূথতন্ত্র (collectivism) স্বপক্ষতা । একেবারেই না-রেখেঢেকে, অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই তিনি জানিয়ে দিলেন যে ব্যক্তিবাদে তিনি অনীহ এবং একমাত্র সাম্যবাদের পথে মানবমুক্তির অমোঘ সম্ভাবনাতেই অটল বিশ্বাসী । মানব-মুক্তির পন্থাগত নিজস্ব বিশ্বাসের কথা—যেন সেই মুক্তি অনয়নে কিছুটা দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে চাপিয়ে—এ-ভাবেই তিনি বললেন । এবং এই বিশ্বাসের কথা উচ্চারণে তাঁর কবিকণ্ঠ যেমন স্পষ্ট, তেমনি আন্তরিক । কিন্তু সমাজের অধিসম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্যপালনে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হ'লেও, কাব্যতাত্ত্বিক Cowley সাহেবের এতদ্‌সম্পর্কিত মূল্যবান মন্তব্য 'Duty is the greatest temptation to the poet and the worst'-এর সত্যতাকেই তিনি এই পর্বে পুরোপুরি প্রমাণিত করেছেন । কেননা জনগণ (mass)-এর মুক্তি সাধনের মহাকর্তব্য পালন তাঁর ক্ষেত্রে, অন্তত এই পর্বে, সত্যিই 'the greatest temptation' হ'য়েই দেখা দিয়েছে, হ'য়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে যেন একটা mad craze । কবিতায় জনগণের প্রতি কর্তব্য পালনের মহাপ্রলোভনের খপ্পরে 'পদাতিকে'র কবিরূপে সেই যে তিনি পড়লেন, কবিজীবনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি না-ঘটা পর্যন্ত তা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না, 'পদাতিক'-পরবর্তী আরো তিনটি কাব্যগ্রন্থেও ('চিরকূট', 'অগ্নিকোণ' এবং 'ফুল ফুটুক') সেই একই পথে তিনি পদচারণা করতে থাকলেন । আর, Cowley-কৃত মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশ—এই temptation যে 'the worst'—নিজের কবিজীবনের এই পর্বে এই অর্থে তিনি সত্য ব'লে প্রতিপন্ন করেছেন যে কবিতাকে গণমুক্তিঅর্জনের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বিস্মৃত হয়েছেন । তিনি ভুলে গিয়েছেন যে রাজনীতি এবং কবিতার জগৎ মূলগতভাবেই (fundamentally) পৃথক,

প্রকৃত কবিতা কখনোই কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার নয়। এবং এই কথাটার বিস্মরণ তাঁর এই পর্বের কবিতার যথার্থ কাব্যগুণান্বিত হ'য়ে ওঠার পক্ষে 'the worst' ফলই প্রসব করেছে।

কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা-সম্পর্কিত এই আলোচনার এই স্তরে এ-সব কথা বলা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমার বলার প্রধান কথাটা হচ্ছে এই যে 'পদাতিক' থেকে 'ফুল ফুটুক' পর্যন্ত পর-পর চারটি কাব্যগ্রন্থ জুড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিজীবনের প্রথম পর্বের ব্যাপ্তি এবং এই পর্বের চারটি কাব্যগ্রন্থেই 'ঘোষণা' ('চিরকূট'), 'জয়মণি, স্থির হও' ('ফুল ফুটুক') ইত্যাদি কয়েকটি কবিতার ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে—তাঁর কবিমানসিকতা মূলত এক। একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব ও অনুসরণই তখন তাঁর মধ্যে প্রধান। অবশ্য সেই একই রাজনীতির বিষয়াশ্রিতাতেও এই গ্রন্থ চারটিতে যে একেবারেই পার্থক্য নেই, তা নয়। 'পদাতিকে'র তুলনায় 'চিরকূট' এবং 'অগ্নিকোণে' তাঁর রাজনৈতিক স্বরক্ষেপ (tone) অধিক উচ্চনাদী। 'পদাতিকে'র কবিতাগুলির পাশে রেখে 'চিরকূটে'র 'দীক্ষিতের গান' (পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই / আমিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তাই / ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই।'), 'জনযুদ্ধের গান' ('বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ, রুখবো দস্যুদলকে আজ, / দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ / ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।'), 'জবাব চাই' ('রক্তের ধার রক্তে শুধবো / কসম ভাই / ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের / জবাব চাই।') এবং 'অগ্নিকোণে'র 'অগ্নিকোণ' ('দিন এসে গেছে ভাইরে / রক্তের দামে রক্তের ধার শুধবার। / দিন এসে গেছে ভাইরে / বিদেশী রাজের প্রাণ-ভোমরাকে / নখে নখে টিঁপে মারবার।'), 'মিছিলে'র মুখ' ('অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি / নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার'), ''একটি কবিতার জন্যে' ('দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা / অনাগত এক দিনের ফতোয়া / মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে / মিছিল এগোয়') ইত্যাদি কবিতা পাঠ করলেই প্রথম গ্রন্থটির সঙ্গে দ্বিতীয় গ্রন্থ দু'টির স্বরক্ষেপের মাত্রাগত পার্থক্য আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিজীবনের প্রথম পর্বের অধিকাংশ রচনায় দলীয় রাজনীতির জ্বর কতদূর সংক্রামিত হয়েছে এবং সেই জ্বরের উত্তাপ কতখানি বিকীর্ণ হয়েছে, সে-সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেবার জন্য এখানে তাঁর সেই পর্বের একটি কবিতার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করছি। কবিতাটির নাম 'একটি কবিতার জন্যে।' তাঁর 'অগ্নিকোণ' কাব্য-গ্রন্থের তৃতীয় রচনা এটি। যথাক্রমে দ্বাদশ এবং দশ পংক্তির দু'টি স্তবকে কবিতাটি বিন্যস্ত। দু'টি স্তবকের মতোই কবিতাটির অংশও দু'টি—নিসর্গ ও জনতা। প্রথম অংশের পটভূমি নিসর্গ-প্রকৃতি এবং দ্বিতীয় অংশের উপজীব্য যূথজনতা। কবিতাটি প্রকৃতির (of Nature) অথবা রাজনীতির (of Polities)—এই বিতর্কে প্রবেশের কিংবা এ-সম্পর্কে মতামত জানানোর আগেই এটির প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথাটি আমি জানিয়ে দিতে চাই—এটির ছত্রে-ছত্রে উৎসারিত কবিহৃদয়ের আবেগের কথাটি। এই

আবেগই কবিতাটির মূল চালিকাশক্তি (principal driving force), কেননা এই আবেগ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে সেই বেগ, যা কবিতাটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সমাপ্তির দিকে। এবং এই বেগের অস্তিত্ব কবিতাটির আদ্যন্ত সমান ব'লেই বক্তব্যের ভারে কবিতাটি কোথাও অবনত হ'য়ে পড়ে নি, প্রথম পংক্তি 'একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে' থেকে শুরু ক'রে শেষ পংক্তি 'একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে' পর্যন্ত সেটি সমানভাবে তরঙ্গিত থেকেছে।

এখান থেকেই কবিতাটির আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে, এই গতির এবং তার নিয়ামক আবেগের স্বরূপ-বিশ্লেষণ থেকে। কবিতাটি যে বেগতাড়িত এবং বেগের তাড়নাতেই যে এটি সমাপ্তির দিকে অভিচালিত (directed), এ-সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই ; কিন্তু এ-বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্নের অবকাশ আছে যে, বেগের তাড়না কবিতাটিতে এত তীব্র কেন? তীব্র এই কারণে যে এর পেছনে রয়েছে কবির সেই আবেগ, যা সত্যিই আন্তরিক ; ফলে, গভীর। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠে—অন্তত ওঠানো যেতে পারে (এবং আমি মনে করি ওঠানো উচিতও)—কবির সেই আবেগের এত আন্তরিকতার ও গভীরতারই বা কারণ কী? আর, এই প্রশ্নটি উত্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই এবং এই প্রশ্নটিকে সঙ্গী ক'রেই আমরা এক মুহূর্তে কবিতাটির একেবারে মর্ম-বিন্দু বা core-point-এ পৌঁছে যাই—বিশ্বাস, একটা জ্বলন্ত বিশ্বাসের দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত হই। বিশ্বাসের সেই মর্মবিন্দু থেকেই কবিতাটি উচ্ছ্রিত।

বিশ্বাসের অমোঘতা অনস্বীকার্য। কিন্তু আবারও এখানেই এবং সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, বিশ্বাসের এই অমোঘতা কবি অর্জন করলেন কী ভাবে? এই প্রশ্নটির উত্তরজ্ঞাপনে, সত্যের খাতিরেই, কিঞ্চিৎ কঠোর এবং ঈষৎ অপ্রিয় হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কেননা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির উত্তর-সন্ধানে আধুনিক বাংলা কবিতাবিষয়ক বাজার-চল্‌তি আলোচনাগ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ সমালোচকের সিদ্ধান্তকে অনেক ভেবেচিন্তেও আমি শেষ পর্যন্ত সমর্থন করতে পারছি না। এই কবিতাটিতে তাঁর বিশ্বাসের অমোঘতার উৎস হিসেবে তাঁরা দলমত-নির্বিশেষে মানবিকতার কথাই বলেছেন এবং এ-প্রসঙ্গে তাঁদের প্রায় সকলেই কবিতাটির দ্বিতীয় অংশের 'নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা'—এই পংক্তিটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই পরিণতিতে উপনীত করাবার জন্য 'রক্তের লাল দর্পণে' ভস্ম-লোচনের মুখ দেখা, 'দেয়ালে দেয়ালে' 'অনাগত এক দিনের ফতোয়া' এঁটে দেয়া কিংবা 'মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লট্‌কে দিয়ে' মিছিলের এগোনো ইত্যাদি যে-পংক্তি-স্তবক-পরম্পরায় কবিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা যে স্পষ্টতই রাজনৈতিক এবং বিশেষ-ভাবেই দলীয় রাজনৈতিক—এই স্থূল এবং মূল সত্যটা হয় তাঁদের নজরে পড়েনি, নয়তো তাঁরা ইচ্ছে ক'রেই সেটা এড়িয়ে গিয়েছেন। অথচ বিশ্বাসে এত নির্দ্বিধ হওয়ার মূলে বিশেষ একটি দলীয় রাজনীতির প্রতি কবির নিঃশর্ত আনুগত্যই যে প্রধান, এই সত্যের স্বীকৃতি ব্যতীত কবিতাটির ব্যাখ্যাকে সত্যের ওপর দাঁড় করানোই কঠিন। বিশুদ্ধ

মানবিক রসে কবিতাটির সিঞ্চিত হওয়ার পথে সম্ভাব্য কোনো বাধাই থাকতো না, যদি কবি এই কবিতাটিতে মাত্র 'বিশেষ' কয়েকটি শব্দের অবাধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলতে পারতেন। এখানেই, কবিতাটির, যদি কিছু থেকে থাকে, সীমাবদ্ধতা। না-হ'লে কবিমানসে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক শক্তির নিয়ত সংঘর্ষে কবিতার প্রজ্বলন-প্রক্রিয়ার রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস হিসেবে কবিতাটি নিঃসন্দেহে সার্থক।

এই কবিতাটিতে প্রকৃতির পটভূমি থাকা সত্ত্বেও এটি প্রকৃতির কবিতা নয়, এটি রাজনীতির কবিতা। কেননা সেই পটভূমি প্রকৃতির রূপোন্মোচনের জন্য সৃজিত হয় নি, তা সৃষ্ট হয়েছে রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার রূপায়ণের উদ্দেশ্যে। রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে মানবসমাজের কল্পিত নবরূপায়ণকে কবি প্রতিফলিত দেখেছেন 'রক্তের লাল দর্পণে' ; লোকদেবতা শিবের প্রলয়ঙ্কর মূর্তির স্মারক 'ভস্মলোচন' শব্দটির উল্লেখে কবি বিপ্লবের ভয়ঙ্করতাকেই প্রতীকায়িত করেছেন ; সংক্ষুব্ধ যূথজনতাই কবিকল্পনার 'ভস্মলোচন'। এই জনতাই কবিতাটির দ্বিতীয়াংশের 'কারা', যারা 'দেয়ালে দেয়ালে' ফতোয়া এঁটে দেয়—অর্থাৎ, আগামী দিনের সংকেত সূচনা করে। আবার এই জনতারই সঞ্চিত রোষের দ্যোতক আকাশের 'রাগে রী-রী' করা এবং সমুদ্রের ডানা ঝাড়া। এইভাবে প্রকৃতি ও সমাজের কৌশলী যৌগপদ্যে কবিতাটি হ'য়ে উঠেছে যথার্থই একটি প্রকৃতি-প্রতীকী (nature-symbolic) রাজনৈতিক কবিতা।

প্রথম পর্বের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ফুল ফুটুক'-এ তদানীন্তন কমিউনিস্ট-সাম্রাজ্যসম্রাট যোসেফ স্তালিনের গুণকীর্তনে মুখর 'কমরেড স্তালিন'-এর মতো উগ্র রাজনৈতিক কবিতা স্থান পেলেও দলীয় রাজনীতির হাঁকডাক বেশির ভাগ কবিতাতেই অনেক নিচু-সুরে নেমে এসেছে এবং 'আগুনের ফুল', 'পাথরের ফুল', 'সন্ধ্যামণি', 'শুধু ভাঙা নয়' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় তো একেবারেই অশ্রুত (inaudible) হ'য়ে উঠেছে। 'সন্ধ্যামণি' কবিতার :

> ততক্ষণ
> আমিই বা বসে থাকি কেন ?
> উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার
> এই তো সময় ··· ··· ।

অথবা 'ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়'—সমগ্র গ্রন্থটির এই ধ্রুব-পদবাহী 'শুধু ভাঙা নয়' কবিতাটির :

> ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
> যারা হয়ে গেছে অন্ধ
> তাদের নাকের কাছে ধরে দিও
> ফুলের একটু গন্ধ।

ইত্যাদি সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই (অথচ প্রথম পর্বের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে

একেবারেই অপ্রত্যাশিত) পংক্তিগুলি পড়লেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয় তাঁর তখনকার মনের পরিবর্তমান চেহারাটা। বেশ বোঝা যায়, তাঁর বিশ্বাসের ইমারত আর খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই, অনেকখানি হেলে পড়েছে—দেখা দিয়েছে তাঁর ভিতে ফাটলের রেখা। তবু, অন্তত কতিপয় কবিতায় রাজনীতিস্পৃষ্টতায়, 'ফুল ফুটুক'ও তাঁর প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থ হিসেবেই চিহ্নিত হ'য়ে রইলো, হয়তো বা ক্রান্তি (transition)-পর্বের গ্রন্থরূপেও।

কবিমানসিকতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্পষ্টরূপে পরিবর্তিত হলেন তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'যত দূরেই যাই'-এর রচনাগুচ্ছে। এ-কথা ঠিক, পূর্ববর্তী 'ফুল ফুটুকে'ই তাঁর কাব্যমানস (poetic mentality)-গত একটা দিক্-বদল কিছুসংখ্যক কবিতায় আভাসিত হয়েছিলো। সেই আভাসটাই সুস্পষ্ট হলো তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থে। 'যত দূরেই যাই' থেকে তাঁর এই পরিবর্তন একটা বাঁকের ভূমিকা পালন করেছে, বইয়ে দিয়েছে তাঁর কবিতাকে ভিন্ন একটা খাতে ; তাঁর কবিতা নূতন অভিজ্ঞতার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। অর্থাৎ, এই পরিবর্তন তাঁর কবিজীবনে দ্বিতীয় পর্বকে সূচীত করেছে। 'যত দূরেই যাই' থেকে আরম্ভ ক'রে পর-পর 'কাল মধুমাস', 'এই ভাই', 'ছেলে গেছে বনে', 'একটু পা চালিয়ে, ভাই', 'চইচই-চইচই' ইত্যাদির রচনাবলী অতিক্রম ক'রে একেবারে সাম্প্রতিক-কালের কবিতা পর্যন্ত তাঁর এই পর্বের বিস্তার।

কবি হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে এই যে পরিবর্তন, তার স্বরূপটা কী বা কেমন ? তাঁর কাব্যকৃতির স্থায়িত্বের পক্ষে এর গুরুত্বই বা কত-টুকু ? দ্বিতীয় পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তন অনেক। কিন্তু মাত্র 'অনেক' বললেই সেই পরিবর্তনের প্রকৃতিকে বোঝানো যাবে না। বস্তুত, তা এতই আমূল যে তার অভিঘাত কবিরূপে তাঁকে নবজন্মে অভিষিক্ত করেছে। অবশ্য বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না যে নবজন্মে তাঁর সেই অভিষেক এত তরান্বিত হ'তো না যদি চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ওলোট-পালটের একটা তুমুল ঝড় না-উঠতো। বিশেষভাবে রাজনীতি-স্পর্শাতুর কবি ব'লেই ভারতবর্ষের সেই রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণেই তিনি গোত্রান্তরিত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করলে যে-কোনো তুলনামনস্ক ও পরিণত পাঠক কিংবা পাঠিকাই উপলব্ধি করবেন যে এগুলিতে তিনি তাঁর কয়েক-দশকে-লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে শেষবারের মতো যাচাই ক'রে নিতে চেয়েছেন এবং নির্মমভাবেই। বিশ্বসংসারের প্রতিটি বিষয় ও ঘটনাকেই দলীয় রাজ-নীতির কষ্টিপাথরে ঘ'ষে বিচার করার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি (কমিউনিস্ট-অভিধানে অবশ্য এরই গালভরা নাম world-outlook) পরিত্যাগ ক'রে খোলা চোখে ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং খোলা মনে ঘটনা বিশ্লেষণের উদার নিরপেক্ষতায় ক্রমেই তিনি নিজেকে দীক্ষিত করেছেন। তাঁর প্রথম পর্বের কবিজীবনের প্রধান আয়ুধ গগনবিদারী শ্লোগান এবং আক্রমণাত্মক স্যাটায়ার—এর কোনোটিতেই তিনি আর ধার দেন নি, ব্যবহার পর্যন্ত

করেন নি—এই পর্বে। অপসৃয়মান বিশ্বাসকে আঁক্‌ড়ে থাকার কোনো প্রয়াসও এই পর্বে তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। আর, তা যাবেই-বা কেমন ক'রে—কেননা ইতি-পূর্বেই, আমরা দেখেছি, তাঁর পুরোনো বিশ্বাসের ভিতে দেখা দিয়েছে ফাটল। সেই কারণেই এই পর্বের কবিতায় নূতন-নূতন চিন্তা-ভাবনাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, মানবিক বিশ্বাসের উদার উজ্জীবনকে অভ্যর্থিত করেছেন। ফলে, নেতির সঙ্গে ইতি এবং বর্জনের সঙ্গে গ্রহণ—এই উভয় প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিকতায় তাঁর এই পর্বের কবিতা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত।

আসলে, এই পর্বে তাঁর মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তনের সংঘটন আভ্যন্তরীণ তাড়না (inner impulse)-হেতুই হ'য়ে উঠেছিলো একপ্রকার অনিবার্য। বিশ্বাসের পরি-বর্তনের ফলে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিলো একাধিক আত্মজিজ্ঞাসা। কোথা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, কোথায় এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন, আর কোথায়ই বা তিনি যেতে চান —এই সমস্তই তাঁর সামনে উদ্যত প্রশ্নের চেহারায় দেখা দিয়েছে। এমনকি শিল্পের সরলীকরণ (simplification) সম্ভব কিনা, এবম্বিধ নান্দনিক জিজ্ঞাসাতেও তিনি মাঝে-মাঝে কমবেশি আলোড়িত হয়েছেন। ফলত, কমিউনিস্ট-দর্পণে বিশ্বদর্শন নয়, পরিবর্তে মানবিক উজ্জীবনে আস্থাস্থাপন—এই-ই হ'য়ে উঠেছে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কবিজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে তাঁর মনোজাগতিক পরি-বর্তনকে স্পষ্ট ক'রে তোলার জন্য খুব বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই, দুই পর্বের মাত্র দু'-একটি কবিতা থেকে আংশিক উদ্ধৃতির সাহায্যেই সেই পরিবর্তনকে বোধগম্য ক'রে তোলা যেতে পারে। সংকীর্ণ দলীয় রজনীতির বৃশ্চিক-দংশনে বিদ্ধ হ'তে-হ'তে প্রথম পর্বে তিনি তাঁর একটি উঁচু-সুরে-বাধা নিচু কবিতায় বলেছিলেন ঃ

> চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
> গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
> তিলে তিলে মরণেও জীবন অসংখ্য
> জীবনকে চায় ভালোবাসতে।
>
> ('মে-দিনের কবিতা')

এবং ঐ একই কবিতার চতুর্থ স্তবকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ঃ

> মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
> পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে উদার মানবিকতায় ঋদ্ধ হ'তে হ'তে তাঁর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে নিচু-সুরে-বাধা উঁচু কবিতা—এবং একাধিক ঃ

১.

> আমাকে কেউ কবি বলুক
> আমি চাই না।

কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
('আমার কাজ')

২.

ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির
অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই
পাল্লা ভারী হচ্ছে।
ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালোবাসা।
('মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ')

৩.

আমার চোখের পাতায় লেগে থাক
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই ॥
('যত দূরেই যাই')

তিনটি উদ্ধৃতি-খন্ড থেকেই অনুমান করা সম্ভব, প্রথম পর্বের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিমনের আভিমুখ্য দ্বিতীয় পর্বে কোন্ দিকে এবং কতখানি মুখ-ফেরানো।

এই আলোচনা শেষ করার আগে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয় ও বক্তব্য প্রসঙ্গে আর না-এগিয়ে, তাঁর কবিতার অঙ্গ-প্রাকরণিক দিক্ (technical aspects) সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কবিতায় কারুকর্মে উভয় পর্বেই তিনি একজন দক্ষ শিল্পী এবং এই কারুদক্ষতা (craftsmanship) প্রথম থেকেই তাঁর অর্জিত। কিন্তু প্রথম থেকে মাত্র অর্জিতই নয়, প্রথম থেকেই এই দক্ষতায় তাঁর অধিকার এতই অনায়াস এবং স্পষ্ট যে তা সতর্ক পাঠকের লক্ষ্য এড়াতেই পারে না। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিকে' মাত্র বত্রিশটি পৃষ্ঠার সামান্য পরিসরে তরুণ বয়সেই তিনি যে আলোড়ন জাগিয়েছিলেন, জাগাতে পেরেছিলেন, তার কারণ কেবল বিশ্বাসের স্পষ্টতা ও স্বরগত বলিষ্ঠতাই ছিলো না, কাব্যকলাকৌশলনৈপুণ্যও ছিলো তার আরেকটা মস্ত কারণ। অজস্র দেশী, অন্ত্যজ ও আঁকাড়া শব্দের নির্বাচনে ও ব্যবহারে, ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ও সাফল্যে, উচ্চারণের কথ্য ও লৌকিক ভঙ্গিতে, মাঝে-মাঝেই ক্রিয়াপদহীন ও ছেদচিহ্নশূন্য সংক্ষিপ্ত বাক্যগঠনরীতিতে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত প্রয়োগে এবং রূপক, রূপকল্প ও প্রতীকের সচেতন নির্বাচন, নির্মাণ ও প্রয়োগে তাঁর কবিতায় স্বতন্ত্র একটা আবহ (atmosphere) সৃজনে, স্বীকার করবো, তিনি মাত্র

সফলই হননি, তিনি রীতিমতো সফল হয়েছেন—যদিও একই সংগে এ-কথা বলতেও আমি দ্বিধা করবো না যে সেই আবহসৃজনে বিশেষ একটি দলের রাজনৈতিক মতবাদ ধর্মবিশ্বাসের মতোই তাঁকে সাহায্য করেছে, তাঁর মধ্যে শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছে। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে এই স্বীকৃতিতেও আমার আপত্তি নেই যে সেই সাহায্যের বা শক্তি সঞ্চারের মাত্রা তাঁর কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্বের তুলনায় প্রথম পর্বে বহুগুণে বেশি।

আবয়বিক বিবেচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কোনো সুপারস্ট্রাকচার নেই। তাঁর কবিতায় স্ট্রাকচারের যে-পরিচয়, তাতে, কোনো-না-কোনো রচনায়—'জেলখানার গল্প', 'জয়মণি, স্থির হও' কিংবা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' ইত্যাদিতে—নাট্যাবয়বের বাঁধনই বিষেশভাবে নজরে পড়ে। ছন্দে তিনি সিদ্ধ। বাংলা ছন্দের অনেক ক'টি নিয়েই তিনি তাঁর কবিতায় নানারকমের পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর কবিতায় প্রযুক্ত ছন্দের প্রায় সব ক'টিতেই তাঁর সাফল্য ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। বেশির ভাগ কবিতাই তিনি লিখেছেন পয়ারে এবং তিন মাত্রার ছন্দে। এর কারণ এই দুই ছন্দেই তাঁর সাবলীলতা সবচেয়ে বেশি। মাত্রাবৃত্তে লেখা তাঁর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য সেগুলির বাক্যবিন্যাসে বহু ক্ষেত্রেই পংক্তিলঙ্ঘনরীতির অনুপস্থিতি। আর, তাঁর অক্ষরবৃত্তে রচিত কবিতাসমূহে প্রশংসাযোগ্য উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেনের মতো প্রাজ্ঞ ছান্দসিক। ছন্দ ও মিল যে কখনোই এক নয়, কবি হিসেবে সেটা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন এবং জানেন ব'লেই নিজের কবিতায় ছন্দের মতো মিলের ব্যাপারেও তিনি অনলসভাবে উদ্যোগী। মিলের কবিতাগুলিতে তাঁর সাফল্য সত্যিই চমকপ্রদ (startling)। কিন্তু এই চমকপ্রদ সাফল্যের আড়ালেই ব্যর্থতার এক জীবাণু অবশ্য প্রায়ই সক্রিয় হ'য়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। কবিতার-পর-কবিতায় মিলের ঝুমঝুমি বাজাতে-বাজাতে শেষ পর্যন্ত মিলের মোহেই তিনি প'ড়ে যান, কবিতায় কবিত্বের বদলে মিলই প্রধান হ'য়ে ওঠে। এই আত্যন্তিক মিলপ্রবণতা, কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর কবিকেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা লিখিয়ে তৃপ্ত রাখে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের রাজনৈতিক ব্যঙ্গাশ্রয়ী মিলপ্রধান কবিতাসমূহে এবং দ্বিতীয় পর্বের সামাজিক প্রসঙ্গ-নির্ভর ছড়াজাতীয় রচনা-গুলিতে রয়েছে এই অপ্রিয় মন্তব্যের প্রতিই পুরোপুরি সমর্থন।

তাঁর কবিতার রূপক ও প্রতীকগুলি তাৎপর্যবাহী—যদিও সেই তাৎপর্যের বেশির ভাগটাই রাজনৈতিক, অন্তত সামাজিক তো বটেই। এগুলির কোনো-কোনোটিতে ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিতও স্পষ্ট। তুলনামূলকভাবে রূপক ও প্রতীকের নৈসর্গিক প্রাসঙ্গিকতা (relevance to Nature) তাঁর কবিতায় কম। কিন্তু রূপকল্পের রূপ-শিল্পে তাঁর কবিতার প্রাসঙ্গিকতা প্রায়শই প্রাকৃতিক। তাঁর কবিতায় রূপকল্পের নির্মাণ প্রসঙ্গে বলার অনেক কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কথাটি সম্ভবত এই যে নিজের কবিতায় রূপকল্পের অবিরল উপস্থিতিতে তৎকৃত তুর্কী নাজিম হিকমতের (কিন্তু বুলগেরিয় কবি নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের নয়) কবিতার অনুবাদের একটা ইতিবাচক ভূমিকার কথা

অস্বীকার করা যায় না কোনোমতেই। বস্তুত, অনুবাদে হিকমতের 'বিকেলের হাওয়ায়', 'তুমি আমি' কিংবা 'না-ধরানো সিগারেট' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যথাক্রমে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক', 'পারাপার' ও 'অগ্নিগর্ভ'-শীর্ষক কবিতা তিনটিকে মিলিয়ে পাঠ করলেই স্পষ্ট হয় সব-সব কবিতায় রূপকল্প-নির্মিতিতে ভিনদেশী এই দুই কবির মধ্যে মিল কোথায় এবং কতখানি ॥

যে-বয়সে যৌবন মানুষের জীবনে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশও করে না, সে-বয়সেই যক্ষ্মা-যন্ত্রণা ভুগে সুকান্তকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে—এ-দুঃখ কোনোদিনও ভোলার নয়। কিন্তু তাঁর সেই অকালমৃত্যুর দিকে তাকিয়ে এ-কথা ভেবেও মন আনন্দে ভ'রে ওঠে যে মাত্র একুশ বৎসরের অতি-সংক্ষিপ্ত আয়ু-পরিসরেই জীবনের সার্থকতার শিখর তিনি স্পর্শ ক'রে গিয়েছেন। নিতান্তই আবেগের ভারে অবনত হ'য়ে কথাটা আমি বললাম না, বললাম অনেক ভেবে-চিন্তেই। বস্তুত, এই প্রাণময় গ্রহে অবিরাম জীবনপ্রবাহে কত মানুষেরই তো আবির্ভাব ঘটে, কত মানুষই তো বিলীন হ'য়ে যান! কিন্তু নিছক আয়ুদৈর্ঘ্যের পরিমাপে তাঁদের ক'জনকেই বা আমরা মনে রাখি। আর, তাছাড়া, সত্যি বলতে, কেনই বা আমরা মনে রাখবো তাঁদের, যাঁদের জীবন শুধুই প্রলম্বিত নিষ্ফল কালাতিপাতে, ষাট-সত্তর-আশী বৎসরের দীর্ঘ আয়ু-পরিসরেও যাঁদের জীবনে বিচ্ছুরিত হ'লো না সৃজনীশক্তির সামান্যতম স্ফুলিঙ্গও? মানবজীবন বাস্তবিকই নিষ্ফল কালাতিপাত যদি তাতে তেমন কোনো মুহূর্তও না-আসে, যখন সৃষ্টির আগুনে আমরা ঝলসিত হ'য়ে উঠি। সৃজনীক্ষমতা বা creative power-এর চেয়ে বড়ো সংসারে আর কিছুই নেই। এবং নিছক আয়ুর দৈর্ঘ্য (span of life) নয়, নিঃসন্দিগ্ধ সৃষ্টির ক্ষমতা (faculty of creation)-ই এই সংসারে মানুষের জীবনের সার্থকতা বিচারের সর্বোচ্চ মানদণ্ড। সেই মানদণ্ডেই অকালমৃত সুকান্তের স্বল্পায়ু জীবন সার্থকতায় উত্তীর্ণ।

কী চেয়েছিলেন সুকান্ত তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে, আর পেয়েছিলেনই বা কী? বিশেষ কিছুই চাননি তিনি এবং তাঁর নিজের জন্য তো একেবারেই কিছু না। বস্তুত, নিজের কোনো একান্ত দাবি নিয়ে সুকান্তের মতো মানুষরা কোনোদিনই আবির্ভূত হন না। তাঁর দাবি ব্যক্তিগত ছিলো না, ছিলো সমষ্টিগত; সেই দাবি কোনো যূথভ্রষ্ট 'এক'-এর নয়, তা যূথবদ্ধ 'সমষ্টি'-র। তাঁর মনের মর্মে একটা স্বপ্ন ছিলো; সেই স্বপ্নের রঙে তিনি পৃথিবীকে রাঙিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সেই স্বপ্নের আলোয় সংসারকে উদ্ভাসিত ক'রে যেতে। বাস্তবিক, স্বপ্নতাড়িত হ'য়েই এবং স্বপ্নতাড়িতের মতোই নতুন এক পৃথিবীর আবির্ভাবের অত্যাবশ্যকতাকে তিনি তাঁর চেতনার কোষে-কোষে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু কী ছিলো তাঁর সেই স্বপ্ন? তাঁর স্বপ্ন ছিলো তেমন এক পৃথিবী নির্মাণের, তেমন একটা সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার, যেখানে আর্থিক ক্ষমতাই সামাজিক জীবনের মুখ্য নিয়ন্ত্রক হবে না, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ধনবৈষম্যের ঘটবে অবসান, অথবা অন্তত সর্বাধিক সঙ্কোচন, শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন-অধ্যাদেশ পর্যবসিত হবে অতীতের স্মৃতিখণ্ডে। অর্থাৎ, এককথায়, সেই পৃথিবী ও সমাজে ধনতন্ত্রের (capi-

talism) চিহ্ন-অবশেষও হবে অবলুপ্ত এবং তার স্থলে নিপীড়িত মানুষের পরিত্রাতারূপে আবির্ভূত হবে সাম্যতন্ত্র (communism)। এমনই এক পৃথিবীর আর এমনই এক সমাজের স্বপ্নই তিনি দেখে গিয়েছেন আমৃত্যু, তাঁর মাত্র একুশ বছরের অত্যল্প আয়ু-পরিসর ব্যেপে।

স্বপ্নটা অবশ্যই মহৎ এবং এর চৌম্বকাকর্ষণও দুর্দমনীয়। তাছাড়া, এর সর্বজন-জীবনস্পর্শসম্ভাব্যতার দিক্‌টিও অনস্বীকার্য। সত্যিই তো, জগতে কে কবে না-চেয়েছে বা না-চায় যে পৃথিবীটা আরো সুখের আবাস হোক, সমাজব্যবস্থায় আরো সাম্যভাব জাগুক কিংবা জীবনযাত্রা আরো সুসহ হ'য়ে উঠুক। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখাটা যত সহজ, প্রত্যহের জীবনে তাকে বাস্তব ক'রে তোলাটা ঠিক তত কঠিন। অথচ মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে, নিতান্ত অপরিস্ফুটভাবে, সুকান্ত যখন কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন, তখন এই স্বপ্নের মোহমাদকতায় তিনি মাত্র মুগ্ধই হ'তে শুরু করেছেন (এই স্বপ্নে তখনো তিনি পুরোপুরিভাবে গ্রস্ত হ'য়ে পড়েন নি, তা আরো কয়েক বৎসর পরের ঘটনা) তদ্‌সম্পর্কিত এই রূঢ় সত্য বা এই সত্যের রূঢ়তার মাত্রা সম্বন্ধে সামান্যতম বাস্তব জ্ঞানেরও অধিকারী হন নি। অবশ্য তখন তাঁর কাছ থেকে সেটা প্রত্যাশা করাটাও ছিলো অন্যায়। এই স্বপ্নের মোহাচ্ছন্নতা দিয়েই তাঁর কবিজীবনের সূত্রপাত।

সুকান্তের কবিতায় নূতন পৃথিবীর এই স্বপ্নটা প্রথমাবধি একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের তবকে মোড়া, একটা স্পষ্ট পলিটিক্যাল 'ইজম্'-এ আশ্রিত। এবং প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় সেই 'ইজম্'-এর উচ্চারণে তিনি একেবারেই মুক্তকণ্ঠ, একেবারেই নির্দ্বিধ ও একেবারেই নিঃশঙ্ক। কবিতা লেখার প্রথম পর্বেই কমিউনিজম যেমন নিজের ফাঁদে তাঁকে জড়িয়ে ফেলেছে, তিনিও তেমনই নিজের কবিতাকে কমিউনিজমের প্রচারে নিয়োজিত করেছেন। ব্যক্তিজীবন ও সৃষ্টিজীবন—উভয়ত এই মতবাদের সঙ্গে হরিহর-আত্মা হ'য়ে যাবার ফলেই তাঁর কবিতায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো স্ব-বিরোধ (self-contradiction) নেই। অবশ্য তা থাকার কথাও নয়; কেননা ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত তাঁর মাত্র আট বছরের কবিজীবনে ভারতীয় বা বিশ্বরাজনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন সংসাধিত হয়নি, যার আমূল অভিঘাত (radical impact) কমিউনিজমের প্রতি তাঁর একান্ত আস্থার সুদৃঢ় দেয়ালে সন্দেহের কোনো চিড় ধরাতে পারতো। মন্তব্যটি, বিস্তারিতভাবে না-হ'লেও, বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই শতকের চল্লিশের দশকের যে-সমস্ত বাঙালী কবি সুকান্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশিত হ'য়ে কবিতার পথে আজ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছেন (এর প্রধান কারণ, বার্ধক্যহেতু শারীরিক দিক্ দিয়ে এঁরা প্রায় সকলেই পঙ্গু হ'য়ে পড়েছেন, বয়সে সত্তরের কোঠা এঁদের অনেকেই অনেকদিন পেরিয়ে এসেছেন।), বিগত কয়েক দশক ধ'রে ভারতের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এবং যেন-বা তালে তাল মিলিয়েই, তাঁরা যেভাবে নিজেদিগকে ও

নিজেদের কবিতাকে লক্ষণীয়ভাবে (remarkably) পাল্‌টে ফেলেছেন. (এর সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা। বস্তুত. সুভাষের 'যত দূরেই যাই'-পূর্ব ও পরবর্তী দুই পর্বের কবিতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বরক্ষেপ (political tone)-গত সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রয়াস পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর।) তা থেকে এমনতরো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াতেও আমি বিশেষ অযৌক্তিকতা দেখিনা যে আজ পর্যন্ত জীবিত থাকলে সুকান্তও পরিবর্তিত হতেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর কবিতাও পরিবর্তিত হ'তো, এবং সম্ভবত বহুলাংশেই। কেননা সুভাষ এবং অন্য যে-সমস্ত একদা-বামপন্থী কবির প্রতি আমি ইঙ্গিত করছি. তাঁরা কেউই সুকান্তের আয়ুষ্কালীন চল্লিশের সেই জ্বলন্ত দশকে 'কমিউনিস্ট' অভিধায় তাঁর চেয়ে বড়ো কম সুখ্যাত বা কুখ্যাত ছিলেন না। হতভাগ্য সুকান্তের এইটুকুই সৌভাগ্য যে রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনোদিনও তাঁকে ঘর-বদল করতে হয়নি. পরিবর্তন করতে হয়নি মতের বা পথের। তাঁর অকাল-মৃত্যুর দুর্ভাগ্যই তাঁকে রক্ষা করেছে সেই সম্ভাব্য দুর্ভাগ্য থেকে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নিজের বিশ্বাসের কাছে তিনি বিশ্বস্তই থেকে যেতে পেরেছেন।

আত্মবিরোধের উপস্থিতির মতো, সুকান্তের কবিতায়, বৈচিত্র্যের বিদ্যমানতাও কম এবং তা-ও সেই একই কারণে। কিন্তু তাঁর কবিতা বিবর্তনবিহীন নয় কিংবা সেই বিবর্তনের গতিপথটিও একেবারেই অচিহ্নিত নয়। তবু বলবো, এবং দায়িত্ব নিয়েই, যে, বিবর্তনের বিবেচনায়, তাঁর কবিতায় এমন কোনো স্পষ্টতা নেই—কি বিষয়গত, কি প্রকরণগত—যার ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর সমগ্র কবিতাকে প্রথম ও দ্বিতীয়—এই দুই পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। এবং আবারও বলি, তাঁর কবিতাকে, সুস্পষ্ট বিবর্তনের সুযোগ ও সম্ভাবনা থেকে তাঁর অকালমৃত্যুই বঞ্চিত করেছে।

সুকান্তের কবিতার সাধারণ বিষয় মানুষ, মানুষের শ্রেণীবিভাজিত ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব-জর্জরিত সমাজ। এই সমাজের মানুষের কথাই তিনি তাঁর কবিতায় নানাভাবে ব'লে গিয়েছেন—কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে ; কখনো রূপকে মুড়ে, কখনো-বা রূপকের মোড়ক উন্মোচিত ক'রে। কিন্তু খুলেমেলেই হোক আর রেখেঢেকেই হোক (অবশ্য তাঁর কবিতায় রেখেঢেকে প্রায় কিছুই বলেন নি তিনি, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতের প্রভাব-প্রাবল্যে তেমনভাবে কিছু বলার কোনো প্রয়োজনীয়তাই তিনি অনুভব করেন নি কোনোদিন।)—যেভাবেই বলুন না কেন, যে-মানুষদের তাঁর কবিতায় তিনি পদার্পিত করিয়েছেন, তাঁরা যেমন সমগ্র সমাজের প্রতি-নিধি নন, যে-সমাজের চিত্র তাঁর কবিতায় তিনি অঙ্কিত করেছেন, সে-সমাজও তেমনই সামগ্রিক নয়। সমগ্র সমাজকে নয়, সমাজের একটা বিশেষ অংশকে তাঁর কবিতায় তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে নয়, মাত্র নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীকেই তাঁর কবিতায় তিনি অভ্যর্থিত করেছেন। কমিউনিজমের উন্মাদনায় তাঁর কবিতাকে তিনি যতই গণমুখী ক'রে তুলুন না কেন, যতই জনগণচিত্তবিমোহন ক'রে তুলতে পেরে থাকুন না কেন, এ-সত্য (যদিও খুবই অপ্রিয় এবং খুবই রূঢ়) অস্বীকারের উপায়

দেখিনা যে তাঁর কবিদৃষ্টি, দলমতনিরপেক্ষ সাধারণ পাঠকের প্রত্যাশার অনুপাতে, যথেষ্ট উদার নয়, বরং রীতিমতো অনুদার ; কবি হিসেবে তিনি আংশিকতা (part-biasness)-অতিক্রমী নন, তিনি অংশ-সীমিত (part-limited)। বিষয়াভিমুখো এই একদর্শিতায় তাঁর কবিতা আদ্যন্ত চিহ্নিত। তাঁর এবং তাঁর কবিতা—দু'য়ের পক্ষেই এটা ত্রুটিপদবাচ্য। যিনি প্রকৃত কবি, কবি নামের মর্যাদারক্ষাকারী, তাঁর কাছে আমরা কী প্রত্যাশা করি ? প্রত্যাশা করি যে তাঁর দৃষ্টি ক্রমেই প্রসারিত হবে জগৎ ও জীবনের যাবতীয় আংশিকতা অতিক্রম ক'রে তার সমগ্রতার দিকে, জৈব অস্তিত্ব (material existence)-গত সমস্ত বিরোধকে স্বীকার ক'রে নিয়েও সেই বিরোধের অন্তরালবর্তী গভীর ঐক্য ও সামঞ্জস্য তাঁর দৃষ্টির গোচরীভূত হবে, শুধু সমকালেই তাঁর দৃষ্টি প্রতিহত হবে না, চিরকালের দিকেও তাঁর দৃষ্টির অভিমুখিনতা অব্যাহত থাকবে। সেই কারণেই না প্রাচ্যের প্রাচীনরা কবিকে বলেছেন 'ঋষি' আর তাঁর সৃষ্টিকে তুলনা করেছেন প্রজাপতি ব্রহ্মার পরাসৃষ্টির সঙ্গে। অবশ্য সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো মাত্র-একুশ-বৎসর-বয়সে-পৃথিবী-থেকে-বিদায়-নেয়া একজন দীনঅভিজ্ঞ কবির কাছ থেকে এই সমুন্নত কাব্যপ্রত্যাশার (lofty poetic expectation) পূরণ হয়নি ব'লেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা আমি করিনি ; আমি প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছি শুধু এই কথাটা জানাতে যে তিনি যদি দীর্ঘ আয়ু পেতেন এবং বহুবিষয়ক উপাদানে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি করতে পারতেন, তাহ'লে, আমার বিশ্বাস, নিজের কবিতায় এই মহনীয়তা (sublimity) অর্জন করা তাঁর পক্ষেও একেবারেই অসম্ভব কিছু হ'তো না। এবং আমার এই বিশ্বাস নিতান্ত নির্ভিত্তিকও নয় ; কেননা, সংখ্যায় সামান্য হ'লেও, এমন কিছু কবিতা তিনি লিখেছেন, লিখতে পেরেছেন, যেগুলিতে এই সম্ভাবনা শুধু অঙ্কুরিতই নয়, সেই অংকুর স্পষ্টরূপে প্রকাশিতও। তাঁর এই কবিতাগুলির যোগ্যতম প্রতিনিধি 'ছাড়পত্র'—তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি। বস্তুত, কবিতাটির ঃ

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ঃ
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চ'লে যেতে হবে আমাদের।
চ'লে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ-বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
ক'রে যাবো আশীর্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস ॥

এই পংক্তি-একাদশ সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির সুদূরতম গন্ধ-স্পর্শ-বিরহিত মাত্র নয়, উদার মানবিক রসে সম্পূর্ণরূপে অভিসিঞ্চিতও। 'এ-বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো, আমি—/ নবজাতকের কাছে এ-আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'—এই নিঃশর্ত অঙ্গীকার কোনো কমিউনিস্টের নয়, হ'তে পারে না, এ-অঙ্গীকার সেই বিবেকী বিশ্বনাগরিকের, নবাগত প্রজন্মের প্রতি মানবিক কর্তব্যের দায়ভার যিনি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে নিজের কাঁধে তুলে নেন। 'চ'লে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল'—এই পংক্তি দু'টিতেই কবিতাটির মহত্ত্ব, তার মহনীয়তা। কবিতাটির বাণীমূল্য (message-value)-ও এখানেই নিহিত ; অথচ এই বাণী কোনো অর্থেই মার্ক্স-প্রচারিত নয়, তা সর্ব অর্থেই বিবেক-উচ্ছ্রিত। উদ্ধৃত অংশটির (এবং কবিতা-টিরও) অন্তিম পংক্তিটিতে রয়েছে কবি-হৃদয়ের একটি উপলব্ধির উজ্জ্বল অভিজ্ঞান ঃ কী-ক'রে নিজেকে ইতিহাসের অংশে পরিণত করতে হয়। কবি নিজেকে ইতিহাসে পরিণত করতে চেয়েছেন মার্কা-মারা কোনো রাজনৈতিক দল-নির্দেশিত সহজ পন্থায় নয়, নিজের 'দেহের রক্তে নতুন শিশুকে' 'আশীর্বাদ' করার মতো মহৎ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে।

এ-প্রসঙ্গে 'ছাড়পত্রে'রই অন্য একটি কবিতা 'ঐতিহাসিক'-এর—

> আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
> নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
> অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
> আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন ।।

এই শেষ ছত্র ক'টিও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ছত্র ক'টিতে কোনো নির্দিষ্ট মতের কিংবা পথের উচ্চারণ বা নির্দেশ নেই, তথাকথিত কোনো আদর্শবাদের কাছে বাঁধা-প'ড়ে-থাকা নেই, কেবল আছে বৃহৎ চলৎ কালের অবিরাম গতিপ্রবাহকে সঙ্গী ক'রে ক্রমাগত অগ্রগামিতার চিরন্তন আহ্বান, চরৈবেতির অভীমন্ত্রের নিঃসংশয়িত উচ্চারণ। এই মহামন্ত্রের উচ্চারণে কবির কণ্ঠ সকল মতের ও পথের সকল সীমাকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে ব'লেই আপাতসাধারণ এই কবিতাটিতে লেগেছে অসাধারণত্বের স্পর্শ। হুবহু সমগোত্রীয় না-হ'লেও অন্তঃস্থ বাণীমাহাত্ম্যে কিছুটা একই ধরনের রচনা 'প্রার্থী'—এবং 'আগামী' কবিতাটিও। দু'টি কবিতাতেই কবির উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর মানবিকতার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। 'প্রার্থী'র ঃ

> হে সূর্য !
> তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
> উত্তাপ আর আলো দিও,
> আর উত্তাপ দিও
> রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

এবং 'আগামী' কবিতার ঃ

সেদিন ছায়ায় এসো ঃ হানো যদি কঠিন কুঠারে
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেবো বারেবারে।
ফল দেবো, ফুল দেবো, দেবো আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

এই সমবেদনাবিগলিত অংশ দু'টির বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না-হ'য়েও অনায়াসেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আশ্চর্য লাগে, যখন ভাবি, এই কবিতাগুলির পাশে তাঁর একই গ্রন্থ 'ছাড়পত্রে'র অন্য কবিতাগুলি কতই পৃথক ধরনের! এই পার্থক্য যত না আঙ্গিকগত, তার চেয়ে ঢের বেশি বিষয় ও বক্তব্যঘটিত। শেষোক্ত এই কবিতাগুলি শুধু যে রাজনৈতিক, তা-ই নয়—বিশেষভাবে দলীয় রাজনীতির এবং স্পষ্টতই প্রচারধর্মী। এগুলিতে তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতা সন্দেহাতীত, কিন্তু সেই বক্তব্যে এমন কোনো ঔদার্য নেই, যে-কারণে তা সর্বজনীন হ'য়ে উঠতে পারে। সমাজের বৃহৎ অংশই (বিশেষত অধিজনগোষ্ঠী) হয়তো সেই বক্তব্যের সমর্থক, কিন্তু সকল অংশ (বিশেষত ঊনসম্প্রদায়) নয়। এতে অবশ্য তিনি ভাবিত হবার কিংবা বিচলিত বোধ করার কোনো কারণ খুঁজে পান নি, কেননা এই কবিতাগুলিতে তিনি খোলাখুলিভাবেই সমাজের বিত্তজীবী শ্রেণী-বিরোধী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী-সমর্থক। এই বিরোধিতা এগুলির কোনোটিতে শ্রেণীবিদ্বেষে পরিণত—যেমন 'মজুরদের ঝড়' কবিতায় সরাসরি মালিকদের বিরুদ্ধে না-হ'লেও মালিকপক্ষের তাবেদার 'ধর্মঘটভাঙা-দালাল'দের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ ঃ

কই? কোথায়? বেরিয়ে এসো ধর্মঘটভাঙা দালালরা;
... ...
জাহান্নামে-যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত—
বেরিয়ে এসো!

আবার কোনো-কোনোটিতে প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহায় পর্যবসিত—যেমন 'বোধন'-শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটিতে ঃ

শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হ'লো কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব দিবি কি তার?
... ...
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবোই।

দু'হাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা··· ··· ।

প্রতিশোধস্পৃহাচারিতার্থতার এই হিংস্র আহ্বান দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—'ঘুম নেই'-এর রচনাবিশেষেও স্পষ্টত উচ্চারিত এবং সমান হিংস্রতাতেই ঃ

জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর
হয়েছে তীক্ষ্ণ হয়েছে প্রখর
ওঠে তার গর্জন—
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ !

শোনো, পৃথিবীর মানুষেরা শোনো,
শোনো স্বদেশের ভাই,
রক্তের বিনিময় হয় হোক
আমরা ওদের চাই ॥

('জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী')

অপরপক্ষে শ্রমজীবী শ্রেণী-সমর্থনে সেই শ্রেণীর সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম-অভেদিত (self-identified)। সেই শ্রেণীর সুখ-দুঃখকেই তিনি নিজের সুখ-দুঃখ জ্ঞান করেছেন, সেই শ্রেণীর সাধারণ মানুষ (common folk)-দের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করেছেন। এবং এটা করতে গিয়ে সামাজিক জীবনে নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীগত অবস্থানের কথা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন। এই আত্মশ্রেণী-নির্মোহ কবি হিসেবে তাঁর একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্র (class-character) বিস্মরণের অগ্নিপরীক্ষায় (ordeal) উত্তীর্ণ হ'য়েই এবং তার অগ্নিমূল্যেই তিনি অর্জন করেছেন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সান্নিধ্য, আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তা কোনো অর্থেই কৃত্রিম বা শৌখিন নয়, সকল অর্থেই তা যথার্থ ও আন্তরিক। সমাজের খেটে-খাওয়া, বিত্তবঞ্চিত শ্রেণীর সত্যিকার আত্মীয়তা-অর্জন, আশী বৎসরের দীর্ঘ জীবনে, মাত্র বারেকের জন্য হ'লেও রবীন্দ্র-অভিলষিত ছিলো। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-অবস্থান (feudal class-position)-এর দরুণই সেই অভিলাষ তিনি পূরণ করতে পারেন নি। তাঁর 'ঐক্যতান' কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি সেই ক্ষোভেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু ঐ কবিতাতেই তিনি কান পেতে ছিলেন অনাগত যুগের সেই কবির জন্য, কর্মে ও কথায় যিনি সেই শ্রেণীর মানুষদের জীবনের সত্যিকার শরিক। রবীন্দ্র-প্রতীক্ষিত সেই কবিই সুকান্ত ভট্টাচার্য। শুধু কথায় নয়, কথা ও কর্ম উভয়তই 'মাটির কাছাকাছি'-থাকা, শ্রমিকের কৃষাণের জীবনের যথার্থ 'শরিক' হ'য়ে-ওঠা। অবশ্য এই শরিকানার অঙ্গীকারে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ঐক্যতানে'র ধ্বনিরই অস্পষ্ট ও পরোক্ষ প্রতিধ্বনি ঃ

আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐক্যতান।

অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।
('বিবৃতি' ঃ 'ছাড়পত্র')

শ্রমিক ও কৃষকদের কারণ (cause)-এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে দু'ধরনের কবিতা লিখেছেন সুকান্ত। কিছুসংখ্যক কবিতায় ('ছাড়পত্রে'র 'ঠিকানা' ও 'অনুভব' এবং 'ঘুম নেই'-এর 'একুশে নভেম্বর ঃ ১৯৪৬' ইত্যাদিতে) সেই সমর্থনটা ঈষৎ আলগা (detouched) গোছের, ক্যাজুয়েলভাবে জ্ঞাপিত, দলীয় রাজনীতির স্পষ্টতাবিহীন। কিন্তু অধিকাংশ কবিতাতেই (আঙুলে গুণে দেখেই বলছি সেগুলি সংখ্যায় অনেক) তা অত্যন্ত উগ্র, বড়ো বেশি রকমের স্পষ্ট এবং দলীয়তাদুষ্ট তো বটেই। স্বাভাবিকভাবেই এগুলিতে বিকীর্ণ রাজনৈতিক ঝাঁঝ ((pungency)-টাও রীতিমতো তীব্র। এই দু'-ধরনের দু'টি কবিতা থেকে সামান্য উদ্ধৃতির সাহায্যেই মন্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে ঃ 'অনুভব' কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।

আর, 'ফসলের ডাক ঃ ১৩৫১' কবিতাটিতে তিনি শপথ নিয়েছেন ঃ

তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

বোঝা যায়, সমাজের কোনো শ্রেণীর প্রতি সাধারণভাবে সমর্থন জ্ঞাপন এবং সেই সমর্থনকে শপথের পর্যায়ে উন্নয়ন—এ-দু'য়ের মধ্যে সমর্থনের মাত্রাগত যে-পার্থক্য, উদ্ধৃত অংশ দু'টিতে সে-পার্থক্যই বিশেষরূপে স্পষ্ট।

সুকান্ত মার্ক্সবাদে মাত্র উদ্দীপিতই ছিলেন না, ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিতও। জীবনের আদর্শ হিসেবে যেমন তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই মতবাদকে, নিজের কবিতাকেও তেমনই তিনি নিয়োজিত করেছিলেন এই মতবাদেরই প্রচারে। এই বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকেই তাঁর কবিতার যা-কিছু দীপ্তি। বিষয়ের নির্বাচনে এবং বক্তব্যের উপস্থাপনে তিনি সম্পূর্ণভাবে এই মতবাদ-অনুসারী। স্বাভাবিকভাবেই মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকতার (theorisation) কোনো-কোনো দিক্ তাঁর কবিতায় নির্ভুলভাবে না-হ'লেও প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে—যেমন, আলোচনার সুবিধার্থে, ধরা যেতে পারে, মার্ক্সীয় তত্ত্বের দুই প্রধান উপাদান শ্রেণীসংগ্রাম ও জনযুদ্ধের কথা। তাঁর কবিতায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের মাত্র ইন্ধনই নেই, তাঁর বহু কবিতাই তো সেই সংগ্রামের অগ্নি-প্রজ্বলিত। তাঁর অনেক কবিতাতেই আছে সেই আহ্বান —শ্রেণীশত্রুর প্রত্যক্ষ বিরোধিতার, শ্রেণীবিদ্রোহের, শ্রেণীসংগ্রামের—যা মার্ক্সীয় তত্ত্বসমর্থিত। 'ছাড়পত্রে'র 'বিবৃতি', 'শত্রু এক', 'মজুরদের ঝড়' ও 'বোধন' এবং 'ঘুম নেই'-এর 'পয়লা মে-র কবিতা ঃ ১৯৪৬', 'পরিখা', 'বিদ্রোহের গান', 'অনন্যোপায়' ও

'সূচনা' (খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে)—ইত্যাদি কবিতার প্রতিটিতেই কাব্যগত সর্ব লক্ষণকে অতিক্রম ক'রে এই লক্ষণটাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে।

এই লাক্ষণিক বিবেচনায় একদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেনের সঙ্গে এবং অন্যদিকে নজরুল ইসলাম ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুকান্তের তুলনামূলক কিঞ্চিৎ আলোচনা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। অবশ্য এই তুলনাকে খুব বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, কেননা এতে সাদৃশ্যের মতো বৈসাদৃশ্যও বড়ো কম নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সুকান্তের মিল এখানটায় যে প্রথম পর্বের প্রেমেন্দ্রের কবিতার (স্মরণীয়, তাঁর 'আমি কবি যত কামারের'-শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটির কথা) গণ-জীবনাভিমুখ্যের অনুরূপ সুকান্তের কবিতার গণজীবনস্পর্শিতা ; কিন্তু সেই প্রাথমিক বিষয়-সাদৃশ্যের পর থেকেই এই দু'জনের পথ পৃথক হ'য়ে দুই দিকে চ'লে গিয়েছে। প্রেমেন্দ্রের পরবর্তী কবিতা নিছক গণজীবনের সংকীর্ণতা অতিক্রম ক'রে ক্রমেই সর্ব-সামাজিক হ'য়ে উঠেছে, আর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, সুকান্ত তাঁর কবিতায় সমাজের সকল দিকের পরিবর্তে এই দিক্‌টিকেই সর্বতোভাবে আঁক্‌ড়ে ধরেছেন। সমর সেনের কবিতায় শ্রেণী-সংঘর্ষের উত্তাপ আছে, সুকান্তের কবিতাতেও আছে। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের কলকোলাহল ও উত্তেজনা থেকে সমরের কবিতার অবস্থান বহু দূরে. আর সুকান্তের কবিতা সেই কোলাহল-উত্তেজনার একেবারেই কেন্দ্রে অবস্থিত। নজরুলের কবিতার সঙ্গে সুকান্তের কবিতার মিল অনেক—বিষয় ও উপস্থাপনা, উভয়তই। বস্তুত, গণ-সাহিত্যের নিরিখে সুকান্তের 'রানার' কোনোক্রমেই নজরুলের 'কুলি-মজুর' কবিতার চেয়ে অপকৃষ্ট নয় ; কিন্তু 'রিক্তের বেদন' ও 'সর্বহারা'র লেখকের এবং 'সাম্যবাদী'র কবির 'কারার ঐ লৌহকবাট / ভেঙে ফেল্, কর রে লোপাট' আহ্বানে পৌরুষের যে স্পষ্ট প্রকাশ, বিশেষত আবেগের যে গভীর উচ্ছ্বাস, সুকান্তের কবিতায় তা নেই, পরিবর্তে আছে অনভিজ্ঞের আস্ফালন। দু'-জনের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ, নজরুল তাঁর গণকবিতা রচনায় 'হিউম্যানিজম্' ছাড়া অন্য কোনো 'ইজম্'-এর অধীনতা স্বীকার করেন নি, কিন্তু অপক্ক সুকান্তের কাছে কমিউনিজম ছিলো বুঝি-বা হিউম্যানিজমের চেয়েও অনেক বড়ো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুকান্তের মিল সর্বাধিক। মার্ক্স-বাদের ধর্মপ্রচারে উভয়েই রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। কিন্তু গুরু সুভাষের সন্ন্যাসী-কণ্ঠে 'স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! এক পা-ও পিছু হটবো না কেউ, করুক রক্তারক্তি। / স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! পথে আজ মোকাবিলা হোক, কার দিকে কত শক্তি।'—এই নির্ভীক চ্যালেঞ্জ কিংবা 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ'—এই গগনবিদারী চিৎকার শিষ্য সুকান্তের মার্ক্সবাদ ভজনার স্বরগ্রাম (pitch)-কে অনেকখানি ছাপিয়ে গিয়েছে। বয়সের স্বল্পতা এবং অভিজ্ঞতার অল্পতাই কি গুরুর কাছে শিষ্যের এই পরাভবের কারণ ?

'ছাড়পত্রে'র সর্বশেষ কবিতাটির নাম 'হে মহাজীবন'। এই কবিতাটিতে মাত্র আটটি পংক্তির পরিসরে, সুকান্ত তাঁর গদ্যাত্মক (prosaic) কাব্যসৃষ্টির কথা জানিয়ে গিয়েছেন। তা জানাতে গিয়ে তিনি 'প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—' কিংবা

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' ব'লে যতই ঘোষণা করুন অথবা 'পূর্ণিমা-চাঁদ' তাঁর কাছে 'ঝলসানো রুটি'রূপে যতই প্রতিভাত হোক না কেন, কাব্যদৃষ্টির এত গদ্যধর্মিতা সত্ত্বেও কবি হিসেবে তিনি কিন্তু একেবারেই রোম্যান্টিক স্বপ্নশূন্য নন, রোম্যান্টিকতার আশীর্বাদ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত নন। অবশ্য তাঁর রোম্যান্টিসিজম্ আদপেই রবীন্দ্রঐতিহ্যলালিত নয়, তা ম্যাক্সিম গোর্কী'র সংজ্ঞা-নিরূপিত—অর্থাৎ 'রেভলিউশন্যারী রোম্যান্টিসিজম্'। এই রোম্যান্টিকতার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে 'প্রিয়তমাসু'র মতো প্রেমের এবং 'চিরদিনের' ও 'এই নবান্নে'র মতো পল্লীজীবনকেন্দ্রিক কোমল কবিতাগুলিতে। এর মধ্যে 'প্রিয়তমাসু' কবিতাটি দু'টি কারণে বিশেষভাবে আলোচিত হবার যোগ্য। প্রথম কারণ, বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা সুকান্ত লিখেছেন খুবই কম এবং সেই কমসংখ্যকের মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠতম ; আর দ্বিতীয় কারণ, কবিতাটির অন্তিম স্তবকে একটি আশ্চর্য উপমার উপস্থাপনা। সেই স্তবকে এই কবিতার সীমান্তরক্ষীরূপী প্রেমিক পুরুষটিকে এমনই এক হতভাগ্য বাতিওয়ালার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

> যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
> অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
> নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার ॥

'চিরদিনের' কবিতায় গ্রামবাঙলার যে-জীবনচিত্রণ, তা রোম্যান্টিকতার পথ ধ'রে এগোতে-এগোতেই কবিতাটির শেষ দিকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ হ'য়ে উঠেছে। 'এই নবান্নে' কবিতাটিতেও পল্লীবাঙলার প্রত্যাশিত যে-সুখস্বপ্ন দেখি, তা-ও তো বিশুদ্ধ রোম্যান্টিকের চোখেই দেখা ঃ

> এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
> আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান
> পৌষ-পার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।

সুকান্ত বক্তব্যের (ফলে, বিবৃতিপ্রধান) কবি, আঙ্গিকের নন। কবিতার করণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত হওয়ার অবকাশ কিংবা মানসিকতা—কোনোটাই তাঁর ছিলো না। তাঁর কবিতার শব্দ প্রচলিত এবং ছন্দও গতানুগতিক। শব্দব্যবহারে বা ছন্দোনৈপুণ্যে তাঁর কোনো স্বতন্ত্র কৃতিত্ব নেই। তাঁর কবিতার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বক্তব্যের বাহন অধিকাংশ স্থলেই পয়ারজাতীয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দের ঘাতসহতাই তাঁর বক্তব্যের গুরুভার বহনের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। প্রতীক ও রূপকল্প তাঁর কবিতায় কম, উপমা আরো কম। তবে রূপকের অনেক সার্থক ব্যবহার রয়েছে তাঁর কবিতায়—তাঁর কিছুসংখ্যক কবিতা তো আদ্যন্তই রূপক। তাঁর রূপকাশ্রিত কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'ছাড়পত্রে'র 'আগামী', 'চারাগাছ', 'দেশলাই কাঠি', 'সিগারেট', 'চিল' ও বিখ্যাত 'একটি মোরগের কাহিনী' এবং ছড়ার বই 'মিঠেকড়া'র 'ব্ল্যাকমার্কেট', 'পুরোনো ধাঁধা' ও বহুআবৃত্ত 'ভালো খাবার'। এগুলির মধ্যে কবিতায় তাঁর রূপকথাপ্রয়োগ-

নৈপুণ্যের সর্বোত্তম নিদর্শন অবশ্যই 'একটি মোরগের কাহিনী'। কবিতাটির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সুকান্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্রে'র নবম সংখ্যক রচনা 'একটি মোরগের কাহিনী'র সম্ভাব্য রচনাকাল হয় ১৯৪৩ নয় ১৯৪৬। এ-বিষয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেও কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। ১৯৪৩-এ হ'লে দুর্ভিক্ষের সময়ে এবং ১৯৪৬ সালে হ'লে দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে কবিতাটি রচিত। তবে কবিতাটির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ থেকে এটির রচনাকাল হিসেবে ১৯৪৬ সালটিকেই অধিকতর গ্রহণীয় ব'লে মনে হয়। কেননা কবিতাকে সুকান্ত যে-সামাজিক রূপান্তরের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সেই চাওয়ার মূল শিকড়টাই নিহিত ছিলো সমাজবাস্তবতা (social reality)-র উপলব্ধির গভীরে। আর, সেই উপলব্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে সমকালসচেতনতা। সুকান্তের কবিচরিত্রে এই সচেতনতা ছিলো এবং তাঁর কবিতাতেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু 'একটি মোরগের কাহিনী'তে সমকালের যে-প্রতিফলন, তাতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় কোনো প্রত্যক্ষ প্রলম্বন বা প্রসারণ নেই—বরং আছে দুর্ভিক্ষ-পরবর্তীকালীন সঞ্চিত যুগক্ষোভের মানবিক রূপকায়ণ (human allegorisation)। ফলত. ১৯৪৩ নয়, ১৯৪৬-ই এটির রচনাসাল হিসেবে গ্রহণীয়।

কবিতাটি একটি রূপক, নিটোল এবং নির্মম। এটির আপাতরূপের অন্তরালে রয়েছে আরেকটি রূপ, এটির রূপকরূপ ; এবং সেই রূপের তথা রূপকের উন্মোচনেই সম্ভব এটির কাব্যসত্যের উদ্ঘাটন। মধ্যযুগের জীবনবাদী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বহুপঠিত 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী' কবিতায় দেবী অন্নপূর্ণার সঠিক পরিচয় পেয়ে দীন-দরিদ্র ঈশ্বরী পাটনীর যেমন মনে হয়েছিলো 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়', সুকান্তের এই কবিতাটির রূপকোন্মোচনে আমাদেরও তেমনই ধারণা জন্মে—এ-মোরগ তো মোরগ নয়, মানুষ নিশ্চয়। কিন্তু কোন্ সে মানুষ, যে সামান্য একটি মোরগের রূপকে আবৃত ? সে-মানুষ নিঃস্ব ও নিপীড়িত, বুভুক্ষু ও বঞ্চিত। আধা-সামন্ততান্ত্রিক (pseudo-feudal) ও পুঁজিবাদী (capitalist) সমাজব্যবস্থায় সে নির্যাতীত ও নিষ্পেষিত, কিন্তু সহজে বা বিনা সংগ্রামে পর্যুদস্ত নয়। নিজের সামর্থ্যদৈন্য ও অসহায়তা সত্ত্বেও সে সংগ্রামরত—'সুতীক্ষ্ন চিৎকারে' গলাফাটানো 'প্রতিবাদে' মুখর। কিন্তু সমাজের নিম্নকোটির নিপীড়িত মানুষের এত চিৎকারে-প্রতিবাদেও সমাজের উচ্চকোটির নিপীড়ক মানুষদের চৈতন্যের উদয় ঘটে না, তাদের পাষাণ-হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না। ফলে, সামাজিক নিষ্পেষণের জাঁতাকলে তার ঘটে সামূহিক বিলয় (total annihilation)।

কবিতাটিতে 'ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা দু'তিনটে মানুষ' পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের এবং 'শক্ত' ও 'ইমারত' শব্দদ্বয় সমাজের বিত্তবান সম্প্রদায়ের হৃদয়হীনতার প্রতি অভ্রান্ত ইঙ্গিতকারী। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, এত জ্বলন্ত আর্থ-সামাজিক বিষয়স্পৃষ্টতা সত্ত্বেও কবিতাটিতে কোথাও দলীয় রাজনীতির সরাসরি আশ্রয়গ্রহণ নেই, সমাজ-পরিবর্তনের

প্রয়োজনীয়তার তাড়নায় কোনো তূর্যনাদী শ্লোগানধ্বনি উচ্চারিত হয় নি। কিন্তু সমাজ শত্রুদের সনাক্তকরণে (identification) কবিতাটি অভ্রান্ত ও নির্মম। ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আন্তর-স্বরূপ উন্মোচনই কবিতাটিতে কবির মূল অভীষ্ট এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হ'তে গিয়ে নিজেকে তিনি আশ্চর্য সংযমের শাসনে বেঁধেছেন। অন্যথায় সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকথা উচ্চারণের ঢালুপথে কবিতাটি নিশ্চিতরূপেই নেমে যেতে পারতো। কবিতাটির শেষদিকে প্রগাঢ় anticlimax-এর শিল্পকৌশলে নিপীড়িত মানুষের শোচনীয় পরিণতির অবশ্যম্ভাবিতার প্রতি যে-ইঙ্গিত, তাতে পাঠকচিত্ত করুণায় বিগলিত না-হ'য়ে পারে না।

সুকান্তের কবিতায় ব্যক্তির চেয়ে সমাজের এবং চিরকালীনতা অপেক্ষা সাম্প্রতিকতার মূল্যই অধিকতর স্বীকৃত। জনতার কণ্ঠে কন্ঠ মিলিয়েই নিজের কবিতায় তিনি তাঁর জীবনসঙ্গীত রচনা করতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই প্রয়াসে ফ্রীডরিশ্ এঙ্গেলস্-এর 'in order to affect the masses it (poetry) must also give the mass prejudices of the period' উক্তির মর্মসত্যের বাস্তবায়নের আকুতিও একেবারে অলক্ষ্য নয়। গণজীবনস্পর্শব্যাকুলতাতেও (স্মরণীয়, 'ঘুম নেই'-এর 'মণিপুর' কবিতায় তাঁর পংক্তি, 'যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর, / এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।') তাঁর সমকক্ষ কবি আমাদের সাহিত্যে কম। কবি হিসেবে যত, কমিউনিস্ট হিসেবে তার চেয়ে বেশি তিনি পরিচিত হ'তে চেয়েছিলেন এবং হয়েও-ছিলেন। বস্তুত, জনৈকা আত্মীয়াকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, 'আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কী করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট।' এখানেই ঘটেছে তাঁর গোড়ায় গলদ, তাঁর পথভ্রান্তি, দিগ্‌ভ্রষ্টতা ; রাজনীতির কাঁধে নিজে না-চ'ড়ে রাজনীতিকে নিজের কাঁধে চড়াতে গিয়ে (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বললাম) জগৎ ও জীবন-পর্যবেক্ষণগত দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি একেবারেই একপেশে হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, কবিতা ও দলীয় রাজনীতির পৃথিবীপরিধি কখনোই এক নয় ; কোনো 'ইজম'-এর স্থানই জীবনের অবস্থানের চেয়ে ঊর্ধ্বে নয় ; জীবন সকল সময় এবং সকল অবস্থাতেই সকল 'ইজম্'-এর চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক মহৎ॥

আলোচিত কবিদের কাব্যগ্রন্থাবলী

জীবনানন্দ দাশ

১. ঝরা পালক
২. ধূসর পাণ্ডুলিপি
৩. বনলতা সেন
৪. মহাপৃথিবী
৫. সাতটি তারার তিমির
৬. রূপসী বাংলা
৭. বেলা অবেলা কালবেলা
৮. শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১. তন্বী
২. অর্কেস্ট্রা
৩. ক্রন্দসী
৪. উত্তরফাল্গুনী
৫ সংবর্ত
৬. প্রতিধ্বনি
৭. দশমী
৮. কাব্যসংগ্রহ
৯. শ্রেষ্ঠ কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

১. খসড়া
২. একমুঠো
৩. মাটির দেয়াল
৪. অভিজ্ঞান-বসন্ত
৫. দূরযানী
৬. পারাপার
৭. পালা-বদল

৮. ঘরে-ফেরার দিন
৯. হারানো অর্কিড
১০. পুষ্পিত ইমেজ
১১. অমরাবতী
১২. অনিঃশেষ
১৩. শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

১. প্রথমা
২. সম্রাট
৩. সাগর থেকে ফেরা
৪. ফেরারী ফৌজ
৫. হরিণ চিতা চিল
৬. কখনো মেঘ
৭. অথবা কিন্নর
৮. শ্রেষ্ঠ কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

১. মর্মবাণী
২. বন্দীর বন্দনা
৩. পৃথিবীর পথে
৪. কঙ্কাবতী
৫. নতুন পাতা
৬. এক পয়সায় একটি
৭. ২২শে শ্রাবণ
৮. দময়ন্তী
৯. রূপান্তর
১০. দ্রৌপদীর শাড়ি
১১. শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর
১২. যে-আঁধার আলোর অধিক
১৩. মরচে-পড়া পেরেকের গান
১৪. শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিষ্ণু দে

১ উর্বশী ও আর্টেমিস
২. চোরাবালি
৩. পূর্বলেখ
৪. সাত ভাই চম্পা
৫. সন্দ্বীপের চর
৬. অন্বিষ্ট
৭ নাম রেখেছি কোমল গান্ধার
৮. আলেখ্য
৯. তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
১০. স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ
১১. সেই অন্ধকার চাই
১২. সংবাদ মূলত কাব্য
১৩. ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে
১৪. রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে
১৫. ঈশাবাস্য দিবানিশা
১৬. চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর
১৭. উত্তরে থাকো মৌন
১৮. আমার হৃদয়ে বাঁচো
১৯. শ্রেষ্ঠ কবিতা

অরুণ মিত্র

১. প্রান্তরেখা
২. উৎসের দিকে
৩. ঘনিষ্ঠ তাপ
৪. মঞ্চের বাইরে মাটিতে
৫. শুধু রাতের শব্দ নয়
৬. প্রথম পলি শেষ পাথর
৭. খুঁজতে খুঁজতে এত দূর
৮. কাব্যসমগ্র
৯. শ্রেষ্ঠ কবিতা

সমর সেন

১. কয়েকটি কবিতা
২. গ্রহণ
৩ তিনপুরুষ
৪. সমর সেনের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১ পদাতিক
২. অগ্নিকোণ
৩. চিরকূট
৪. ফুল ফুটুক
৫. যত দূরেই যাই
৬. কাল মধুমাস
৭. এই ভাই
৮. ছেলে গেছে বনে
৯. একটু পা চালিয়ে, ভাই
১০. চইচই-চইচই
১১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
১২. শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১. ছাড়পত্র
২. ঘুম নেই
৩. পূর্বাভাস
৪. মিঠেকড়া

) * (